শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
হারিয়ে যাওয়া লেখা

হারিয়ে যাওয়া লেখা

দ্বি তী য় খ ণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হারিয়ে যাওয়া লেখা

দ্বি তী য় খ ণ্ড
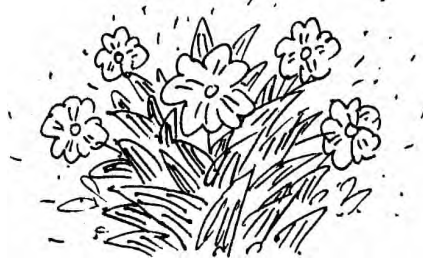
সংগ্রাহক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুব্রত মাজি
ব্যাক কভার পোর্ট্রেট রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

HARIYE JAOWA LEKHA—Vol 2
by Shirsendu Mukhopadhyay
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-506-2

" রা-স্বা "

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

পত্রভারতী প্রকাশিত বই

হারিয়ে যাওয়া লেখা (প্রথম খণ্ড)
শীর্ষেন্দু ৭৫
এককুড়ি একডজন
মনের অসুখ
ঈগলের চোখ
ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে
ঝুড়ি কুড়ি গল্প
শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১
পাঁচটি উপন্যাস
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত
রূপ মারীচ রহস্য
ভৌতিক গল্পসমগ্র

কৈফিয়ত

আমি বড় অগোছালো মানুষ। এটা কোনও গুণের কথা নয়। অগোছালো বলে জীবনে আমি বিস্তর কষ্ট পেয়েছি। অনেক মূল্যবান কিছু হারিয়েও গেছে। তার মধ্যে গল্পের ফাইল কপি থেকে আরও অনেক কিছু। এগারোবার বাসা এবং বাড়ি বদল করার ধাক্কাতেও খুইয়েছি অনেক মহার্ঘ সম্পদ। বর্ধমানের রঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে একজন পরম বন্ধুর মতো এগিয়ে না এলে আমার অনেক মুদ্রিত রচনা হারিয়েই যেত চিরতরে। রঞ্জন দীর্ঘকাল ধরে আমার লেখা সংগ্রহ করেছে, ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও। তার সেই সংগ্রহশালাই এই দুই খণ্ড গ্রন্থের উৎস।

অবশ্য গ্রন্থিত সব লেখাই নিরুদ্দিষ্ট ছিল এমন নয়। কিছু লেখার হদিশ ছিল, কিন্তু আমার সংগ্রহে ছিল না। জন্মান্তর লেখাটি সম্ভবত পুজো সংখ্যার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। আগাগোড়া সংলাপে লেখা গোটা উপন্যাস, কোথাও কোনও ন্যারেশন নেই। ন্যারেশন বা বিবরণ অংশও সংলাপের অঙ্গীভূত। এ ধরনের লেখা এর আগে কেউ লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি শুরু করেছিলাম একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হিসেবেই। এবং দেখলাম, এভাবেও লেখা যায়।

জলতরঙ্গ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম গল্প। তখন আমার বয়স বাইশ কি তেইশ। এম এ পড়ি এবং হোস্টেলে থাকি। গল্পটা তেমন উচ্চমানের নয় হয়তো, কিন্তু আমার এই লেখালেখির জীবনের সূত্রপাত ওই গল্পটি থেকে। তাই ওই গল্পটির প্রতি একটু দুর্বলতা আমার আছে। কয়েকদিন আগে গল্পটার একটা কপি হাতে এল। পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কয়েক লাইন পড়ে আর পড়তে ইচ্ছে হল না। কেন, কে জানে।

তবে প্রথম খণ্ডে একটা গল্প আছে, ভূতের বাড়ি। কে বিশ্বাস করবে যে, এটা আসলে প্রেমের গল্প? প্রেমের গল্প কতভাবে লেখা যায় তারই একটা কসরৎ করতে গিয়ে এই গল্পটির সৃষ্টি হল।

আমি যে খেলা-পাগল তা অনেকে জানে। আমার কাছে ক্রীড়াভূমির মতো এমন আকর্ষক আর কিছুই নয়। বাল্যে কৈশোরে এমন খেলা নেই যা আমি খেলিনি। দারিয়াবান্ধা, কাবাডি, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ডাংগুলি, মার্বেল, হাইজাম্প, লংজাম্প, দৌড়। সবচেয়ে প্রিয় ছিল টেবিল টেনিস। একবার কলেজের চ্যাম্পিয়নও হই। সেই সুবাদেই খেলা বিষয়ক নানা লেখা।

এখন আর রাজতন্ত্র নেই। তবু আমি রাজা বিষয়ক বেশ কিছু গল্প লিখেছি। তার একটা কারণ হয়তো ইংলন্ডবাসীর মতোই আমারও রাজতন্ত্রের প্রতি অমোঘ একটু দুর্বলতা আছে। রাজতন্ত্রের সবটাই খারাপ এমন আমার মনে হয় না। গল্পে রাজাকে একজন মহান ব্যক্তির প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত করেছি। কখনো ট্রাজিক, কখনও সন্ন্যাসী বা নিছক মজার চরিত্র হিসেবে। মনে হয় আমার রাজার গল্পগুলিরও একটা ভিন্ন সংকলন হতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া লেখা মানে একটা মিশ্রণ। কিছু গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ, রিপোর্টাজ ইত্যাদি। কাজেই এখানে আমার নানা চরিত্রেরই প্রকাশ।

এখানে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু উদ্ধার করা লেখা সন্নিবেশিত হল। আরও কিছু নিরুদ্দেশ লেখা আছে, যা অনেক আগেকার কয়েকটি অপ্রধান, ছোট পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। যদি আমার ভাগ্যক্রমে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে আবার তা নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হওয়া যাবে।

২১.১.২০১৮
কলকাতা

বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলা ভাষার কিংবদন্তী কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর প্রায় দুষ্প্রাপ্য কিছু রচনা পুনরুদ্ধার করে দুই খণ্ডে 'হারিয়ে যাওয়া লেখা' গ্রন্থটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রায় পঁচানব্বই ভাগ লেখা বই আকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

এই সুবৃহৎ সংকলনের দুটি খণ্ডে লেখকের ৬টি উপন্যাস, ৭৩টি বিভিন্ন স্বাদের গদ্য-রচনা ও ৫৭টি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে।

পূর্বে গ্রন্থিত যে দু-একটি লেখা এই সংকলনে আছে, সেগুলির অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে হয়। যেহেতু শুরুতে লেখকের 'প্রথম গল্পের জন্মবৃত্তান্ত' শীর্ষক মূল্যবান রচনাটি রাখা হয়েছে, তাই সঙ্গত কারণে তাঁর প্রথম গল্প 'জলতরঙ্গ' এই সংকলনের 'গল্প' বিভাগে সর্বাগ্রে জায়গা দিতে হয়েছে।

শীর্ষেন্দু বাংলা সাহিত্যের শীর্ষবিন্দু। তাঁর বৃহৎ আকারের উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক-একটি মাইল ফলক। 'উপন্যাস সমগ্র'-তে সেই বড় মাপের উপন্যাসগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে সংকলিত করা হয় এবং তার সঙ্গে ছোট মাপের দু-একটি কাহিনি সংযোজিত হয়। অনেকে তাই এই ধরনের 'সমগ্র' সংগ্রহ করতে অনীহা বোধ করেন। এই সংকলনে গৃহীত 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি সেই রকমই একটি স্বল্প পরিচিত ভিন্ন স্বাদের ছোট উপন্যাস।

এছাড়া এই সংকলনে গৃহীত লেখকের 'অভিযান' নামক অগ্রন্থিত কাহিনিটি একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনির একটি সার্বিক আভাস এই রচনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

এই সংকলনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হল, লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক স্বাদু প্রবন্ধমালার উজ্জ্বল উপস্থিতি। খেলাধুলা, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনাগুলি ছাড়াও লেখকের একগুচ্ছ অগ্রন্থিত আধ্যাত্মিক রচনা রয়েছে এই সংকলনে। সংযোজিত হয়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে একমাত্র চলচ্চিত্র সমালোচনাটিও।

এই সংকলনের প্রবন্ধ বিভাগে রইল লেখকের অগ্রন্থিত একরাশ স্মৃতিকথার পসরা, যা পাঠকদের নিয়ে যাবে মায়াময় অতীতের হারিয়ে যাওয়া সময়ের আনন্দ-ভ্রমণে। 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' বিষয়ক রচনাগুলোতে লেখক যেমন নিজের সাহিত্যিক জীবনের গল্প শুনিয়েছেন, করেছেন তাঁর সমসাময়িক লেখকদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা, তেমনি তিনি করেছেন আশাপূর্ণা দেবী, কমলকুমার মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সাগরময় ঘোষ প্রমুখদের মতো বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে স্মৃতিচারণা।

অঞ্জন দত্তর গানের সেই বিখ্যাত লাইন মনে পড়ে? 'তুমি না থাকলে তোমার চিঠি জমানোই হত না!' হ্যাঁ, এখানেও কথাটা একশো ভাগ সত্যি! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সোনার কলমটি না থাকলে ছড়ানো-ছিটানো এই মণিমুক্তগুলো সংগ্রহ করে রাখাই হত না। তাঁর লেখনী আশৈশব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সংকলনটি তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

পত্রভারতী প্রকাশনার কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্রয় ছাড়া এই মহাগ্রন্থটির নির্মাণ কখনোই সম্ভব হয়ে উঠত না। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। চুমকি চট্টোপাধ্যায় উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছেন, তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এই গ্রন্থটির গবেষণা পর্বে প্রধান সহায়ক হিসেবে

পাশে থেকেছেন বন্ধু সন্দীপ মণ্ডল। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া বাতুলতা। ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার মাতৃদেবী ও অর্ধাঙ্গিনীসমেত আমার বৃহত্তর পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট পত্রভারতীর সকল কর্মীবৃন্দের।

এবার পাঠকদের কোর্টে বল। তাঁদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১লা জানুয়ারি ২০১৮
শ্রীপল্লী, বর্ধমান

সূচিপত্র

গৌরবের শতবর্ষ

উপন্যাস

বাঁচার জন্য

হাই ব্লাড সুগার, প্রোস্টেট, রক্তচাপ, রেটিনা ডিটাচমেণ্ট এসব নিয়ে বড্ড ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন শিবশঙ্কর দত্ত। বাহাত্তর চলছে। শরীরে যে এত বায়নাক্কা থাকতে পারে তা আটষট্টি অবধি বুঝতেই পারেননি। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে যে, শরীরের এইসব নানা গণ্ডগোল দেখা দেওয়ায় সময় কাটছে মন্দ নয়। রোগগুলো নিয়েই ভাবেন, রোগ সম্পর্কেই কথা বলেন, ডাক্তার-বদ্যিদের সঙ্গেই তাঁর নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। রিটায়ার করার পর আটষট্টি বছর বয়স অবধি সময়টা একঘেয়ে কেটেছে। এখন আর একঘেয়ে নয়।

মাধবী দত্ত তাঁর চেয়ে এগারো বছরের ছোটো। রোখা-চোখা নারীবাদী, স্পষ্টবক্তা এবং একটু বহির্মুখী এই মহিলার সঙ্গে শিবশঙ্করের দেখাসাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা যা হয় তা সকালের দিকে। একষট্টি বছর বয়সী মাধবী একটি বড় বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস। তাছাড়া কয়েকটা সমিতির সদস্যা। তাঁর অনেক কাজ। শিবশঙ্করের দেখাশোনার জন্য একজন মধ্যবয়সী মহিলা আছে। তাকে আয়া বলা যেতে পারে। তার নাম মধুশ্রী। ভদ্রঘরের বউ ছিল, স্বামী মারা যাওয়ায় আতান্তরে পড়ে এ কাজ করছে। শিবশঙ্কর তাকে বেশি হুকুমটুকুম করেন না। মধুশ্রীর বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।

মাধবী শিবশঙ্করের স্ত্রী, সকাল সাতটায় দুজনের কথা হচ্ছিল খাওয়ার টেবিলে বসে।

মাধবী বলেছিলেন, দু-চার দিনের মধ্যেই টেলিফোনটা এসে যাবে।

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এখন আর টেলিফোন দিয়ে হবেটা কী?

কেন, এখনই তো বেশি দরকার। শরীর-টরীর খারাপ হলে ডাক্তার ডাকতে বা খবর দিতে সুবিধে।

শিবশঙ্কর কথার পিঠে কথা বলতে পারেন না। টেলিফোনের জন্য সম্প্রতি যে একটা চেষ্টা চলছে তা তিনি জানেন। ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ নয়। কেন নয় তা তিনিও জানেন না। তবে মনে হয়, টেলিফোন নেই বলেই এখনও দু-চারজন লোক মাঝে মাঝে খবর নিতে বাড়িতে আসে। টেলিফোন হলে আর আসবে না, টেলিফোনেই খবর নিয়ে দায় সারবে।

শিবশঙ্কর শুকনো টোস্ট আর শশা খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। দুটিই শক্ত জিনিস। বাহাত্তর বছরের দাঁতে আর সেই জোরটা নেই।

শোনো, কাল থেকে আমি আর সকালের জলখাবার খাব না।

বিস্মিত মাধবী বললেন, কেন?

শিবশঙ্কর বললেন, দরকারটা কী? এখন যত না খাওয়া যায় শরীর তত ভালো থাকে।

আসলে এরা তাঁর তেমন খোঁজখবর রাখে বলে শিশঙ্করের মনে হয় না। তিনি শশা অর টোস্ট সরিয়ে দিলেন।

পাশেই মধুশ্রী দাঁড়ানো। তার দিকে চেয়ে বললেন, কফি কি হবে?

রোজই হয়। মধুশ্রী রান্নাঘরে গেল এবং চিনি-ছাড়া গরম কফির কাপ এনে সামনে রাখল।

মাধবী একটা চিরকুটের মতো জিনিস দেখছিলেন। বললেন, রাকার জন্মদিন বাইশে মার্চ। প্রবীর চিঠি পাঠিয়েছে।

চিঠি?

হ্যাঁ। অফিসের পিওনের হাতে।

শিবশঙ্কর একটু ভাবলেন, ভাবতেই হলো। প্রবীর তাঁর বড় ছেলে। নিজস্ব ফ্ল্যাটে চলে গেছে নিউ আলিপুরে। কালেভদ্রে অসে।

শিবশঙ্কর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, ও।

মাধবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ এবং মাধবীর চব্বিশ। মাধবী কালো, ছিপছিপে, কাটা কাটা মুখ-চোখওয়ালা যুবতী ছিলেন। কালোর মধ্যে সুন্দর বলা যায়। মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছিল। শিবশঙ্কর মাধবীকে ওই কারণেই একটু সমীহ করতেন। এখনও করেন।

মাধবী হিসেব করে বললেন, বাইশে মার্চ মানে তো সামনের বুধবার। যেতে হবে।

শিবশঙ্কর উদাস মুখে কফিতে চুমুক দিলেন। যাওয়া-টাওয়া তাঁর পোষায় না।

মাধবী ব্যাপারটা জানেন, বললেন, যাবে তো!

শিবশঙ্কর কোথায় যাওয়ার কথা হচ্ছে জেনেও অন্যমনস্কতার একটু অভিনয় করে বললেন, কোথায়?

নিউ আলিপুরের কথা বলছি।

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললেন, না না, আমি কোথায় যাব?

খারাপ দেখাবে না?

শিবশঙ্কর ঠান্ডা গলাতেই বললেন, খারাপ দেখাবে কেন? আজকাল কিছুই খারাপ দেখায় না। আমার শরীরেরও তো একটা অজুহাত আছে।

মাধবী তাঁর দিকে একটু চেয়ে থাকলেন। সে দৃষ্টির কোনও উদ্দেশ্য নেই। শুধুই তাকিয়ে থাকা। শিবশঙ্কর এসব আজকাল বুঝতে পারেন।

কফিটা খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন। মার্চের গরম কিছু কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে। দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় পাতা একটা ইজিচেয়ারে তিনি রোজই সকালে কিছুক্ষণ বসেন। খবরের কাগজ থাকে, আর থাকে একটা ট্র্যানজিস্টার রেডিও, একটা জলের জগ, কিছু বইপত্র আর ম্যাগাজিন।

সময় কাটানোটাই একটা সমস্যা। এ সময়টায় কেউ এলে ভালো হয়। কিন্তু কে আসবে? দোতলা বাড়িটা করেছিলেন প্রবীর আর প্রতুল দুই ছেলে থাকবে ভেবে। বেশ বড় বাড়ি। থাকলে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তাদের পোষাল না। প্রবীর আই আই টি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। বড় কোম্পানিতে বিরাট চাকরি, তার আলাদা একটা জীবন আছে বোধহয়। তাই এখানে থাকল না। প্রতুলও কম যায় না। সেও ইঞ্জিনিয়ার, থাকে বিদেশে। কিন্তু তারও কলকাতায় আয়রনসাইড রোডে বিরাট ফ্ল্যাট কেনা আছে।

দোতলা বাড়িটা কোনও কাজে লাগবে কি? ঠিক বুঝতে পারেন না শিবশঙ্কর। তবে একতলাটা তিনি ভাড়া দিয়েছেন একটি ব্যবসায়ী গুজরাটি পরিবার থাকে।

শিবশঙ্কর স্বস্তিবোধ করেন মাধবী বেরিয়ে যাওয়ার পর। যতক্ষণ মাধবী থাকেন ততক্ষণ তিনি একটু ধাতস্থ থাকেন। কেন কে জানে মাধবীর কাছে তিনি কোনওদিনই সহজ নন।

মাধবী যে বেরিয়ে গেলেন তা টের পেলেন শিবশঙ্কর। যাওয়ার আগে মধুশ্রীকে বললেন, ধোপার কাছে ইস্তিরির কাপড় রয়েছে পাঁচখানা, এবেলাই আনিয়ে নিও।

ঠিক আছে।

আমার আজ ফিরতে রাত হবে।

ঠিক আছে।

শিবশঙ্কর বাইরে মাঠের রোদের দিকে চেয়ে রইলেন। সকাল চলেছে মধ্যাহ্নের দিকে, তারপর আসবে অপরাহ্ন, তারপর অন্ধকার।

শিবশঙ্কর ডাকলেন, মধুশ্রী!

যাই।

মধুশ্রী সামনে এসে দাঁড়াল। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারা ভালোই। মুখে সবসময় একটা ক্লান্তির ভাব থাকলেও মধুশ্রী খুবই পরিশ্রমী এবং কাজের মহিলা। মধুশ্রীকে ন'শো টাকা বেতন দেওয়া হয়, তা ছাড়া খাওয়া-পরা।

শিবশঙ্কর মধুশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন, আমার প্রেশারটা আজ বোধহয় বেড়েছে।

ডাক্তারকে খবর দেব?

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললেন, না না, বাড়ি এলেই তো ভিজিট নেবে! আমি বরং একটু হেঁটে গিয়ে কালু ডাক্তারকে প্রেশার দেখিয়ে আসি।

মধুশ্রী একটু সন্দিহান গলায় বলল, কালু ডাক্তার! সে কি তেমন ভালো?

ভালো কিনা কে জানে! রুগী তো হয়। আর দেখবে তো প্রেশার। তা বেরোচ্ছিই যখন বাজারের দিকটা ঘুরে আসব'খন। কিছু লাগলে বলো।

না, কিছুই লাগবে না। কিন্তু আপনি তো আজ সকালে কিছুই খেলেন না। একটু দুধ খেয়ে বেরোবেন কি?

না। দুধ আমি পছন্দ করি না।

শিবশঙ্কর কী পছন্দ করেন বা করেন না সে-খবর মধুশ্রী বা মাধবী কেউই রাখে না। এতে তাঁর প্রচণ্ড রাগ এবং অভিমান হয়। কিন্তু কী আর করবেন!

শিবশঙ্কর উঠে পোশাক পরলেন। পোশাক বলতে ধুতি আর পাঞ্জাবি। আগে প্যান্ট-শার্ট পরারই অভ্যোস ছিল। আজকাল প্যান্ট-শার্ট ভারী লাগে।

কালু ডাক্তারের বয়স ষাটের ওপর। কাঁচা-পাকা চুল, গায়ের রং কালো। কালু ঘোর কমিউনিস্ট, পার্টি করেন বলেই বোধহয় ডাক্তারিটা মন দিয়ে করলেন না। রোজগার-পশার তেমন নেই।

শিবশঙ্কর যখন ঢুকলেন তখন কালু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। চেম্বার ফাঁকা। তেমন সাজানো-গোছানো চেম্বার নয়। চেয়ার-টেবিলগুলো পর্যন্ত যাচ্ছেতাই।

তাঁকে দেখে কালু ডাক্তার খবরের কাগজটা সরিয়ে বললেন, কী হলো?

প্রেশারটা একটু দেখে দাও। শরীরটা বেতাল লাগছে।

প্রেশার! বড়িটা রেগুলার খান না?

খাই। তবু ফ্রাকচুয়েট করে।

কালু তাঁর পুরনো যন্ত্রটা বের করে লাগালেন। তারপর বেশ যত্ন নিয়ে দেখেটেখে বললেন, নাঃ, তেমন কিছু বাড়াবাড়ি তো নয়।

বলছো!

যন্ত্র বলছে।

তোমাদের যন্ত্রগুলোকে আমার বিশ্বাস হয় না।

তাহলে আর কী করা?

শরীর বেতাল লাগছে কেন?

কালু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হেসে বললেন, আপনি ইদানীং বেশ রোগা হয়ে গেছেন। কেন বলুন তো!

রোগা! কই, আমি তো টের পাইনি।

ওজন নেন?

না না, ওসব নিয়ে কি হবে?

রোগা হওয়া ভালো, কিন্তু অপুষ্টি ভালো নয়।

শিবশঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যার এত রোগ তার অপুষ্টি তো হবেই। সুগার আছে না!

ওঃ, তাই তো! আমি তো আপনার চিকিৎসা রেগুলার করি না, তাই জানি না। এনিওয়ে, প্রেশারটা নিয়ে এখনই ভাববার কিছু নেই।

আমি একটু লোনলি, জানোই তো?

কালু হেসে বললেন, লোনলি কারা জানেন? যাদের কোনও ইনভলভমেন্ট নেই। ঘরে বসে থাকেন কেন, এই বয়সেও অনেক কিছু করার আছে।

তোমার পার্টি আছে, আমার কী আছে বলো তো!

চাইলে আপনারও হবে। আন্তরিকভাবে কিছু করতে চেয়েই দেখুন।

কালু তাঁকে ভজাতে চাইছেন কিনা তা বুঝতে না পেরে কালুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শিবশঙ্কর। তারপর বললেন, কী করার কথা বলছো? তোমার মতো পার্টি?

না না দাদা, পার্টি আমিও করি না। তবে রিলেটেড কিছু ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। আপনাকে তাও করতে বলি না। অনেক কিছু করার আছে।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু কী করা যায় বলো না?

টাকা-পয়সার কথা ভাবলে কিন্তু হবে না।

না হয় না-ই ভাবলাম। সেবামূলক কাজটাজ কিছু?

যদি তাই হয়?

করতে পারি। আপত্তি নেই।

রিটায়ার করেছেন কতদিন?

তা হলো বেশ কয়েক বছর। শরীরে জরা-ব্যাধি এসে গেল।

জরা-ব্যাধিকে ডেকে আনলে তো আসবেই। শরীর বসিয়ে রাখলেন, মনটাকে অকেজো করে দিলেন, হবে না রোগ?

ঠিক আছে। এ নিয়ে ভাবব। তুমিও ভাবো।

শরীর বেচাল লাগছে বলছিলেন, কীরকম বেচাল?

দুর্বল লাগছে। সহজেই হাঁফিয়ে যাচ্ছি।

সুগার বাড়েনি তো!

বাড়তে পারে।

নাড়ী আর বুকটা একটু দেখা দরকার। শুয়ে পড়ুন তো।

শিবশঙ্কর শুয়ে পড়লেন। কালু ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে পরীক্ষা করার পর বললেন, ব্লাড সুগারটা এবার চেক করান। সুগারের জন্য ওষুধ খাচ্ছেন কি?

বাড়লে খাই। নইলে ডায়েটের ওপর থাকলে খাওয়ার দরকার হয় না।

আগে ব্লাডটা করিয়ে নিন। সুগার যদি কন্ট্রোলে থাকে তবে ধরতে হবে জেনারেল ডেবিলিটি। আপনার ট্রিটমেণ্ট কে করে?

আছে একজন। আমার বউ তাকে ঠিক করেছে। ডাক্তার বিনায়ক সেন।

ওঃ। তাঁকে একবার দেখান।

শিবশঙ্কর উঠে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, আমার রোগ নিয়ে ভেবো না। বয়স হয়েছে, ওসব হবেই। বরং তোমার প্রস্তাবটা বেশি কাজ দেবে। আমাকে একটা কাজ দাও তো!

সেটার কথাই ভাবছি। কী কাজ যে আপনাকে দেওয়া যায়!

আমি একসময়ে ছবি আঁকতে পারতাম।

বাঃ, তাহলে ছবি আঁকুন।

আঁকবো! না হয় তাই আঁকলাম। কিন্তু তাতে কী হবে?

কালু হেসে বললেন, সেটা বলা মুশকিল, এঁকেই দেখুন। হয়তো এমন মজা পেয়ে যাবেন যে বাহুল্য চিন্তা ঝরে যাবে। কী ছবি আঁকবেন, প্যাস্টেল না ওয়াটার কালার?

দেখি। কতকাল আঁকিনি, হাত স্টেডি নেই।

একটা কাজ করুন, একটা কামপোজ খেয়ে নিয়ে এখন গিয়ে একটু শুয়ে থাকুন। ঘুম পেলে ঘুমোবেন। দুপুরে ভাতটা খাবেন না। দুধ-রুটি খেয়ে এবেলাটা কাটিয়ে দিন।

শিবশঙ্কর মানিব্যাগ বের করতেই কালু ডাক্তার হাতজোড় করে বললেন, আজ থাক। আমি কোনও চিকিৎসা করিনি এখনও। ভিজিটটা ডঃ সেনকেই দেবেন।

শিবশঙ্কর একটু অপ্রতিভ মুখে বললেন, ডাঃ সেন আমার স্ত্রীর চেনা। আমার তো কোনও বাছাবাছি নেই।

ভিজিট লাগবে না। আসুন।

শিবশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। এখন বেশ চড়া রোদ। ছাতা নিয়ে বোরোনো উচিত ছিল। রোদটা খারাপ লাগছে। বাজারের দিকটায় হাঁটা ধরেও দাঁড়ালেন। না, কাজটা উচিত হবে না। রোদে ঘোরাঘুরি এই ঋতুতে ভালো নয়।

শিবশঙ্কর ফিরলেন। বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখলেন, তিনজন লোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে সাইকেল দাঁড় করানো। লোকগুলোর হাতে কিছু তার-টার জাতীয় জিনিস, মিস্ত্রিই হবে।

শিবশঙ্কর কাছাকাছি হতেই জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার?

লোকগুলো বলল, দোতলায় টেলিফোন লাগাতে এসেছি, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই।

নেই! সে কী? বাড়িতে তো মধুশ্রী আছে।

দশ মিনিট ধরে কলিংবেল বাজিয়েছি। কেউ দরজা খোলেনি।

বলেন কি? আসুন তো আমার সঙ্গে। আমিই দোতলায় থাকি।

শিবশঙ্কর একটু বেহিসেবী দ্রুত পায়েই দোতলায় উঠলেন। বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাতে লাগলেন, কিন্তু কেউ দরজা খুলল না।

পিছনে মিস্ত্রিরা দাঁড়িয়ে। কী করবে বুঝতে পারছে না। মধুশ্রী বাথরুমে গেলেও এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। মধুশ্রীর সবই চটপট সারা হয়ে যায়।

মিস্ত্রিদের একজন বলল, আমরা বরং পরে আসব।

শিবশঙ্কর বললেন, একটু দাঁড়ান।

তাঁর একটু ঘাম ঘাম ভাব হচ্ছে। শরীরটা কাহিল লাগছে। তবু একটু শক্ত হয়ে বললেন, একটা কাজ করবেন?

কী কাজ?

দরজার লকটা ভাঙতে পারবেন?

মিস্ত্রিরা অবাক হয়ে বলল, ভাঙতে হবে? কিন্তু—

আমার কাজের লোকের ভিতরে থাকার কথা। সে যখন সাড়া দিচ্ছে না তখন একটা কিছু হয়ে থাকবে। আপনাদের ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না, বরং একতলায় একটি বউ থাকে, তাকে ডেকে আনুন, সাক্ষী থাকবে।

তাই হলো। মিস্ত্রিদের একজন গিয়ে একতলা থেকে নয়না নামে বউটিকে ডেকে আনল। নয়নার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। দেখতে ভারি মিষ্টি আর সবসময় মুখে হাসি।

কী হয়েছে আঙ্কেল?

তা তো বুঝতে পারছি না। মধুশ্রী সাড়া দিচ্ছে না।

কোথাও যায়নি তো?

না। মধুশ্রী তো এসময়ে কোথাও যায় না।

নয়না হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, একটু আগে, আধঘণ্টা হবে, ওপরে কে যেন একবার একটা চিৎকারের মতো করছিল।

চিৎকার?

হ্যাঁ, আমি রান্না করছিলাম, তখন শুনেছি। খুব সিরিয়াস কিছু নয়। দুধ পড়ে গেলে, বাসন ভাঙলে বা কোনও ভুল করলে আমরা যেমন চেঁচিয়ে উঠি তেমনি।

সেটা কী মধুশ্রীর গলা?

হ্যাঁ। তাই হবে।

শিবশঙ্কর মিস্ত্রিদের দিকে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে মধুশ্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু সাহায্য করবেন কি?

তিনজনের মধ্যে একজন বলল, ঠিক আছে, দেখছি। দরজার এই তালা তো খোলা যাবে না। ভাঙলে আপনার বেশ লস হবে কিন্তু।

হোক।

মিস্ত্রিরা কিছুক্ষণ তালার ফুটোয় স্ক্রু ড্রাইভার আর তার ঢুকিয়ে খোলার চেষ্টা করল। পারল না। তারপর তিনজনে পর্যায়ক্রমে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকল, তাতেও মজবুত দরজা ভাঙল না।

নয়না বলল, আমার কাছে অনেক রকমের চাবি আছে। নিয়ে আসছি, যদি কোনওটা লেগে যায়।

নয়না চার গোছা চাবি নিয়ে এল। সবই চ্যাপ্টা গোছের চাবি। চেষ্টা করতে লাগল। কোনওটা ঢোকে তো ঘোরে না। কোনওটা ঘুরেই যায়, কাজ হয় না। তবে প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টার পর একটা চাবি বরাতজোরে লেগে গেল। কয়েকবার চেষ্টার পর কট করে খুলে গেল দরজাটা।

মধুশ্রীকে খুঁজতে হলো না। সে বাইরের ঘরের মেঝের ওপরেই টান শুয়ে আছে। চারদিকে রক্তের পুকুর, তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা হাতুড়ি। মাথাটা থ্যাঁতলানো। মাথার অবস্থা দেখে সন্দেহের কোনও কারণই থাকে না যে মধুশ্রী বেঁচে নেই।

শিবশঙ্কর স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। নয়না দরজার কাছেই মাথা ঘুরে বসে পড়ল। তারপর ওয়াক তুলতে লাগল। মিস্ত্রিরা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে বলল, বাবু, আমরা বরং যাই—

শিবশঙ্কর তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন, আপনারা পুলিশে খবর দিন।

দুই

বড়বাবু ডাকলেন, দত্ত!

বিটু পাশের ঘরে সোজা হয়ে বসে বলল, ইয়েস স্যার।

দেখ তো, একটা মার্ডার কেস।

মার্ডার! বলে বিটু চেয়ার ছেড়ে বড়বাবুর ঘরে চলে এল। বড়বাবু নয়ন ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হতে হতে বললেন, জিপে গিয়ে ওঠো, আমি টয়লেট ঘুরে যাচ্ছি।

বিটুর বয়স কম, উৎসাহ বেশি। পুলিশের চাকরির চেয়ে তার উৎসাহ বেশি স্পোর্টসে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে, নাটকে এবং মাঝে মাঝে কবিতা লেখাতেও। পুলিশের চাকরিতেও সে যে খুব নিরুৎসাহ তা নয়। তবে অপরাধজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়তো তার তেমন পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে সে বড়বাবুর কাছে এজন্য ধমক খায়।

মার্ডার কেস! মার্ডার কেস! মনে মনে কথাটা আবৃত্তি করতে করতে সে আরও একজন এস আই অমিত বোস, দুজন কনস্টেবল এবং জিপের ড্রাইভারকে সদরে জড়ো করে ফেলল। মার্ডার কেসটা সবসময়েই গুরুতর ব্যাপার।

বড়বাবু বেশ নাম করা ওসি। কিন্তু ইদানীং তাঁর মনের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তাঁর এগোরো বছরের ছেলের সাঙ্ঘাতিক জ্বর যাচ্ছে, সঙ্গে পেট খারাপ। জ্বর একশো পাঁচ-ছয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ডাক্তাররা সন্দেহ করছে, টাইফয়েড। ছেলেটা বড়বাবুর প্রাণ।

বিটু বলল, স্যার, আপনার না গেলেও হবে। আমরা প্রথমটায় দেখে-টেখে আসি।

বড়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, না হে, পরে জবাবদিহি করতে হবে। ফটোগ্রাফার চলে গেছে স্পটে।

কে খুন হয়েছে স্যার?

একজন মহিলা। এক ফ্যামিলির আয়া।

ওঃ।

জিপ ছেড়ে দিল। খুনটুন পুলিশের কাছে নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার।

অমিত বোস চাপা গলায় বিটুকে বলল, ইয়ং নাকি?

কে জানে!

স্পটে বিস্তর ভিড় জমে গেছে। লোকজন সরিয়ে তারা ওপরে উঠল। কনস্টেবল দুজন ঘর থেকে অনভিপ্রেত বাইরের লোকজন বের করে দিল। রইলেন শুধু বাড়ির কর্তা, তিনজন টেলিফোন মিস্ত্রি এবং একজন মহিলা, যিনি এবাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে।

প্রাথমিক জেরার পর যা জানা গেল তার মাথামুণ্ডু নেই। খুন হওয়া ভদ্রমহিলার নাম মধুশ্রী গুপ্ত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত খবর বা পরিচয় শিবশঙ্কর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, আমার স্ত্রী জানেন, উনিই চাকরি দিয়েছিলেন ওকে।

কত বয়স হবে মধুশ্রীর? বড়বাবুর জিজ্ঞাসা।

আমার ধারণা নেই। চল্লিশ-টল্লিশ।

কেউ দেখা করতে আসত?

না।

বিধবা বললেন না? ছেলেপুলে?

বোধহয় নেই।

আপনার স্ত্রীকে কখন পাওয়া যাবে?

বলে গেছে রাত হবে।

আপনার বাড়িতে কে কে আসে?

তেমন কেউ না। কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা, জমাদার এরাই নিয়মিত আসে। আর ঠিকে ঝি।

মধুশ্রীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসত না?

আমার জানা নেই।

আপনি তো রিটায়ার্ড ম্যান, বাড়িতেই থাকেন, কখনও কাউকে আসতে দেখেননি?

না।

আপনার সঙ্গে ওঁর কথাবার্তা হতো না?

না। কাজের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আমার পছন্দ নয়।

মধুশ্রীর কোনও ঠিকানা নেই?

আমার স্ত্রীর কাছে থাকতে পারে।

আপনি কতক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন?

বোধহয় চল্লিশ মিনিট।

এর মধ্যেই খুনটা যখন হয়েছে তখন ধরে নিতে হবে খুনী বা খুনীরা এই বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল।

তা হবে। আমার শরীরটা ভালো নেই। আমি একটু ওঘরে গিয়ে শুয়ে থাকব কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যান। বরং একটা প্রেশারের ট্যাবলেট খেয়ে নিন।

খেয়েছি। একটা কামপোজও। ঘটনাটা আমাকে ভীষণ—

জানি।

শিবশঙ্কর চলে যাওয়ার পর বড়বাবু নয়ন ঘোষ নয়নার দিকে তাকালেন। তাকাল বিটু আর অমিতও। ফুটফুটে সুন্দর চেহারার নয়না ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।

বাংলা জানেন?

জানি।

কী হয়েছিল বলবেন?

কিছু টের পাইনি। শুধু একবার মধুদিদি একটা চিৎকার মতো করেছিলেন।

কিরকম চিৎকার?

ও বাবা বা ওরকম কিছু।

আর কোনও শব্দ পাননি?

না তো।

পড়ে যাওয়ার শব্দ-টব্দ?

না।

দেখছেন তো মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়েছে। তাতেও শব্দ হওয়ার কথা।

আমি কিছু শুনিনি। একতলা থেকে দোতলার শব্দ বিশেষ পাওয়া যায় না।

মধুশ্রীর সঙ্গে আলাপ ছিল?

ছিল।

কীরকম মহিলা?

ভালোই তো। নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন।

খুব ভালো করে ভেবে বলুন, এবাড়ির মালিকের বা মালকানির সঙ্গে মধুশ্রীর কেমন সম্পর্ক ছিল?

যতদুর জানি খুবই ভালো, বিশেষ করে আন্টির সঙ্গে।

ঝগড়াঝাটি হতো না?

না। এরা খুব কোয়াইট পিপল, সাড়া-শব্দই পাওয়া যেত না।

মধুশ্রীর সঙ্গে আপনার কথা-টথা হতো? মানে পারসোনাল লেভেলে?

খুব কম।

নিজের সম্পর্কে উনি কখনও কিছু বলেছেন?

তেমন কিছু নয়। উনি উইডো ছিলেন।

ছেলেপুলে?

কখনও শুনিনি।

ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। তবে তদন্তের জন্য আপনাকে পরে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার হতে পারে।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বড়বাবু বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, দত্ত, কিছু পেলে?

বিটু মৃতদেহের মুখের দিকে খানিকটা ভয়ার্ত মুখে চেয়ে ছিল। খুব মৃদু স্বরে বলল, না, স্যার।

কী দেখছো ওরকমভাবে? চেনা নাকি?

বিটু একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, চেনা কিনা বুঝতে পারছি না। রক্তটা মুছলে বুঝতে পারব। চেনা-চেনা ঠেকছে।

তাহলে তো তুমিই আমার প্রাইম উইটনেস। ভালো করে দেখো।

বিটু বিতৃষ্ণ মুখে বলল, দৃশ্যটা হরিবল স্যার।

আরে, পুলিশের চাকরিতে এসব কত দেখতে হয়। মেমারিটা একটু প্রোব করো। দেখো, কিছু বেরিয়ে আসে কিনা। বোস, তুমি কিছু পেলে?

অমিত বোস মাথা নেড়ে বলল, কিছু না স্যার। জাস্ট যা দেখছি তাই। হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়েছে, এবং দরজা খোলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাটাক হয়। তাই ডেডবডি দরজার এত কাছাকাছি। ডেথ অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস।

হাতুড়িটা কি খুনী সঙ্গে এনেছিল বলে মনে হয়?

মোস্ট প্রোবাবলি।

আর কী মনে হচ্ছে?

ক্রুয়েল মার্ডার। খুব আক্রোশ থেকে।

গুড। ভেরি গুড। দেন দেয়ার ইজ এ স্টোরি ইন দা ব্যাকগ্রাউন্ড। দি লেডি হ্যাড এ পাস্ট। ডিটেলস নোট করে নাও।

হ্যাঁ, স্যার।

আমি যাচ্ছি। আমার ছেলের ব্লাডের রিপোর্টটা নিতে হবে। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার কথা।

আপনি যান স্যার।

আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বোলো। দু'পাশের বাড়ি আর উল্টো দিকের বাড়ি।

আপনি ভাববেন না স্যার। রুটিন চেক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে আমি চলি।

বড়বাবু চলে যাওয়ার পর অমিত বোস বিটুর দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই মহিলা আপনার চেনা নাকি?

বিটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, মনে হচ্ছে। কিন্তু পিন পয়েন্ট করতে পারছি না। মধুশ্রী নাম বলছিল না?

হ্যাঁ।

মাধবী ফিরলেন রাত সাড়ে আটটায়। তখন মধুশ্রীর মৃতদেহ অপসারিত হয়েছে। ঘরে হত্যাকাণ্ডের কোনও চিহ্ন নেই। পাড়াতে ঢুকেই খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন মাধবী। বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ দাঁড়ানো। দুজন সেপাই দরজায় অপেক্ষা করছিল। পরিচয় পেয়ে ছেড়ে দিল। বলল, ওপরে ছোটোবাবু অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।

মাধবী যখন ঘরে ঢুকলেন তখন চেহারা উদভ্রান্ত, চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?

বিটু সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

উনি কোথায়?

আপনার হাজব্যান্ড খুব শকড। শুয়ে আছেন।

আমি আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ঠিক আছে। উনি ওঘরে আছেন। যান, কিন্তু দেরি করবেন না। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

মাধবী ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। চাপা স্বরে কী কথা হলো ওঁদের মধ্যে তা শুনতে পেল না বিটু, তবে উত্তেজনাটা টের পাচ্ছিল। এই খুনের তদন্তের ভার শেষ অবধি হয়তো লালবাজারই নেবে, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যতখানি পারে তাকে করতেই হবে। কারণ, নিহত ভদ্রমহিলার মুখখানার কোথাও একটা বিস্মৃত পরিচিতির চিহ্ন আছে। কী সেটা তা বিটু বুঝতে পারছে না। সারাদিন সে অস্থির, চিন্তিত এবং বিভ্রান্ত থেকেছে। ভালো করে খায়নি। তবে ডিউটি অফ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু বড়বাবুকে বলে সে জেরা করার ভার নিয়ে এতক্ষণ ঝুলে আছে। তার এই বাড়তি খাটুনিতে সহকর্মীরা খুশি। কারণ তারা রেহাই পাবে।

বিটু দু'বার ঘড়ি দেখল। প্রথমবার দশ মিনিট এবং দ্বিতীয়বার প্রায় পনেরো মিনিট অতিক্রান্ত। মাধবী ঘরের দরজাটা কখন ভেজিয়ে দিয়েছেন টের পায়নি বিটু। পর্দার আড়াল ছিল, বিটুর অন্যমনস্কতা তো ছিলই।

যখন ধৈর্য হারাতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই মাধবী দরজা খুলে খুব ধীর পায়ে এঘরে এলেন, দু'পা পেছনে ধীরতর পায়ে শিবশঙ্কর।

মাধবী আর শিবশঙ্কর পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল সোফায় বসলেন। মাধবী বললেন, কী জানতে চান বলুন?

সব কিছু। প্রথমে জানতে চাই মৃতা মধুশ্রীর পরিচয় কি?

মাধবী একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি ওকে পেয়েছিলাম এক বান্ধবীর মারফৎ।

বান্ধবীর নাম আর ঠিকানা বলুন।

মধুছন্দা সেন। আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

মধুশ্রী সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন কি?

হ্যাঁ। ওর স্বামী ভালো চাকরি করত। ওরা সচ্ছল পরিবার। স্বামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় অভাবে পড়ে গিয়েছিল।

ওঁর ছেলেমেয়ে ছিল?

মাধবী একটু দোনামোনা করে বললেন, জানি না।

কত বছর আপনার কাছে কাজ করছিলেন?

জাস্ট দু'বছর।

এই দু'বছরেও জানতে পারেননি ওঁর ছেলেমেয়ে আছে কিনা!

থাকলে জানতে পারতাম।

ওটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ।

আমি এর বেশি বলতে পারব না।

বিটু ঈষৎ গরম হয়ে বলে, তার মানে কি বলতে চাইছেন না? মনে রাখবেন এটা মার্ডার কেস। মামলা উঠলে জেরায় জেরায় পাগল হয়ে যাবেন। সত্য গোপন করলে তার খেসারতও দিতে হবে।

মাধবী একটু ঘাবড়ে গেলেন কি? অসহায়ভাবে একবার শিবশঙ্করের দিকে চাইলেন।

শিবশঙ্কর বললেন, বলে দাও।

মাধবী মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন, আমরা ওর ব্যাকগ্রাউন্ডও খুব ভালো জানি না। তবে শুনেছি, ওর দুই মেয়ে আছে। ও সেটা স্বীকার করতে চাইত না বলে আমরা গা করিনি।

স্বীকার করতে চাইত না! কেন বলুন তো!

ওর স্বামী মেয়েদের নিয়ে আলাদা থাকে। ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই যে বললেন স্বামী মারা গেছে!

ও বলত।

তাহলে মরেনি?

লোকে তাই বলে।

লোকটা আবার কে?

মধুছন্দা।

তিনি কী বলেন?

মধুছন্দার কাছে শুনেছি, মধুশ্রীর চরিত্রে সন্দেহ করত বলে ওর স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মধুশ্রী আমাকে বলেছিল ও বিধবা। আমরা মধুশ্রীর কথাই বিশ্বাস করতাম।

না কি মাথা ঘামাতেন না?

তাও বলতে পারেন। আমাদের কাজের লোকের খুব দরকার। আমার স্বামীর দেখাশোনা করার জন্যই বিশেষ করে। তাই মধুশ্রীর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

আপনি ওর স্বামীর নাম-ঠিকানা আমাদের দিতে পারেন কি?

না। ও বলেনি।

মধুশ্রীদেবীর জিনিসপত্র কোথায়?

ঘরে আছে। আমাদের পাশের ঘর।

আমি একটু দেখতে পারি?

এখন আর দোষ কী? দেখুন।

মাধবী উঠে গিয়ে পাশের বেডরুমের আলো জ্বেলে দিলেন। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। খাট আছে, আলমারি আছে, চেয়ার-টেবিল আছে।

মাধবী খাটের তলা থেকে একটা ফোল্ডেড স্যুটকেস টেনে বের করে বললেন, এইটে নিয়েই এসেছিল।

তালা দেওয়া নাকি?

মাধবী খোলার চেষ্টা করে বললেন, না! খোলাই।

বিটু হাঁটু গেড়ে বসে শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি নামিয়ে রাখল বিছানায়। স্যুটকেসের তলার দিকে একটা ডায়েরি পাওয়া গেল। বড় ডায়েরি। কয়েক বছরের পুরোনো। আর কিছু চিঠি।

ডায়েরিটা খুলে দেখতে লাগল বিটু। তেমন কিছুই নেই।

চিঠি আসত কি ওঁর?

মাঝে মাঝে।

চিঠিগুলো খুলে দেখল বিটু। প্রায় সব চিঠিই একই হাতে লেখা। বিনা সম্বোধনে শুরু, শেষেও কোনও নাম নেই, শুধু ইতি।

একটা চিঠি একটু পড়ল বিটু। বুঝল কোনও মেয়ে তার মাকে লিখছে। মেয়েটা তার বাবার কাছে থাকে, বোন আছে। বাবা তাদের খুব যত্নে রেখেছে, কত কত জিনিস কিনে দিয়েছে এইসব কথা। আর বারবার একটা আশ্বাস, তুমি ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা চেষ্টা করছি বাবার মন ঘোরানোর।

আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোনও ঠিকানার হদিস পাওয়া গেল না।

বিটু ডায়েরি আর চিঠিগুলো প্যাক করে ব্যাগে ভরে বলল, এর জন্য রসিদ চাই কি?

না। রসিদ নিয়ে আমরা কী করব?

কেউ দেখা করতে আসত না ওঁর সঙ্গে?

না। কখনও দেখিনি।

উনি কোথাও ছুটি নিয়ে যেতেন কি?

মাধবী একটু থমকে বললেন, কাছেপিঠে যেত হয়তো।

আমি জানতে চাই কখনও তিন-চার ঘণ্টার জন্য উনি বেরিয়ে যেতেন কি?

মাঝে মাঝে।

মাসে মাসে না সপ্তাহে সপ্তাহে?

সপ্তাহে বা মাসে নয়। হয়তো দু'তিনমাস পর একদিন।

উনি কি শিক্ষিতা ছিলেন?

খুব বেশি নয়। শুনেছি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। বি.এ. পড়তে পড়তে বিয়ে হয়। আর পড়েনি।

কেন পড়েননি বলেছেন?

বলত লেখাপড়া ভালো লাগে না বলে পড়েনি।

ওঁকে আপনি কত মাইনে দিতেন?

ন'শো টাকা।

কিন্তু ওঁর স্যুটকেসে তিনশো পঞ্চান্ন টাকা রয়েছে। টাকা কি উনি ব্যাঙ্কে রাখতেন?

জানি না তো!

ব্যাঙ্কে থাকলে পাসবই বা চেকবই থাকবে। তাও নেই। ওঁর আর কোনও ব্যাগট্যাগ আছে?

না।

অনেক সময়ে এমন হয় যে কাজের লোকেরা গিন্নিমার কাছেই মাইনের টাকা জমা রাখে। মনে করে দেখুন তো, বেতনের টাকা আপনার কাছেই জমা রাখতেন না তো উনি?

প্রথমটায় অবাক হয়ে মাধবী বললেন, না তো! আমার কাছে জমা রাখবে কেন? রাখলে—

মাধবীর মুখভাব লক্ষ্য করছিল বিটু।

হঠাৎ মাধবী যেন কথাটার নিহিত ইঙ্গিত ধরতে পেরে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন। বিটুর দিকে চেয়ে ঝামড়ে উঠলেন, কী বলতে চাইছেন বলুন তো! আমি কি ওর টাকা গাপ করার চেষ্টা করছি?

বিটু মৃদু স্বরে বলল, সব অ্যাঙ্গেল থেকেই বিচার করতে হবে তো! প্রশ্ন হলো টাকাগুলো গেল কোথায়?
কাউকে পাঠাত হয়তো।
কাকে?
তা আমি জানি না।
তাহলে পাঠানোর কথা বলছেন কী করে?
না হলে টাকা যাবে কোথায়?
আন্দাজ করছেন?
হ্যাঁ।
আন্দাজ করার দরকার নেই। ওটা আমরাও পারব। আপনি শুধু হার্ড ফ্যাক্টসগুলো দিন।
ফ্যাক্টস জানা থাকলে বলতাম।
মাধবীদেবী, আপনি যে কিছু কথা আড়াল করছেন তা প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আমি আবার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এটা মার্ডার কেস এবং সিরিয়াস ব্যাপার। পুলিশকে এর কিনারা করতেই হবে। আপনি যদি হেল্পফুল না হন তাহলে সন্দেহটা আপনার ওপরেও গিয়ে পড়তে পারে।
শিবশঙ্কর হঠাৎ বললেন, যা জানো বলে দিলেই হয়।
মাধবী স্বামীর দিকে একবার ধমকে চোখে তাকিয়ে নীরবে যেন শাসন করলেন। তারপর বিটুকে বললেন, হয়তো ও ওর মেয়েকে দিত।
ওঁর স্বামীর অবস্থা কেমন?
ঠিক জানি না।
নেতিবাচক জবাব দিয়ে লাভ নেই। আপনি একজন মহিলা। আপনার বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে তার পারসোনাল লাইফ নিয়ে আপনার কথা হয়নি, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মেয়েদের মধ্যে জন্মগত গোয়েন্দা-প্রবণতা থাকে। ইন ফ্যাক্ট পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গোয়েন্দা হওয়ার কোয়ালিটি মেয়েদের মধ্যেই বেশি আছে।
মাধবী একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, তাই নাকি? আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন মেয়েরা বেশি ইনকুইজিটিভ?
যদি বলি তাহলে কি সেটা মিথ্যে?
আমি একদমই গালগল্প পছন্দ করি না। আমার অন্য কাজ আছে।
এই বয়স্কা মহিলার বাইরে একটা বেশ কঠোরতার ছদ্মবেশ আছে। হয়তো নিজের মহলে ইনি কঠোর হিসেবেই পরিচিতা। কিন্তু বিটু ওঁর দুর্বলতাও দেখতে পাচ্ছে।
সে বলল, কাল খবরটা কাগজে বেরোবে। বোধহয় খুব হেলাফেলা করার খবর নয়। আপনার ওপর ভয়ঙ্কর প্রেশার আসবে।
তা জানি।
বিটু মাথা নেড়ে বলল, না, জানেন না। আপনার তথ্য গোপন করার চেষ্টা অন্য ইন্ডিকেশন দিচ্ছে।
কী দিচ্ছে?
হয়তো এই মার্ডার কেস সম্পর্কে আপনার ভাইটাল কিছু জানা আছে। সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা পুলিশ আপনার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা জানেন দয়া করে বলে দিন।
মধুশ্রীর স্বামীর অবস্থা ভালো।
কতটা ভালো?

বেশ ভালো। ব্যবসাদার। বিদেশ-টিদেশেও যায়।
তাহলে মধুশ্রী তাঁর মেয়েকে টাকা দিতেন কেন?
মেয়েকেই দিত এমন কথা বলিনি। হয়তো দিত।
যা যুক্তিসিদ্ধ নয় তা বলছেন কেন?
মাধবী হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, জানি না।
গত দু'বছর ধরে মাসে ন'শো টাকা তো কম নয়। বিশ হাজার টাকার ওপর।
হ্যাঁ।
টাকাটা কোথায় যাবে? ওঁর তো খরচ বলতে কিছু ছিল না।
না।
মধুছন্দার ঠিকানাটা জানেন কি?
হ্যাঁ। টু বাই এ বাই ওয়ান, একডালিয়া প্লেস। দোতলায় ফ্ল্যাট।
এবাড়িতে আপনারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই আর?
না।
আপনার ছেলেমেয়েরা?
তারা বাইরে বাইরে।
বুঝেছি। আপনাকে আরও একটু কষ্ট দেব।
বলুন।
মধুশ্রীর ঘরে একটা আলমারি আছে। আমি ওটা দেখতে চাই।
ওটা ওঘরে থাকলেও মধুশ্রীর নয়। ওঘরে আমার বড় ছেলে থাকত। ওটা তারই আলমারি। চাবি ওর কাছে থাকে।
উনি কোথায় থাকেন?
নিউ আলিপুরে।
মধুশ্রীর বয়স অনুমান করছি চল্লিশ-টল্লিশ!
ওরকমই।
এবাড়ির সব কাজই কি উনি করতেন?
হ্যাঁ। বাসন মাজা, কাপড় কাচা আর ঝাঁটপাট দেওয়ার জন্য ঠিকে লোক আছে। আর সব মধুশ্রী করত।
রান্নাও?
হ্যাঁ।
কেমন কাজ করতেন?
ভালোই। নইলে রাখব কেন?
গান-বাজনা, বইপড়া বা এরকম কোনও শখ ছিল কি?
না। টিভি দেখত খুব।
স্বাভাবিক। টিভি কে না দেখে!
এ ছাড়া আর কোনও শখ শৌখিনতা ছিল না।
সিনেমায় যেতেন?
খুব একটা নয়।
মাঝে মাঝে?

রেয়ার।
গেলে কার সঙ্গে যেতেন?
একাই।
উনি কি টকেটিভ ছিলেন?
না। কথা বেশি বলত না।
বাজারহাটে যেতেন?
হ্যাঁ। বাজার তো ও-ই করত।
তার মানে বাইরে যেতেন?
হ্যাঁ।
তাহলে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ হলেও হয়ে থাকতে পারে।
দেখুন, আমি হরেক রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। সময় পাই না। কে অত খোঁজ রাখবে? হলে হতেই পারে।
আপনি কিছু জানেন কিনা!
কী জানব!
এনি লাভ অ্যাফেয়ার?
চোখ বড় বড় করে মাধবী বললেন, লাভ অ্যাফেয়ার! এই বয়সে?
নয় কেন?
মাধবী মাথা নেড়ে বলেন, অসম্ভব।

তিন

তুমি কী বলতে চাও বলো তো?
আমি! আমি তো বলছি, ওরা তোমাকে হ্যারাস করবে। তাই যা জানো বলে দিলেই হয়।
কী বলব? আমিই বা কতটুকু জানি? যা জানতাম তা তো বলেই দিয়েছি।
তুমি যে মধুশ্রী সম্পর্কে এতটা জানতে তাও আমার জানা ছিল না।
তোমার জেনে লাভ কী? মধুশ্রীকে রেখেছিলাম তোমার দেখাশোনা করার জন্য। তার কাজটাই দরকার ছিল। পারসোন্যাল লাইফ দিয়ে তুমি কী করবে?
শিবশঙ্কর খেতে বসেছেন। আজ তাঁরা বাইরের ঘরের ডাইনিং টেবিলে বসেননি। বসেছেন শোওয়ার ঘরেই, একটা টেবিল এবং দুটো চেয়ার পেতে। মধুশ্রী নেই, তাই এবেলা মাধবী নিজেই খাবার করেছেন। ফ্রিজে পাঁউরুটি ছিল, সেটাই টোস্ট করা হয়েছে। আর আলু সেদ্ধ। সঙ্গে একটু দুধ। কিন্তু শিবশঙ্কর পাঁউরুটি চিবোতে পারেন না। টোস্ট করলে শক্ত হয়ে যায় বলে, দুধে ভিজিয়ে খেতে গেলেন। কিন্তু দেখলেন তাঁর খাওয়ার ইচ্ছে নেই। বমি উল্টে আসছে।
খাচ্ছো না কেন?
পারছি না।
কেন পারছো না?
খিদে নেই।
থাকবে কি করে? ওই দৃশ্য দেখলে কি খাওয়া যায়? ভাগ্যিস আমি দেখিনি! ঘরদোর পরিষ্কার করল কে?
পাড়ার কয়েকটা ছেলে।
মা গো! কি করে যে এবাড়িতে থাকব!

খুনটা কে করেছে বলে তোমার মনে হয়?

স্বামীটাই হবে।

শিবশঙ্কর মাথা নাড়লেন।

তুমি উঠে পড়ো। আর খেতে হবে না।

শিবশঙ্কর বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন।

মধুশ্রী তাঁর যত্ন করত না, মাধবীও করেন না। তিনি প্রায় সময়েই মধুশ্রীর রান্না খেতে পারতেন না। এত জোলো, বিস্বাদ, এত খারাপ খাবার তিনি খাবেন কী করে? তাঁর পেট ভরত না। মাধবী যদি রাঁধেন তাহলেও ইতরবিশেষ হবে না। মাধবী রাঁধতে জানেন না।

শিবশঙ্কর মুখ ধুয়ে আসার পর মাধবী বললেন, কাল প্রবীরকে খবরটা দিতে হবে।

হুঁ।

আমাদের এখন এবাড়িতে থাকাটা খুব অসহ্য হবে।

কেন?

কেন আবার! একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল।

হ্যাঁ, ঠিকই তো!

চলো, কিছুদিন প্রবীরের কাছে থেকে আসি।

শিবশঙ্কর মুখটা বিকৃত করে বললেন, না না, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

কেন, সে তো ছেলে।

ওরা তো আমাদের অ্যাভয়েট করতেই দূরে সরে গেছে। ওদের ঘাড়ে গিয়ে চাপব কেন?

এটা তো ইমার্জেন্সি।

আমার তো মনে হচ্ছে না। বেশ তো আছি।

আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

ভয় পাচ্ছো নাকি?

ভয়ও পাচ্ছি। ভীষণ খারাপ লাগছে। কেমন লাগছে বোঝাতে পারব না।

জীবনে কখনও মাধবীকে এত ভগ্ন অবস্থায় দেখেননি তিনি। মাধবী শক্ত ধাতের মহিলা। অতিশয় কঠিন, সাহসী, স্পষ্টবক্তা।

শিবশঙ্কর আবার একটা ট্র্যাংকুইলাইজার খেতে যাচ্ছিলেন। মাধবী বললেন, আমি আসার পর তোমাকে দুটো খেতে দেখেছি। আবার খাচ্ছো কেন?

খাব না? ঘুম আসবে না খেলে?

অত খেতে নেই। বরং বড়িটা আমাকে দাও। ঘুম তো হবেই না। তবু দেখা যাক।

শিবশঙ্কর বড়িটা মাধবীকে দিলেন। বললেন, তুমি তো খাও না, কাজেই তোমার ঘুম এসে যাবে। আমি ইমিউনি হয়ে গেছি বলে ওতে তেমন কাজ হয় না।

ছেলেটা কেমন রোখাচোখা দেখেছো?

দেখলাম।

আর কেমন অভদ্র! আমাকে সন্দেহ করছিল মধুশ্রীর টাকা গাপ করেছি বলে।

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বলেন, ওটা বোধহয় ওদের একটা প্রসেস। কিন্তু সন্দেহটা তো আর অমূলক নয়। মধুশ্রী তো তার মাইনের টাকা তোমার কাছেই জমা রাখত!

হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে কি এই যে, টাকাটা আমি নিয়ে নেব।

সে কথা নয়। কিন্তু টাকাটা যে তোমার কাছেই আছে তা বলে দিলেই পারতে।

ওদের বলতে যাব কেন? পুলিশ বলে কথা! যদি টাকাটা নিয়ে নেয়! আমি টাকাটা রেখে দিয়েছি, মধুশ্রীর মেয়েকে দেব।

মেয়ে যদি আসে।

আসবে। খবরের কাগজে বেরোলে কি আর চুপ করে থাকবে?

দেখো কী হয়।

হ্যাঁগো, আমি বলি কি, আজ বরং গয়লাদের ছেলে বসন্ত এসে আমাদের বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে থাকুক।

তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

বলেছি তো পাচ্ছি।

তাহলে ডাকো। রাত তো বেশি হয়নি, মাত্র দশটা।

বাড়ির পিছনেই রামলালের খাটাল। তারা এবাড়িতে দুধ দেয়। ওদের জমিটাও শিবশঙ্করের জমি। খাতির করে। জানালা দিয়ে মাধবী ডাকাডাকি করায় রামলাল আর বসন্ত দুজনেই টেমি হাতে বেরোলো।

কী মাইজি?

বসন্ত আজ আমাদের ঘরে শোবে।

জি।

তাড়াতাড়ি এসো।

বসন্ত এল এবং বাইরের ঘরে মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে শুল। মাধবী খানিকটা স্বস্তিবোধ করে শিবশঙ্করের সঙ্গেই আজ এক বিছানায় শুলেন। অনেককাল তাঁদের বিছানা আলাদা।

ঘুমোলে নাকি?

শিবশঙ্কর বললেন, না। ঘুম কি সহজে আসবে? বড়িটা খেলে হতো।

তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

করো।

তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

না তো!

কে মারবে বলো তো ওকে?

তুমি তো ওর স্বামীর কথা বলছিলে।

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু যা শুনেছি, ওর স্বামী বেশ ভালোই লোক। মধুছন্দা তো বলে মধুশ্রীরই দোষ।

কি দোষ?

মধুশ্রীর কিছু অ্যাফেয়ার ছিল।

ও।

তুমি যেন গা করছো না।

ভাবছি।

মধুশ্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাও নাকি বছর পাঁচেক হলো। মধুছন্দার এক কাকার বাড়িতে ছিল। কাকারা সব আমেরিকায় সেটল করতে চলে যাওয়ায় মেয়েটা বেকার হয়ে যায়। তখন মধুছন্দা আমার কাছে পাঠায়।

এসব শুনে লাভ?

না, বলছিলাম, এতদিন পরে স্বামীটা কি প্রতিশোধ নিতে আসবে?

আসতেই পারে।
আচ্ছা, বাতিটা জ্বালিয়ে রাখব?
ভয় করলে জ্বালাও।
ভয়-ভয় করছে। আনক্যানি ফিলিং। তোমার তো বাতিতে অসুবিধে হবে।
না, হবে না। আজ ঘুমের সম্ভাবনাই নেই। জ্বালাতে পারো।
ছোটো লাইটটা জ্বালাই, কেমন?
জ্বালাও।
ব্র্যাকেটের আলোটা জ্বালিয়ে মাধবী আবার শুতে এলেন। বললেন, ওর স্বামীর টাকার অভাব নেই, দুটো ফুটফুটে মেয়ে। সে কেন খুন করবে?
সবসময়ে মোটা দাগের কারণ থাকে না। হয়তো সূক্ষ্ম কারণ আছে।
সেইটেই তো ভাবছি।
শিবশঙ্কর বললেন, ঠিকানাটা মিস্টার দত্তকে দিলেও পারতে।
না বাপু, বেশি আগ বাড়িয়ে জানানোর দরকার কি? ওরা তো খুঁজে বের করবেই।
তা করবে।
ধরতে পারবে?
না পারার কী? হাতুড়িতে তো হাতের ছাপই পাবে।
খুনীদের ধরা অত সহজ নয়। আজকাল হাতের দাগের কথা সবাই জানে।
তাও ঠিক।
শিবশঙ্কর হাই তুলছেন দেখে মাধবী জিগ্যেস করলেন, ঘুম পাচ্ছে নাকি?
না না, তুমি বলো।
আচ্ছা, আজ তো তুমি প্রেশারের বড়িটা খেলে না রাত্রে?
বিকেলে খেয়েছি। প্রেশার তেমন টের পাচ্ছি না।
আমার কিন্তু ঘুম আসছে না। তুমি ঘুমোলে আমার খুব একা লাগবে।
শিবশঙ্কর নরম গলায় বললেন, বারান্দায় গিয়ে বসবে?
চলো যাই। বারান্দাটাই বরং ভালো। খোলামেলা, রাস্তাঘাট দেখা যাবে।
দু'জনে উঠলেন। বাথরুম হয়ে বারান্দায় গিয়ে পাশাপাশি বসলেন।
কী থেকে কী হয়ে গেল, না?
শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।
খুব বীভৎস দৃশ্য দেখেছো, না?
হ্যাঁ, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ঘরটা।
আর মধুশ্রী?
সে আর বোলো না।
শুনতে চাইছিও না। জলজ্যান্ত একটা মানুষ, উঃ!
দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মশা কামড়াচ্ছে একটা-দুটো, তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। চারদিকে ঘুমন্ত পৃথিবী। তার মধ্যেই রাস্তায় ঘেয়ো কুকুর ঘুরছে। কখনও কখনও ডেকে উঠছে। জাগরণের ঐটুকুই যা চিহ্ন।
মাধবী বললেন, মধুশ্রীর একজন প্রেমিক ছিল, শুনছো?
হ্যাঁ।

পাড়ার ছেলে।
ও।
স্বামী ব্যবসার কাজে বাইরে যেত আর তখন—
ও।
একদিন ধরা পড়ে যায়।
ওদের ডিভোর্স হয়েছিল?
হবে না? তবে ডিভোর্স হলেও মাসোহারা পেত না।
কেন?
কেন আবার। স্বামী দিত না।
কোর্ট তো ছিল।
কোর্টে কতবার যাবে? গিয়ে গিয়ে হদ্দ হয়ে আর যেত না। চাকরি করত।
এটা খুব অন্যায়।
মাধবী একটু হাসলেন, কত অন্যায় হচ্ছে।
শিবশঙ্কর আনমনে সামনের দিকে চেয়ে বললেন, ওই ছোকরা পুলিশ অফিসারটা বলছিল, ও নাকি মধুশ্রীকে চেনে।
চমকে উঠে মাধবী বললেন, চেনে!
বলছিল, মুখটা খুব চেনা-চেনা। মনে করতে পারছিল না।
তাই অত রোখাচোখা ভাব!
ওকে চটিয়ো না। যা জানো বলে দিও।
সব বলেছি গো, সবই বলেছি। কিছু কি বাকি আছে?
ঠিকানাটাও দিয়ে দিও।
দেব। ভেবো না।
শিবশঙ্কর আবার হাই তুললেন।

চার

আপনার নামই কি মোহিত রায়?
হ্যাঁ, আমিই মোহিত রায়।
আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।
দুঃসংবাদ! আমার স্ত্রীর মৃত্যু তো? জানি, খবরের কাগজে পড়েছি।
আপনাকে বিচলিত মনে হচ্ছে না তো!
না। মৃত্যুসংবাদ পেলে সে যারই হোক, মনটা একটু খারাপ হয়। তার বেশি কিছু নয়। আমার সঙ্গে মধুশ্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল না। ডিভোর্স হয়ে গেছে।
আপনার মেয়েরা?
আমার বড় মেয়ে খুবই শকড।
আমি কি আপনার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?
পারেন। তবে তার কি কোনও দরকার আছে?
আছে। তবে সেটা পরে হবে। আগে আপনি।

মোহিত রায় বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। পেটানো স্বাস্থ্য। সুপুরুষ। মধুশ্রীকে এঁর পাশে একেবারেই মানাত না। মোহিত রায়ের পয়সাও যথেষ্ট। ঝকঝকে দোতলা বড়লোকী বাড়ি। স্থাপত্যও খুব আধুনিক। ভিতরে মহার্ঘ সব আসবাব।

মোহিত বললেন, বলুন।

বিটু বলল, মধুশ্রীকে কে বা কারা মার্ডার করতে পারে জানেন?

না মশাই, মধুশ্রী কেমন জীবন যাপন করছিল তাও জানি না। ওঁর খবরই আমার জানা ছিল না।

উনি একটা বাড়িতে আয়ার কাজ করতেন।

তা জানি। খবরের কাগজে খবরটা ছিল। তবে সেটা খবরের কাগজ পড়েই জেনেছি। খুন হওয়ার কারণ কি করে বলব?

আপনাদের ডিভোর্স হলো কেন?

সে অনেক কথা। শুনতে চাইলে বলতে পারি। আপনি পুলিশের লোক, কথা টেনে তো বের করবেনই। আমারও গোপন করার কিছু নেই।

তাহলে বলুন।

শী ওয়াজ অ্যান অ্যাডাল্টারাস উওম্যান।

অপনি কি সিওর? অনেক সময়ে সন্দেহের বশে—

মোহিত মাথা নেড়ে বললেন, না মশাই, আমি বাতিকগ্রস্ত লোক নই।

কোনও প্রমাণ আছে?

এসব ঘটনার সাক্ষীসাবুদ তো থাকে না। আমি যখন শ্যামবাজারে থাকতাম তখন পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার হয়।

ইমোশন্যাল না ফিজিক্যাল?

ইমোশন্যাল হলে তো আমাকে ছেড়ে তার সঙ্গেই গিয়ে ঘর করত। আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কটা শরীরের বেশি ছিল না।

উনি কি একটু বেশি সেক্সি ছিলেন?

এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে রুচিতে বাধে। তবে এটা খুনের মামলা বলেই কবুল করছি, আমি বাইরে বাইরে থাকতাম। ব্যবসার কাজে আমাকে যেতেই হতো। অনেক সময়ে টানা পনেরো দিন কুড়ি দিন বা একমাস। মনে হয় সেই সময়টা ওর ফিজিক্যাল নীডের জন্য—

ছেলেটার নাম কী?

নীতিন না কি যেন। খুব ব্রাইট ছেলেও নয়। তাকে কি দরকার হবে?

হতে পারে।

নীতিন বিশ্বাস, আমার বাড়ির কাছেই থাকত। ছোটোখাটো কনস্ট্রাকশনের কাজ করত। আমার বাড়ির কিছু রিপেয়ারের কাজ করেছিল।

বাড়িটা কি এখনও আছে?

আছে। আমি বেচে দিয়েছি আমার এক চেনা লোককে।

ঠিকানাটা?

লিখে নিন।

বিটু তার নোটবইতে তুলে নিল ঠিকানাটা।

আমি কি আপনাদের সাসপেক্ট লিস্টে আছি?

এনকোয়ারি সবে শুরু হয়েছে। দেখা যাক।
মধুশ্রীর যা চরিত্র তাতে এরকম ঘটতেই পারে।
আপনার মেয়েরা কি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত?
আমি তো বারণই করতাম। তবে ওরা এখন বড় হয়েছে, নিজস্ব মতামত হয়েছে। তবে যোগাযোগ রাখত কিনা জানি না। ওদেরই জিগ্যেস করুন।
করব। তার আগে আপনি বলুন, মধুশ্রীর সঙ্গে আপনার কবে শেষ দেখা হয়েছিল?
মনে নেই। ডিভোর্সের পরে একবারই বোধহয় আমার সুরেন ব্যানার্জি রোডের অফিসে এসেছিল।
কেন এসেছিলেন?
টাকা-পয়সা ইত্যাদির ব্যাপারে সেটলমেন্ট করতে।
কী ব্যবস্থা হয়েছিল?
আমি বলেছিলাম আদালতে গিয়ে আদায় করতে।
উনি কি মাসোহারা পেতেন?
না। আমি দিতাম না।
কেন?
ইচ্ছে করত না।
কোর্ট সেটল করে দেয়নি?
মধুশ্রী পারসু করেনি। করলে দিতে হতো। ও চেয়েছিল আউট অফ কোর্ট সেটলমেন্ট।
আপনি কি ওঁকে ঘৃণা করতেন?
মনেপ্রাণে।
তাহলে তো আপনার মোটিভ আছে বলে সন্দেহ হতে পারে।
সেটা আমি জানি। তবু না বললে মিথ্যাচার হবে।
এত ঘৃণা?
আপনি কি বিবাহিত?
না।
বিবাহিত হলে বুঝবেন স্ত্রী অবিশ্বস্ত হলে পুরুষের কী ফিলিং হয়।
আন্দাজ করতে পারি।
মধুশ্রীকে খুন করার কথা যে একসময়ে আমারও মনে হয়নি তা নয়। যখন ওকে ধরলাম তখন ওরকম ইচ্ছে হয়েছিল।
আপনি কি ওঁকে রেড হ্যান্ডেড ধরেছিলেন?
হ্যাঁ, সন্দেহটা হচ্ছিল। তারপর একটু কায়দা করে মাসখানেকের নামে বাইরে যাচ্ছি বলে দু'দিন হোটেলে থেকে একদিন মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকি। দরজাটা আগে থেকেই তৈরি রেখেছিলাম। তারপর আর কি? দে ওয়্যার দেয়ার।
কী করেছিলেন?
নীতিনকে ধরে প্রচণ্ড ধোলাই দিয়েছিলাম। মরেই যেত, মধুশ্রী মাঝখানে এসে না পড়লে। তারপর মধুশ্রীকেও দু'চার ঘা দিয়েছিলাম। অন্যায় কিছু করেছি বলে আজও মনে করি না।
পাড়ায় জানাজানি হয়নি?

তা তো হবেই। দুঃখের কথা কী জানেন, ওরা যে অ্যাডাল্টারি করত তা পাড়ার লোকও জানত। আমি জানবার আগেই জানত। কাজেই পাড়ায় আমার বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলেনি। বরং আমাকে এসে অনেকে বলেছে, ঠিক কাজ করেছেন।

আচ্ছা, নীতিনের কি কোনও মোটিভ থাকতে পারে?

থাকার কথা নয়। নীতিন বয়সে মধুশ্রীর চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের ছোটো। মধুশ্রীর সঙ্গে তার সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্টও ছিল না। তা ছাড়া সে সম্প্রতি বিয়েও করেছে বলে শুনেছি। না মশাই, নীতিন মধুশ্রীকে খুন করেছে বলে আমার মনে হয় না। কেন করবে?

আপনার মেয়েদের একটু ডাকবেন?

মোহিত ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, আমার বড় মেয়ে পড়তে গেছে। এখনই আসবে। ছোটো মেয়ের জ্বর। ঘুমোচ্ছে। তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না।

বিটু বলল, ঠিক আছে। মধুশ্রী যখন চলে যান—অর্থাৎ তাঁকে যখন আপনি তাড়িয়ে দেন তখন মেয়েদের বয়স কত ছিল?

মোহিত একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন। তারপর বললেন, ঘটনাটা ঘটেছে বছর দশেক আগে। আমার বড় মেয়ের বয়স এখন আঠারোর মতো। হিসেব করে নিন।

আর ছোট মেয়ে?

শী ইজ ফিফটিন।

আপনারা অর্থাৎ আপনি আর মধুশ্রী কতদিন বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলেন?

বছর দশেকের কাছাকাছি।

এখন আপনার বয়স কত?

ছেচল্লিশ।

মধুশ্রীর?

সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ।

আপনি আর বিয়ে করেননি?

না। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

মেয়েদের নিজেই মানুষ করেছেন?

আমার মা ছিলেন। তিনিই দেখতেন।

তিনি এখন কোথায়?

আমার ভাইয়ের কাছে, নাগপুরে। আমার কাছেই থাকেন। বেড়াতে গেছেন।

কথার মাঝখানেই ডোরবেল বাজল। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক ভিতর থেকে দ্রুত পায়ে এসে দরজা খুলল। বইখাতা হাতে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল সে শ্যামলা, মুখশ্রী বাবার মতোই। তবে মুখে একটা মলিন বিষাদের আস্তরণ পড়েছে।

মোহিত মেয়েকে বললেন, তাড়াতাড়ি পোশাক চেঞ্জ করে এসো। ইনি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন।

মেয়েটা বিটুর দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে চলে গেল।

মোহিত বললেন, আফটার অল মা তো, তাই আমি ওদের দিয়ে অশৌচ পালন করিয়েছি। চার দিনের দিন শ্রাদ্ধও করেছে।

মধুশ্রী তাঁর মেয়েদের দখল নিতে চাননি?

চেয়েছিল, তবে খুব জোরালোভাবে নয়।

জোরালোভাবে নয় কেন?

দুশ্চরিত্রা হিসেবে তার কুখ্যাতি হয়েছিল। মর‍্যাল কারেজ নষ্ট হয়ে যায়। ভয়ও পেয়েছিল বোধহয়।

ওঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই?

থাকবে না কেন? সবাই আছে। বাবা, ভাই, বোন। মা ছিল না। ওর ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। বাপের বাড়ির লোকেরাও ওর ওই কাণ্ডের পর ওকে একরকম বয়কট করে।

তাহলে তারা আপনাকেই সমর্থন করেছিল?

হ্যাঁ। ওর বাবা আমাকে বলেছিল, তুমি ওকে খুন করলে না কেন?

মধুশ্রী তাহলে সত্যিই একা হয়ে পড়েছিলেন?

খুব। নইলে আয়ার কাজ নেয়?

আপনার মায়া হতো না?

মানুষ তো! তাই কখনও কখনও ঘৃণার ভাবটা চলে গিয়ে মায়াও হয়েছে। হিউম্যান নেচারটাই ওরকম। তবে সেটাকে প্রশ্রয় দিইনি।

বাসবী একটা হালকা প্রিন্টের ঢোলাজামা আর স্কার্ট পরে ঘরে এসে ঢুকল। বাপের পাশে শান্তভাবে বসল।

মোহিত বললেন, ইনি পুলিশের লোক। কথা বলো।

বিটু বাসবীকে দেখছিল। বেশ দেখতে। শ্যামলা মাজা রং হলেও মেয়েটি বেশ সুন্দরী। বিষাদ যেন নতুনতর মাত্রা যোগ করেছে।

বিটু বলল, মিস, আপনার মায়ের সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করলে আপনি কষ্ট পাবেন না তো?

বাসবী মাথা নেড়ে বলল, না।

মোহিত উঠে পড়ে বললেন, আমার সামনে হয়তো ও অকপট হতে পারবে না। আমি দোতলায় আমার ছোট মেয়ের কাছে যাচ্ছি।

ঠিক আছে।

মোহিত চলে যাওয়ার পর বিটু জিগ্যেস করল, আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?

ছিল।

কীভাবে যোগাযোগ হত?

মা ফোন করত মাঝে মাঝে।

আর দেখাসাক্ষাৎ?

হতো। মাসে এক-আধবার।

কখন এবং কোথায়?

মা আমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি একটু আগে যেতাম। কথা হত।

আপনার বোনের সঙ্গে?

না। আমার বোন মা'কে ততটা পায়নি। ওর তেমন স্মৃতিও নেই। তবে কখনও-সখনও দেখা হয়েছে।

আপনারা দু'বোন একই স্কুলে পড়েন?

হ্যাঁ।

মা আপনাকে টাকা দিত?

বাসবী অবাক হয়ে বলল, টাকা! টাকা কেন দেবে? আমরা মা'র টাকা নেবই বা কেন?

আপনাদের অনেক টাকা, না?

আমার বাবা বিজনেসম্যান।

তা তো বটেই। মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল? খুব ভালোবাসতেন?

ভালোই বাসতাম তো।

বাবার চেয়ে বেশি, না কম?

বাবা! বাবার চেয়ে বেশি আমি কাউকে কখনও ভালোবাসতে পারবই না।

আপনার বাবা কেমন মানুষ?

বাবার মতো মানুষ হয় না।

আপনার মাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, জানেন তো?

বাসবী মাথা নাড়ল। তারপর দু'হাতে হঠাৎ মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। বিটু লক্ষ্য করল মেয়েটা কাঁদছে। সে একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলল, পুলিশ এই খুনের ব্যাপারে যদি আপনার বাবাকে সন্দেহ করে তাহলে কী করবেন?

বাসবী হঠাৎ যেন ফণা তুলে বলল, বাবা! আমার বাবাকে যে সন্দেহ করবে সে স্টুপিড, আমার বাবা ওরকম নয়।

কীরকম?

বাবা আমাদের মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি কখনও। আমার বাবার মতো মানুষ হয় না!

আর আপনার মা? তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?

বাসবী একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, মা ভালোই ছিল। বাবার সঙ্গে বনিবনা ছিল না বলে ডিভোর্স হয়ে যায়। এরকম কতই তো হয়।

শুনুন মিস রায়, ওরকম আলগা আলগা কথা বললে আমরা তদন্তের কাজে এগোতে পারব না। আপনার শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে যে, মধুশ্রীদেবীর সঙ্গে মোহিতবাবুর ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণটা আমরা জানি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জানতে চাই মধুশ্রীদেবী কেমন মানুষ ছিলেন?

বাসবী মুখ তুলল। তারপর বেশ তেজি গলাতেই বলল, ওসব আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই। আমি জানি, আমার মা ভালোই ছিল।

বিটু একটু দমে গিয়ে নরম গলায় বলল, আমরা তাঁর খুনীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি মিস রায়। সেইজন্যই তাঁর সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্য দরকার। তিনি কীরকম জীবন কাটাতেন, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, এসব তথ্য না জানলে আমরা মোটিভটা ধরতে পারব না।

বাসবী একটু চুপ করে থেকে বলল, মার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হতো। কথাও হতো। কিন্তু মা কেমন জীবন কাটাতেন তা আমি জানব কী করে?

আপনি কি মধুশ্রীদেবীর সঙ্গে গোপনে দেখা করতেন, অর্থাৎ মোহিতবাবুকে না জানিয়ে?

একরকম তা-ই। তবে প্রথম দিকে মা যখন আমার স্কুলে যেত তখন বাবাকে এসে বলতাম।

তাতে কি মোহিতবাবু রেগে যেতেন?

হ্যাঁ। পরে আর বলতাম না। তবে আমার মনে হয় মার সঙ্গে যে আমার দেখা হয় এটা বাবা জানতেন। কিছু বলতেন না।

আপনার মা কখনও এ বাড়িতে এসেছেন?

বাসবী একটু চিন্তা করে বলল, একবার।

কবে?

গত বছর। বিজয়ার পরের দিন।

কেন এসেছিলেন?

বাবাকে প্রণাম করতে।
কী হয়েছিল?
বাবা দেখা করেননি। মা নিচের ঘরে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়।
আপনি মাঝে মাঝে আপনার মাকে চিঠি লিখতেন কি?
হ্যাঁ।
উনি কি জবাব দিতেন?
না। মার চিঠি এলে বাবা খুশি হবে না বলে মা লিখত না।
আপনার বাবা কি আগে চাকরি করতেন?
হ্যাঁ। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করছেন।
মধুশ্রী সম্পর্কে আপনি আর কিছু বলতে পারেন কি?
না। কিছু মনে পড়ছে না।
আপনার বোনকে কি কিছু প্রশ্ন করা যাবে আজ?
ওর তো ভীষণ জ্বর। তাছাড়া ও মা সম্পর্কে কিছুই জানে না। মাকে ওর তেমন মনেই নেই। আমি কি এখন যেতে পারি?
হ্যাঁ। আপনাকে অনেকক্ষণ ডিস্টার্ব করলাম।
আপনিই নীতিন বিশ্বাস?
হ্যাঁ।
বয়স কত?
তেত্রিশ।
কী করেন?
ঠিকাদার।
মধুশ্রী রায় নামে কাউকে কখনও চিনতেন?
নীতিন বিশ্বাস স্পষ্টই অস্বস্তিতে পড়ল। ছিপছিপে, ফর্সা, টানটান চেহারার ছেলেটির একটা চকটদারি আকর্ষণ আছে। হি-ম্যান নয় কিন্তু রোম্যান্টিক চেহারা। এ ধরনের ছেলের প্রেমিকা জুটতে দেরি হয় না।
নীতিন বলল, চিনতাম। প্রতিবেশী ছিলেন।
উনি যে খুন হয়েছেন জানেন?
জানি। কাগজে পড়েছি।
ভণিতা না করেই বলি, আপনার সঙ্গে ওঁর একটা ফিজিক্যাল বা রোমান্টিক অ্যাফেয়ার ছিল কি?
নীতিন একটু গরম খেয়ে বলল, ওসব মোহিতদার অপপ্রচার। কিছু ছিল না। উনি মস্তান ছিলেন তো, তাই গায়ের ঝাল ঝেড়েছিলেন।
উনি কি মিথ্যা কথা বলছেন?
আলবাৎ মিথ্যে।
পাড়ার লোকেরা কী বলে?
ওদের কথা ছাড়ুন। কেলেঙ্কারির গন্ধ পেলেই সবাই একেবারে কোরাস গাইতে শুরু করে। মধুশ্রী বউদির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। উনি স্নেহ করতেন।
ওঁর সঙ্গে আপনার লাস্ট কবে দেখা হয়েছে?
দেখা! ওঁরা তো কবে পাড়া ছেড়ে চলে গেছেন।

আপনার সঙ্গে দেখা হতো না?

না তো!

ভালো করে মনে করুন। পরে অন্যরকম বেরোলে মুশকিলে পড়বেন।

না, দেখা হতো না।

একদম সম্পর্ক ছিল না?

না। মোহিদতা যে কাণ্ডটা করেছিলেন তাতে লজ্জায় আমাকে পাড়া ছাড়তে হয়।

মোহিতবাবু কি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত?

তাই তো মনে হয়।

কিন্তু শোনা যায় আপনাকে উনি মধ্যরাতে ওঁর বেডরুমে রেড হ্যান্ডেড ধরেছিলেন!

একটু বিবর্ণ হয়ে নীতিন বলল, বাজে কথা। মধ্যরাতে নয়। গ্রীষ্মকাল, রাত এগারোটা-টেগারোটা হবে। বউদি একটা কাজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই কথা বলতে গিয়েছিলাম।

কথা বলার পক্ষে রাত এগারোটা কি প্রশস্ত সময়?

আমি অত ভাবিনি। মনে তো পাপ ছিল না।

তারপর কী হলো?

মোহিতদা এসে ঝামেলা করলেন।

ঘটনার পর কি আপনি পাড়া ছাড়েন?

হ্যাঁ। জব্বলপুরে চলে যেতে হয়েছিল। বাবাই পাঠিয়ে দেন।

আর মধুশ্রী?

ওঁদের খবর আর রাখতাম না।

আর কখনও দেখা হয়নি?

না।

মধুশ্রী যে খুন হয়েছে তা জানলেন কি করে?

কাগজে দেখেছি।

কে বা কারা ওঁকে খুন করতে পারে বলুন তো!

জানি না।

মধুশ্রীকে যে মোহিতবাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা জানেন?

জানি। কাজটা ঠিক হয়নি।

আপনি কি মধুশ্রীর সঙ্গে যোগাযোগের কোনও চেষ্টা করেননি?

কেন করব?

উনি কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন?

না না, আমাদের কোনও খারাপ রিলেশন ছিল না, বিশ্বাস করুন।

জব্বলপুরে আপনি কতদিন ছিলেন?

ছ'মাস হবে।

তারপর ফিরে এসে এ পাড়াতেই বাস করতেন?

হ্যাঁ।

কোনও ঝামেলা হয়নি?

না।

আপনি শিবশঙ্করবাবুকে চেনেন?

না।

নামটা শুনেছেন?

হ্যাঁ। মধুশ্রী বউদি ওবাড়িতে কাজ করতেন। কাগজে দেখেছি।

বিটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নোটবই বন্ধ করল। এই জেরা তাকে কোথাও নিচ্ছে না। মাথামুণ্ডু বোঝাও যাচ্ছে না কিছু। হয়তো তদন্তটার ভার শেষ অবধি লালবাজার নিয়ে নেবে। কিন্তু তারও তো কিছু করার ছিল! মধুশ্রীর অতীত যথেষ্ট উত্তেজক। স্বামী বা প্রেমিক যে কেউ তাকে খুন করে থাকতে পারে। কিন্তু মোটিভ এবং সুযোগ যথেষ্ট জোরালো নয়।

মধুশ্রীকে কোথায় দেখেছে বিটু? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

নীতিনকে ছেড়ে ধীর পায়ে হাতিবাগানের বাসস্টপে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বিটু জানে সে যথার্থ অর্থে খুব ভালো পুলিশ নয়। সে একটু ভাবুক, একটু রোমান্টিক, একটু কবি-কবি। ঘটনাবলীকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তি পরম্পরায় জুড়ে দেয়ার জন্য যে বাস্তব বুদ্ধি দরকার তার সেটা নেই। একজন ভালো পুলিশম্যানের এসব গুণ থাকা একান্ত দরকার। বেকার সমস্যার এই যুগে তো চাকরি বাছাবাছি করা যায় না। যা পেয়েছে নিয়েছে।

বিটু চিন্তিত মাথা নিয়ে বাসে উঠল।

পরের গন্তব্য মধুশ্রীর বাপের বাড়ি।

বাপের বাড়িটা দেখে বিটু একটু ব্যোমকে গেল। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউয়ের ওপর চারতলা বিশাল বাড়ি। নিচে দোকানঘর, ওপরে ফ্ল্যাট। বাড়িটা এদের নিজস্ব। নিজেরা তিনতলাটা নিয়ে থাকে। বাকি সব ভাড়াটে। তিনতলাটাও কম বড় নয়। বিটুর হিসেবমতো অন্তত দশ-বারো হাজার স্কোয়ার ফুট। মধুশ্রীর বাবার বয়স বাহাত্তর, মা তো কবেই মারা গেছেন। দুই ভাই ও তাদের পরিবারেরা থাকে। পুলিশের লোক বলে প্রথমে একটু খাতির দেখাল। কিন্তু জেরার সময়ে সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে রইল। কেউই মধুশ্রীর কোনও খবর রাখে না। হ্যাঁ মৃত্যুসংবাদ তারা কাগজে দেখেছে। না, তারা খুনী বলে কাউকেই সন্দেহ করে না। এবং হ্যাঁ, মধুশ্রীর চরিত্র সম্পর্কে তারাও কিছু কানাঘুষো শুনেছে। বিটু ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টাতেও এদের শীতল কঠিনতা ভাঙতে পারল না।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা গেছে, হাতুড়ির একটি ঘা-ই ছিল মধুশ্রীকে মারার পক্ষে যথেষ্ট। পরে আরও কয়েকবার মারা হয়েছে নিতান্তই অযথা। এই নৃশংসতার পিছনে খুব জোরালো উদ্দেশ্য থাকতেই হবে।

বড়বাবু বললেন, দত্ত, কিছু হলো?

না, স্যার।

শেষ অবধি তাহলে কি কেসটা সাজানো যাবে না? একজন সাসপেক্ট তো দরকার।

হ্যাঁ, স্যার।

শোনো, কাল-পরশু বরং ওই স্বামী আর প্রেমিক দুটোকেই ভরে দাও।

ভরে দিয়ে?

কথা বলতে হবে হে। চেপে যাচ্ছে। লাইন অফ ইন্টেরোগেশন ঠিক হচ্ছে না। আগে হাজতে ভরো। গুঁতোর চোটে ঝেড়ে কাশবে। আমার ছেলেটার জ্বর না কমলে আমি কনসেনট্রেট করতে পারব না। তোমরা দু'জনে চালিয়ে নাও আপাতত।

আপনার ছেলের জ্বর এখন কত?

পাঁচ-ছয় চলছে।

বিটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল, বড়বাবুর লাইন নেওয়া ঠিক কাজ হবে কিনা। অনেক সময় এতেই কাজ হয়ে যায়। আবার অনেক সময়ে হয়ও না।

বড়বাবু জিগ্যেস করলেন, মেয়েটার বাপের বাড়ির লোক কী বলছে?

স্পিকটি নট।

খুব খারাপ। লক্ষণ ভালো নয়। বাপের বাড়ির লোকেরাই তো আজকাল ডায়েরি করে। এরা গরম হচ্ছে না কেন?

কলঙ্কের ভয়ে। মধুশ্রী ত্যাজ্য মেয়ে ছিলেন।

ব্যাড, ভেরি ব্যাড।

পাঁচ

খুব ভোরে পার্কের একটা গাছতলায় বেঞ্চে বসে আছেন শিবশঙ্কর। মুখে স্মিত একটু হাসি। তাঁর স্ত্রী মাধবী তাহলে ভয় পান? অ্যাঁ, ভয় পান!

গত কয়েকদিন ধরে মাধবী ডাক্তার না দেখিয়েই শিবশঙ্করের প্রেশার আর ট্র্যাংকুলাইজারের বড়ি দু'বেলা খাচ্ছেন। অগে তাঁদের আলাদা খাট ছিল। এখন খাট জোড়া লেগেছে। সবসময়ের কাজের লোক খোঁজা হচ্ছে পাগলের মতো।

শিবশঙ্কর বারকয়েক বলেছেন, লোকের দরকারটা কী?

মাধবী বলেছেন, বাড়িটা ছমছম করছে। একজন লোক থাকা দরকার।

ছমছম! কই, আমার তো লাগে না।

আমার লাগে।

মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে নাও। আমাদের বয়স হয়েছে, এখন কি ভয় পেলে চলবে?

ওটা কী কথা! ওরকম বলতে নেই।

মধুশ্রীর মৃত্যুর পর মাধবীই রাঁধেন। রান্না তিনি একরকম ভুলেই গেছেন। শিবশঙ্করের রান্নায় নুন কম, চায়ে চিনি কম ইত্যাদি মনে রাখতে ভুলে যান। টোস্ট বড্ড শক্ত করে সেঁকেন। শিবশঙ্করের কষ্ট হয়। গত কয়েকদিন তাঁর খাওয়ার কষ্ট আরও বেড়েছে। মধুশ্রীও ঠিক তাঁর যত্ন করত না।

একদিন ঠিকে ঝিয়ের সঙ্গে গুনগুন করে রান্নাঘরে গল্প করছিল মধুশ্রী। চায়ের এঁটো কাপ রাখতে গিয়ে শুনে ফেলেছিলেন শিবশঙ্কর।

মধুশ্রী বলছিল, বুড়োটার হাড় শক্ত আছে। সহজে মরবে না।

ঝি বলল, মরবে কেন? দিব্যি আছে।

কেপ্পনের জাসু। হাজার টাকা চেয়েছিলাম, কিছুতেই দিল না। একশো টাকা কম দিচ্ছে।

গিন্নিমার কাছে চেয়ে নাও না।

দেবে! সে পাত্রী পাওনি।

শিবশঙ্কর দুঃখিত হয়ে সরে এসেছিলেন। মধুশ্রী কত মাইনে পায় তা তিনি জানেন বটে, কিন্তু মাইনেটা তিনি ঠিক করেননি। ন'শো টাকা মাইনে তাঁর কাছে খুবই বেশি ঠেকেছিল, কিন্তু তিনি মতামত প্রকাশ করেননি। ওসব করে মাধবী। তাহলে কি মাধবী তাঁকে শিখণ্ডী খাড়া করে কাজের লোকদের ওসব বোঝায়? হবেও বা।

সারাদিন শিবশঙ্করের একলাই কাটত। চুপচাপ বারান্দায়, ঘরে বসে কিংবা শুয়ে। মধুশ্রী কখনও জিগ্যেস করেনি তিনি অসুস্থ বা একা বোধ করছেন কিনা। মধুশ্রী দু'বছর ছিল, কখনও আপন হয়নি। কখনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি শিবশঙ্করের সঙ্গে। মধুশ্রী ছিল নিষ্প্রাণ ও ঠান্ডা। সে শীতলতা যেন মৃত্যুর মতো। মধুশ্রী ডাকলে

কাছে আসত, কিছু বললে করে দিত। নিজে থেকে কখনও কিছু আগ বাড়িয়ে করত না। খুব সূক্ষ্ম একটা অবহেলা ছিল। যে টের পায় সে-ই পায়।

মধুশ্রীর বদলি হিসেবে শিবশঙ্কর কাউকেই চান না। আবার যদি ওরকমই কেউ আসে?

শিবশঙ্কর প্রাতঃভ্রমণের পর বিশ্রাম সেরে ফিরলেন বাড়ির দিকে। বেশ ভারমুক্ত লাগে আজকাল। একটা ছোটো স্বাধীনতাই যেন। মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই। আসুক সে। শান্তভাবেই মরতে পারবেন।

ডোরবেল বাজাতেই মাধবী দরজা খুললেন। আজ এত দেরি যে?

দেরি! শিবশঙ্কর বিব্রত হয়ে বললেন, দেরি কোথায়?

ইনি অনেকক্ষণ বসে আছেন।

শিবশঙ্কর বিটুকে চিনতে পারলেন। থানার সেই ছোকরা অফিসার। সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

শিবশঙ্কর হাসলেন, তদন্তের কতদূর?

এখনও চলছে। আপনার কাছেই আসা।

বসুন। জামাকাপড় পাল্টে আসছি।

জামাকাপড় পাল্টাতে আজ একটু সময় নিলেন শিবশঙ্কর। তাঁর মনটা হালকা এবং বেশ খানিকটা অন্যমনস্কও তিনি।

মাধবী ঘরে এসে চাপা গলায় বললেন, এত সকালেই লোকটা এসেছে কেন বলো তো?

তা তো জানি না! তোমাকে কিছু বলেনি?

বলেছে যে ওরা কোনও মোটিভ পাচ্ছে না।

ও। তদন্ত এগোলে পাবে ঠিকই।

শোনো, আমার আর এ বাড়িতে থাকার ইচ্ছে নেই।

অবাক হয়ে শিবশঙ্কর বললেন, সে কী! কেন?

এই এত্ত বড় বাড়ি দিয়ে আমাদের কী দরকার? থাকব তো তুমি আর আমি। মেনটেন করারও অনেক ঝামলা। তার চেয়ে এটা বিক্রি করে আমরা একটা ছোটো ফ্ল্যাট কিনে চলে যাই চলো।

শিবশঙ্কর গম্ভীর মুখ করে বললেন, কত যত্ন করে বাড়িটা করেছিলাম বলো তো!

তা কি জানি না! কিন্তু ছেলেরা কেউ থাকবে না, এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করে না? তার ওপর এই ঘটনা।

ভয় পাচ্ছো?

মাধবী একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, বার বার ভয়ের কথা জিগ্যেস করো কেন? বলেছিই তো পাচ্ছি।

তোমার ভয়ডর কখনও দেখিনি তো।

এখন বয়স হচ্ছে। মনটা দুর্বল।

আমার বয়স তো তোমার চেয়ে অনেক বেশি।

তুমি পুরুষমানুষ।

বলছো! বলে শিবশঙ্কর একটু হাসলেন।

হাসছো কেন?

এতকাল পরে স্বীকার করছো যে আমি পুরুষমানুষ আর তুমি মেয়ে। তফাৎটা চোখে পড়ছে তাহলে?

মাধবী ভ্রূ কোঁচকালেন। তারপর বললেন, আমার কথাটা কানে তুলেছো তো!

কোনটা? ফ্ল্যাট কেনার কথা তো!

হ্যাঁ।

তুমি যা চাও তাই তো হয়। এটাও হবে।

তুমি এ বাড়ি ছাড়তে চাও না কেন বলো তো? এত মায়া কিসের? একটা অপঘাত হয়ে গেছে, এ বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন কেমন ভারী-ভারী ঠেকছে।

ওটা মানসিক ব্যাপার। পৃথিবীতে হাজারো, লাখো, কোটি অপঘাত হয়েছে। তাহলে তো গোটা পৃথিবীর অবহাওয়াই ভারী-ভারী হওয়ার কথা।

সে যাই বলো, মানসিক ব্যাপারটাও তো উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

না, উড়িয়ে দিচ্ছি না।

আচ্ছা একটা কথা বলব?

বলো।

তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে কেন বলো তো!

অন্যরকম বলতে?

অন্যরকম মানে অন্যরকম। সেই তুমি যেন নও।

শিবশঙ্কর হাসলেন। এই বাহাত্তরে কি পাল্টে গেলাম! তাই কি হয়? তবে বাহাত্তুরে বুড়োদের ভীমরতি হয় বলে শুনেছি। সেরকম কিছু কি?

তোমাকে বাহাত্তুরে বলে মনে হচ্ছে না। আর তাইতেই অবাক হচ্ছি।

বাহাত্তুরে নয় তো কী?

তুমি চিরকাল নিরীহ, জড়োসড়ো মানুষ।

তা তো বটেই। বিশেষ করে বিয়ের পর থেকে।

কেন, বিয়ের দোষটা কি?

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললেন, বিয়ের দোষ হবে কেন? দোষের কথা হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীর একজনের বেশি ব্যক্তিত্ব থাকলে অন্যজন একটু ওইরকম হয়ে যায়।

তার মানে আমার ব্যক্তিত্ব বেশি?

লোকে তাই বলে।

বাজে কথা।

আচ্ছা না হয় তাই হলো। কিন্তু আমার নিরীহ ভাবটা কি আর নেই? এখন কি আমার নখ-দাঁত বেরোচ্ছে?

কি জানি বাপু, আমার তো অন্যরকম লাগছে।

পুলিশ অফিসারটি বসে আছেন। এখন আমার ওঁর কাছে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ, যাও।

কিছু বলছিল? ক্লু-টু কিছু পেয়েছে।

সেরকম মনে হলো না।

শিবশঙ্কর একটু ভাবিত মুখে পুলিশ অফিসারটির মুখোমুখি হওয়ার জন্য বাইরের ঘরে এলেন। সোফায় বসে বললেন, এবার বলুন।

বিটু একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

আরে না না, বলুন। কথা কইতে আমি ভালোইবাসি। সারাদিন তো মুখ বুজেই থাকতে হয়।

আপনার কি কোনও হাতুড়ি আছে?

হাতুড়ি? অবাক শিবশঙ্কর খানিকক্ষণ বিটুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, হ্যাঁ। আছে তো। থাকবারই কথা।

কোথায় সেটা রাখেন?

কোথায়! তাই তো! আমার একটা টুল বক্স আছে, সেখানেই কিছু যন্ত্রপাতি রাখা থাকে। রেঞ্চ, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার এইসব। সেখানে থাকতে পারে।

আপনি তো অগোছালো মানুষ নন। আপনার স্ত্রী বলছিলেন আপনি এসব ব্যাপারে খুবই গোছানো মানুষ।

তা বটে।

এ বাড়িতে দুষ্টু ছেলেপুলেও নেই যে অগোছালো করবে।

কী বলতে চাইছেন?

জানতে চাইছি, আপনার হাতুড়িটা কোথায়?

একটু বিরক্ত হয়ে শিবশঙ্কর বললেন, হঠাৎ হাতুড়ির কী দরকার হল?

দেখুন না সেটা আছে কিনা। প্লিজ!

শিবশঙ্কর উঠে গেলেন। টুলবক্স থেকে হাতুড়িটা নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে বললেন, দেখুন।

বিটু হাতুড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফের রেখে দিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনার ব্যক্তিগত ধারণায় মধুশ্রী কেমন মানুষ?

বলেছি তো, কাজের মানুষদের সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই।

তা হলেও উনিই তো আপনার দেখাশোনা করতেন!

তা করত।

দু'বছর আপনাদের বাড়িতে উনি কাজ করেছেন। একটা ধারণা তো হয়!

ভালোই ছিল। কাজের মানুষ।

উনি আপনার দেখভাল ঠিকমতো করতেন তো!

আমার দেখভাল করার কিছু নেই। রাঁধত, খেতে দিত এই পর্যন্ত।

যত্ন করে দিত?

শিবশঙ্কর হাসলেন, মাইনে করা লোকের কাছ থেকে আজকাল কতটা আশা করা যায়?

আপনাকে উনি কী বলে ডাকতেন?

ডাকত? না, কিছু বলেই ডাকত না। ডাকার দরকারই বা হতো কোথায়? বলত, চান করে আসুন, খেয়ে নিন বা এই আপনার চা। ব্যস।

কাকাবাবু বা মেসোমশাই এসব বলে ডাকতেন না?

আমার তো মনে পড়ে না।

উনি কেমন ছিলেন?

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললেন, আমার ধারণা নেই। আমার স্ত্রী হয়তো ধারণা করেছেন।

আপনার স্ত্রীর জবানবন্দী আমি নিয়েছি। আপনার অ্যাঙ্গেলটা জানা দরকার। দু'বছর একটা পরিবারে কাজ করলে বেতনভুক কর্মচারীর সঙ্গেও এটা পারসোনাল রিলেশন তৈরি হয়।

হওয়ারই কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি।

উনি কি একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন?

মাধবী রান্নাঘরে বোধহয় শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কিছু রাঁধছেন। হঠাৎ ঝাঁঝে শিবশঙ্করের কাশি উঠল। কাশতে কাশতে মুখ-চোখ একটু লাল হয়ে গেল। খানিকক্ষণ সময় লাগল সামলাতে। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমি ওকে স্টাডি করিনি।

ব্যাপারটা অদ্ভুত।

আমার তো অদ্ভুত লাগছে না। মধুশ্রী নিজের কাজ নিয়ে থাকত। আমি থাকতাম স্মৃতির রোমন্থন নিয়ে, খবরের কাগজ, বই, পত্রিকা নিয়ে। একটু অ্যালুফ এই যা।

আমার এক পিসি ছিল। সন্তানহীনা বিধবা। আমরা যৌথ পরিবারের ছেলেমেয়েরা বলতে গেলে তাঁর শাসনেই বড় হয়েছি।

ভালো, খুব ভালো। যৌথ পরিবার উঠে যাচ্ছে, এটা দুঃখের কথা।

কথাটা শেষ হয়নি।

ও। বলুন।

আমার এই পিসি ছিলেন স্যাডিস্ট। অন্যকে কষ্ট বা যন্ত্রণা দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। তাতেই আনন্দ পেতেন। ভাইয়ের বউদের যা খুশি অপমান করতেন, ভাইদের কথা শোনাতেন, নিজের মা-বাপকেও রেহাই দিতেন না। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশি শাসন ছিল বাচ্চাদের ওপর। কেন কে জানে! শাসন বা অপশাসন যাই বলুন তাতে আমাদের জীবনের সব আনন্দই ছাই হয়ে যেত।

বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনার কি মনে আছে মধুশ্রীর ডেডবডি দেখে প্রথমেই আমার তাঁকে চেনা-চেনা ঠেকছিল?

তা হবে। মনে নেই।

মধুশ্রীকে আমি কখনও দেখিনি জ্যান্ত অবস্থায়। মৃত মধুশ্রীর মুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম।

শিবশঙ্কর চেয়ে রইলেন বিটুর দিকে।

বিটু বলল, ওঁর মুখে আমি আমার সেই পিসির একটা অদ্ভুত আদল দেখেছিলাম। তখন ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। কাল রাতে হঠাৎ ঘুমোনোর ঠিক আগে মনে পড়ে গেল। ক্লিক।

শিবশঙ্কর হাসলেন, ও। কিন্তু তাতে এই মোকদ্দমার কিছু সুবিধে হবে কি?

বিটু মাথা নেড়ে বলল, না, মোকদ্দমার ব্যাপারে পুলিশ তাদের মতো করে এগোবে। অনেক খুনের মামলারই কোনও কিনারা হয় না। খুনীকে আইডেন্টিফাই করাও যায় না। পুলিশ তার মতো কাজ করে।

আপনিও তো পুলিশ।

হ্যাঁ। কর্মসূত্রে তাই। কিন্তু আমি ভালো পুলিশ নই। আমার পুলিশী মস্তিষ্ক নেই।

কে বলল?

কলিগরা।

ও। তাহলে—

হ্যাঁ, আমার আরও দু'একটা কথা আছে।

বলুন।

হাতুড়ির হাতলে কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।

তাই বুঝি?

মধুশ্রীর স্বামী এবং প্রেমিক দু'জনকেই পুলিশ আরও জেরা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় তাদেরও কারোই মধুশ্রীকে খুন করার যথেষ্ট মোটিভ ছিল না।

কী করে বুঝলেন?

জাস্ট হানচ। বলেছিই তো আমার পুলিশী মস্তিষ্ক নেই। শুধু ইমাজিনেশন আছে।

আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?

শুনবেন? বলব?

শুনিই না হয়।

আপনার স্ত্রী কি ব্যস্ত আছেন?

হ্যাঁ।

এ ঘরে আসবেন না তো!

বোধহয় না। উনি রান্না নিয়ে ব্যস্ত। এখনই বেরিয়ে যাবেন। ওঁর অনেক কাজ।

মধুশ্রী দু'বছর এ বাড়িতে ছিলেন। হয়তো তিনি একজন স্যাডিস্ট, কোল্ড এবং নিষ্ঠুর মহিলা। ঠিক বলছি?

বলে যান।

তিনি যাঁর দেখাশোনা করতেন তাঁর বয়স সত্তরের ওপর। নিরীহ, গোবেচারা, স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে জড়োসড়ো। তাঁর ছেলেরা কাছে থাকে না। ফাঁকা বাড়ি। তাঁর সময় কাটে না। সারাক্ষণ বার্ধক্য, রোগভোগ নিয়ে পড়ে আছেন। সারা জীবনে যাঁর কোনও পৌরুষের প্রমাণ কেউ পায়নি। একজন অনাত্মীয় মহিলা তাঁর দেখাশুনো করেন, কিন্তু সূক্ষ্ম অবহেলা, পরোক্ষ অপমান এবং শীতল উপেক্ষা তিনি টের পান। এই মহিলার নিরন্তর সাহচর্য তাঁকে বাঁচার প্রেরণা দেয় না। উপরন্তু তিনি নিবে যাওয়ার আগে নিজে পৌরুষকে নিজের কাছে অন্তত একবার প্রমাণ করতে চান।

শিবশঙ্কর বিনা বাক্যে চেয়ে রইলেন।

বিটু হাতুড়িটা তুলে নিয়ে বলল, এই হাতুড়িটা নতুন। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে এর হাতলের পালিশ তোলার চেষ্টা হয়েছে। একটু তেলকালিও মাখানো হয়েছে। তবু নতুনকে পুরনো করা যায়নি।

শিবশঙ্কর একটু হাসলেন, বাঃ! আপনার পুলিশী মস্তিষ্ক নেই কে বলল? এই তো দিব্যি আছে।

বিটু মাথা নাড়ল, না, নেই। শুধু ইমাজিনেশন। আমি এই গল্পটা বললে আমার কলিগরা হাসবে। বাহাত্তর বছর বয়সী নিরীহ একজন মানুষ স্রেফ নিজের বার্ধক্য, রোগভোগ এবং প্রমাণিত অপদার্থতার খোলস ভেঙে বেরোনোর জন্য এরকম সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করতে পারেন একথা আদালতকেও খাওয়ানো শক্ত। পুলিশে এ লাইনে ভাববেও না। তারা প্রেমিক এবং স্বামীর পিছনে লাগবে। তারপর একদিন হাল ছেড়ে দেবে।

আপনি তো হাল ছাড়ছেন না!

আমি! বিটু হেসে মাথা নাড়ল, আমি ভালো পুলিশ নই।

গ্রেফতার করবেন না?

বিটু ফের মাথা নাড়ল, না। আমার কি দায়?

খুনীকে ছেড়ে দেবেন?

বিটু নিষ্পলক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, ধরলেও কত বছর সাজা হবে আপনার? আর কীই বা সংশোধন হতে পারে সাজা থেকে! ইউ আর বিয়ন্ড দ্যাট। কিন্তু খুনের পর থেকে আপনার ভিতরে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।

কী সেটা?

অনেক দৃপ্ত, অনেক আত্মবিশ্বাস, অনেকটা যেন বয়সও ফিরে পেয়েছেন আপনি।

শিবশঙ্কর সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই প্রথম বাঁচার একটা স্বাদ পাচ্ছি আমি।

বিটু টুপিটা তুলে মাথায় পরল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি নরম্যাল নন। আপনি একধরনের পাগল।

আমাকে ছেড়ে রাখবেন? রাখাটা ঠিক হবে কি?

ইচ্ছে করলে আপনি কনফেস করতে পারেন। কিন্তু আমার কর্তব্য এই অবধি। গুড বাই।

বিটু চলে গেল।

শিবশঙ্কর বসে রইলেন। কী করবেন তা স্থির করতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর বিন্দুমাত্র নার্ভাস লাগছে না। ভয় হচ্ছে না। দুর্বলতা টের পাচ্ছেন না। শান্ত মাথায় ভাবতে লাগলেন, সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হবে। ধরা দেবেন? নাকি চুপচাপ থেকে যাবেন?

সে যাই হোক, একটা কিছু করা যাবে। যতক্ষণ স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পারছেন ততক্ষণ বাহাত্তরের পরবর্তী এই জীবনে একটা জোয়ারকে উপভোগ করতে চান তিনি। সময় তো বেশি নেই।

জন্মান্তর

কুসুমকুমারীর সঙ্গে হরিদাসের বিয়ে হয়নি। হয়েছিল শিবনাথের। কুসুমকুমারীর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে শিবনাথ মারা যান। কুসুমকুমারী বেঁচে ছিলেন ছিয়ানব্বই বছর বয়স অবধি।

তিনি সারাজীবন হরিদাসের কথা মাঝে মাঝে ভাবতেন কি না বলা যায় না। শিবনাথের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখেরই হয়েছিল। কুসুমকুমারীর মৃত্যুকালে তাঁর ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি এবং তস্য পুত্রকন্যা মিলে সংখ্যা বড় কম হয়নি। কুসুমকুমারী তাঁর পরবর্তী তিন প্রজন্মের মানুষ দেখে গেছেন।

আর হরিদাস?

না, হরিদাস তত ভাগ্যবান ছিলেন না। কুসুমকুমারীর কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেননি, বিরহ অনলে ধিকি ধিকি জ্বলে পুড়ে মরতেন। কুসুমকুমারীর জন্যই তিনি কখনও বিয়ে করেননি। পাটনায় একটা চাকরি করতেন। খুবই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। শেষ দিকে তাঁর দানধ্যান, সাধুসঙ্গ এবং জ্যোতিষচর্চার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। এ সব কথা তিনি ডায়েরিতে লিখে যান। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে সম্ভবত সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। সন্ন্যাস কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ডাক্তার তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটে ওই কথাটাই লিখেছিল।

হরিদাসের মৃত্যুসংবাদ কি কুসুমকুমারী পেয়েছিলেন?

পেয়েছিলেন। হরিদাসের মৃত্যু সংবাদ আসে প্রথম তাঁর ভাই ও ভাইপোদের কাছে। যখন খবর আসে তখন হরিদাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাঁর এক সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীনাথ পাণ্ডে সে কাজ করেন।

ভাইপোদের খবর দেওয়া হয়েছিল হসিদাসের অফিস থেকে তাঁর পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে যেতে। হরিদাসের ভাইপো দ্বিজদাস গিয়েছিলেন। হরিদাসের মৃত্যুর পর খবরটা কুসুমকুমারী পান।

কুসুমকুমারীর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? দুঃখিত হয়েছিলেন কি?

বলা মুশকিল। কুসুমকুমারীর তখন বড় সংসার। শরীর ও মন দুই-ই সংসারে সমর্পিত। ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে বা হচ্ছে। দুঃখ হলেও তা এত বেশি নয় যে, দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হবে। তবে আমাদের অনুমান, কুসুমকুমারীর হৃদয় গভীরভাবে আহত হয়েছিল।

তাঁদের প্রেম কতখানি গভীর ছিল?

সে আমলে প্রেম হত খুব সামান্য চোখাচোখি, একটু সলাজ হাসি, চোখ নত করা, কখনও এক-আধটা চকিত বাক্য বিনিময়। এর বেশি কিছু নয়।

কুসুমকুমারীর সঙ্গে হরিদাসের সম্পর্কটা কি ওইরকমই ছিল?

তাঁরা একই গ্রামে থাকতেন। এ পাড়া-ও পাড়ার দূরত্ব। শিশুকালে তাঁরা হয়তো একসঙ্গে খেলাধুলো করেছেন। দু-বাড়ির মধ্যে যাতায়াত, সদ্ভাব ছিল। দুজনের মধ্যে প্রকাশ্য প্রণয় না থাকলেও হয়তো উভয়েই উভয়কে কামনা করেছিলেন।

সেটা কিভাবে বোঝা গেল?

হরিদাস তাঁর কুড়ি বছর বয়সের সময় দ্বাদশী কুসুমকে একটি প্রেমপত্র লেখেন। তাতে লিখেছিলেন, প্রিয়তমা কুসুম, এই তৃষিত হৃদয় তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছে। দেবী, এই অভাগার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে কি?...ইত্যাদি। কুসুমকুমারী এই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এই ভাবে, আপনি আমাকে গ্রহণ করিলে এই নারীজন্ম সার্থক বলিয়া মনে করিব। দুটি চিঠিই কিন্তু পাওয়া গেছে এবং আজও আছে।

কীভাবে পাওয়া গেল?

হরিদাসের জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিজদাস চিঠিটি খুঁজে পায়। তবে চিঠিটা কার লেখা তা সে বুঝতে পারেনি। চিঠিটা সে রেখে দিয়েছিল। হরিদাস মৃদুভাষী, হাস্যমুখ এবং নম্র প্রকৃতির ছিলেন বলে সহজেই মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতেন। দ্বিজদাস তাঁর এই উদাসীন কাকাটিকে বড় ভালোবাসত। হরিদাসের জিনিসপত্র সে সযত্নে রক্ষা করত, কাউকে হাত দিতে দিত না।

আর হরিদাসের চিঠি কিভাবে পাওয়া গেল?

সেটা পাওয়া গেছে গত বছর কুসুমকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর পুরোনো একটি হাতবাক্সে অনেক কাগজপত্রের মধ্যে। তাঁর নাতনি বিজয়া চিঠিটি পায় বটে, কিন্তু হরিদাস কে তা তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, চিঠিটা পেয়ে তারা খুব মজা পায় এবং হাসহাসি করে। প্রায় চুরাশি বছর আগে লেখা এই প্রেমপত্র তো এখন হাসিরই খোরাক।

দুটি চিঠিতেই কি তারিখ দেওয়া ছিল?

হ্যাঁ।

তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে বাধাটা কী ছিল? জাতের তফাত?

না। উভয়েই ব্রাহ্মণ পরিবারের। বিবাহের প্রস্তাব উঠলে হয়তো বাধাও হত না। কিন্তু লাজুক হরিদাস বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেননি। তাঁর রাশভারী বাবা এবং দাদাদের তিনি খুব সমীহ করতেন। তাছাড়া সময়ও পাননি। প্রণয় ব্যক্ত করার ছ'মাসের মধ্যে শিবনাথের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের প্রস্তাব আসে। শিবনাথ বয়সে হরিদাসের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। তিনি ধনীর পুত্র ছিলেন এবং ল ক্লাসের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। পাত্র হিসেবে তাঁর কাছে হরিদাস কিছুই নয়। কুসুমকুমারী অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটেই কালক্ষেপ করেননি।

কুসুমকুমারী কি বিন্দুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করেননি?

হয়তো করেছিলেন, হয়তো ভয়ে করেননি। তখন তো মেয়েরা নিজেদের মতামত দিত না।

তাহলে কি এই ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য কুসুমকুমারীকে দায়ী করা যায়?

না, করলে সেটা কুসুমকুমারী ওপর অবিচার হবে। মনে রাখা দরকার ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো-তেরো বছর। ওই বয়সে আসলে একটি মেয়ের পক্ষে গোপনে অশ্রুমোচন করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

দুজনের মধ্যে আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি?

বলা কঠিন, কুসুমকুমারী বাপের বাড়ি কমই আসতেন। আর কুসুমের বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই হরিদাস পাটনায় চাকরি নিয়ে চলে যান।

তাহলে তো বলতে হয় এই প্রণয়কাহিনীটি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছেই গেছে। কোনও চিহ্নই আর নেই।

তা বটে। তবে কুসুমকুমারী মারা যাওয়ার আগে অর্ধচেতন অবস্থায় ককেদিন অনেক পারম্পর্যহীন কথা বলতেন। তার মধ্যে একটি কথা প্রায়ই বলতেন, ওরে, কাশীতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কাশীর ঘাট কী সুন্দর! সেখানে বসে কত কথা হল।

কুসুমকুমারী কি কাশী গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, স্বামী মারা যাওয়ার পর শোকাভিভূতা কুসুমকুমারী কাশীতে গিয়ে মাসখানেক থেকেছিলেন। শোনা যায় কাশীতে গিয়ে তিনি শান্তি পান। সেই শান্তি বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় পেয়েছিলেন, না কি অন্য সূত্রে তা এসেছিল সে কথা বলা আজ সহজ নয়।

অন্য সূত্রটা কী?

এইখানেই রহস্যটা ঘনীভূত এবং প্রায় অভেদ্য। সচেতন অবস্থায় তিনি কাশীর অনেক গল্প করতেন বটে, কিন্তু সেখানে কার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তা কখনও কাউকে বলেননি, শুধু একটি নাতনি ছাড়া।

তিনি কি একা কাশী গিয়েছিলেন?

না, সঙ্গে তাঁর মা ও এক ননদ ছিলেন।

তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না?

না। এমন হতেই পারে যে, কুসুমকুমারী একাই হরিদাসের দেখা পেয়েছিলেন।

লোকটা যে হরিদাসই এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় কি?

না। একেবারেই না। এটা সম্পূর্ণ অনুমান।

কুসুমকুমারী তাঁর বিকারের ঘোরে আর কী বলেছেন?

বিকারের ঘোরে বলা সব কথা ধর্তব্য নয়। তবে তিনি বারবার কাশীর কথা বলতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, তার একটা ছেলে আছে। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ও ঠিক তার মতো।

সে কী! এ তো গল্পের নতুন মোড়!

হ্যাঁ, তবে লোকটা কে সেটাই যখন অনুমানের বিষয় তখন এটাও ধর্তব্য নয়। মনে রাখতে হবে হরিদাস বিয়ে করেননি।

তাও তো বটে।

তবে বিয়ে না করলেও ছেলে হতে বাধা কী?

ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা জটিল।

কীরকম জটিল?

খুবই জটিল। আমাদের আবার দ্বিজদাসের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। দ্বিজদাস অবশ্য অনেকদিন অগেই মারা গেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাকার কাগজপত্র ডায়েরি সবই সযত্নে তালা দিয়ে রেখে যান। তাঁর ছেলেরা কেউই ও সব খুলে দেখেননি। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নয়ন টাকাপয়সা পাওয়া যায় কি না তা খুঁজে দেখতে হরিদাসের বাক্স খোলে। হরিদাসের মোট আটটা ডায়েরি ছিল। তার মধ্যে কয়েটিতে বারবার ঘুরে ফিরে পুষ্প নামে একটি মেয়ের কথা ছিল। খুব বেশি কিছু নয়। যেমন লিখেছেন, পুষ্প আমার কত সেবা করে! ওরকম মেয়ে হয় না। আবার লিখেছেন, পুষ্প আজ আমাকে ঠেকুয়া তৈরি করে খাওয়াল। অতি উপাদেয়, ইত্যাদি।

পুষ্পটি কে?

দ্বিজদাস যখন হরিদাসের জিনিসপত্র আনতে পাটনা যায় তখন এই পুষ্পর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মেয়েটির নাম পুষ্প মা। এখন তার বয়স, অনুমান ত্রিশ-বত্রিশ।

তাহলে কি এই পুষ্পর সঙ্গে হরিদাসের কোনও সম্পর্ক হয়েছিল?

হওয়াটা অস্বাভাবিক কী? প্রেম তো হৃদয়ের ব্যাপার, তার সঙ্গে শরীরের ক্ষুধা তো পায়ে পা মিলিয়ে চলে না!

আরও স্পষ্ট করে ব্যাপারটা জানা দরকার।

এ গল্পের কিছুই স্পষ্ট নয়। সবই অনুমান। কখনও সবল অনুমান, কখনও দুর্বল অনুমান।

তা অনুমান কী বলছে?

হরিদাস এক জায়গা সখেদে লিখছেন, আমার এই পাপ ভগবান খণ্ডাইবেন কি? ইহার জন্য আমার যে বাঁচিয়া থাকিয়াই নরক যন্ত্রণা হইতেছে। কিসের পাপ, কেন পাপ তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু আরও কয়েক পাতা জুড়ে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথাও বলছেন। এসব জায়গায় কিন্তু পুষ্পর নাম নেই।

তাহলে তো আবার আবছা হল।

না হল না। পুষ্পর নাম না-থাকার কারণ তখন মনের যা অবস্থা তাতে পুষ্পর নাম লিখতেও তাঁর লজ্জা করেছিল। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, যে বিশুদ্ধ প্রেমের স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন সেই প্রেমেই প্রতারণা করা হল। উপরন্তু একটি কুমারী মেয়ের ধর্মনাশ।

পুষ্প সম্পর্কে আর কী জানা যায়?

পুষ্প এক তেজস্বিনী মহান মহিলা। তিনি হরিদাসকে একটি মৃত প্রেমের গারদ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

এরকম সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সওয়াল কী?

সওয়াল হল, পুষ্প হরিদাসকে বাধ্য করতে পারতেন তাঁকে বিয়ে করার জন্য। তা তিনি করেননি। বরং তিনি গর্ভে হরিদাসের সন্তানকে ধারণ করার পরই উধাও হয়ে যান। রটনা হয় যে, তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের উধাও হওয়া কি এত সোজা?

না। বরং খুব কঠিন। এবার পুষ্প সম্পর্কে কিছু তথ্য না প্রকাশ করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। পুষ্প বিহারের এক কট্টর মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। তিনি তেমন পর্দানশীন ছিলেন না। উদার মনোভাবের বাবা তাঁকে বাল্যাবস্থায় বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাল। পুষ্প স্বদেশী করতেন।

ও বাবা! এত কথা জানা গেল কী করে?

ভুলে যাবেন না, পুষ্পর একটি সন্তান হয়েছিল। আর সন্তানের কাছে মা তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী বলবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

থাক থাক, তাড়াতাড়ি এগোতে হবে না। স্টেপ বাই স্টেপ।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। পুষ্পর চরিত্রের মধ্যে মুক্ত নারীর চরিত্র ছিলই। তিনি আদিবাসীদের মধ্যে স্বদেশ চেতনা ছড়ানোর কাজ করতেন। আমাদের ধারণা, তিনি গর্ভবতী অবস্থায় কোনও আদিবাসী পরিবারে আশ্রয় নেন। সেখানেই তাঁর সন্তান হয়। একটি ছেলে।

তিনি কি হরিদাসের কাছে ফিরে এসেছিলেন?

কাছে নয়। হরিদাস আত্মগ্লানিতে ভুগছেন দেখে পুষ্প আর তাঁর কাছে যাননি। তিনি সাঁওতাল পরগনার আদিবাসী সমাজেই থেকে যান। তবে নিজের সন্তানের কথা হরিদাস জানতে পারেন। ডায়েরিতে আছে, আজ আমি রজতকে দেখিলাম। এত দুঃখ, এত গ্লানি, এত অনুশোচনার মধ্যেও কি জানি কেন, তাহাকে দেখিয়া আমার বড় ভালো লাগিল। মনে হইল, সে যেন আমারই সত্তার নবীকরণ। সে যেন আমিই। জায়া মানে যাহার ভিতর দিয়া পুরুষ আবার জন্মগ্রহণ করে।

ব্যস, আর কিছু না?

না। হরিদাস জায়া শব্দের ব্যাখ্যা করেই থমকে গেছেন। ভেবেছেন ব্যাখ্যা দিতে গেলেই পুষ্পকে জায়া বলে স্বীকার করা হয়।

পুষ্প কেন হরিদাসকে জোর করে বিয়ে করল না?

পুষ্প এক তেজস্বিনী মহান মহিলা।

কথাটা তো আগেও শুনেছি।

হ্যাঁ। পুষ্প সাধারণ হলে বিয়ের জন্য পাগল হতেন।

কিন্তু বিয়ে না করে অবৈধ সন্তান নিয়ে তখন সমাজে বাস করতেন কী করে?

বলেছি তো পুষ্প এক মহান মহিলা। তিনি সমাজে ফেরেননি। আদিবাসীদের উদার পারমিসিভ সমাজেই থেকে যান।

কিন্তু ছেলের পিতৃপরিচয় কী দিতেন?

কেন, হরিদাস ঘোষাল! পুষ্প ও হরিদাসের সামাজিক বা ধর্মীয় বিয়ে হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় উভয়ে উভয়কে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মনে মনে গ্রহণ করলেও তা আসলে বিয়েই। হিন্দুশাস্ত্রে এরকম বিয়ের প্রথা আছে। গান্ধর্ব, রাক্ষস কত মতেই তো বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তবু তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু অস্পষ্টই থেকে গেল।

বলেছি তো এ কাহিনির কিছুই স্পষ্ট নয়। এ যেন অনেকটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে অবলোকন। আমরা যেন তাসের ঘর তৈরি করছি। কোনও একটা ঘটনার সূত্র বা অনুমান ভুল হলে গোটা কাহিনীটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবে এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, পুষ্পর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের পর থেকেই আত্মগ্লানিতে তিনি অহরহ কষ্ট পেতেন। আর তখন থেকেই তিনি ধর্ম-ঝোঁকা হয়ে পড়েন, দানধ্যান করতে থাকেন এবং জ্যোতিষচর্চারও শুরু তখন থেকেই। আর এই জ্যোতিষচর্চার ফলেই তাঁর কাশী যাওয়া।

কাশীর কথাও কি তাঁর ডায়েরিতে আছে?

অবশ্যই।

তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কুসুমকুমারীর কথাও আছে!

আশ্চর্যের বিষয়, সরাসরি কুসুমকুমারীর কথা নেই। তবে তিনি কাশীর বিবরণ দেওয়ার সময় লিখেছিলেন, এ জীবনে দুইবার ফুল ফুটিল, কিন্তু এ অভাগা তাহার মর্ম বুঝিল না। লক্ষ করবেন তাঁর জীবনে দুই নারীর

নামই সমার্থক। কুসুম ও পুষ্প।

ডায়েরিতে কুসুমের উল্লেখ নেই?

বললাম তো সরাসরি নেই। হরিদাস এক জায়গায় লিখেছেন, কাশীর ঘাটে বসিয়া এক সন্ধ্যায় শাশ্বত নারীর কথা ভাবিতেছি। শাশ্বত নারী রক্ত মাংসসঙ্কুলা নহেন, আইডিয়া মাত্র। পুরুষের সৃষ্ট আইডিয়া। অনুরূপ নারীও এক শাশ্বত পুরুষের আইডিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। Perfection কখনও বাস্তবে সম্ভব নহে, কল্পরাজ্যেই তাহার বাস।

আর কিছু নয়?

হ্যাঁ। আর এক জায়গায় আছে, আজ যেন খালাস হইলাম। বুকের ভার নামিয়া গেল। একটি মুখের প্রসন্নতা কত কী ঘটাইতে পারে!

এ মুখটা কার? কুসুমকুমারীর?

হতে পারে। আমাদের সরল অনুমান, তিনি কুসুমকুমারীই।

কিন্তু হরিদাসের ভাষার মধ্যে তাহলে আবেগ নেই কেন? যার জন্য তিনি প্রবাসী, অকৃতদার, যার প্রেমের জন্য তাঁর এত আকুলি ব্যাকুলি তাঁকে দেখে এবং কাছে পেয়েও তিনি যেন নিরাসক্ত।

জীবন তো এরকমই। ঘটনার সময় কুসুমের বয়স বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ। হিসেবমতো হরিদাসের বয়স পঞ্চাশ-একান্ন। বাল্যপ্রেম তখন স্মৃতির দর্পণমাত্র। এছাড়া হরিদাসের জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমন, সন্তানের জন্ম ইত্যাদিও তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে প্রশমিত করে থাকতে পারে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কুসুমকুমারী হরিদাসের এই সংক্ষিপ্ত সাহচর্যে মনে শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর পতিশোক অন্তর্হিত হয়েছিল।

কীভাবে?

আবার অনুমান। মনে হয় হরিদাস এ সময়ে জীবন সম্পর্কে উদাসীন, কামনারহিত এবং উচ্চ ভাবরাজ্যে বিরাজমান অবস্থায় ছিলেন। মানুষ যখন ভাবরাজ্যের বিশেষ স্তরে অবস্থান করে তখন সম্ভবত তাঁদের সাহচর্য মানুষকে শান্ত করে।

পুরোনো প্রেম মাথাচাড়া দিয়েছিল কি?

দিলেও তার রূপ বদল হয়েছিল। নারীপ্রেম খুব উঁচু পর্যায়ের ব্যাপার নয়। তার মধ্যে কাম কামনা থাকে। আর তা ঢাকা দেওয়া থাকে কিছু আবেগের বাড়াবাড়িতে।

কথাটা মানতে পারলাম না।

বিতর্ক থাক। হরিদাসের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা ঠিক নারীপ্রেমের পরিচর্যা বা অতীত চারণের হা-হুতাশের পর্যায়ে ছিল না, তিনি সেই সীমারেখা সম্ভবত অতিক্রম করেছিলেন।

এই অনুমানটা দুর্বল।

আমরা বিতর্কের মধ্যে যাব না। কারণ পুরো ঘটনাই বিতর্কমূলক। কিছুই প্রমাণিত নয়। আমরা শুধু সম্ভাব্যতার ওপর নির্ভর করে কাহিনীটি ফের তৈরি করছি।

একটা কথা। কাশীর ডায়েরিতে হরিদাস নিশ্চয়ই তারিখ দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ।

কুসুমকুমারীর কাশী গমনের তারিখের সঙ্গে তা মেলে কি?

কুসুকুমারীর কাশী গমনের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি পতি বিয়োগের কিছুদিন পর কাশী যান। হ্যাঁ, হরিদাসের কাশীবাসের সময়ের সঙ্গে তা মেলে। আমাদের অনুমান ইতিহাসনির্ভর।

দুজনের এই সাক্ষাৎকার কোনও নতুন মাত্রা যোগ করছে কি?

করছে। তাঁদের সম্পর্ক সাবলিমেট করেছিল।

এমনও তো হতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে যৌন সংসর্গ হয়েছিল?

এরকম অনুমান করায় কিছু বাধা আছে। কাশীতে যখন দুজনের দেখা হয় তখন কুসুমকুমারীর কোলে ছিল তাঁর দু-বছর বয়সের শিশুপুত্র হেমপ্রভ।

তা হলেই বা যৌন সংসর্গে বাধা কী?

যৌন সংসর্গ দেহের ব্যাপার। তা থেকে মানসিক প্রশান্তি আসা অসম্ভব। বিশেষ করে এক শোকার্তা মধ্যবয়স্কা নারী এবং পাপবোধে ক্লিষ্ট এক উচ্চমার্গের পুরুষের। যৌন সংসর্গ একটি মোক্ষণ মাত্র। মলমূত্র ত্যাগের মতোই ব্যাপার। তা থেকে মানুষের মহত্তর প্রয়োজন মেটে না। বরং তা আবার আমাদের মোটা দাগের সমস্যায় ফেলে দেয়। না, ব্যাপারটা আমাদের অনুমানে আসছে না। আর যদি তা হত, তবে হরিদাসের রোজনামচায় তার কিছু প্রকাশ ঘটত। কুসুমকুমারীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে না পারার লোভ যে তাঁর হৃদয়ে আর নেই তা বোধহয় কাশীতে কুসুমকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন।

কুসুমকে নিজের অবৈধ প্রেম বা সন্তানের কথা বলাটা কি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল?

নয় কেন? হরিদাস তখন স্বীকারোক্তি করার জন্যই বরং উদগ্রীব ছিলেন। কুসুম সেই স্বীকারোক্তি শ্রবণ করার সবচেয়ে উপযোগী মানুষ ছিলেন।

কেন?

কারণ কুসুমকুমারী এই মানুষটিকে বালিকা বয়সে ভালোবাসতেন। আর প্রৌঢ় মানুষটিকে দেখে সেই ভালোবাসাই পরিণত হয় শ্রদ্ধায়।

এটা বাড়াবাড়ি।

তা হতেও পারে। তবে শোকার্ত মধ্যবয়স্কা কুসুমকুমারী যে এই মানুষটির মধ্যে একটা ভাবগত আশ্রয় পেয়েছিলেন তা আমাদের সবল অনুমান।

না। অনুমানটা দুর্বল। হরিদাস তো আর সাধুসন্ত ছিলেন না। কুসুমকুমারী হঠাৎ তাঁর মধ্যে এমন কি খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁর শোক প্রশমিত করেছিল? বোঝা গেল না হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাই বা কেমন হয়ে দাঁড়াল।

এ কথা ঠিক যে, এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। আমরা শুধু জানি, কাশীতে যখন দুজনের দেখা হয় তখন সদ্যবিধবা কুসুমকুমারীর কোলে ছিল তাঁর দু'বছরের শিশুপুত্র হেমপ্রভ। পিতৃহারা অবোধ শিশুটিকে ঘিরে কুসুমের মাতৃত্ববোধ তখন প্রবল। আমাদের অনুমান এই মানসিক অবস্থায় কুসুমকুমারীর কামবোধ ছিল না। হরিদাসের সঙ্গে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ তাঁকে স্মৃতিমেদুর করেছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে স্থূল দেহবোধ সম্ভবত ছিল না।

কিন্তু হরিদাস সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কুসুমকুমারীকে তিনি যৌবন বয়সে কামনা করেছিলেন, এবং তারপর দীর্ঘদিন ধরে বিরহানলে পুড়েছেন। প্রৌঢ় বয়সে যখন দেখা পেলেন তখন তাঁর সংযম বাঁধ ভাঙতেই পারে। প্রৌঢ়ত্বেই নাকি মানুষ সবচেয়ে বেশি নীতিবোধ থেকে ভ্রষ্ট হয়। নারী-পুরুষ উভয়তই।

দেহগত কামনা বা যৌনতার প্রথম উদ্ধব হয় মনে। তারপর তা দেহে সঞ্চারিত হয়। যৌন সংসর্গের সিংহভাগই মানসিক, ক্ষুদ্র অংশ দৈহিক। শতকরা আশি এবং শতকরা কুড়ি ভাগ। মন যখন বিকল বা বিক্ষিপ্ত তখন যৌনতার উদ্ভব হয় না। বারংবার উভয়ের মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক খোঁজা খানিকটা সময়ের অপচয় মাত্র। যদিও এ যুগের প্রবণতাই হল, নারী-পুরুষের ভিতর যৌনতার ঊর্ধ্বে কোনও সম্পর্ককে অবিশ্বাস করা।

আপাতত তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল যে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল প্লেটোনিক।

আমরা চাইছি কুসুমকুমারী ও হরিদাসকে পুনরাবিষ্কার করতে। কারণ আবহমানকাল ধরে মানুষের জীবনে একই ঘটনা বা একই রকমের ঘটনা বারংবার ঘটে চলেছে। পার্থক্য ঘটছে রূপ ও মাত্রায়।

এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেই আমলে কুসুমকুমারী ও হরিদাসের বাল্যপ্রণয়ের সামান্য যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল তা এ যুগে কোনও ঘটনাই নয়। ত্রিশ বছর পর তাঁদের দেখা হওয়াকে এ কাহিনীতে যত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা এ যুগে হাস্যকর রকমের বাড়াবড়ি। আজকাল ওরকম ঘটে না! সুতরাং পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে বলে মানা যায় না।

ঠিক কথা। এ যুগে রোমান্টিক প্রেমে ভাটা পড়েছে এবং এই সামান্য বাল্যপ্রেমকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা এ যুগে ভাবাই যায় না। বরং এ যুগে নর ও নারী উভয় পক্ষই অনেক বেশি বাস্তববোধসম্পন্ন, আবেগবর্জিত এবং সম্পর্কটাও অনেক চাঁচাছোলা। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষের আদিম যুগেও তাই ছিল। গুহামানব বা মানবীরা পরস্পর প্রেমাসক্ত হত বলে মনে হয় না, কিন্তু প্রয়োজনবোধেই জুটি বাঁধত। অনেকটা সেই গুহামানবের যুগের সম্পর্কই যেন ফিরে আসছে। তখন বিবাহপ্রথা ছিল না, পুরুষ বহুনারী গমন করত, নারীরও বহুপুরুষ গমনে বাধা ছিল না। বিংশ শতকের শেষে আমরা অনেকটা সেই যুগের প্রত্যাবর্তনের আভাস পাচ্ছি। তাই বলছি, আবহমানকাল ধরে মানুষের জীবনে একই ঘটনা, একই রকম ঘটনা বারংবার ঘটে চলেছে।

তর্কের থাকিতে মেনে নিচ্ছি। তাতে কী প্রমাণ হল?

এখনও কিছুই প্রমাণ হয়নি। আমরা এই ঘটনার কোনও উপসংহারও হয়তো টানতে পারব না। শুধু গোয়েন্দাগল্পের মতো কিছু সূত্রকে গ্রথিত করে তোলা হচ্ছে।

এ গল্প আমাদের কোনও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে কি?

দেখা যাক।

গল্পটা কিন্তু দুর্বল।

হ্যাঁ, তবে এরকম গল্প নিয়ে পুরনো দিনে উপন্যাস লেখা হত। যাক গে, আমরা কুসুমকুমারীর দিককার কাহিনীর কিছু অস্পষ্টতাও দূর করার জন্য তাঁর নাতনি বন্দনার সাহায্য নিতে পারি। বন্দনা কুসুমকুমারীর কনিষ্ঠ পুত্র হেমপ্রভর কনিষ্ঠা কন্যা। বন্দনার জন্মের সময় তার মা মারা যান। ফলে সে তার ঠাকুমা কুসুমকুমারীর কোলেই মানুষ। বলে রাখা ভালো, স্ত্রী-বিয়োগের এক বছর পর হেমপ্রভর অন্যান্য সন্তানের চেয়ে বন্দনাই কুসুমকুমারীর অধিক মনোযোগ ও স্নেহ পেয়েছিল। কারণ সে প্রায় আঁতুড় থেকেই ঠাকুমার কাছে মানুষ। বন্দনাও ঠাকুমা-অন্ত প্রাণ। দুজনের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। বন্দনার কাছে কুসুমকুমারী কাশীর গল্প অনেক করতেন। এমনকী হরিদাসের কথাও। তবে হরিদাসের সঙ্গে তাঁর প্রনয়ের উল্লেখ করতেন না। কিন্তু হরিদাসের সৎ সাহচর্যে যে তিনি অনেকটাই শোকমুক্তা হয়েছিলেন তাও বলেছেন। মনে হয়, কুসুমকুমারী তাঁর জীবনের কাশীতে বাস করার কয়েকটি দিনকে খুব স্মরণ করতেন। তাঁর জীবনের ওই কয়েকটি দিন ছিল চারণযোগ্য সুখস্মৃতির মতো। এবং সে কথা তাঁর বার বার কাউকে বলতে ইচ্ছে হত। এখানে উল্লেখ করা দরকার, কুসুমকুমারী আর কখনও কাশী যাননি।

কেন?

তা বলা কঠিন। হয়তো সেখানে আর হসিদাসকে পাওয়া যাবে না বলে এবং কাশীতে গেলে সেই সুখস্মৃতি আহত হতে পারে ভেবে। কাশীভ্রমণের কয়েক বছর পর হরিদাসের মৃত্যু হয়। সেই সংবাদ কুসুমকুমারী যথাসময়ে পান।

কীভাবে?

পুষ্প তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।

এসব কথাও কি বন্দনাকে তিনি বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

পুষ্প তাঁকে চিঠি লিখলেন কেন?

খুব স্বাভাবিক কারণে। পুষ্প তাঁদের প্রণয়ের কথা জানতেন। কুসুমকুমারীকে জানানো তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

কুসুমকুমারী কি হিন্দি জানতেন?

না। কিন্তু পুষ্প বাংলা জানতেন। হরিদাস ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় মাস্টারজি এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয়জন। প্রিয়জনের জন্য মানুষ অনেক কিছু করতে পারে।

হরিদাস কি একসময়ে পুষ্পকে পড়াতেন?

হ্যাঁ। প্রাইভেট পড়াতেন। আর সেই সূত্রেই তাঁদের পরিচয়। পুষ্প গভীরভাবে হরিদাসকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

আর হরিদাস?

ঘটনাটা এইখানেই বড় বেদনাদায়ক।

কেন?

আমাদের সবল অনুমান, হরিদাসও পুষ্পকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তবে নিজের অজান্তে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই ভালোবাসার কথা তিনি নিজের কাছেই নিজে স্বীকার করতে চাইতেন না। আর ভিতরকার এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

কুসুম-হরিদাসের চেয়ে তো পুষ্প-হরিদাসের প্রণয়কাহিনী অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

হ্যাঁ, অবশ্যই। এই কাহিনীতে এ পর্যন্ত পুষ্প অন্যায়ভাবে উপেক্ষিতা। জীবনেও তাই। প্রেমের জন্য তিনি যা করেছিলেন তা তুলনারহিত। হরিদাসের সন্তান গর্ভে ধারণ করার পর হরিদাসের যাতে কলঙ্ক রটনা না হয় তার জন্য তিনি একা গৃহত্যাগ করেন। নিজের মাকে একটি চিঠিতে লিখে যান যে তিনি হৃষীকেশের কাছে এক মাতাজির আশ্রয়ে বাকি জীবন ঈশ্বর সাধনায় অতিবাহিত করতে চান।

কিন্তু হরিদাসের সঙ্গে তো তাঁর সম্পর্ক ছিল, নইলে হরিদাস তাঁর ছেলে রজতকে দেখলেন কী করে?

আমরা এমন কথা বলিনি যে পুষ্প হরিদাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। একমাত্র হরিদাসকেই তিনি নিজের অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা দেন। উভয়পক্ষের যাতায়াতও ছিল। অবশ্যই গোপনে।

একটা কথা, হরিদাসের সঙ্গে পুষ্পর বয়সের পার্থক্য কত ছিল?

অতি সঙ্গত প্রশ্ন। আমাদের হিসার মতো উভয়ের বয়সের পার্থক্য একুশ-বাইশ বছরের কম ছিল না। দ্বিজদাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী, হরিদাসের মৃত্যুর পর যখন তিনি পাটনায় যান তখন ত্রিশ-বত্রিশ বর্ষীয়া এক তেজস্বিনী নারী পুষ্পর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যদি বত্রিশও ধরি তাহলেও হরিদাসের চেয়ে তিনি একুশ-বাইশ বছরের ছোট ছিলেন। বয়সের ব্যবধানটা প্রণয়ের ক্ষেত্রে তেমন বড় বাধা নাও হতে পারে। আমরা এও জানি, হরিদাসের মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র রজতের বয়স ছিল আনুমানিক বারো বছর।

রজত কি তার পিতৃপরিচয় জানত?

জানত কেন, আজও জানে।

রজত কি জীবিত?

হ্যাঁ। কিন্তু রজতের কথা এখন থাক। উপেক্ষিতা পুষ্পর কী হয়েছিল সেটা জানা দরকার। পুষ্প অজ্ঞাতবাস করলেও নিজের সংগ্রামী স্বভাব কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি আদিবাসী সমাজের হয়ে কাজে নামেন। একজন নেত্রী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

পুষ্প কি হরিদাসের পদবি ব্যবহার করতেন?

না। হরিদাসকে কোনওভাবে কলঙ্কে টেনে আনতে চাননি তিনি। তবে ছেলের পদবি ঘোষালই রেখেছেন।

রজত ঘোষাল এখন কোথায়?

তাঁর কথা পরে। অগে পুষ্পর কথা।

কাহিনীটি কিন্তু এখন পল্লবিত হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সব কাহিনীই পল্লবগ্রাহী। কোনও কাহিনীরই বাস্তবিক কোনও সমাপ্তি নেই। কাহিনীর ভিতর থেকে উপকাহিনী এবং আরও উপ উপকাহিনী বেরিয়ে আসবেই। একটা মানুষের গল্প আর একটা মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং আরও মানুষের আরও গল্প এসে যুক্ত হতে থাকে তার সঙ্গে।

বুঝেছি। এবার পুষ্পর গল্প।

একটা ছোট্ট ঘটনা একটা জায়গায় থেমে আছে।

কোন ঘটনা?

পুষ্প যে কুসুমকুমারীকে হরিদাসের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে চিঠি লেখেন সেই ঘটনা সেইখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। কারণ, কুসুমকুমারী চিঠিটার জবাব দিয়েছিলেন এবং সে চিঠিরও জবাব দিয়েছিলেন পুষ্প। এইভাবেই দুইজনের মধ্যে চিঠির মাধ্যমে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

কাহিনী তাহলে আরও পল্লব বিস্তার করছে?

হ্যাঁ। করারই কথা। দুই নারীর বন্ধন রচনাকারী একজন পুরুষ—অর্থাৎ হরিদাস তখন বেঁচে নেই। শিবনাথও প্রয়াত। দুই নিঃসঙ্গ নারী তাঁদের হৃদয়ের কথা উভয়ে উভয়কে লিখতেন। না, সেগুলো তেমন গোপনীয়তা ভরা চিঠি নয়। কুশল প্রশ্ন, কিন্তু অতীতচারণ, ছেলেমেয়েদের খবরাখবর এই সবই। কিন্তু যা তাঁরা লিখতেন তার ফাঁকে ফাঁকে আরও কথা থাকত, অকথিত কথা। মানুষ তো কখনওই তার হৃদয়কে পুরোপুরি উন্মোচিত করতে পারে না।

কিন্তু লিখে লাভ কী হত?

লাভ? লাভের প্রশ্নটাই বড্ড বস্তুসর্বস্ব। লাভের বিচার কে করবে? তবে কুসুমকুমারী মাঝে মাঝে রজতকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কেন? রজতকে দেখে তাঁর লাভ কী?

আবার লাভের প্রশ্ন! বলছি তো লাভ-লোকসান কিছু নেই। ইচ্ছের কোনও যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে না। আমাদের অনুমান, কুসুম রজতের মধ্যে হরিদাসের কতটুকু কী আছে তা জানতে চাইতেন। কাশীর সাক্ষাৎকারের উজ্জ্বল স্মৃতিই বোধহয় তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। কে জানে কী?

দেখা হয়েছিল কি?

ধীরে, বন্ধু, ধীরে। রজতের কাছে কুসুমকুমারীর সব চিঠি সযত্নে রাখা আছে। যেমন আছে বন্দনার কাছে পুষ্পর সব চিঠি।

পুষ্পর গল্প কি এখানেই শেষ?

এই অসামান্য নারী স্বাধীনতার পর রাজনীতি করতেন।

এই গল্পে আরও একজন উপেক্ষিত আছেন। তিনি শিবনাথ, কুসুমকুমারীর স্বামী।

উপেক্ষিত নন। আসলে এ গল্পে তাঁর ভূমিকা নেই। তিনি সুখের জীবন কাটিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে সবই দিয়েছেন। অর্থ, সন্তান, নিরাপত্তা, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীর কাছে পেয়েছেনও অনেক, প্রেম, সেবা, সাহচর্য, পরামর্শ, সান্ত্বনা, সাহস। এই গল্পে সুখী ও তৃপ্ত মানুষের ভূমিকা থাকার কথা নয়। তবে তাঁর গল্পও হয়তো আছে, তা অন্যভাবে বলা হবে।

কিন্তু এই গল্পই বা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আগেই বলেছি, এই গল্পের পরিণতি আমরা জানি না। আমরা শুধু কাহিনীটির জট ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। দ্বিজদাসের কথা এক জায়গায় থেমে আছে।

দ্বিজদাস তো মারা গেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু তিনি মারা যান পরিণত বয়সে। পাটনা থেকে কাকার জিনিসপত্র ও টাকাপয়সা নিয়ে ফিরে আসার পর তাঁর মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর কাকা হরিদাসের জীবনে একটা রহস্যময় ঘটনা আছে। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বিজদাসের কাছে রহস্যটা উন্মোচিতও হয়। সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে পাটনা এবং সাঁওতাল পরগনায় যেতেন। দ্বিজদাস অতি সজ্জন ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, ন্যায়পরায়ণও। কাকিমা পুষ্পর প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে তার কিছু পূরণ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। পুষ্প কিছুই গ্রহণ করেননি, কিন্তু দ্বিজদাসকে স্নেহ করতেন।

পুষ্প কি হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা দ্বিজদাসকে বলেছিলেন?

দ্বিজদাসের আন্তরিকতা ও সততা দেখে সম্ভবত এই তেজস্বিনী কোমল হয়েছিলেন। হ্যাঁ, দ্বিজদাসকে তিনি সবই বলেছিলেন।

একথা কিভাবে জানা গেল?

সাক্ষী বেঁচে আছেন রজতশুভ্র ঘোষাল। দ্বিজদাস পুষ্পকে কাকিমা বলেই ডাকতেন। বোধহয় তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি বিবাহ বহির্ভূত এই সম্পর্কটিকে যথোচিত মর্যাদা দেন। শুধু তাই নয়। তিনি রজতশুভ্রকে নিয়ে এসে কিছুদিন নিজেদের বাড়িতে রাখেন।

কী পরিচয়ে?

বন্ধুপুত্র হিসেবে। আর এই সময়েই কুসুমকুমারীর কাছে তিনি রজতকে নিয়ে যান।

দ্বিজদাস আর কুসুমকুমারীর তো এক জায়গায় থাকার কথা নয়। কুসুমকুমারীর শ্বশুরালয়ে থাকার কথা, দ্বিজদাসের থাকার কথা গ্রামে।

তা কেন? কালক্রম ও ঘটনাক্রম পরিবর্তিত হয়ে কুসুমকুমারী কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে এবং দ্বিজদাস ভবানীপুরে বসবাস করতেন। তাঁদের গ্রাম ছিল যশোহর জেলায়। কুসুমকুমারীর শ্বশুরালয় ছিল রাজসাহীতে। দেশভাগের পর তাঁরা চলে অসেন।

উভয়ের মধ্যে তাহলে যোগাযোগ ছিল!

ছিল। প্রথমত তাঁরা এক গাঁয়ের লোক। দ্বিতীয়ত, দ্বিজদাস বরাবরই কুসুমকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কারণটি বিচিত্র কিছু নয়। আগেই বলা হয়েছে, দ্বিজদাস তাঁর কাকা হরিদাসকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দেশত্যাগ করায় শিশু দ্বিদজাস গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন। অসহায়া কুসুমকুমারী যে হরিদাসের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও শিবনাথকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন এটাও দ্বিজদাসকে বিষণ্ণ করত। তিনি হরিদাস এবং কুসুমকুমারী উভয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন। অবশ্য বড় হওয়ার পর।

তিনি এই দুজনের মধ্যে লিয়াজোঁ বা দূতের কাজ করতেন না তো!

কেন তা করবেন? যে আমলের কথা বলছি তখন বিবাহ পরবর্তীকালে আর পূর্ব সম্পর্কের রেশ থাকত না। দ্বিজদাসও তেমন নিম্নরুচির মানুষ ছিলেন না। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, কুসুম ও হরিদাসের ঘটনার সময় দ্বিজদাস শিশুমাত্র ছিলেন। তিনি বড় হয়ে যোগাযোগ রচনা করেছিলেন। ততদিনে কুসুমকুমারীর চার-পাঁচটি সন্তান হয়ে গেছে। যাই হোক, কলকাতায় এসেও দ্বিজদাস সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কুসুমও তাঁকে বরাবর স্নেহ করেছেন।

স্নেহটা কি হরিদাসের ভাইপো বলেই!

সেটাও হতে পারে।

আমরা কাশীর ঘটনা, রজতের প্রতি স্নেহ, দ্বিজসের প্রতি প্রশ্রয় ইত্যাদি থেকে যদি অনুমান করি যে, কুসুমকুমারী কোনওদিনই হরিদাসকে ভোলেননি এবং মনে মনে তিনি দ্বিচারিণী ছিলেন?

মানুষের মনের গূঢ় অভ্যন্তরের খবর পাওয়া দুষ্কর। একটা কথা বলা যেতে পারে, বাল্যপ্রণয়ের শিকড় খুব গভীরে প্রোথিত থাকে না। তাই সহজেই উৎপাটিত হয়। তবু আমরা এই কূট সন্দেহের তীব্র কোনও প্রতিবাদ করব না। এমন হতেও পারে যে, মাঝে মাঝে হরিদাসের কথা ভাবতে কুসুমকুমারীর ভালো লাগত।

আমাদের আরও সন্দেহ হয়, কাশীতে দুজনের সাক্ষাৎকারটি মোটেই আকস্মিক ছিল না। পতিবিয়োগের পর তিনি হরিদাসের আসঙ্গলিপ্সু হয়ে পড়েন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে দুজনের কাশীতে দেখা হয়। এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। এবং আমাদের সন্দেহ যোগাযোগটা ঘটেছিল দ্বিজদাসের মাধ্যমেই।

কাশীর সাক্ষাৎকারটির বিষয়ে কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকলেও থাকতে পারে। পূর্ব পরিকল্পনার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আসঙ্গলিপসা কথাটি প্রতিবাদযোগ্য। আমাদের বিশ্বাস কুসুমকুমারী পতিব্রতা এবং সুখী গৃহবধূ ছিলেন। তাঁর দাম্পত্যজীবন খুবই সুখের হয়েছিল বলে কথিত আছে। তিনি ছয়টি সন্তানের জননী ছিলেন। এই রমণী হয়তো হরিদাসের জন্য দুঃখ অনুভব করতেন, কারণ তাঁর বিরহে হরিদাস বিবাগী হয়ে যান।

এই কাহিনীতে অনেক যুক্তিবহির্ভূত ফাঁক আছে। তবু আমরা এই কাহিনীর পরিণতি জানতে চাই।

তাহলে রজত ঘোষালের প্রসঙ্গে একটু ফিরে আসতে হবে। পুষ্প রজতকে মানুষ করেছিলেন কঠোর অনুশাসনের মধ্যে। রজত তাঁর বাবার মতোই শান্ত, ধীমান, মৃদুভাষী ও নিরীহ পুরুষ। মাকে তিনি জগদ্ধাত্রীর মতো শ্রদ্ধা করতেন। এই মাতৃভক্তিই তাঁকে কৃতী করে তুলেছিল। মাকে খুশি করার জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। হরিদাসের প্রতি পুষ্পর অনুরাগ দেখে তিনি নিজের পিতাকেও পরম শ্রদ্ধা করতে শেখেন।

আবার তাঁর গল্প কেন?

পুষ্প তাঁর ছেলের সঙ্গে একটা রসিকতা প্রায়ই করতেন। তিনি রজতকে বলতেন, তুই বাঙালি, আমি বিহারি। হয়তো বাঙালির ছেলে বলেই এই রসিকতা। রজত ঘোষাল অবশ্য বাংলা মোটেই ভালো জানেন না। তবে নিজেকে আধা-বাঙালি বলে স্বীকার করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুষ্প একটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও এই মহান মহিলার সুগভীর ভালোবাসা আর পতিপরায়ণতার পরিচয় আছে।

পুষ্পকে কুসুমকুমারীর চেয়ে অনেক মহিয়সী বলে আমাদেরও মনে হয়।

এই মীমাংসা মুলতুবি থাক। কিন্তু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, পুষ্পর মতো সাহসিকা একমুখিন মহিলা বিরল। তাঁর কাহিনী থেকে মনে হতে পারে যে, হরিদাসের সঙ্গে তাঁর সংসর্গের কথা বরাবর চাপা থেকে গেছে এবং কোনও হইহই হয়নি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর চরিত্র নিয়ে বেশ বড় রকমের শোরগোল তোলে। তাতে পুষ্পর পরিবারও রেহাই পায়নি। কিন্তু পুষ্প এতে মোটেই ঘাবড়াতেন না। তিনি সতেজে বলতেন, আমি একগামিনী সতী নারী। দ্বিতীয় কোনও কলঙ্ক নেই। তিনি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেননি বটে, কিন্তু মালাবদলই যদি বিয়ে হত তাহলে এত ঘর ভাঙাভাঙি হত না। রাজনীতির সূত্রেই তিনি পাটনায় আসেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, আমার কলঙ্ক নিয়ে যদি তোমাদের অস্বস্তি থাকে তো খুলে বলো, আমি আলাদা বাসা করে থাকব। রজত অবশ্য দৃঢ়ভাবে

বলেছিলেন, কেন তুমি আলাদা হবে? লোকে যা বলে বলুক, আমি তো তোমার আর বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানি।

আর পুত্রবধূ?

পুত্রবধূ মঞ্জু তার শাশুড়িকে ভীষণ ভালোবাসত। কারণ পুষ্পর মধ্যেই ছিল এক শাশ্বত মুক্তনারীর রূপ, মহাভারত রামায়ণেই যাদের দেখা পাওয়া যায়। যেমন তেজি, তেমনি দৃপ্ত, তেমনই একগতপ্রাণা পতিব্রতা। আজকালকার মুক্তিকামী নারীরা শুধু পুরুষের খোঁতা মুখ ভোঁতা করতে চায়। তাতে পুরুষও যায়, নারীও যায়।

একজন মহিলার প্রশংসা করতে গিয়ে গোটা নারীসমাজকে ধিক্কার দেওয়া অন্যায়। সব মেয়েই পুরুষ-বিরোধী নয় এবং পুরুষেরাও নয় গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা। মনে রাখবেন, মেয়েরা কখনও পুরুষকে রেপ করে না, পুরুষেরা মেয়েদের করে।

বিতর্ক এড়ানোর জন্য আমরা কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবং এ কথাও ঠিক যে, পুরুষদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বেশি, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। সব পুরুষই রেপিস্ট নয়, কিন্তু রেপ করার ক্ষমতা তাদেরই আছে। তবে এর দ্বারা মেয়েদের ধ্বাংসাত্মক ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার মনে হয় না। কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদেরই এই ক্ষমতা বেশি। কিন্তু আমরা এইভাবে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই না। রেপ-এর কথাটা যখন উঠল তখন আমরা এবার একটি রেপ-এর কাহিনীই বিবৃত করি।

এই কাহিনীর মধ্যে রেপ আসছে কোথা থেকে?

ঠিক এই কাহিনীর মধ্যে নয়, তবে ঘটনাটা প্রাসঙ্গিক। রেপটি ঘটেছিল সাঁওতাল পরগনার একটি আদিবাসী বস্তিতে। সেসব জায়গায় রেপ জলভাতের মতো ব্যাপার। কারণ ক্ষমতাশালী ধনিক ব্যক্তি বা তাঁদের সশস্ত্র চামচারা গরিব, নিরীহ এবং নিরক্ষর এইসব আদিবাসীদের ওপর নানা কারণেই অত্যাচার করে। এ নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি ঘটেছিল গ্রামের একটু বাইরে একটা জঙ্গলঘেরা জায়গায়। মধ্যবয়স্কা এক রমণী একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলে কিছু বুনো ফল পাড়তে যায়। ছেলেটি কৌতূহলের বশে একটি কাঠবেড়ালীর পিছু নিয়ে একটু তফাতে গিয়েছিল, সেই সময়ে রমণীটি আক্রান্ত হয়। ছেলেটি কাঠবেড়ালীর আশ্চর্য গতিবিধি দেখে উত্তেজিত হয় মাসিকে ঘটনটা বলার জন্য দৌড়ে ফিরে এসে দেখে, মাসি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে, দু'জন তাকে দু'দিক দিয়ে ঠেসে ধরেছে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করছে। যদিও সাত-আট বছর বয়সি নিষ্পাপ শিশুটি বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা কী। কিন্তু সে মাসির ওই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে না গিয়ে চিৎকার করে লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে চিৎকার করেছিল, ছোড় দো, মৌসিকো ছোড় দো, নেহি তো মারেঙ্গে! প্রতিফলটা হয়েছিল ভয়াবহ। চতুর্থ আর একজন একটু দূরে পাহারায় ছিল, অথবা নিজের টার্ন আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই দুর্ব,ত্ত প্রথমে ছেলেটাকে টেনে সরিয়ে দেয় এবং পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটা কথা না শুনে ফের বাধা দিতে গেলে সে ছেলেটাকে দু-চার ঘা দেয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় রেগে গিয়ে একটা টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে দেয়। ছেলেটি রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। চার জন পশুর অত্যাচার সহ্য করার পরও সেই রমণী উঠে দাঁড়ায় এবং শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করে। অবশেষে গাঁয়ের লোকজন তাদের দেখতে পায় এবং উদ্ধার করে।

এটা কি নতুন কাহিনীর সূত্রপাত?

এটাও একটা পটভূমি রচনার চেষ্টা। এই রমণীটি সেই গাঁয়ের বাসিন্দা যেখানে গর্ভবতী পুষ্প একদা আত্মগোপন করে ছিলেন। আর শিশুটি হরিপ্রিয়, পুষ্পর নয়ণের মণি। রজত ও মঞ্জুর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপ্রিয়র চেহারায় হরিদাসের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করে পুষ্প নাতির নাম হরিদাসের নামানুসারেই রেখেছিলেন। শুধু তাই

নয়, পুষ্পর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হরিদাসই ফের হরিপ্রিয় হয়ে জন্ম নিয়েছে। হরিপ্রিয় তাই ছিল ঠাকুমার একান্ত প্রিয় এবং সেও ঠাকুমা ছাড়া কিছু বুঝত না। পুষ্পও নাতিকে সর্বদা কাছে রাখতেন। যেখানে যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই ঘটনার সময় পুষ্প ঘোরতর রাজনীতি করছিলেন। ওই আদিবাসী গাঁয়ে মিটিং করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। হরিপ্রিয়র অবস্থা দেখে পুষ্প উন্মাদের মতো হয়ে যান। তবে যাই হোক, পাটনা এবং পরে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করে হরিপ্রিয়কে সুস্থ করে তোলা হয়। কিন্তু গরিবের ক্ষত সারলেও শিশু হরিপ্রিয়র ভিতরের দগদগে ক্ষতগুলো রয়েই গেল। শিশু হরিপ্রিয় এই ঘটনার পর থেকে আর শিশুর মতো কথা বলত না, শিশুর আচরণ করত না, দুষ্টুমি করত না। সে হয়ে গেল দুঃখী, গম্ভীর, তীক্ষ্ন চাহনি সম্পন্ন একজন অদ্ভুত বালক। তার গহন মনোরাজ্যে কী ঘটছে তা আর বাইরের কেউ টের পেত না। এমনকী ঠাকুমাও না। হরিপ্রিয়র পরও তার মা ও বাবার আরও তিনটি সন্তান হয়। দু'টি মেয়ে এবং একটি ছেলে। কিন্তু হরিপ্রিয়কে ঘিরেই ছিল পুষ্পর যক্ষিণীর মতো আগলে থাকা। হরিপ্রিয় বড় হচ্ছে, পরীক্ষায় ভালো ফল করে পাশ করছে, ফুটবল-ক্রিকেট খেলছে ঠিকই, কিন্তু তবু এক অদ্ভুত উদাসীনতা, নিজের ভিতরে গুটিয়ে থাকা আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ন চকিত চাহনি তার গেল না। এই দুর্জ্ঞেয় বালকের মনোরাজ্যে ঢুকবার অনেক চেষ্টা পুষ্প করেছেন, মাথা ঠুকেছেন, কেঁদেছেন, কিন্তু পারেননি। বুদ্ধিমতী পুষ্প শুধু এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে শৈশবের ওই নিষ্ঠুর স্মৃতি থেকে হরিপ্রিয়র মুক্তি নেই।

আমরা সেই ধর্ষিতা রমণীর কথা কিছুই জানলাম না।

তাঁর পরিচয় সামান্য। তিনি একজন নারী, এক মহান নারী। পুত্রসম হরিপ্রিয়র সামনে তিনি লজ্জায় আর কখনও আসতে পারেননি। সেটাও হয়তো একটা ভুল হয়ে থাকবে। রমণীটির সংস্পর্শে এলে হয় তো হরিপ্রিয় ধীরে ধীরে ঘটনাটা ভুলতে পারত।

ঘটনাটা ভুলতেই হবে কেন?

এই কারণে যে, হরিপ্রিয় কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ার সময় দু'টি লোককে খুন করে। তাকে হাতেনাতে ধরা যায়নি বা সাক্ষ্যপ্রমাণও ছিল না। পুষ্প মা-এর মতো প্রভাবশালী মহিলার নাতি বলেই বোধহয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেয়।

সে কাদের খুন করেছিল? সেই ধর্ষণকারীদের মধ্যে দু'জনকে কি?

ধর্ষণকারী কারা ছিল তা তো আমরা জানি না। পুলিশ কেস হয়েছিল বটে, কিন্তু ধর্ষণকারীদের শনাক্ত করা যায়নি। আর হরিপ্রিয় তখন ছোট ছিল বলে তার স্মৃতিও কতখানি নির্ভুল ছিল তা বলা কঠিন। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল পটনার উপান্তে এক পতিতা পল্লিতে।

সে কী!

শোনা যায় হরিপ্রিয় তার দু'জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে প্রায়ই ওই পতিতা পল্লির আশেপাশে ঘুরঘুর করত। না, তারা কারও ঘরে কখনও যায়নি। তবে ওই পল্লির নয়না নামে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলত। ধরে নেওয়া যায় নয়না তাদের কিছু খবরাখবর দিত। নানা গুজব থেকে অনুমান করা যায়, হরিপ্রিয় কোনও সূত্রে এই দু'জনের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের জন্য ওত পেতে থাকে। ঘটনাটা ঘটেছিল এক শনিবার, রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। পর পর তিনটে বোমা চার্জ করা হয় এবং নিহতদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় উড়ে যায়।

তারা কারা তা কি জানা যায়নি?

হ্যাঁ, জানা গিয়েছিল। তারা এক জোতদারের বেতনভুক সৈনিক। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। শুধু এটুকু বলে রাখা ভালো যে তারা ভূমিহার, রাজপুত, ব্রাহ্মণ বা লালা সম্প্রদায়ের নয়।

বুঝেছি।

এই খুনের ঘটনায় একটিও সাক্ষী পাওয়া যায়নি। হরিপ্রিয় ও তার বন্ধুরা খালাস পেয়ে যায়। কিন্তু খালাস পাওয়া মানেই ভিন্নতর বিপদ। যাদের সে খুন করেছিল তারা দুষ্টচক্রের সদস্য। তাদের নিজস্ব আইন ও প্রতিশোধ ব্যবস্থা আছে। সুতরাং হরিপ্রিয়র জীবনে বিপদের আশঙ্কা ছিল। পুষ্প সে কথা ভালোই জানতেন। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে হরিপ্রিয়কে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আর হরিপ্রিয় সুড়সুড় করে কলকাতায় পালিয়ে গেল?

ধীরে, বন্ধু, ধীরে। না, হরিপ্রিয় কলকাতা পালায়নি। এই ঘটনার পর বরং সে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে বিশিষ্ট একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। স্বভাবে গম্ভীর, স্বল্পবাক, তীক্ষ্ন চাহনি মিলে তাকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত মনে হত। ব্যক্তিত্বও ছিল কঠোর। ফলে ছাত্রনেতা হতে তাকে বিশেষ আয়াস করতে হয়নি। পুষ্পকে সে এই বলে প্রবোধ দিত, কোথায় পালাব নানী? পালাতে গেলে দুনিয়া ছাড়তে হবে। তুমি ভয় পেও না। আমি বন্ধুদের মধ্যেই আছি। তখন পুষ্প উঠে পড়ে লাগলেন মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সী নাতিটির বিয়ে দেওয়ার জন্য। হরিপ্রিয় এই উদ্যোগকেও ঠেকাল। বলল, বিয়ে দিয়ে কিছুই হবে না নানী। তোমার বরং

দুঃখ বাড়বে। ঘর করা যদি কপালে লেখা থাকে তো হবে একদিন। এখন নয়।

প্রেম থেকে আমরা কি বিপ্লবের দিকে সরে যাচ্ছি?

বিপ্লবও তো প্রেমই। একটা কোনও কল্পিত সিস্টেম ছাড়া অন্য সিস্টেম এবং ওই বিশ্বাসের পরিপন্থী যারা তাদেও ঘৃণা করতে শেখে এবং বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। উগ্রপন্থীদের খতম অভিযানগুলি ওই বিদ্বেষেরই পরিণতি। কিন্তু তারা বুঝতে চায় না যে, মানুষ মেরে সিস্টেম বদলে ফেলা সম্ভব নয়। বদলানোর জন্য প্রয়োজন ছিল যাজন।

এ তো ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা বরং হরিপ্রিয়র ব্যাপারটা জানতে চাই।

হরিপ্রিয় একজন চুপচাপ মানুষ। তাকে বোঝা খুবই কঠিন। হরিপ্রিয়কে কদাচিৎ হাসতে দেখা যায়। তার আনন্দের কোনও অভিব্যক্তি নেই। এই নাতিকে নিয়ে পুষ্পর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। বিশেষ করে দু'-দু'টি খুনের ঘটনায় সে অভিযুক্ত হওয়ায় পুষ্পর দুশ্চিন্তা গভীর হয়েছিল। তিনি নাতিকে একজন মনোবিদের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়ে গেছেন জ্যোতিষী এবং ধর্মীয় পুরুষদের কাছেও। কোনও লাভ হয়নি। পুষ্পর মনে হত, হরিপ্রিয় বাইরে প্রশান্ত ও চুপচাপ হলে কী হবে, তার ভিতরটা অগ্নিগর্ভ। অনেকটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতোই। কবে কখন যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে তার ঠিক নেই। এ কথাটা তিনি দুঃখ করে চিঠিতে কুসুমকুমারীকে জানিয়েছিলেন।

এইসব চিঠিপত্রের কথা বারবার উঠছে কেন?

এই গল্পের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির জন্য।

এইসব চিঠি কার হেফাজতে আছে?

আগেই বলা হয়েছে, কুসুমকুমারীর নাতনি বন্দনা সযত্নে তার ঠাকুমার সব কিছু জমিয়ে রেখেছে। এমনকী হরিদাসের লেখা প্রেমপত্রটিও সে জ্যেঠতুতো দিদি বিজয়ার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিজের হেফাজতে রাখে। বন্দনা বালিকা বয়স থেকে কুসুমকুমারী আর হরিদাসের সম্পর্কের কথা জানতে পারে বা আন্দাজ করে। শিশুদের যত অবোধ বলে মনে করা হয় ততটা অবোধ তারা নয়। এই প্রায় হারিয়ে-যাওয়া প্রেম-কাহিনীটি সযত্নে আবার রচনা করার ব্যাপারে বন্দনার চেষ্টা বড় কম ছিল না। আজন্ম রোমান্টিক, ভাবালু ও কল্পনাপ্রবণ এই মেয়েটি তার ঠাকুমার এই বাল্যপ্রণয়ের কথা খুব ভাবত। বিরহী হরিদাসের জন্য তার খুব কষ্টও হত। এই কাহিনির ট্র্যাজিক পরিণতি তাকে আপ্লুত করে থাকবে।

তা হলে কি বন্দনার কাহিনী শুরু হল?

আসলে এই কাহিনীর স্রষ্টা বন্দনাই। সে তার ঠাকুমার সেক্রেটারির কাজ করত। সাত-আট বছর বয়স থেকেই ঠাকুমাকে পত্রিকা বই চিঠি পড়ে শোনাত সে। ঠাকুমার চিঠির জবাব অনুলিখন করত। হরিপ্রিয় যখন কলেজে পড়ে এবং খুনের ঘটনায় তাঁর নাম ওঠে তখন বন্দনার বয়স দশ বছর মাত্র। পুষ্প, রজত, হরিপ্রিয় এরা কারা তা সে ভালোই জানত। হরিপ্রিয়র কথা পুষ্পর চিঠিতে পড়ে সে মনে মনে হরিপ্রিয়র প্রেমে পড়ে যায়।

এই রে!

এ অবাক হওয়ার কিছু নেই। হরিদাসের প্রতি তার মন দ্রবই ছিল। পুষ্পর অসম সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগে সে মুগ্ধ। এই পরিবারটি যে সামাজিক সংকটের ভিতর দিয়ে গেছে তাও তাকে প্রভাবিত করে। আর হরিপ্রিয়র নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকা এবং ব্যক্তিত্বের কঠিন নির্মোক ইত্যাদির কথা পুষ্পর চিঠিতে পড়ে এই বালিকা তৎক্ষণাৎ হরিপ্রিয়র একটি ছবি নিজের মনে এঁকে নেয়। আগ্নেয়গিরির মতো এই পুরুষটির প্রতি সে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

মাত্র দশ বছর বয়সে!

দশ বছর বয়সটা মেয়েদের পক্ষে বড় কম নয়। এ যুগে একটি দশ বছরের মেয়ের প্রায় কিছুই অজানা থাকে না। তবে বন্দনার প্রেমটি ছিল একতরফা, অপ্রকাশ এবং নিরুচ্চার। সে ছাড়া আর কেউ এই মুগ্ধতার কথা জানত না। তবে পাটনা শব্দটাই তাকে আকর্ষণ করত। তার খুব ইচ্ছে হত পুষ্প, রজত, হরিপ্রিয় এদের একবার চোখের দেখা দেখে আসে। কিন্তু ইচ্ছেগুলো তার মনের মধ্যে ঢেউ ভাঙত মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

আমরা অনুমান করছি, এই কাহিনি এবার বন্দনা ও হরিপ্রিয়র প্রেমের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

নয় কেন? তবে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। পনেরো বছর বয়সের সময় বন্দনা অনেক দ্বিধা ও সংকোচ জয় করে হরিপ্রিয়কে সরাসরি একটি প্রেমপত্র লেখে। তার কোনও জবাব আসেনি। বন্দনার কথা থাক, আমরা হরিপ্রিয়র কথায় ফিরে যাই। হরিপ্রিয়র প্রতি প্রেমাসক্ত কিশোরী বা যুবতীর কিন্তু অভাব ছিল না। একে তো আর অতি সুন্দর সৌম্য চেহারা, তদুপরি তার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা। সব মিলিয়ে সে এক সময়ে পাটনার অধিকাংশ তরুণী মেয়েরই কাম্য পুরুষ ছিল। কিন্তু মহিলাদের দিকে তাকানোর বা ঝুঁকে পড়ার মনটাই ছিল না তার।

হরিপ্রিয় যে ধরনের ছেলে তাতে তার বিহারের নকশালদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ার কথা।

খুব ঠিক। হরিপ্রিয় যে খানিকটা সে দিকে ঝোঁকেনি তাও নয়। কিন্তু পুষ্প এমন যক্ষিণীর মতো তাকে আগলে রাখতেন এবং ঠাকুমা ছাড়া হরিপ্রিয়রও যেহেতু চলত না তাই ঘর-ছাড়ায় কিছু বাধা ছিল তার। হরিপ্রিয় এই সব সমস্যা নিয়েই বড় হচ্ছিল।

হরিপ্রিয়র তো মা-বাবাও ছিল বা আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল তার?

রজত শান্ত নিরীহ মানুষ। তদুপরি বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পাটনায় তার নিজস্ব ফার্ম। কাজেকর্মে অতি ব্যস্ত থাকায় সে সংসার বা পুত্রকন্যার দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পেত না। মঞ্জুর সঙ্গে হরিপ্রিয়র সম্পর্ক ছিল খুব ভালো। ঠাকুমার পরই সে ভালোবাসত মাকে। কিন্তু তার ভালোবাসার তো কোনও প্রকাশ ছিল না, সামান্য সামান্য লক্ষণ থেকে বুঝে নিতে হত।

ভাইবোনদের প্রতি?

সে তার ছোট ভাইবোনদের কখনও শাসন করেনি বা উপদেশ দেয়নি। না, সেখানেও ভালোবাসার কোনও অভিব্যক্তি ছিল না। তবে ভাইবোনেরা তাকে খুবই ভালোবাসে।

বয়োধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে। যৌবনকালে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ না-করাটা সেই ধর্মের পরিপন্থী এবং অস্বাভাবিক।

লীনা চৌবে নামে হরিপ্রিয়র এক বান্ধবী আছে। সে সমাজকর্মী এবং ডু গুডার, অর্থাৎ লোকের ভালো করে বেড়ায়। লীনা একজন নারীবাদীও বটে। লীনার কাছে কোনও এক সময়ে হরিপ্রিয় স্বীকার করেছিল যে সে মোটেই হোমোসেক্সুয়াল নয়। কিন্তু কোনও মহিলাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেও সে ভাবতে পারে না। কারণ বাল্যকালের এক ধর্ষণের স্মৃতি তাকে এমন বিকল করে রেখেছে যে তার যৌন সংসর্গের কথা মনে হলেই সেই ধর্ষণের ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং নিজেকে সেই ধর্ষণকারী বলে মনে হয়। কাজেই তার সেক্সুয়াল আর্জ বা যৌন সম্ভোগ কেটে যায়।

লীনা কি তাকে হোমোসেক্সুয়াল বলে সন্দেহ করেছিল?

এ রকম সন্দেহ হরিপ্রিয়র পরিচিত মহলে দেখা দিয়েছিল। সেটা মেয়েদের প্রতি তার কঠিন উদাসীনতা দেখেই হয়েছিল হয়তো। তাকে বহু মেয়েই প্রেমপত্র দিত। সে চিঠিগুলোর কোনও জবাব দিত না। পাটনার এক অতি সুন্দরী মেয়ে কৃষ্ণা সিং রাগ করে তাকে লিখেছিল, তুমি নিশ্চয়ই হোমোসেক্সুয়াল, নইলে আমার মতো মেয়ের দিকে তাকাও না? এইভাবে হরিপ্রিয়কে ঘিরে নানা গুজব এবং গালগল্পও প্রচলিত ছিল। কিন্তু হরিপ্রিয়র জীবনে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তার সংকট ছিল তার নিজের মধ্যেই। দুটো লোককে খুন করার পর সে যখন উগ্রপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তখনই এই ধীমান যুবকটির মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে। এই বিশাল ভারতবর্ষ এবং তার হাজার রকমের সামাজিক সমস্যা, জাতপাতের লড়াই, রাজনীতির কুটিল ও নিম্নমানের নানা আবর্তন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লোভ ইত্যাদি দেখে হতশ্বাস সে।

বন্দনার প্রেমপত্রটির বিষয়ে আমরা জানতে চাই।

আগেই বলেছি, বন্দনা প্রেমপত্রটি লেখে তার পনেরো বছর বয়সে। তখন হরিপ্রিয়র বয়স পঁচিশ। এম এ এবং ল পাশ করার পর হরিপ্রিয় তখন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও নর্মদা পরিক্রমা, কখনও গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী। এক জ্বলন্ত অভ্যন্তরকে শান্ত করার জন্য সে নিজেই তখন উদগ্রীব। সাধুসন্ন্যাসীদের ডেরাতেও হানা দিচ্ছে ঘন ঘন। বন্দনার প্রেমপত্রটি সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছিল তার মা মঞ্জু। মঞ্জু চিঠিটা খুলে পড়ে। চিঠিটির মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও গভীর মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছিল তাতে মঞ্জু মুগ্ধ হয়ে চিঠিটা তার শাশুড়ি পুষ্পকে দেখায়। তাঁদের মধ্যে এ রকম কথাবার্তা হয়েছিল :

মা, এ চিঠিটা পড়ুন। কলকাতা থেকে একটি মেয়ে লিখেছে।

তাই তো! এ তো কুসুমদির নাতনির চিঠি?

কোন কুসুম মা? সেই কুসুমকুমারী?

হ্যাঁ। এ মেয়েটির কথা কুসুমদি কত লেখে। সৎ মা বলে আদর নেই, কুসুমদির কাছেই মানুষ।

এ মেয়েটি হরিকে চিনল কী করে?

চিনবে কি? এই তো দেখ না লিখেছে, আমি আপনাকে কখনও দেখিনি, কিন্তু মনে মনে আপনার চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছি। একটু লম্বাটে গড়ন, ছিপছিপে, খুব ফর্সা নয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল (প্রায়ই আঁচড়ান না), গালে সামান্য দাড়ি আর গোঁফ আছে। ঠিক এ রকম কি আপনি!

অবাক কাণ্ড তো! ঠিকই লিখেছে।

তাই তো দেখছি। বাংলাটা লেখেও ভালো। কুসুমদির সব চিঠি তো ও-ই লিখে দেয়।

আপনি কি মেয়েটিকে দেখেছেন?

না বউমা, কি করে দেখব? কুসুমদির সঙ্গেই দেখা হল না কখনও।

একবার দেখলে হত না মা?

একটু চিন্তায় পড়ে পুষ্প বললেন, দেখতে চাও বউমা? হরির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে?

কী জানি কেন মা, চিঠিটা পড়ে আমার ভারী ভালো লাগছে মেয়েটাকে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুষ্প বললেন, ভালো আমারও লাগছে বউমা। এ তো এখনকার বেলেল্লা মেয়েদের প্রেমপত্র নয়। মেয়েটা হয় তো দুঃখীও বটে।

মেয়েটাকে আনানো যায় না মা?

তার দরকার নেই বউমা। তাতে এটা জানাজানি হবে। বরং তুমি কয়েক দিনের জন্য কলকাতা থেকে ঘুরে এসো। তোমার তো কালীঘাটে পিসির বাড়ি। কিন্তু বউমা, আগ বাড়িয়ে বিয়ের কথা তুলো না। আমাদের যা কপাল, হরিকে বিয়েতে রাজি করাব এমন কথা ভাবতেই পারছি না। বরং পরিচয় না দিয়ে দেখে এসো।

কী পরিচয়ে যাব তা হলে?

অনেক দিন আগে কুসুমদিকে আমার একটা শাল দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। তোমার হাত দিয়ে তা হলে শালটা পাঠাব। লিখে দেব তুমি আমার ভাড়াটে, কলকাতায় যাচ্ছ, তাই তোমার সঙ্গে শালটা পাঠালাম।

মঞ্জু বলল, বাঃ, তা হলে তো বেশ হয়।

এই ঘটনার সাত দিন পর মঞ্জু কলকাতায় এল এবং একদিন সকালে কুসুমকুমারীর বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বেশ বড়লোকের বাড়ি। লোকজনও কম নয়। দোতলার কোণের ঘরে মঞ্জু যখন কুসুমকুমারীর মুখোমুখি হল তখন সে অবাক। নব্বইয়ের কোঠায় বয়স, তবু কুসুমকুমারী যে এখনও কী সুন্দরী তা তাঁর ধারালো মুখ দেখলেই বোঝা যায়। রং এখনও পদ্মফুলের মতো। শরীরে মেদ নেই।

শাল পেয়ে যেমন খুশি তেমনি অবাক কুসুমকুমারী। বার বার বললেন, পুষ্প শাল পাঠিয়েছে আমাকে! শাল পাঠিয়েছে! ওমা! কী দামি আর ভালো শাল!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুষ্পর কথা অনেক বার জিগ্যেস করে করে শুনলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে একটি মেয়ে বার বার কুসুমকুমারীর কাছে আসা-যাওয়া করছিল। মাঝারি লম্বা, ফর্সা এবং ভারী লাবণ্যময়ী মেয়েটি। সে যে বন্দনা তা বুঝতে একটুও দেরি হয় নি মঞ্জুর। দেখে তার এত পছন্দ হয়ে গেল যে, চোখ ফেরাতে পারছিল না। পারলে এখনই কোলে করে পাটনায় নিয়ে যায়।

মঞ্জু যে পুষ্পর ভাড়াটে তা জেনেই বোধহয় বন্দনাও খুব ঘুরঘুর করছিল। কুসুমকুমারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে মঞ্জু যখন বেরিয়ে আসছে তখন ঘরের বাইরে বন্দনা তার সঙ্গ ধরল। এইটাই চাইছিল মঞ্জু। বন্দনা তাকে খুব লাজুক গলায় জিগ্যেস করল, আপনি পুষ্প ঠাকুমার বাড়িতে থাকেন।

হ্যাঁ।

ওঃ! আচ্ছা। তা হলে আপনি তো সবাইকেই চেনেন!

মঞ্জু হেসে বলল, হ্যাঁ, সবাইকেই চিনি। কেন বলো তো?

না। এমনি।

মঞ্জু খুব মজা পেল। সে তো জানে এ মেয়ে কার কথা শুনতে চায়। লজ্জায় বলতে পারছে না। সুতরাং সে নিজেই বলল, তুমি একবার পাটনায় এসো না!

পাটনা কি খুব ভালো জায়গা?

খারাপ কি? আমার তো বেশ লাগে।

আপনি পুষ্পঠাকুমার কাছে প্রায়ই যান?

রোজ যাই। ওঁরা আমাদের আত্মীয়ের মতো।

হঠাৎ ঠোঁট কামড়ে এবং লজ্জায় আরও একটু লাল হয়ে বন্দনা বলল, আচ্ছা, শুনেছি পুষ্পঠাকুমার এক নাতি নাকি একটু কেমন যেন।

মঞ্জু স্মিতহাস্যে বলল, ওঃ, তুমি হরির কথা বলছ? হরি তো এমনিতে খুব ভালো ছেলে, কিন্তু বাউণ্ডুলে, উদাসীন। ওকে নিয়েই তো তোমার পুষ্পঠাকুমার যত দুশ্চিন্তা।

বন্দনা খুব উৎকণ্ঠ চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কেন, দুশ্চিন্তা কেন?

হবে না! তার যে কোনও দিকে মন নেই। তুমি তাকে দেখেছ কখনও?

না তো!

মঞ্জু তৈরিই ছিল। বলল, দাঁড়াও, আমার কাছে হরিপ্রিয়র একটা ফটো আছে, তোমাকে দিতে পারি।

এই বলে ব্যাগ থেকে হরিপ্রিয়র একটা ফটো বের করে দিয়ে মঞ্জু বলল, তোমার একখানা ছবি আমাকে দেবে? ফটো কালেকশন করা আমার একটা বাই।

এই অস্বাভাবিক বাই বা হবি অন্য কারও কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রেমে-পড়া বালিকা বন্দনা তা ধরতেও পারল না। হরিপ্রিয়র ছবি পেয়ে সে এমন

বিহ্বল যে মঞ্জুর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বড্ড মায়া হল মঞ্জুর, মনে মনে নিজের ছেলেকে তিরস্কার করে সে বলেছিল, কোথায় পাবি রে হতভাগা এমন একটা মেয়ে! এ যে তোর জন্য সব করতে পারে?

মঞ্জু হঠাৎ বলল, শোনো বন্দনা, আমি তো কলকাতা শহর কিছুই চিনি না। তুমি আমার সঙ্গে একটু মার্কেটিং-এ যাবে কাল থেকে?

বন্দনা মাথা হেলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

পরপর কয়েক দিন বন্দনাকে নিয়ে মঞ্জু খুব ঘুরল। নিউ মার্কেট থেকে গড়িয়াহাট। ফাঁকে ফাঁকে রেস্টুরেন্টে খাওয়া এবং এমনকী সিনেমা দেখা অবধি। আর এমনই মায়া পড়ে গেল মঞ্জুর যে পাটনা ফিরে যাওয়ার আগে সে বন্দনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসাল। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল হাতের মোটা বালাটা দিয়ে একেবারে আশীর্বাদ করে রেখে যায়। কিন্তু ততটা সাহস পেল না, হরির কথা ভেবে। হরি যদি রাজি না হয় তা হলে একে বেঁধে লাভ কি?

পাটনা ফিরে বন্দনার ছবি পুষ্পকে দেখাল মঞ্জু। বন্দনার কথা তার আর শেষ হয় না। পুষ্প শুনলেন, ছবি দেখলেন, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, সুলক্ষণা মেয়ে।

কুসুমকুমারীর মঞ্জুর হাত দিয়ে পুষ্পকে প্রত্যুপোহার পাঠিয়েছেন, চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি সরিয়ে রেখে বন্দনার ছবিটাই তিনি খুব খুঁটিয়ে বারবার দেখলেন। এ মেয়েটা তাঁর হরিকে ভালোবাসল কেন? নিয়তির এ কী বিধান? একটি তৃষিত হৃদয়ের ঋণ কি শোধবোধ চাইছে? নইলে হরিদাসের নাতিকে কুসুমকুমারীর নাতনি ভালোবাসল কী করে? এসব কি স্বর্গীয় চক্রান্ত?

পুষ্প প্রগতিশীলা হলেও তাঁর কিছু অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। ধর্মপ্রাণা তো ছিলেনই। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরীয় বিধানেই যা কিছু ঘটে। হরিপ্রিয়র মধ্যে তিনি হরিদাসকে ফিরে পেয়েছিলেন। বন্দনার ভিতর দিয়ে কি প্রবাহিত হয়ে এসেছে কুসুমকুমারীর সত্তা? ঠিক বটে, কুসুমকুমারী এখনও বেঁচে আছেন এবং তিনি বন্দনার ভিতর দিয়ে সুতরাং জন্মাতে পারেন না। কিন্তু রক্তের ধারার ভিতর দিয়ে তিনিও তো অছেনই বন্দনার ভিতরে।

এই ক্ষীণ বিশ্বাস তিনি কুটোগাছের মতো আঁকড়ে ধরলেন। হরিকে সংসারে বাঁধতে না পারলে তাঁর মরেও শান্তি নেই।

মঞ্জু এই অসামান্যা নারীকে দেখে সর্বদাই বিস্ময় বোধ করত। একদিন সে না বলে পারল না, মা, কিছু যদি মনে না করেন তা হলে একটা কথা জিগ্যেস করব?

কেন করবে না বউমা? আমার কাছে সঙ্কোচ কিসের?

কুসুমকুমারী তো এক হিসেবে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই না? শ্বশুরমশাই তাঁকে ভালোবাসতেন। কিন্তু আপনার মধ্যে কখনও কোনও হিংসে দেখি না তো!

পুষ্প হেসে ফেললেন। বললেন, দেখো, তোমার শ্বশুরমশাই যদি আর পাঁচটা বিয়ে করতেন তা হলেও আমার হিংসে হত না। আমি তাঁকে ভালোবেসে সব দিয়ে ধন্য হয়েছি। মনে করেছি তাঁর সুখেই আমার সুখ। তিনি অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত হলেও আমার হিংসে হত না, ভাবতাম তিনি সুখী হলেই আমার হল।

মা, আমি আপনার মতো মহিলা কখনও দেখিনি।

বউমা, তোমার শ্বশুরকে ভালোবেসে আমার তো কত কলঙ্কই হয়েছে, কখনও দেখেছ তাতে আমি ভেঙে পড়েছি? বরং সব হাসিমুখে, শান্তভাবে মেনে নিয়েছি। ভালোবাসা এ রকমই তো হওয়ার কথা। এ যুগের মেয়েরা এটা বুঝবে না।

আপনি বোধহয় রক্তমাংসের মানুষ নন মা। আমি আপনার কথাগুলো স্বীকার করতে যদি নাও পারি, তবু ভাবব এ রকম একজন মহিলার জন্যই বোধহয় চন্দ্র সূর্য ওঠে।

অত প্রশংসা কোরো না। কুসুমদির কথা বলছিলে। কুসুমদিকে কেন এত ভালোবাসি জানো? তিনি তো কাউকে ঠকাননি। নিজের স্বামীকে ষোলো আনা দিয়েছেন। তোমার শ্বশুরের প্রতিও তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

সে কি ভালো মা?

শোনো, এরকম ঘটনা শুনে অনেকে বলবে, এ হল দু নৌকায় পা রেখে চলা। তা কিন্তু নয়। কুসুমদির তো কাম ভাব ছিল না। ছিল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা তাঁকে কখনও ছোট করেনি। কাশীতে যখন দু'জনের দেখা হয় তখন যে তাঁদের গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক। ফিরে এসে তোমার শ্বশুর আমাকে সবই বলেছেন। তাঁর চোখেমুখে তখন একটা স্বর্গীয় দীপ্তি দেখেছিলাম।

কীসের দীপ্তি মা?

যৌবনে তিনি যখন কুসুমদিকে ভালোবেসেছিলেন তখন তার মধ্যে তীব্র আকর্ষণ

ছিল। দেহ ছিল, মন ছিল। বিয়ে হল না বলে মনের জ্বালা জুড়োতে বিবাগী হলেন। সেই জ্বালায় আমাকেও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, পাপবোধে ভুগেছেন। কাশীতে যখন পরিণত বয়সে দেখা হল তখনই বুঝতে পারলেন, যে কামনার গারদে তিনি আটক ছিলেন তা থেকে মুক্তি ঘটেছে। তিনি প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

তখন কি তাঁকে আপনি পুরোপুরি পেলেন?

বউমা, আমি ওভাবে ভাবি না। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে নিজেকে দেওয়াই যে ছিল আমার লক্ষ্য। তাঁকে আজও পেয়েছি কিনা জানি না, কিন্তু আমি নিজেকে তো দিয়েছি। সেই আমার ঢের। আমার ঠাকুর কী বলতেন জানো? বলতেন, আমার ঠাকুর বলিসনি, বল ঠাকুরের আমি। এই তত্ত্বটায় আমার গভীর বিশ্বাস। ঠাকুরই আমাকে শিখিয়েছেন ভালোবাসার সার কথা। নইলে বুকে অনেক জ্বালাপোড়া নিয়ে বেঁচে থাকতে হত। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের যে প্রশান্তি এসেছিল তাও ঠাকুরকে ধরেই।

মঞ্জু সব শুনেও কিন্তু এই মহিলাকে ঠিকমতো বুঝতে পারত না। তার কাছে পুষ্প আজও অপার বিস্ময়।

বন্দনার চিঠি আসতে লাগল মঞ্জুর কাছে। মঞ্জু বন্দনার কাছে নিজের বাপের বাড়ির পদবিটাই বলেছিল। বন্দনা তাই মঞ্জু ঘটককে চিঠি দিতে লাগল। না, সে হরিপ্রিয়র খবর জানতে চাইত না, তার নামও লিখত না। কিন্তু তার চিঠির প্রতিটি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে যেন হরিপ্রিয়র কথাই উঁকি ঝুঁকি মারত।

এদিকে বাউণ্ডুলে হরিপ্রিয় কয়েক মাস ধরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে দক্ষিণ ভারত পায়ে হেঁটে ঘুলে এল। কিন্তু এত ঘোরাঘুরি, এত তীর্থদর্শন তাকে একটুও পরিবর্তিত করতে পারেনি।

শাশুড়ি আর বউতে গোপনে অনেক শলাপরামর্শ হয়।

মঞ্জু একদিন বললেন, ওকে কি কিছু বলব মা?

বন্দনার কথা! এখন বোলো না। ওর ভিতরটা স্থির নেই।

স্থির তো নেই মা, কিন্তু স্থির করার জন্যই তো বিয়েটা দেওয়া দরকার।

মেয়েমানুষ পেলে স্থির হবে এমন কি হরি সম্পর্কে বলা যায় বউমা? ও তো সেরকম নয়। ও একটা রেপ দেখেছিল, একটা জানোয়ার ওই দুধের শিশুকে টাঙ্গি দিয়ে মেরে শেষ করেছিল, এসব তো আছেই, তার ওপর কৃতকর্মেরও কিছু ফল তো হচ্ছে। ও দুটে লোকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। না, বউমা, বন্দনার কথা ওকে বলার সময় আসবে, তখন বলব। বন্দনা বড় হোক, সেও তো কচি বয়সী। ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

সুন্দরী মেয়ে মা, যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়!

ঠাকুর করলে তা হবে না। ঠাকুরের ওপর ভরসা রাখো। জেনো, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটাও নড়ে না। ভবিতব্যে থাকলে এ বিয়ে খণ্ডাবে কে?

ভবিতব্যে এত গভীর বিশ্বাস মঞ্জুর ছিল না। তবে সে এও জানত হুড়োহুড়ি করে, জোর করে কিছু ঘটানো যাবে না। তাই সে অন্য পন্থা নিল! সে বন্দনাকে ঘন ঘন চিঠি দিত আর তাতে হরিপ্রিয়র কথাই থাকত বেশি। যাতে কোনও রকমে হরিপ্রিয়র ওপর থেকে বন্দনার মন সরে না যায় সেই জন্যই এই চেষ্টা।

আমরা কি কোনও মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর দিকে যাচ্ছি?

কাহিনীটা মিলনান্তক না বিরহান্তক সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, জীবনে বিরহ ঘটে, মিলনও ঘটে, আবার কখনও অসমাপ্ত থেকে যায় কাহিনী। যেমন হরিদাসের কাহিনী। সেটা কি বিরহান্তক, না মিলনান্তক? নাকি এর ঊর্ধের কিছু? আমরা এক ব্যর্থ প্রেমের নায়ককে জানি, সে পরে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখেদুঃখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। প্রৌঢ় বয়সে সে তার পুরনো প্রেমিকাকে দেখে চমকে উঠেছিল, এঃ, এর জন্য আমি এত পাগল হয়েছিলাম! সুতরাং বিরহ বা মিলনটা নিয়ে ভাবিত হওয়ার কারণ নেই।

প্রেম আর রূপতৃষ্ণার মধ্যে পার্থক্য আছে। মেয়েটা মোটা হয়ে গেলে বা পুরুষটার টাক পড়লে যে প্রেম কেটে যায় তা কি প্রকৃত প্রেম?

ঠিক কথা। তাই মানুষে-মানুষে ঠিক সেরকম স্থায়ী প্রেম হয়ও না। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে জরা আসে, মৃত্যু আসে, আমাদের ঘর গেরস্থালি উড়েপুড়ে যায়। নশ্বরতাই আমাদের বড় বিঘ্ন। মৃত্যুহীন প্রেম বলে কিছু নেই, এক ঈশ্বরপ্রেম ছাড়া।

আবার ঈশ্বরকে এর মধ্যে ডাকাডাকি কেন?

যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে।

ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাক। আমরা বরং এই দু'জনের কথাই জানতে চাই। নায়িকা পঞ্চদশী বন্দনা কলকাতায় থাকে, নায়ক পঞ্চবিংশতি বছরের হরিপ্রিয় থাকে পাটনায়। হরিপ্রিয়র নারী-বিমুখতা, কাম কৈবল্য এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং কলকাতা থেকে পাটনার দূরত্ব অতিক্রম করে তার গলায় বন্দনা মালাটি পরাল কী ভাবে? গল্পের গরু কি এ বার গাছে উঠবে?

এই কাহিনীর কুশীলব প্রায় সকলেই জীবিত। শুধু গত বছর কুসুমকুমারী প্রয়াতা হয়েছেন। বন্দনার বয়স এখনও কুড়ি পোরেনি। সে বিএ ক্লাসের ছাত্রী। কলকাতার বাড়িতে সে একরকম নিঃসঙ্গ। তার একমাত্র সহোদরা দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। এক পিসতুতো ভাই থাকে বটে। তবে সে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে মাত্র। জ্যাঠামশাইরা ভাগের বাড়ি ছেড়ে যে যার নিজস্ব বাড়ি বা ফ্ল্যাটে চলে গেছে। তার বাবা এবং সৎমা থাকে মুম্বই শহরে, যোগাযোগ ক্ষীণ। বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে দেওয়ার কথা চলছে।

মনে হচ্ছে এইখানে গল্পের একটা মোচড় আছে। কিন্তু আমরা জানতে চাই, উনিশ-কুড়ি বছরের এ যুগের একটি মেয়ে একটা অনির্দিষ্ট প্রেম বুকে পুষে রেখেছে—এটা কি স্বাভাবিক? তার জীবনে কি অন্য পুরুষের

সমাগম হয়নি বা কাউকে ভালোও লাগেনি তার? অদেখা অজানা হরিপ্রিয়র প্রতি তার প্রেম কি এত প্রগাঢ় হওয়া সম্ভব?

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, এই যুগে যখন ছেলে এবং মেয়েদের অবাধ মেলামেশা তখন এরকম একটা একরোখা প্রেমের কথা ভাবা যায় না। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য

আমরা বলি, কিছু মহিলা ও পুরুষ প্রতি যুগেই বুকভরা এক রোমান্টিক ভালোবাসা নিয়ে জন্মায়। শত মেলামেশাতেও তাদের এই রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ মরে যায় না। এইসব মেয়েদের বাঞ্ছিত পুরুষ থাকে কোনও অগম দেশে, তারা তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর এইসব ছেলেদের বাঞ্ছিত নারীটি থাকে কোনও এক রহস্যময় রূপকথার রাজ্যে। তারাও অপেক্ষা করে। শেষ অবধি তারা হয়তো পায় না বাঞ্ছিত পুরুষ বা নারীকে। একটা মৃদু পিপাসা নিয়েই তারা জীবনটা কাটিয়ে যায়।

আমরা এবার গল্পের মোচড়টার জন্য অপেক্ষা করছি।

হ্যাঁ, এই গল্পে প্রত্যাশিত একটি মোচড় আছে বটে। আগেই বলা হয়েছে, কুসুমকুমারী মারা যাওয়ার পর বাড়িটা ফাঁক হয়ে যায় এবং বন্দনা আর তার ভাই কার্যত সেখানে অভিভাবকহীন। এক বুড়ি দাসী, একজন রাঁধুনি আর পুরোনো দারোয়ান ছাড়া কেউ নেই। বন্দনার বাবা মুম্বাই থেকে টাকা পাঠায়, তাই তাদের অভাবের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু টাকায় আর মানুষের কত অভাব মেটে?

এত দিনেও কি হরিপ্রিয় বন্দনার কথা জানতে পারেনি? সে কি জানে না একটি তৃষিত হৃদয় তার জন্য অপেক্ষা করছে! সে তো পৃথ্বীরাজের মতো টগবগ করে এসে সংযুক্তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে! গল্পের শেষ তো তাই, নাকি!

হয়তো তাই। কিন্তু মোচড়টার জন্য একটু অপেক্ষা করতে দোষ কী? তবে হ্যাঁ, বন্দনার কথা হরিপ্রিয় জানে বই কি। তাকে পাঁচ বছর ধরে তার মা আর ঠাকুমা বহুবার বন্দনার কথা বলেছে। কিন্তু শীতল হরিপ্রিয় বন্দিমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। সে একটি কলেজে অধ্যাপনা করে এবং আপনমনে থাকে। চুপচাপ এবং অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এই পটভূমিকায় এক শীতের বিকেলে মঞ্জু একটি চিঠি নিয়ে চিন্তিতভাবে পুষ্পর ঘরে এল। এবার গল্পে ঢুকে পড়া যাক।

মঞ্জু বলল, মা, বন্দনার একটা চিঠি এসেছে আজ।

কী লিখেছে?

ওর আত্মীয়স্বজন কী যে করছে বুঝি না। অত বড় বাড়িতে কচি দুটো ছেলেময়ে পড়ে আছে, কেউ তাদের দেখার নেই। আমার তো ভয় করছে।

পুষ্প একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভয়েরই কথা বউমা। আমি কুসুমদি চলে যাওয়ার পর থেকেই তো ভাবছি। কী যে হবে ওদের! কী লিখেছে বলো তো!

লিখেছে, এ বাড়িটা এখন এত ফাঁকা হয়ে গেছে যে আমার কেমন খাঁ-খাঁ লাগে। ঠাকুমা মরে যাওয়ার পর থেকেই বাড়িটা যেন আমাকে গিলতে আসে। আমার পিসতুতো ভাই নান্টু এখানে থাকে। কিন্তু ভাই তার পড়া আর খেলা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। আমার কলেজের পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেই করে না। কার কাছে ফিরব? মেজো জ্যাঠা কাছাকাছি থাকে বলে মাঝে মাঝে আসে। ওদের কাছে গিয়ে থাকতেও বলে। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। গত মাসে বাবার কাছে মুম্বই গিয়েছিলাম ক'দিনের জন্য। ভালো লাগেনি। নতুন ভাইবোনরা দিদি বলে পাত্তাও দিল না। আমার যে কীভাবে দিন কাটছে! সর্বক্ষণ শুধু ভয় আর ভয়। কোথাও যেন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

পুষ্প দুঃখিত গলায় বললেন, আহা রে! আপনজনের অভাব যে কী তা এই বয়সেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কী করব বলো তো বউমা?

আমি বলি, ওকে পাটনায় আনিয়ে নিই মা। আমাদের কাছে থাকুক।

কী পরিচয়ে? না বউমা, সেটা ভালো দেখাবে না।

তা হলে?

অপেক্ষা করো। হয়তো অবস্থাটা সয়ে যাবে। না হলে চলবেই বা কেন? এ যুগের মেয়েদের তো নিজের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়াতে হবে। ওকে মনের জোর বাড়াতে লিখে দাও।

মঞ্জু তাই লিখল। কিন্তু পনেরো দিন পরেও কোনও জবাব এল না। কিন্তু পনেরো দিনের মাথায় এক সন্ধেবেলা এল একটা টেলিফোন। কলকাতা থেকে। নারীকণ্ঠ।

মঞ্জু ঘটকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মঞ্জু উল্লসিত হয়ে বলল, কে, বন্দনা বলছ?

না, আমি বন্দনা নই। বন্দনার এক বান্ধবী।

বান্ধবী! কী ব্যাপার ভাই?

আমি আপনাকে একটা খবর দিতে চাই। খারাপ খবর।

ভয়ে মঞ্জুর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

ঠিক এইরকমভাবেই কয়েক দিন আগে এক খাঁ-খাঁ দুপুরে বন্দনারও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল।

কিছুদিন যাবৎ সে লক্ষ করছিল দুটো কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে তার যাতায়াতের পথে ঘুরঘুর করে। একটা মারুতি গাড়িতে করে তারা তার বাসের পিছু নেই। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেদের চোখ মেয়েদের লক্ষ করবে—এ তো জানা কথাই। কিন্তু এরা যেন অন্যরকম।

কিরকম তা সে বুঝতে পারত না। কিন্তু তার ভয়-ভয় করত।

বন্দনা খুব ভিতু ধরনের নয়। কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে একা থাকতে থাকতে সে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পাড়াটাও খুব বড়লোকদের পাড়া বলে ভীষণ নির্জন। দোতলা থেকেও সে প্রায়ই দেখতে পেত সামনের রাস্তায় নীল মারুতি গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা ছেলেদুটোকে দেখতে পেত গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে চেয়ে আছে।

ভাই নান্টুকে বলব বলব করেও বলেনি। নান্টুর বয়স মোটে সতেরো। সে কীই বা করতে পারে? পুলিশে জানাবে ভেবেও জানায়নি। কে জানে মশা মারতে কামান দাগা হবে কিনা।

দু'দিনের জন্য রাধুনি দেশে গেছে বলে সেদিন ছুটির দুপুরে নিজেই রান্না করছিল বন্দনা। নান্টু গেছে নুন শো সিনেমায়, রাতে কোন বন্ধুর বাড়ি জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবে। বুড়ি ঝি সুরমা আর দারোয়ান মোহন সিং ছাড়া কেউ নেই।

রান্নাঘর থেকে সে হঠাৎ সুরমার একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল, ও মা গো! তারপরই সব চুপ।

বন্দনা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, সুরমা মেঝেতে পড়ে আছে আর ঘরের মাঝখানে সেই ছেলেদুটো দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, বন্দনা চেঁচিয়েছিল, জীবনে এত জোরে চেঁচায়নি সে। বন্দনা প্রতি আক্রমণ করতেও ছাড়েনি দাঁতে-নখে। বন্দনা কেঁদেও ছিল চিৎকার করে। কিন্তু দুটি কামসর্বস্ব পুরুষ তাকে রেহাই দেয়নি।

বন্দনার মনে হয়েছিল, যে নৈবেদ্য সে এক দেবতার জন্য রেখেছিল তা চেটেপুটে খেয়ে গেল দুটো নেড়ি কুকুর।

কী হবে আর ইহজীবনে? কী হবে আর এই পাপদেহ বহন করে? নার্সিংহোমে চোখ মেলে সে তার বান্ধবী কমলিকাকে বলেছিল, আর কাউকে নয়, শুধু একজনকে জানাস যে আমার আর কাউকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, চাওয়ারও কিছু নেই। বলিস।

ফোনটা রেখে মঞ্জু কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মেঝেয়। হাউ হাউ করে কাঁদল। তারপর তার মাথায় ফেটে পড়ল একটা বিকট রাগ। যেমন রাগ সে কখনও রাগেনি। ছুটে গিয়ে ঢুকল হরিপ্রিয়র ঘরে।

যেমন পাথরের মতো বসে থাকে হরিপ্রিয় তেমনই বসে ছিল সেই দিনও। আচমকা ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়াল মঞ্জু।

ত্রিশ বছর বয়সি কোনও ছেলের গালে তার মা চড় মারতে পারে না। কিন্তু মঞ্জু মারল। পাগলের মতো মারতে মারতে চুলের ঝুঁটি ধরে মুচড়ে দিয়ে বলতে লাগল, বল আর কী চাস? আর কী চাস হতভাগা? পারলি তাকে বাঁচাতে? সে তোর জন্য কবে থেকে অপেক্ষা করেছিল জানিস? বুঝিস তার দাম? দুনিয়ার কোন ভালোটা তোকে দিয়ে হবে বল!...

বিমূঢ় হরিপ্রিয় তার মাকে দু'হাতে জাপটে ধরে বলল, হোয়াই ভায়োলেন্ট মা? কী হল? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

আমি পাগল না তুই পাগল? শুধু পাগল নোস, তোর মতো অমানুষও আর জন্মায়নি কখনও! মেয়েটা তোর জন্য শেষ হয়ে গেল।

পুষ্প এসে শান্তভাবে দরজায় দাঁড়ালেন।

কী হয়েছে বউমা?

কিছু হতে বাকি নেই মা। বন্দনাকে বাড়িতে ঢুকে দুটো ছেলে রেপ করে গেছে। সে এখন নার্সিংহোমে। হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু তারপর গলায় দড়ি দেবে বা গায়ে আগুন। তার এক বান্ধবী ফোন করে বলল। এই পাথরটাকে আর কত আগলে রাখবেন মা? একে এখন বাড়ি থেকে বের করে দিন। যাক ও পাহাড়ে জঙ্গলে সাধু হয়ে থাকুক। ওকে দিয়ে আমাদের আর কাজ নেই।

পুষ্প এসে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, চলো তোমার ঘরে চলো। সব শুনি।

আমি আজই রাতের গাড়ি ধরে কলকাতা যাব।

যেও। আমি ফোন করে ব্যবস্থা করছি। শুধু তুমি কেন, আমিও যাব।

রেপ কথাটা কানে যাওয়ার পরই কেমন শক্ত আর বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল হরিপ্রিয়। সমস্ত মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল এক তীব্র উত্তেজনায়। কানে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। হাত পা শক্ত। বুকের মধ্যে ছলাৎছল রক্তের স্রোত। শরীর জুড়ে ফণা তুলেছে ভয়ঙ্কর এক রাগ। তার ক্ষিপ্ত অভ্যন্তরে এক পাগল চিৎকার করতে থাকে, কিল দেম! কিল দেম! কিল দেম!

ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। তারপর তার ড্রয়ারে তার মায়ের সযত্নে রেখে দেওয়া ফটোটা বের করল সে। কী সুন্দর নিষ্পাপ এক কিশোরীর মুখ! সে ভালো করে দেখেওনি কোনও দিন! বন্দনার লেখা পাঁচ বছরের পুরনো চিঠিটাও বের করল সে। পড়ল।...আমি আপনাকে কখনও দেখিনি, কিন্তু মনে মনে আপনার চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছি। একটু লম্বাটে গড়ন, ছিপছিপে, খুব ফর্সা নয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল (প্রায়ই আঁচড়ান না), গালে সামান্য দাড়ি আর গোঁফ আছে।...

আশ্চর্য! শুধু কল্পনা করে এত ঠিকঠাক মেলানো যায়! ফটো দেখে এবং চিঠিটা পড়ে হরিপ্রিয়র যন্ত্রণা আর রাগ আরও বহু গুণ বাড়ল। এমন হতে থাকল যেন, নিজের নিরুদ্ধ রাগে সে এ বার বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে ছিটকে পড়বে ঘরের চারধারে।

তবু ধীরে ধীরে উঠল সে। মুখ শান্ত, শুধু চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। সে ধীরে ধীরে তার মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে বিছানায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছিল মঞ্জু। পাশে তার পিঠে হাত রেখে গভীর শোকের মুখ নিয়ে পুষ্প।

মা।

মঞ্জু অশ্রুভারাক্রান্ত মুখ তুলল।

আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব মা!

কেন যাবি? কেন যাবি রে পাষাণ! পাথর! আর গিয়ে কী হবে? সব শেষ হয়ে গেল, সাক্ষীগোপালের মতো বসে রইলি। যা তুই, যা আমার সামনে থেকে!

হঠাৎ যেন হরিপ্রিয়র গলায় বহুকালের ওপার থেকে হরিদাস শান্ত গলায় বলে উঠল, আমি ওকে বিয়ে করব মা।

উপসংহার

বাঃ! চমৎকার! খেল খতম, পয়সা হজম। তবু বাহবা দিচ্ছি। গল্পের মোচড়টা ভালোই হয়েছে। এটা প্রত্যাশিত ছিল না।

মোচড়! না, মোচড় তো এখনও আসেনি।

আসেনি! বলেন কি মশাই? বন্দনার রেপ হল, মায়ের হাতে চড় খেয়ে হরিপ্রিয়র বরফ ভাঙল, সে লক্ষ্মী ছেলের মতো বন্দনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল, মোচড় আর কাকে বলে! আরও মোচড়ালে যে গল্পের রসকষ সব বেরিয়ে যাবে।

এ হয়তো রসের গল্প নয়। আমরা দু'দিন পরের এক দৃশ্যে প্রবেশ করতে চাই।

শোওয়ার ঘরে ঠাকুমার প্রকাণ্ড খাটে শুয়ে আছে একটু শীর্ণ, একটু সাদা হয়ে যাওয়া বন্দনা। নিস্পৃহ চোখে সে তার সামনে চেয়ারে বসা তিনজন মানুষকে দেখছিল। পুষ্প, মঞ্জু আর হরিপ্রিয়।

মঞ্জু বলল, আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মা!

ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বন্দনা বলল, কোথায় নেবেন?

পাটনায়, আমাদের বাড়িতে। হরি নিজে এসেছে মা, তোমাকে নিয়ে যাবে বলে।

বন্দনা সিলিং-এর সাদা শূন্যতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল। সিলিং ফ্যান স্থির ঝুলে আছে। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, আমার তো কোথাও যাওয়ার নেই।

আমরা বিয়ের দিন ঠিক করেই এসেছি, তুমি কিছু ভেবো না।

বন্দনা অস্ফুট উচ্চারণ করল, বিয়ে!

যেন এই শব্দটাই সে কখনও শোনেনি।

এ বাড়িতে তোমাকে আর একা ফেলে রাখব না মা। যথেষ্ট হয়েছে।

বন্দনা সিলিং-এর দিকে আধবোজা চোখে চেয়ে থেকে বলল, এই বাড়িতেই আমি বেশ আছি। একা একাই তো ভালো। আমার আর একটুও ভয় করছে না।

হরিপ্রিয় মৃদু স্বরে মাকে বলল, তোমরা একটু ও ঘরে যাও মা। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

মঞ্জু আর পুষ্প উঠে যাওয়ার পর হরিপ্রিয় চেয়ারটা একটু খাটের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল।

বন্দনা, চলো।

বন্দনা তার দুটি অপরূপ চোখ নিঃসঙ্কোচে হরিপ্রিয়র চোখে স্থাপন করে বলল, কেন যাব?

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভ্রূ সামান্য কুঁচকে বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দের মতো বলল, তুমি কে? তুমি তো সে নও!

আমি হরিপ্রিয় বন্দনা।

হরিপ্রিয়! হবে হয়তো। তবু তুমি সে নও।

আমি কে নই বন্দনা?

তুমি সেই হরিপ্রিয় নও।

আমি বুঝতে পারছি না বন্দনা।

বন্দনা ফের সিলিং-এর দিকে চেয়ে খুব ক্ষীণ গলায় বলল, দশ বছর বয়স থেকে তাকে আমি গড়েছি। কত কষ্টে! কত চোখের জলে। সে আমার স্বপ্নের পুরুষ। ঝড়ের বেগে এসে একদিন তুলে নিয়ে যাবে আমাকে। এল কই? জানো তোমরা, আমার সর্বস্ব যেদিন লুঠ হয়ে যাচ্ছিল ওই ঘরে, সেই ভয়ঙ্কর দুপুরে, আমি ভগবানকে ডাকিনি। ডেকেছি হরিপ্রিয়কে, এসো আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে রক্ষা করো। সে আসবে না—তা কি হয়? কিন্তু এল না তো! আমার ভীষণ বিপদের দিনে কই শোনা গেল না তো তার অশ্বক্ষুরধ্বনি! আমার হরিপ্রিয় নেই। তোমরা ফিরে যাও।

নতমুখ হরিপ্রিয় তার বুকের আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল। বলল, ফিরে যাব বন্দনা?

হ্যাঁ। পৃথিবী এত নিষ্ঠুর জানতাম না তো! জানা হল। এখন আমার শক্ত মাটিতে পা। আমার জন্য তোমাদের আর কাউকে ভাবতে হবে না। ফিরে যাও।

তবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল হরিপ্রিয়। হতমান, বিষণ্ণ, বাষ্পাকুল। তারপর বলল, তাই হবে বন্দনা। কিন্তু সারাজীবন তোমারই অপেক্ষায় থাকব। আর কারও নয়।

গল্প কি এখানেই শেষ?

কোনও গল্পেরই শেষ নেই। একদিন বন্দনা হয়তো যাবে হরিপ্রিয়র কাছে। হয়তো মিলন হবে তাদের। হয়তো হবে না। আবার হয়তো দুটি তৃষিত হৃদয় অপেক্ষা করবে জন্মান্তরের। জন্ম জন্মান্তরের। কে জানে!

…………………

বি. দ্র.

খুব সম্প্রতি এই উপন্যাসটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত উপন্যাসসমগ্র ৯ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বেই এই দুটি খণ্ডের কাজ শেষ হয়েই গিয়েছিল।

একটি করুণ রাগিণী

আজ পুন্নিমে নাকি রে সাজু?

পুন্নিমে! কী যে বলো মুকুন্দদা। পুন্নিমে কি রোজ রোজ হয়? আজ হচ্ছে নিকষ্যি অমাবস্যে। কষ্টিপাথরের মতো অমাবস্যে।

তাহলে চাঁদ দেখছি যে! ওই তো উঠি-উঠি করতেছে।

সাজু তার ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে অম্লানবদনে বলল, তা পুন্নিমেও হতে পারে। অমাবস্যে-পুন্নিমে দিয়ে আমাদের হবেটা কি বলো। একুট বাদে নেশা জমলে তো সবই ভেসে যাবে। নাকি!

তা বটে। তবে পুন্নিমে-টুন্নিমে হলে একটু ভালো লাগে। চাঁদ হলো ভগবানের জিনিস। বুঝলি না!

সে আমিও শুনেছি বটে। চাঁদ-সুয্যি ভগবানের জিনিস। তবে বিরিঞ্চি সাধুখাঁর নাকি একখানা চাঁদ ছিল।

বটে! সে কীরকম?

তা কে জানে। সোনারুপো দিয়েই তৈরি বোধহয়। ফুটু মিস্তিরি নাকি অমাবস্যের রাতে মস্ত মই বেয়ে উঠে আকাশের গায়ে চাঁদটা ফিট করে দিত।

সে তো বিপদের কথা। পেরেক খুলে চাঁদখানা মাথায় এসে পড়লে কী হতো?

ফুটু মিস্তিরি কি আর যে-সে? তার হাতে টাইট-করা স্ক্রু খোলে কার সাধ্যি! স্ক্রু এমন টাইট দিত ফুটু মিস্তিরি, ইহজন্মে যা আর খোলার নয়।

পাঁচ নম্বর ভাঁড় চলছে। দু'পাঁইট ফাঁকা। দুজনেরই বেশ নেশা হয়েছে। তবে কিনা তারা পুরনো নেশাখোর। মাতাল হলেও বেহেড নয়। দুজনের হাতেই গুরুতর কাজ। ঠাকুরমশাই নবাবগঞ্জে গেছেন, ফিরতে রাত হবে। ঘরে যুবতী বউ। তারা বাইরে বসে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

মুকুন্দ পাঁচ নম্বর ভাঁড় শেষ করে বলল, চ, একটা পাক মেরে দেখি।

চলো।

দুজনেই বাড়ির চারদিকটা টলমল পায়ে পাক মেরে দেখে এল। না, কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশ কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। বামনী বোধহয় ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোক।

দুজনে বসে ছ'নম্বর ভাঁড় মুখে তুলল।

সাজু, কত রাত হলো রে?

বেশি হবে না। একটু আগেই চাঁদ উঠল যে।

সে তো দু'নম্বর ভাঁড়ের সময়। তখন অ্যাত্ত বড় ছিল। এখন দেখ, কেমন ছোট্টোটি হয়ে গেছে। রাত হয়েছে রে।

হতে দাও না। রাত আর কতই বা লম্বা হবে! বেশি লম্বা হতে গেলে ফস করে ভোর এসে ভো-কাট্টা করে দেবে রাতকে।

তা বটে। সব ঠিকঠাক আছে তো! চারদিকে নজর রাখছিস?

হ্যাঁ হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। তুমি আর আমি দুজনে আছি, কে ঘেঁষবে এদিকে? এ তল্লাটে তো কারও ঘাড়ে একটার বেশি দুটো মাথা দেখিনি।

তবু ঠাকরোনকে ডেকে একটু সাড়া নে।

তুমিও যেমন। ঠাকরোন হলো সাঁঝ-ঘুমুনি। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে।

এদিকটায় গরিব লোকেদের বাস। গাঁয়ের প্রান্তে, একটেরে জায়গা। সামনে একটা ফুটবল খেলার মাঠ আছে। মাঠের ধার ঘেঁষে কাঁচা রাস্তা। তার পাশেই ঠাকুরমশাইয়ের তিন কাঠা জমিতে দুখানা টিনের চাল আর বেড়ার ঘর। ভিটেটা ইটে-বাঁধানো বটে, তবে ইটের ওপর আর পলেস্তারা দেওয়ার পয়সা জোটেনি। ঠাকুরমশাইয়ের অবশ্য তাতে অসুবিধে নেই। যেমন তেমন থাকতে পারেন।

সাজু হঠাৎ নেশার মধ্যেও সিধে হয়ে বসে বলল, লোকটা কে আসছে বলো তো! হাঁটা দেখে তো চেনা লোক মনে হচ্ছে না।

মুকুন্দ খেঁটে লাঠিটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, খারাপ মাল মনে হচ্ছে?

আরে না। ভদ্দরলোকই। তবে চেনা নয়। কার বাড়ি যাচ্ছে বলো তো!

কে জানে! যেতে দে।

লোকটা গেল না। বরং বাড়ির সামনে এসে হাঁটায় ব্রেক কষল। ফটফটে জ্যোৎস্নায় তারা দুই মূর্তিমান সদর আগলে বসে। লোকটা তাদের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

মুকুন্দ খুব মায়াভরা গলায় বলল, কার বাড়ি খুঁজছেন?

লোকটা দ্বিধান্বিত গলায় বলল, এটা শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ি না?

নিয্যস। কোথা থেকে আগমন হচ্ছে বলুন তো!

কলকাতা থেকে। বিশেষ দরকার। উনি নেই?

মুকুন্দ থুতনিতে চার দিনের না, কামানো দাড়ি চুলকে বলল, বিষয়কর্মে গেছেন। এসে পড়বেন টক করে।

লোকটা ক্লান্ত গলায় বলল, বাড়ি নেই? তাহলে তো মুস্কিল। আমাকে আজ রাতের গাড়িতেই ফিরতে হবে।

সাজু বলল, শেষ গাড়ি এগারোটায়। দেরি আছে।

লোকটা ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে আটটা বাজে। স্টেশনটাও তো মাইল খানেক দূর। কখন ফিরবেন জানেন?

সাজু মাথা নেড়ে বলল, সে কেউ জানে না।

আপনারা কারা?

এই গাঁয়েরই লোক। বসে যান এখানেই।

লোকটা অবস্থাটা চেয়ে দেখল। শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ির একটুখানি দাওয়ায় দুজন বসা। চেয়ার বা টুল পর্যন্ত নেই। কার্তিকের হিম পড়তে শুরু করেছে। গ্রামদেশ বলে বেশ ঠান্ডাও। ইটের দাওয়ায় বসাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তাছাড়া লোক দুটোকেও তার পছন্দ হচ্ছে না। দিশি মদের উৎকট গন্ধ আর বোতল আর ভাঁড় থেকে অনুমান করতে এক লহমাও দেরি হলো না যে, এরা তুরীয় মার্গে রয়েছে। শাসন ভট্টাচার্যের চেনাজানার পরিমণ্ডলটি বড়ই বিচিত্র।

লোকটা বড়ই পরিশ্রান্ত। তাই এগিয়ে এসে একটু দূরত্ব রেখে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল।

মুকুন্দ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। বলল, মশা আছে কিন্তু।

জানি। মাস ছয়েক আগে একবার এসেছিলাম। শাসনবাবুর স্ত্রী বাড়িতে নেই?

খুব আছেন। আপনি কি তাঁর কেউ হন?

আত্মীয় নই, তবে চেনা।

তবে উঠে ডাকুন না। ঠাকরোন বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।

দরকারটা তাঁর সঙ্গে নয়, শাসনবাবুর সঙ্গে। ঘরে ঢোকার দরকার নেই। বাইরে থেকে কথা বলেই বিদায় নেবো।

তাহলে চেপে বসে থাকুন। ঠাকুরমশাই এসে পড়বেন। তা বাবু, কী করা হয় আপনার?

চাকরি।

মোটা মাইনের চাকরি নাকি?

না না। সামান্য চাকরি। আপনারা?

মুকুন্দ ছ' নম্বর ভাঁড় সবে মুখে তুলে বলল, গাঁয়ের লোক, চাষবাস করি আর কি। গতিক সুবিধের নয়। চাষের যা খরচা, টাকা তুলতে জিব বেরিয়ে যায়। একটা চাকরি পেলে দিতাম সব ছেড়েছুড়ে।

সাজু আবছা গলায় বলল, নিয্যস। গাঁয়ের লোকের বড়ই দুর্গতি। কলকাতায় দেখুন তো কচি সিম চল্লিশ টাকায় বিকোচ্ছে, এখানে ছ'টাকা। চাষ করে আর লাভ কী বলুন!

লোকটার যেন এসব কথায় গা নেই। কেমন উসখুস ভাব। প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ধরাল। কি ভেবে প্যাকেটটা তাদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, খাবেন?

মুকুন্দ খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, বিড়িই চলে আমাদের। তা দেন খাই।

তিনজন সিগারেট ধরানোর পর সাজু হঠাৎ বলল, বাবু, একটা কথা।

লোকটা বলল, বলুন।

বোতলটা তুলে ধরে সাজু বলল, আপনার চলবে?

লোকটা হাসল। বলল, না। আপনারা খান।

ভালো জিনিস ছিল কিন্তু। দিশি বটে, কিন্তু দু'নম্বরি নয়।

আমি খাই না। দিশি-বিলিতি কোনওটাই না।

সাজু ভারী লাজুক গলায় বলল, আমরা সারাদিন খেটেপিটে এই সাঁঝবেলায় একটু না খেলে গায়ের ব্যথা মোটেই মরতে চায় না।

তাতে কী? খান।

মুকুন্দ চাঁদের আলোয় যতদূর দেখল, লোকটা বেশ লম্বা, ফর্সাই মনে হচ্ছে, আর রীতিমতো বাবুগোছের। প্যান্ট, শার্ট আর বুকখোলা একটা হাফ সোয়েটার থেকে আর কিছু বোঝার জো নেই।

ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে চেনাজনা আছে নাকি বাবু?

তা আছে।

কতদিনের?

বছর দুই হবে।

ঠাকুরমশাই খুব বিচক্ষণ লোক। মেলা মানুষ তার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসে।

হ্যাঁ। শাসনবাবু খুব বুদ্ধিমান মানুষ।

লোকটা ঘড়ি দেখছে।

রাত এগারোটার গাড়ি ধরবেন তো?

হ্যাঁ।

দেরি আছে।

কিন্তু উনি যদি দেরি করেন তাহলে মুস্কিল হবে। কোথায় গেছেন তা কি জানেন?

আজ্ঞে না। ঠাকুরমশাইয়ের কি কাজের অভাব?

সাজু বলল, জয়নগর যাবেন বলে একবার শুনেছিলুম যেন। ঠিক জানি না।

লোকটা একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, কিছুক্ষণ বসি তাহলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন আরাম করে।

মশা কামড়াচ্ছিল। লোকটা উসখুস করছে, বার করে নিজের গায়ে চড়চাপড় দিল কয়েকটা। পা আর হাত চুলকোলো।

মুকুন্দ মোলায়েম গলায় বলল, মশা আছে কয়েকটা। আমাদের তেমন কামড়ায় না। নতুন লোক দেখে আপনার পেছুতে লেগেছে।

তাই দেখছি।

কিছুক্ষণ বাদে সয়ে যাবে, দেখবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মুকুন্দ আর সাজুর নেশা বেশ উঁচুতে উঠেছে। এসময়ে মুকুন্দর গান আসে আর সাজুর বুকটা হু-হু করে।

মুকুন্দ সবে গুনগুন শুরু করেছিল। সাজু হঠাৎ বলে উঠল, ওই আসছেন।

একটা সাইকেল ঘচাং করে এসে থামল সামনে। শাসন নেমে পড়ল। লোকটা ঘড়ি দেখল, ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

সাজু আর মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল টপ করে। গ্যালগ্যালে একটু হেসে মুকুন্দ বলল, এসে গেলেন ঠাকুরমশাই? এই যে ইনি বসে আছেন অনেকক্ষণ ধরে।

শাসন সামান্য বিস্মিত গলায় বলল, অভিসারবাবু নাকি?

আজ্ঞে।

কী আশ্চর্য! এত রাত্রে?

জরুরি কথা আছে শাসনবাবু।

বলিবেন। আগে অভ্যন্তরে চলুন।

যাবো? আপনার স্ত্রীর অসুবিধে হবে না?

না মহাশয়। আমার ব্রাহ্মণী এক লক্ষ্মীছাড়ার সংসার করিয়া থাকে। তাহার সর্বপ্রকার অভ্যাস আছে। ওহে মুকুন্দ, ওহে সাজু, তোমরা এইক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পার।

পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। বলে দুজনে চটপট সরে পড়ল।

শাসন কড়া নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল তার ঘোমটাটানা বউ।

মহাশয়, কিছু আহার করিয়াছেন কি?

আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি ভরপেট খেয়ে এসেছি। আপনি জামাকাপড় বদলে নিন তাড়াতাড়ি। আমি এগারোটার ট্রেনে ফিরে যাবো।

অদ্য প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন কী? আমার একটি অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

না, উপায় নেই।

যথা আজ্ঞা। আসুন।

সামনের ঘরের আসবাবপত্র সামান্যই। একটি নিচু তক্তপোশে শতরঞ্চি বিছানো, দুটি জলচৌকি।

মহাশয়, উপবেশন করুন।

অভিসার বসল।

সাইকেলটা ভিতরের দিকে রেখে এসে মুখোমুখি শাসনও বসল। বলল, এইবার বলুন কী এত গুরুতর কারণ।

কাল বাদে পরশু আমার বিয়ে।

নাকি মহাশয়? ইহা তো জানা ছিল না।

হঠাৎ ঠিক হয়েছে। বিয়ের পরই মেয়েটি আমেরিকায় চলে যাবে। গিয়ে আমাকেও কয়েকমাস পরে নিয়ে যাবে বলে কথা।

ইহা তো অতি উত্তম প্রস্তাব মহাশয়। গুণবতী কন্যালাভ ভাগ্যের কথা।

হ্যাঁ, সেই লোভেই আমার মা-বাবা বিয়ের প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছিল। মেয়েটি যে খুব ব্রিলিয়ান্ট তা কিন্তু নয়। ওর এক দাদা আমেরিকার সিটিজেন, সে-ই গ্রীন কার্ড করে দিয়েছে। সায়েন্সের মোটামুটি ভালো ছাত্রী। মিনেগোটায় একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে।

সকলই তো অতি শুভ সংবাদ মহাশয়। বিঘ্নটা কোথায়?

আসলে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর আমার মা-বাবা অতি উৎসাহের চোটে বেশি খোঁজখবর নেয়নি। পাত্রীপক্ষেরও বিয়ের তাড়া আছে। আর দিন পনেরো পরই মেয়েটা আমেরিকায় চলে যাবে। তাই একটু হুড়োহুড়ি করেই বিয়েটা হচ্ছে। কিন্তু তিন দিন আগে আমার কাছে একটি চিঠি আসে। ইংরেজিতে যাকে বলে পয়জন লেটার, এটা হলো তাই।

তবে তো ধন্ধে পড়িয়াছেন মহাশয়।

ঠিক তাই।

পত্রটি সঙ্গে আনিয়াছেন কি?

আপনাকে দেখানোর জন্যই এনেছি। পাত্রী আপনার কাছাকাছিই থাকে। জয়নগর। আপনার পরামর্শ এখন আমার খুবই দরকার।

পরামর্শ ছাড়া মানুষকে আমার কী-ই বা দেওয়ার আছে! পত্রটি গোপন রাখিতে ইচ্ছা হইলে রাখিতে পারেন। মোক্তা কথাটা মুখে বলিলেই হইবে।

না, চিঠিটা আপনি দেখুন।

হিপ পকেট থেকে একটা দোমড়ানো খাম বের করল অভিসার। শাসনের হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন।

শাসন চিঠিটা হাতে নিয়েই খুলবার চেষ্টা করল না। চিঠিটা হাতে ধরে রেখে অভিসারের মুখের দিকে চেয়ে বলল, মহাশয়, চিঠিটা পড়িবার আগে আমার গুটিকতক প্রশ্ন আছে।

বলুন।

কন্যাটি কি সুন্দরী?

আমি তাকে চাক্ষুষ দেখিনি। মেয়ের দাদু একটু গোঁড়া প্রাচীনপন্থী। তাঁরা নাকি পাত্রকে মেয়ে দেখান না, অভিভাবকদের দেখান। তবে মেয়ের ফটো দেখেছি।

ফটো কেমন দেখিলেন?

সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে না। একটু মোটা।

আপনার পছন্দ হয় নাই?

চেহারা পছন্দ হওয়ার মতো নয়। তবে চেহারা তো বহিরঙ্গ মাত্র। মেয়ের অন্যান্য গুণ বিচার করে অপছন্দ হয়নি।

মুখশ্রী কী রূপ?

ভালো নয়। তবে হ্যাক ছিঃ বলা যাবে না।

লাবণ্যময়ী?

অভিসার একটু হাসল, অপানি যে কেন মেয়েটার চেহারা নিয়ে এত ভাবছেন বুঝতে পারছি না।

তাহার কারণ আছে। আপনার জন্মপত্রিকা আমি দেখিয়াছি। আমার বিদ্যা কহিতেছে, আপনি কুরূপা নারীকে বিবাহ করিলে অনিষ্ট হইবে।

মালিকা কুরূপা নয়, সুরূপাও নয়।

বুঝিলাম। এখন বলুন, পাত্রীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ?

ভালো।

কতটা ভালো?

ওর বাবার বিরাট ব্যবসা।

ভাঙিয়া বলুন। কিসের ব্যবসা?

কলকব্জার পার্টস তৈরি করার কারখানা আছে। বলবিয়ারিং আর কী সব যেন। ভদ্রলোক সেই সুবাদে বছরের ছ'মাস ব্যাঙ্গালোর আর দিল্লিতে থাকেন।

তাহার অর্থ কয়েক কোটি টাকার লগ্নী।

তা হবে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা পড়ুন।

শাসন খাম খুলে চিঠি ও তৎসহ একটা জেরক্স কপি বের করে কিছুক্ষণ হ্যারিকেনের আলোয় পড়ে দেখল। জেরক্স কপিটাও উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর সযত্নে ভাঁজ করে খামে ভরে খামটা অভিসারের হাতে দিয়ে বলল, এই রামচরণ লোকটি কে?

মালিকার কাকা। এঁরও বড়বাজারে আড়ত আছে। মালিকার বাবার সঙ্গে খুবই রেষারেষি। মুখদর্শন অবধি নেই।

তাহা হইলে তো পত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়াই ধরিতে হয়।

সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।

বলুন কী করিতে হইবে।

চিঠিতে লিখেছে মালিকার বছর দুই আগে একবার অ্যাবরশন হয়। ধরেই নিচ্ছি ঘটনাটা সত্যি।

ধরিতে হইবে না। রামচরণ পাকা লোক। নার্সিংহোমের এন্ট্রি এবং কেস হিস্ট্রি জেরক্স করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তবু বলি, টাকার জোরে এসবও করা যায়। রামচরণ বিয়েটা ভণ্ডুল করতে চাইছেন।

আপনি চাইতেছেন না?

বলছি। মেয়েটা যদি একটু ভুল করেই থাকে সেটাকে বড় করে ধরে পিছিয়ে আসাটা ঠিক হবে কি? আমি উদার মনের মানুষ। এসব ব্যাপারকে মূল্য দিতে চাই না।

উত্তম প্রস্তাব। তবে অগ্রসর হউন।

চিঠিটা তো পড়লেন। রামচরণ আমাকে নিষেধ করছেন এবং নিষেধ না মানলে বাধা দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কী করা?

তিনি বাধা দিবেন, সেই বাধা আপনি নস্যাৎ করিবেন। তাহা হইলেই আর গোল থাকে না।

উনি যদি বিয়ের আসরে গোলমাল পাকান তাহলে তো লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

লোক জানাজানিকে ভয় পাইলে আর উদারতার কী পরিচয় দিলেন! যাহা উচিত বলিয়া মনে করিবেন তাহা তো বক্ষদেশ স্পিত করিয়াই করা উচিত।

আপনি এই বিয়ে সমর্থন করছেন কি?

অগ্রে বলুন, এই পত্রের কথা আপনার অভিভাবকেরা জানেন কি?

না। চিঠিটা অফিসের ঠিকানায় এসেছে। আমি কাউকে দেখাইনি।

আমি বলি, তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করুন।

মা রাজি হবে না। বাবা হয়তো—

মাকে বুঝাইয়া বলুন।

মা হয়তো বুঝতে চাইবে না।

বুঝিবেন। কোটি কোটি টাকার তলায় অনেক কিছু চাপা দেওয়া যায়।

আপনি কি বলতে চান আমরা লোভে পড়ে এই বিয়েতে রাজি হয়েছি?

কথাটা কঠিন বটে, কিন্তু মনে হয় অযৌক্তিক নহে।

আপনি আমাকে কী করতে বলেন? বিয়ে ভেঙে দেব? নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি হয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবকে আমেরিকা যাওয়ার কথাও বলেছি। কেনাকাটা, কেটারারকে অর্ডার দেওয়া সব হয়ে গেছে। এখন বিয়ে ভেঙে দিলে প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবে?

আপনি আমার নিকট কেন আসিয়াছেন তাহা এখনও কহেন নাই।

অভিসার একটু চুপ করে থেকে নিজের উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করল। তারপর মোটামুটি শান্ত গলাতেই বলল, আমি রামচরণের চিঠিটাকে বিশ্বাস করি না। আমি চাই আপনি ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

এই কথা! ছাই ফেলিতে ভগ্ন কুলা!

আমি সেইজন্য আপনার ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবো।

শাসন হাসল, মহাশয়, আমার উঞ্ছবৃত্তি আর ঘুচিল না। দক্ষিণা পাইলে বোধহয় চণ্ডালের জুতাও বহন করি। যাহা হউক, পারিশ্রমিকটা বড় কথা নহে। আপনার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক। সেই কারণেই খবরাখবর আমি লইব।

দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করবেন। পরশুই বিয়ে।

মহাশয়, যদি দেখা যায় পত্রোক্ত অভিযোগ সত্য তা হইলে আপনি কী করিবেন?

তাহলেও বিয়েটা হবে।

তাহা হইলে সত্য জানিয়াই বা কী হইবে। আমি কহি, আপনার আর এ বিষয়ে আন্দোলন না করাই সমীচীন। বিবাহ যখন মালিকাকে করিবেনই তখন জল ঘোলা করিয়া কী হইবে?

আমি জানতে চাই।

কি কারণে মহাশয়? স্ত্রীর দুর্বলতা জানিয়া তাহাকে ব্ল্যাকমেল করিবার ইচ্ছা নাকি?

ছিঃ শাসনবাবু! আপনি আমাকে এত নীচ ভাবলেন?

না অভিসারবাবু, আপনাকে কদাপি নীচ বলিয়া মনে হয় নাই। দুর্বলচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু নীচ ছিলেন না। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়।

তার মানে?

মনুষ্য যখন প্রবৃত্তির হস্তে পতিত হয় তখন সাধুও রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

আমি কি সেরকমই করছি?

মহাশয়, কন্যাটি সুন্দরী নহে, তদুপরি কলঙ্কের ইতিহাস রহিয়াছে। তাহা হইলে ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আপনি এত উদগ্রীব কেন? ধনী শ্বশুরের ছত্রছায়ায় থাকিবেন এবং স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া আমেরিকায় থানা গাড়িবেন এরূপ ইচ্ছাই কি বলবতী বলিয়া মনে হইতেছে না?

অভিসার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কটূকাটব্য করলেও আপনি যে আমার প্রকৃত ভালো চান তা আমি জানি। আপনি স্পষ্টবাদীও বটে। স্বীকার করছি, আমেরিকায় যাওয়ার লোভ আমার অনেক দিনের। বহু চেষ্টা করেও কোনও সুযোগ হচ্ছিল না। এই সুযোগটা হাতে এসে যাওয়ায় আমার বহুকালের একটা সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

মহাশয়, আমেরিকা অত্যাশ্চর্য দেশ, শুনিয়াছি। সকলেই সেখানে যাইতে চায়। তাহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু ইহা যে মোহ তাহা স্বীকার করিবেন কি?

না শাসনবাবু, আপনি জানেন না, আমেরিকায় গিয়ে ভালো থাকব বলে যেতে চাইছি না। আমি সেখানে হায়ার স্টাডিজ-এর জন্যই যেতে চাই। ফিরে এসে দেশেই কাজ করব।

সকলেই ওরূপ কহিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা এক রূপকথার কুহক বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যাহারা গিয়াছে তাহারা আর আইসে না।

আমার ক্ষেত্রে তা হবে না।

আপনার ক্ষেত্রে না হইলেও আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে হইতে পারে। তখন কী করিবেন? স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আসিবেন কি?

পরের কথা পরে। ভবিষ্যতে কী হবে তা বলতে পারি না।

মহাশয়, আপনাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে হইবে না। আমি কেবল আপনার মনোভাবটি জানিতে চাই। আপনার নিজের মনকে প্রশ্ন করিয়া জানুন আপনি প্রকৃতই কী ভাবিতেছেন। কন্যাটির প্রতি আপনার দ্রব মনোভাব এবং সীমাহীন ক্ষমার প্রবণতা কতখানি সত্য তাহাও বিচার করিবেন।

আমি অনেক ভেবেই আপনার কাছে এসেছি।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে অনেক অনভিপ্রেত পরিণতি এড়াইতে পারা যায়।

বুঝেছি।

শাসন হাসল, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আমার নিকট পরামর্শ লাভের আশায় আসিয়াছিলেন বলিয়া ভূমিকা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরামর্শ গ্রহণ নহে, আপনার একটি কার্যনির্বাহের জন্যই আমাকে আপনার প্রয়োজন।

আপনি এই বিয়েতে আপত্তি করছেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইছেন না।

বুঝিয়াছি। একটা কথা, আপনি স্বয়ং কেন রামচরণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন না?

অসুবিধে আছে।

কিসের অসুবিধা? খুলিয়া বলুন।

রামচরণ ধূর্ত লোক বলে শুনেছি।

তাহাতে কী হইল? দুনিয়ার সকল সফল পুরুষই অল্পবিস্তর ধূর্ত। আপনার শ্বশুরমহাশয় কিরূপ মানুষ?

তা জানি না। দেখে তো ভালোই মনে হয়।

অনুসন্ধান করিলে হয়তো জানিতে পারিবেন তিনিও ধূর্ত কম নহেন।

স্থানীয় লোকেরা বলে রামচরণ গুণ্ডামি করতেন। তাঁর নামে বেশ কয়েকটি খুনের মামলা ছিল।

তাহা প্রচারও হইতে পারে।

হতে সবই পারে। তবু দয়া করে আমার কাজটি করে দিন। এই পাঁচশো টাকা রাখুন।

শাসন হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বলল, উঞ্ছবৃত্তিই আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতেছে।

না শাসনবাবু, উঞ্ছবৃত্তি হবে কেন? আপনি বুদ্ধিমান লোক, বুদ্ধি ধার দিয়ে দক্ষিণা নেওয়াটা তো উঞ্ছবৃত্তি নয়।

মহাশয়, সকল অপকর্মেরই ধর্মানুরগ ব্যাখ্যা আছে। টীকা ভাষ্যকাররা দিবসকে রজনী করিতে পারে।

রাত হচ্ছে শাসনবাবু। আমি আজ উঠি। খবর কিন্তু কালকেই চাই।

জানি মহাশয়। খবর কল্যই পাইবেন।

অভিসার বেরিয়ে গেলে শাসন ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল।

দুই

আরে! শাসনবাবু যে! কী খবর আপনার?

রামচরণের বৈঠকখানায় তেমন আধুনিক আসবাব নেই। একখানা নিচু তক্তপোশে জমিদারদের কাছারির মতো বিছানা পাতা, তাতে তাকিয়া দেওয়া আছে। সামনে কয়েকটা ভালো জাতের মোড়া। রামচরণ তক্তপোশে বসে কিছু হিসেবপত্র দেখছিল। বয়স পঞ্চাশের নিচে এবং বেশ শক্তপোক্ত মেদহীন চেহারা, মাথায় টাক এবং মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। চোখ দুখানা বেশ জ্বলজ্বলে, ঘন ভ্রূ, পাতলা ঠোঁট। রামচরণকে সুপুরুষ বলা যায় না, তবে চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

শাসন একটা মোড়ায় সন্তর্পণে বসে বলল, মহাশয়ের কুশল?

রামচরণের গোঁফের নিচে খুব মজবুত ও ঝকঝকে দাঁতের হাসি যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। হাসিটা আন্তরিক নয়, তবে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। রামচরণ বলল, ব্যবসা-বাণিজ্য করি, জীবনে নানা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি, কুশলের তোয়াক্কা করি না। ভালো থাকাই কি সব সময় ভালো?

তাহা বটে। আপনি তো ঘটনাবহুল জীবনযাপন করিতে ভালোবাসেন।

বাঃ, কথাটা বেশ বলেছেন তো! একেবারে ঠিক কথা। ঘটনাবহুল। লাগাতার ভালো থাকাটাও তো একঘেয়ে।

যথার্থই মহাশয়। অবিরল কিছুই উপভোগ্য নহে।

একজন কর্মচারী এসে নতুন কিছু খাতাপত্র রেখে গেল রামচরণের সামনে।

চা খাবেন নাকি শাসনবাবু?

না মহাশয়।

এবার বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি।

শাসন একটু ভেবে বলল, আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কী?

গুরুচরণ। কেন বলুন তো!

তিনি কেমন মানুষ বলিতে পারেন?

রামচরণের মুখে হঠাৎ ভ্রূকুটি দেখা দিল। অতি তীক্ষ্ন এবং প্রায় অসহনীয় এক দীপ্ত চোখে কিছুক্ষণ শাসনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কেন বলুন তো!

বিশেষ প্রয়োজন। সম্ভব হইলে আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইতে পারে। সেই কারণেই অগ্রে কিছু প্রস্তুতি লইতেছি।

কী কাজ?

চাকরি প্রার্থনাও করিতে পারি।

রামচরণ হাসল, চাকরি চাওয়ার লোক আপনি নন। কারণটা বলতে চান না, এই তো!

বলিতেও পারি। তবে পরে।

রামচরণের গায়ে পুরনো আমলের বেনিয়ান, নিম্নাঙ্গে ধুতি। বাঙালিয়ানাটি বেশ জোরালো রকমের। রামচরণ সামান্য খাটো গলায় বলল, গুরুচরণ সম্পর্কে বলতে আপত্তি নেই। কারণ, তাকে অনেকেই ভালোরকম চেনে। সে লোক ভালো নয় শাসনবাবু।

বটে মহাশয়?

খুবই বটে। অসম্ভব ধূর্ত, অসম্ভব নিষ্ঠুর এবং অতি মোলায়েম পাজি।

শুনিয়াছি তিনি বিস্তর টাকা করিয়াছেন।

ঠিকই শুনেছেন। টাকার পাহাড়ে বসে আছে। ম্যানুফ্যাকচারার তো। ব্যবসাটা লেগেও গেছে। তবে দাদা এমন কাজ নেই যা করতে না পারে। মুখ দেখে অবশ্য বোঝা যায় না।

শুনিয়াছি তাঁহার কন্যার বিবাহ, সত্য নাকি?

আমিও শুনেছি।

সে কি মহাশয়, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের কথা আপনি কি লোকমুখে শুনিয়াছেন নাকি?

তাও বলতে পারেন। তবে ডাকে একটা নেমন্তন্নের চিঠিও এসেছে। আমার ভাইঝির বিয়েতে আপনার কিছু কৌতূহল আছে দেখছি। কী ব্যাপার?

শাসন হাসল, মহাশয়, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর লইয়া কী করিব? তো লোকমুখে শুনিতেছি আপনি এই বিবাহ অনুমোদন করেন না।

রামচরণ হঠাৎ তার বিদ্যুৎচমকের মতো হাসিটা হেসে বলল, না, করি না। বিয়েটা যাতে হতে না পারে সেইজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করছি।

শাসন সবিস্ময়ে বলল, কেন মহাশয়?

একটা নিরপরাধ ছেলেকে একজন দুশ্চরিত্রা মেয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই কাজ আমাকে করতে হবে। কিন্তু শাসনবাবু, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি কিছু খোঁজখবর নিয়েই আমার কাছে এসেছেন। আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসুন।

শাসন অমায়িক হেসে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। অযথা কালক্ষেপ করিব না। এই পত্রটি কি মহাশয়ের লিখিত?

রামচরণ খামটা ছুঁয়েও দেখল না। একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। চিঠিটা কে দিল আপনাকে? ওই অভিসার ছোঁড়া নাকি?

আজ্ঞে হাঁ। ঘটনাক্রমে তাঁহার সঙ্গে বৎসর দুই হইল আমার কিছু হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। তিনি কখনও সখনও আমার নিকটে আইসেন।

ভালো কথা। তাকে বুঝিয়ে বলবেন এই বিয়ে আমি হতে দিচ্ছি না।

ইহার বিশেষ কোনও কারণ রহিয়াছে কি?

ক্রুর চোখে শাসনের দিকে চেয়ে রামচরণ বলল, না থাকলে নিষেধ করছি কেন?

শাসন উদাস মুখে বলল, পারিবারিক বিষয় লইয়া প্রশ্ন করিতে দ্বিধা হয়। তবে বিবাহটি সংঘটিত না হইলে অভিসারবাবুর কিছু অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতারও বোধ করি সুবিধা হইবে না। সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে।

তা হবে। কিন্তু বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়।

তাহা তো বটেই।

আমার দাদার মেয়ে মালিকা একটি ছেলের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই মেলামেশা করে আসছে। ছেলেটি ভালো, দোষের মধ্যে গরিব। একটা মাইনর স্কুলে মাস্টারি করে। দাদা যখন জানতে পারে তখন মেয়ের ওপর শাসন তর্জন শুরু হয়। দাদাকে যারা জানে তারাই সাক্ষী দেবে, মানুষটা অত্যন্ত অহংকারী। তার অহং-এ আঘাত লাগলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মালিকা এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করছে জেনে দাদা প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করে।

মহাশয়, একটি প্রশ্ন। সেই মাস্টার মহাশয় কি আপনাদের সবর্ণ?

হ্যাঁ, সবর্ণ। চরিত্রবান ছেলে, দেখতেও ভালো, চমৎকার গান গায়, পরোপকার করে।

দারিদ্র্য এক অভিশাপ বিশেষ।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মেয়ে যেখানে প্রেমে পড়েছে সেখানে তেমন অসুবিধে না থাকলে বিয়ে দেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ ছিল।

হাঁ মহাশয়। ইচ্ছা করিলে তিনি তো জামাতা বাবাজীবনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার তো টাকার অভাব নাই।

না, সেটা পারত না। সুবিনয় শ্বশুরের সাহায্যে বড়লোক হওয়ার মতো মানুষ নয়। সে স্বাধীনচেতা, তেজি ছেলে। দাদা সেইজন্যই তাকে আরও বেশি সহ্য করতে পারত না। আক্রোশটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাকে খুন করারও চেষ্টা হয়।

বলেন কী মহাশয়? এতদূর?

দাদাকে তো জানেন না। প্রেস্টিজে লাগলে কাণ্ডজ্ঞান বলে তার কিছু থাকে না।

মহাশয়, সুবিনয়বাবু কি আপনার পরিচিত?

হ্যাঁ, ছেলেটিকে আমি স্নেহ করি।

মালিকাদেবীর যে কলঙ্কের কথা আপনি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি এই সুবিনয়বাবুর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে?

সুবিনয় সেরকম ছেলেই নয়। তবে মালিকা যতটা সুবিনয়ের দিকে ঢলে পড়েছিল, সুবিনয় কিন্তু ততটা ঢলেনি। বরং মালিকাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার আগ্রহের অভাব ছিল। কিন্তু মালিকা দিনের পর দিন তাকে ভালোবাসা জানিয়ে গেছে। মেয়েটির এই আগ্রহ দেখে সুবিনয় অবশেষে নিমরাজি হয়।

একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। মালিকাদেবী দেখিতে কেমন?

সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে না। একটু মোটাসোটাও। তবে মুখে একসময়ে একটু লাবণ্য ছিল।

তাহার পর বলুন, মালিকাদেবীর কলঙ্ক কীরূপে ঘটিল?

তার জন্যও দাদার জেদই দায়ী। মেয়েটাকে ঘরবন্দী করে রেখে, মারধর করে সে এমন একটা বিশ্রী সিচুয়েশন তৈরি করল যে মালিকার মতো শান্ত মেয়েও গেল বাপের ওপর ক্ষেপে। কিন্তু প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করার মতো সাহস তো ছিল না। সে তাই প্রতিশোধ নিল নিজের কলঙ্ক ঘটিয়ে।

কীরূপে মহাশয়?

সেটাও জানতে চান?

বাধা থাকিলে কহিবেন না।

পারিবারিক কেচ্ছা বলতে ইচ্ছে হয় না। তবে অপনি যেহেতু কোনও একটা সমাধানসূত্র বের করতে এসেছেন বলেই আমার অনুমান, তাই বলছি। যে সময়ে ঘটনাটা ঘটে সে সময়ে মালিকাকে রাজগীরে রাখা হয়েছিল। রাজগীরে দাদার বাড়ি আছে। বেশ কড়া পাহারারও ব্যবস্থা হয়েছিল। মালিকা সেখানে একবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। সেটা পারেনি শেষ অবধি। তারপর সে মরিয়া হয়ে, বাবাকে জব্দ করার জন্যই কাণ্ডটা বাধিয়ে বসে।

কাহার সঙ্গে মহাশয়?

ওখানকারই একটি ছেলের সঙ্গে। তার নাম জয়নাথ দুবে। ছেলেটিকে পরে পুলিশ অ্যারেস্টও করেছিল রেপ চার্জে। কিন্তু চার্জ টেকেনি। মালিকা নিজেই বলেছিল, সে-ই ছেলেটিকে অ্যালাউ করে। সে অনেক কাণ্ড মশাই। মহাভারত।

জয়নাথবাবু কীরূপ মানুষ?

কে জানে মশাই। তবে স্থানীয় লোকেরা বলে সে খারাপ ছেলে নয়।

কাহিনীটা জটিল হইতেছে কি?

না। জটিল হতো যদি জয়নাথের সঙ্গে মালিকার প্রেমটেম হতো। তা তো নয়। মালিকা শুধু নিজেকে কলঙ্কিত করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছিল।

বুঝিলাম। গুরুচরণবাবু কি সুবিনয়বাবুকে এখনও সমান অপছন্দ করিয়া থাকেন?

দাদার পছন্দ-অপছন্দ বরাবরই একপেশে। ওর বড় কথা হলো, জেদ। নিজের জেদ বজায় রাখা ছাড়া ও কিছু বুঝতে চায় না।

সুবিনয়বাবুকে খুন করিবার চেষ্টা কবে হইয়াছিল?

দু'বছর তো হবেই। সুবিনয়কে যখন গুণ্ডারা মারল তখনই বোধহয় মালিকা ক্ষেপে গিয়ে এই কাণ্ড করে।

সুবিনয়বাবু এখন কিরূপ আছেন?

ভালোই আছে। গুণ্ডাদের হাতে তার মরারই কথা ছিল। বরাতজোরে বেঁচে গেছে।

এক্ষণে তাঁহার মনোভাব কীরূপ?

কোন মনোভাবের কথা বলছেন?

মালিকাদেবীর প্রতি।

সুবিনয় তো কোনওদিনই মালিকার প্রেমে হাবুডুবু খায়নি। তবে মনোভাব বিরূপও নয়।

মালিকাদেবীর বিবাহে তিনি আপত্তি তুলিয়াছেন কি?

না। আপত্তি আমিই তুলেছি। মেয়েটার জীবন তাতে নষ্ট হবে। পাগলামি করে নিজের অনেক ক্ষতি করেছে। এবার বোধহয় আত্মহত্যাটা বাকি।

মহাশয়, অভিসারবাবু যে মালিকাদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল।

আবার সেই ছটাকে হাসি হেসে রামচরণ বলল, তাও জানি। সেই ব্যাটা টাকা আর আমেরিকা যাওয়ার লোভে পাগল হয়ে আছে।

এইবার আপনিই বলুন, আমি তাঁহাকে কী পরামর্শ দিতে পারি।

তাকে বিয়েটা ভেঙে দিতে বলুন। এই পরিস্থিতিতে সেটাই একমাত্র পথ।

মহাশয়, আমি তো সর্বত্রগামী। আমার ইচ্ছা কুশীলবদিগের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

করতে পারেন। কিন্তু বিয়েটা ঘটাতে পারবেন না কিন্তু। আমি ওটা হতে দেবো না।

জিব কেটে শাসন বলল, আমি আপনার বিরোধিতা করিতে আসি নাই। আমার প্রয়াস সমস্যার জটাজাল হইতে অভিসারবাবুকে উদ্ধার করা। তিনি আমার শরণাগত।

টাকা খেয়েছেন নাকি?

সামান্য কিছু পাইয়াছি। আমার জীবিকাই উঞ্ছবৃত্তি।

ঠিক আছে। আপনি অনুসন্ধান করুন।

মহাশয়, আপনি কি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে বিশেষ স্নেহ করেন?

স্নেহ তো করতাম। মেয়েটি খারাপ ছিল না। কিন্তু যে-কাণ্ডটা করল তাতে বড্ড খারাপ লাগছে। দাদার সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও পারিবারিক স্ক্যান্ডাল তো!

আপনার মনোভাব বুঝিতেছি। আপনি আমাকে বিপক্ষের লোক ভাবিবেন না। আমি পক্ষপাতদুষ্ট নহি।

আমি আপনাকে যতদুর জানি, আপনি অকারণে আমার কাজে বাগড়া দেবেন না। তবে অভিসার ছোকরা আপনাকে টাকা দিল কেন সেটাই ভাবছি। বিয়ের জন্যই বড়ই বেজাহান হয়ে পড়েছে দেখছি।

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়। তিনি আমেরিকায় গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার অভিলাষী।

অর্থাৎ পাত্রীর চেয়ে আমেরিকায় যাওয়াটা অনেক বেশি গুরুতর।

আজ্ঞা হ্যাঁ।

এরকম ছেলেকে বিশ্বাস করা যায় না। এসব ছেলেরাই বিয়ে করে কার্যসিদ্ধির পর হয় বউকে ডিভোর্স করে, না হয় তো মেরে ফেলে।

অভিসারবাবু সম্বন্ধে আপনার মনোভাব খুবই তিক্ত দেখিতেছি।

তা তিক্ত হওয়ারই কথা। তার টাকা খেয়ে আপনি আমাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেললেন। আপনি ধুরন্ধর লোক, কোথা দিয়ে কী চাল দেবেন তা বোঝা দুষ্কর।

মহাশয়, আপনার এই মন্তব্য আমি প্রশংসাবাক্য হিসাবেই গ্রহণ করিলাম। ধুরন্ধর হইলেও আমি ইষ্টবিহীন নহি। ছলে বলে কৌশলে মঙ্গল সাধনই আমার লক্ষ্য। আপনি ইহার অন্যথা দেখিবেন না।

তা দেখিনি। তবে আপনার সম্পর্কে একটা দ্বিধা কাজ করেই।

মহাশয়, বিবাহবাসর ভণ্ডুল করিবার নিমিত্ত আপনি গুণ্ডা নিয়োগ করিয়াছেন কি?

রামচরণ আবার তার কঠোর হাসিটি হেসে বলল, দলের চেয়ে বলের ওপরেই আমার ভরসা বেশি। হ্যাঁ শাসনবাবু, প্রয়োজন হলে পেশীশক্তির প্রয়োগ করা হবে। শুনেছি দাদা পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছে। তাতে লাভ বিশেষ হবে না।

জানি মহাশয়। বিবাহবাসরটি ঘিরিয়া রাখিলেও বরানুগমনের দীর্ঘ পথটি প্রহরা দিবার ব্যবস্থা সম্ভব নহে। আপনি কুশলী।

অভিসার কি খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে?

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়।

ওরা বিয়ের আগেই সিভিল ম্যারেজ সেরে ফেলতে পারে আন্দাজ করে আমি সে ব্যবস্থাও নিয়েছি।

আপনি পাকা লোক। কী ব্যবস্থা মহাশয়?

দু'পক্ষের ওপরই নজরদারির ব্যবস্থা।

ইহা অতীব ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা।

হ্যাঁ। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতোই ব্যাপার। তবে আমি যা করব বলে স্থির করি তা করেই ছাড়ি।

জানি মহাশয়। আপনি আমাকে সুবিনয়বাবুর ঠিকানাটা দয়া করিয়া দিলে বাধিত হই।

আবার তাকে কেন?

বলিয়াছি তো, এই ঘটনার কুশীলবদিগকে আমি একটু দেখিতে চাই।

তা ভালো। তবে কোনও চাল চালবেন না কিন্তু।

মহাশয়, কূটনৈতিক চালে আমি আপনার সহিত আঁটিয়া উঠিব কীরূপে? আপনি বুদ্ধিতে, কর্মদক্ষতায় অধিকতর বলবান বলিয়াই অদ্য সমাজের উচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। আর আমি নিতান্তই অকিঞ্চন।

আপনি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু পারতেন। যাকগে, সুবিনয়ের ঠিকানা দিচ্ছি। দেখা করুন গিয়ে।

তিন

জয়নগরে গুরুচরণের প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম বাড়িটার সামনে গিয়ে যখন শাসন পৌঁছোল তখন সেই বাড়িকে বিয়েবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল বটে। হ্যাঁ, জম্পেশ ব্যাপার চলছে। বাড়ির চারদিকে উঁচু দেওয়াল। তবে মস্ত লোহার ফটক খোলা। তা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সামনের মাঠ জুড়ে পেল্লায় প্যান্ডেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠেলাগাড়ি করে মেলা চেয়ার-টেবিল আসছে। ভিতরে মেলা লোকজন। সকলেই ভারী ব্যস্ত।

ঢুকতে কোনও বাধা নেই দেখে শাসন ভিতরের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই একটি ছোকরা কোথা থেকে তার পাশে এসে হাঁটা ধরে বলল, ভিতরে যাচ্ছেন নাকি?

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়। কেন, কোনও বাধা আছে কি?

না, বাধা কিসের? কোথা থেকে আসছেন?

নিকটেই এক গ্রামে বাস করি। কেন মহাশয়?

আপনি কি সাধু ভাষায় কথা বলছেন নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে?

না মহাশয়। আমার পিতামহ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন। এমনকি আমার পিতামহীর সহিতও। আমার পিতা কথঞ্চিৎ তাহা বজায় রাখিয়াছিলেন। অধুনা কেহ সংস্কৃত অনুধাবন করিতে পারে না হেতু আমি সাধু ভাষায় কথা কহি। অপরাধ নিবেন না।

বাঃ, বেশ মজা তো।

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়। অনেকেই আমার বাক্যালাপ শুনিয়া কৌতুক অনুভব করে।

আপনি কি কাজে এসেছেন?

বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিবাহকার্যে সাহায্য করিয়া যদি কিছু জুটে সেই আশায় আসিয়াছি।

অন্য কোনও মতলব নেই তো?

আজ্ঞা না মহাশয়।

পিছন থেকে কে যেন হাঁক দিল, কে রে সঞ্জয়?

সঞ্জয় নামে ছেলেটি পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, এ এক মজার মাল কালোদা। সাধু ভাষায় কথা বলে।

অ্যাঁ! সাধু ভাষায়? শাসন ভট্টাচার্য নয় তো!

শাসন ফিরে তাকাল। কালো নামের লোকটি বেশ লম্বা। রং কালোই। বেশ মস্তান টাইপের চেহারা। এগিয়ে এসে পা ফাঁক করে শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রুর চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, এ যে বাস্তুঘুঘুটিই দেখছি!

শাসন একটু হেসে বলল, কালোবাবু, সর্বাঙ্গীণ কুশল তো!

হ্যাঁ কুশল। তা তুমি এখানে কী মনে করে ভশচায?

কেন মহাশয়, এইখানে কি সান্ধ্য আইন জারি হইয়াছে, নাকি আমি ব্রাত্যজন?

ওসব বোলো না ভশচায, আমার কাছে তো ডিকশনারি নেই যে অর্থ বুঝে নেবো। মতলবটা কী?

নিতান্তই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। কন্যাপক্ষের সহিত একটু বাক্যালাপ করিব।

কিসের বাক্যালাপ? মতলবটা খুলে বলো।

মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি কোনও চক্রান্ত করিতে আসি নাই।

সেটা বুঝব কী করে? তুমি বিটলে বামুন, পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি। তোমাকে রামচরণবাবু কাজে লাগায়নি তো!

না মহাশয়। তাহার সহিত পরিচয় নাই।

কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে যে আমার সন্দেহ হচ্ছে বাপু।

মহাশয়, আপনারা কি বিবাহবাটির প্রহরায় নিযুক্ত আছেন? কিন্তু আমি তো তস্কর নহি।

তস্কর নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা নেই। চোর ডাকাত এলে আমরা বরং পথ ছেড়ে দেবো। কিন্তু অন্য মতলবে এলে মুস্কিল হবে।

কিন্তু মহাশয়, এবাটির তো অবারিত দ্বার দেখিতেছি। বিস্তর মনুষ্য গমনাগমন করিতেছে।

তা করুক না। ওরা ডেকোরেটরের লোক আর আত্মীয়স্বজন।

শাসন একটু হাসল। তারপর গলা এক পর্দা নামিয়ে বলল, আমি গুরুচরণবাবুর অনুমতি লইয়াই অসিয়াছি।

তাই নাকি? তিনি তোমাকে পাঠালেন কেন?

কিছু উদ্দেশ্য আছে।

কী উদ্দেশ্য?

তাহা কহিবার অনুমতি নাই। তবে আমি মালিকাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন?

কালো বারকয়েক আপাদমস্তক তাকে দেখে নিয়ে বলল, বিটলে বামুন, সত্যি কথা বলছো তো!

অসত্য স্থানবিশেষে কহিতে হয়। আপৎকালীন ব্যবস্থা। মহাশয়, আমার দ্বারা আপনাদের কাজ বিঘ্নিত হইবে না।

মালিকার সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?

কহিলাম তো, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

শোনো ভশ্চায, তোমার মতো পিছল লোককে বিশ্বাস নেই। বহুৎ নটঘট তোমার জানা আছে। তবু গুরুবাবুর নাম বলছো বলে ছাড়ছি। হিমাদ্রিকে সঙ্গে দিচ্ছি, সে এ বাড়িরই ছেলের মতো। সে তোমাকে মালিকার কাছে নিয়ে যাবে। নইলে মালিকার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। রদ্দা খেয়ে ফিরে আসতে হবে।

মহাশয়, আপনি বড়ই উপকার করিলেন।

হিমাদ্রি নামে ছিপছিপে ফর্সা হাস্যমুখ ছেলেটি চোখের ইশারায় চলে এল।

যাও বামুন, কোনও গন্ডগোল কোরো না কিন্তু।

মহাশয়, নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভিতরে ঢোকার ব্যাপারে কোনও বাধা হলো না। বাড়িটি বিশাল, বিস্তর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা কাজে। সুতরাং তাদের কেউ আলাদা করে লক্ষ্য করল না। হিমাদ্রি বেশ পরিচিত ছেলে বলেই মনে হচ্ছিল শাসনের। দু-একজনের সঙ্গে একটু-আধটু নিয়মরক্ষার মতো কথাও কইল।

দোতলায় এসে দেখা গেল, এ মহল্লায় মেয়েদেরই বেশি আধিক্য। পুরুষ নামমাত্র। অনেকেই তাকাচ্ছে তাদের দিকে। দু-একজন হিমাদ্রিকে জিগ্যেস করল, কি রে, কী খবর?

বাড়ির দুটি মহল, সামনের সঙ্গে পিছনের মহলের যোগাযোগ দোতলায় একটা সরু ব্রিজের মাধ্যমে। এই সেতুটি একটি লম্বা সরু ঘরের মতোই।

পিছনের মহলে ভিড় কম। এটাই খাসমহল বলে মনে হচ্ছিল।

হিমাদ্রি হঠাৎ জিগ্যেস করল, আপনি মালিকাকে চেনেন তো!

না মহাশয়।

তবে কী বলে পরিচয় দেবো?

একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বলিলেই হইবে।

শেষে আমি বকুনি খাবো না তো!

আমি একজন উত্তম ব্যবস্থাপক। আপনি চিন্তিত হইবেন না।

একেবারে শেষের দিকে অনেক লম্বা বারান্দা আর দরদালান পেরিয়ে একখানা ঘরের বন্ধ দরজায় সামনে দাঁড়াল হিমাদ্রি। দরজায় টোকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর দরজা সামান্য ফাঁক করে একজন সুন্দরী যুবতী উঁকি দিয়ে বলল, কি রে, কী চাস?

মালিকার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের কী দরকার।

যুবতীটি সন্দেহাকুল চোখে শাসনের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রসন্ন মুখে বলে উঠল, আরে ঠাকুরমশাই!

আজ্ঞা হাঁ।

আপনি এখানে!

গুরুতর প্রয়োজনে আসিয়াছি।

মালিকার সঙ্গে দেখা করবেন?

আজ্ঞা হাঁ।

একটু দাঁড়ান। পোশাক পাল্টাচ্ছে। আমাকে মনে আছে তো!

আছে। আপনার নাম বুলা। বটকৃষ্ণপুরের ঘটকমহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

উঃ, আপনার মনেও থাকে!

থাকিবে না? আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছি, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়নও আমারই পৌরোহিত্যে হইয়াছিল।

আসুন, হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি দরজা থেকেই বিদায় নিল। শাসন ঢুকে দেখল বেশ বড় একটি ঘর। মহার্ঘ সব আসবাবে সাজানো। পুরনো আমলের উঁচু মকরমুখী পালঙ্ক, আধুনিক দামি কাঠের আলমারি, একধারে সোফাসেটও আছে। টিভি, ভিসিআর, মিউজিক সিস্টেম কোনও কিছুর অভাব নেই।

মালিকাকে যতটা কুচ্ছিত বলে অনুমান হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই নয়। মালিকার গায়ের রং ফর্সা, মুখটি ঢলঢলে। তবে গায়ে কিছু অতিরিক্ত চর্বি আছে। একটু ব্যায়াম বা জগিং করলেই সেটা ঝরে যেতে পারে বলে শাসনের মনে হলো। মালিকার মুখশ্রীতেও কোনও উগ্র ভাব নেই, বরং নম্রতা আছে। সোফায় বসেছিল, তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

বুলা বলল, ইনি ঠাকুরমশাই। আমাদের খুব চেনা। সাধু ভাষায় কথা বলেন কিন্তু।

ও। বলে চুপ করে রইল মালিকা। তারপর বলল, বসুন। চা খাবেন তো!

না মহাশয়া, আমার অভ্যাস নাই। আগে খাইতাম, ছাড়িয়া দিয়াছি।

অন্তত মিষ্টিমুখ তো করবেন। ব্রাহ্মণ মানুষ।

শাসন মুগ্ধ হলো। মেয়েটি অভিজাত পরিবারেরই বটে। শুধু বড়লোক হলেই তো হয় না।

মহাশয়া, আমি অসময়ে আহার করি না। ব্রাহ্মণদিগের সংযম পালন করিতে হয়।

শুধুমুখে চলে যাবেন?

আপনি সৌজন্য লইয়া ব্যস্ত হইবেন না। আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট আসিয়াছি। কথাটি গোপন।

আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি। বলে বুলা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

এবার বলুন।

আপনি কি এই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক?

না। কিন্তু বাধ্য হয়ে করছি।

অভিসারবাবু এই বিবাহে অতিশয় আগ্রহী।

ওরা লোভী। অনেক টাকাও পাচ্ছে তো। বাবা ওদের কিনে ফেলেছে। শুনেছি নগদ দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার। দানসামগ্রীও অনেক।

সুবিনয়বাবুর সহিত বিবাহ হইলেও কি এরূপই দেওয়া হইত?

মালিকার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। চোখ নত করে মাথা নেড়ে বলল, সে ওসব নিতই না।

মহাশয়া, আগামীকল্য আপনার বিবাহ। আপনি কি জ্ঞাত আছেন যে, এই বিবাহে কিছু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা?

শুনেছি। কাকা বিয়েটা হতে দেবেন না।

আপনি এ ব্যাপারে কিছু ভাবিয়াছেন কি?

কী ভাবব?

আপনার পিতাঠাকুরও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে হয় আপনার খুল্লতাতকে টেক্কা দিবার জন্য তিনি ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করিবেন।

তাই নাকি?

শাসন হাসল। বলল, আপনার খুল্লতাত বাইরে পাহারা বসাইয়াছেন, অভিসারবাবুকেও আসিতে বাধা দিবেন। কিন্তু এসকলই গুরুচরণবাবু অনুমান করিতে পারিবেন।

আমি তো কিছু জানি না।

আপনি জানিবেন কেন? কেহই জানে না। আমিও জ্ঞাত নহি, তবে আমার ইহাই অনুমান। আপনার খুল্লতাত বুদ্ধিমান বটেন, কিন্তু গুরুচরণবাবুর কথা যতদূর শুনিয়াছি, তিনি আরও বুদ্ধিমান। আপনি কি এই বিবাহে ইচ্ছুক?

আমার আর কিছু যায় আসে না।

কেন মহাশয়া, আপনি এত হতাশ কেন?

আর কী হবে বলুন! আমার জীবনটা তো অন্ধকারই হয়ে গেছে।

মহাশয়া, নিরাশ হইবেন না। তবে অদ্য রজনী আপনার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তার মানে?

শাসন হাসল। বলল, অধিক বলিতে পারি না। তবে এই সকল উদ্যোগ আয়োজন সকলই বহ্বাস্ফোট বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার অন্তরালে অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। আপনাকে সতর্ক ও তৎপর থাকিতে কহিব। বুলা আপনার কে হয়?

মাসতুতো বোন।

আমি বিদায় হইতেছি। সময়কালে সংবাদ পাইবেন।

কিসের সংবাদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝিবেন।

শাসন উঠল। দরজার বাইরে বুলার সঙ্গে কিছু কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

হাঁটতে হাঁটতে সে পুবদিকে খানিকটা এসে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকল। কয়েকখানা বাড়ির পরই একটা জীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়ল।

যে দরজা খুলল সে লম্বা, সুপুরুষ এবং মুখে একটি গভীর ভাবনাচিন্তা আর বিষণ্ণতার ছাপ আছে।

মহাশয়, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। অধমের নাম শাসন ভট্টাচার্য। আপনি কি সুবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি শাসন ভট্টাচার্য! আপনার কথা আমি শুনেছি। আসুন, ভিতরে আসুন।

সামনের ঘরখানা বেশ বড়। বইপত্রে ঠাসা।

মহাশয় খুবই অধ্যয়নপ্রিয় দেখিতেছি?

হ্যাঁ, পড়াশুনো নিয়েই আমার সময় কাটে।

ভালো মহাশয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি।

আমি আপনার কথা অনেকের কাছে শুনেছি। আপনি বিজ্ঞ মানুষ।

না মহাশয়, আমি কুলাঙ্গার। আমাদের বংশে কিছু অধ্যয়নের অভ্যাস ছিল।

আমার খুব সংস্কৃত শেখার ইচ্ছে। আপনি শেখাতে পারবেন?

আপত্তি কি মহাশয়! শিখিবেন। যৎসামান্যই জানি। তাহাই শিখাইতে পারি।

ওতেই হবে। আপনি কম জানা মানুষ নন।

শাসন হাসল। বলল, সংস্কৃতের বিকল্প নাই। ভারতের রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতেরই হইবার কথা। কাহাকে বলিবেন, কেহই আজিকালি প্রকৃত চিন্তাশীল নহে।

ঠিকই বলেছেন।

অদ্য আপনার নিকটে বিশেষ কারণে আসিয়াছি।

বলুন।

মালিকাদেবীর প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ তাহা অকপটে আমাকে বলুন।

হঠাৎ একথা কেন?

বিশেষ প্রয়োজন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবিনয় একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি প্রশ্নটা করছেন বুঝতে পারছি। আমার লুকোবার কিছু নেই। মালিকা আমাকে ভালোবাসত। প্রথম দিকে আমি তাকে অ্যাভয়েড করতাম। বড়লোকের মেয়ে তো, বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে কী হবে। তাছাড়া ওর প্রতি আমি আকর্ষণও বোধ করতাম না। কিন্তু মেয়েটা বড্ড ভালো। এত ভালোবাসা আর নম্রতা দেখে আমারও ওকে খুব ভালো লাগতে লাগল। কিন্তু কী হবে বলুন, ওর বাবার তো ভীষণ আপত্তি।

মহাশয় রাখ-ঢাক না করিয়া বলি, মালিকাদেবীর জীবনে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা আছে, আপনি তাহা জানেন কি?

ওপর-নিচে মাথা নেড়ে সুবিনয় চাপা গলায় বলল, জানি। এটা ও ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছিল বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে। এর জন্যও মূলত আমিই দায়ী।

আপনি কি সেজন্য তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন?

শাসনবাবু, শরীরের কোনও পাপ হয় না, পাপ হয় মনের। তার মন তো পরপুরুষে আসক্ত হয়নি। আমি তাকে জানি।

শাসন হাতজোড় করে বলল, মহাশয়, বয়সে আপনি কনিষ্ঠ না হইলে আপনাকে আজ আমি প্রণাম করিতাম। এই সত্যজ্ঞান কয়জনের থাকে? আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরও এই কথাই বলিয়াছেন। আপনার কথায় তাহার প্রতিধ্বনি পাইয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম।

অত প্রশংসা করলে লজ্জা পাবো।

মহাশয়, মালিকাদেবীর প্রতি আপনি কি অদ্যপি আসক্ত?

হ্যাঁ শাসনবাবু। সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কী? তবে আগামীকাল তার বিয়ে। তার কথা ভুলবার চেষ্টা করছি।

শুনিয়াছি গুরুচরণবাবু আপনাকে প্রহার বা হত্যা করিবার জন্য গুণ্ডা লাগাইয়াছিলেন।

হ্যাঁ, সেসব ইতিহাস। আমি সেই স্মৃতিও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

আপনার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন না। কিন্তু মহাশয়, আপনাকে এইবার কিছু তৎপর হইতে হইবে।

কেন বলুন তো!

প্রয়োজন আছে। আর একটি গুরুতর কথা।

বলুন।

মালিকাদেবী বিবাহের পর আমেরিকা যাইবেন।

জানি।

আপনার সঙ্গে যদি তাঁহার বিবাহ হইত তবে কি আপনি তাঁহার সহিত আমেরিকা যাইতেন?

সুবিনয়ের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। একুট তপ্ত গলায় সে বলল, কখনোই নয়। আমেরিকায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একটা কথা শুনে রাখুন। মালিকাও স্বেচ্ছায় যাচ্ছে না। ওকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। তবে মালিকার এখন যা মনের অবস্থা তাতে ওর বিদেশে যাওয়াই ভালো। হয়তো অন্যরকম পরিবেশে ভালোই থাকবে।

বুঝিতেছি আপনি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

স্নেহ! তাই হবে। আমি মালিকার ভালো চাই। বেচারা বড্ড মানসিক কষ্ট পাচ্ছে। আমারও তাই মনটা ভালো নেই। ভাবছি কোথাও বেরিয়ে পড়ব, দু-চার দিন ঘুরে-টুরে আসব। কেন যে মেয়েটা আমাকে ভালোবাসল কে জানে!

মহাশয়, স্নেহের সহিত দুঃখও অঙ্গাঙ্গী। যেখানে স্নেহ সেখানেই উদ্বেগ, বিরহ, শঙ্কা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মালিকাদেবীর সহিত আমেরিকায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা আপনার ছিল না?

এবার সুবিনয় হেসে বলল, না মশাই, না। আমি গরিব দেশের গরিব মানুষ, আমেরিকায় গিয়ে কী হবে? এদেশেই কত কী করার আছে। আর যদি যেতেই হয় তাহলে নিজের জোরেই যাবো, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবো কেন? আমার কি আত্মমর্যাদা নেই?

সবিশেষ আছে। এখন প্রশ্ন, যেসব গুণ্ডা আপনাকে প্রহার করিয়াছিল তাহারা ধৃত হইয়াছিল কি?

না। তারা প্রফেশনাল গুণ্ডা। রাতে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। ওই মোড়ের মাথায় রড-ফড দিয়ে অ্যাটাক করেছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। তাদের চোখেও দেখিনি।

প্রহারের ফলে কি ভয় পাইয়া পিছাইয়া গিয়াছেন?

ভয়-টয় আমি বিশেষ পাই না। গুরুচরণবাবু এতটাই বা করতে গেলেন কেন তাও বুঝতে পারি না। আমি তাঁর মেয়েকে নিয়ে তো পালিয়ে যেতাম না। হয়তো তাঁদের অমতে বিয়ে করতাম, সেটা তেমন কিছু

অপরাধ তো হতো না। আমরা ওদের সবর্ণ, কোনও দিক দিয়েই বাধা ছিল না। মস্ত বাধা একটিই, ওরা বড়লোক, আমি গরিব।

মহাশয়, এক্ষণে আমাকে উঠিতে হইতেছে। নানা দিক সামাল দিতে হইবে। এক ব্যক্তি চাতকপক্ষীর ন্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অদ্য রাত্রিটি বড় সুবিধার হইবে না। দয়া করিয়া আমার জন্য নিজগৃহেই অপেক্ষা করিবেন। যখনই হউক আমি আসিব।

কেন বলুন তো! কী হবে?

তাহা পরে জানিতে পারিবেন। আমার আর সময় নাই।

শাসন বেরিয়ে এল। বেলা প্রায় দেড়টা বাজে। সে অভুক্ত। তবে খাওয়ার অনিয়ম তার বহুদিনের। একটি টেলিফোন বুথে এসে সে অভিসারের বাড়িতে ফোন করল। অভিসার ফোন ধরতে বলল, মহাশয়, সংবাদ কী?

সংবাদ! সে তো আপনি দেবেন।

আমিও দিব। আপনার দিকের কোনও সংবাদ আছে কি?

না না! কিছু নেই।

রামচরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি।

একটু চুপ করে থেকে অভিসার সতর্ক গলায় বলল, তিনি কী বললেন?

পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিক নহে। তিনি এই বিবাহ হইতে দিবেন না।

ও।

এবার মহাশয় কী করিবেন?

আপনি আর কিছু বলবেন?

বলিব।

বলুন।

মালিকাদেবী যে একজনের প্রতি প্রণয়াসক্তা তাহা কি আপনি জানেন?

প্রণয়াসক্তা? সে কে? যার সন্তান—

না মহাশয়, ইনি সেরূপ নীচাশয় নহেন। ভদ্রলোক।

না, আমি ব্যাপারটা জানি না।

এখন তো জানিলেন।

হুঁ।

কী করিবেন?

এখন এসব জেনেই বা লাভ কি? হাড়িকাঠে গলা তো দিয়ে ফেলেছি।

তাহাই কি মহাশয়? ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

মেয়েটা কার প্রেমে পড়েছে?

সুবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শিক্ষক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তবে ধনী নহেন।

এসব তো আর গুরুচরণবাবু আমাদের জানাননি।

তিনি কি কন্যার কলঙ্কের কথাও আপনাদের জানাইয়াছেন?

না, তাও জানাননি।

মহাশয়, আপনারা কি বিবাহে পণ লইতেছেন?

না, অন্তত আমি জানি না।

শুনিতেছি, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনি শোনেন নাই?

না। কানাঘুষো শুনেছি যে, ওঁরা নাকি বউভাতের খরচ দেবেন।

তাহাই কি দেওয়ার নিয়ম?

ওসব কথা থাক। আমি বাবার হুকুমে বিয়ে করছি।

বিবাহ কোথায় হইবে?

কেন, গুরুচরণবাবুর জয়নগরের বাড়িতে।

আমি আপনাকে জয়নগর হইতেই টেলিফোন করিতেছি। সত্য বটে, গুরুচরণবাবুর বাড়িতে জাঁকাল রকমের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু বিবাহটা কোথায় হইবে মহাশয়?

এ কথার মানে কি?

তা আমিও অবগত নহি। তবে অনুমান করি, বিপদের আশঙ্কায় বিবাহের স্থান পরিবর্তন হইতে পারে। তারিখও বদলাইতে পারে।

সেসব আমি তো জানি না।

মহাশয়, আপনি এই ক্ষণেই জয়নগর আসুন।

কেন?

বিশেষ প্রয়োজন।

পাগল নাকি? আমাকে মা বেরোতে দিচ্ছে না।

কী কারণে মহাশয়?

বলছেন যে বিয়ের আগে কোনওরকম কাটাছেঁড়া হতে নেই। খুব সাবধানে থাকতে হয়।

অতি সত্য কথা। ধর্মীয় কার্যে ক্ষত বিঘ্নকারক।

তাই বেরোচ্ছি না।

অন্য কারণ নাই?

আর কী কারণ থাকবে?

মহাশয়, কারণ লইয়া আর প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা নাই। এখন অন্য প্রশ্ন।

বলুন।

যে স্ত্রীলোক অন্যের প্রতি আসক্তা তাহাকে লইয়া ঘর করিবেন কি প্রকারে?

সে যে অন্য কাউকে ভালোবাসে তা তো আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। এখন এ বিষয়ে কি করা যাবে বুঝতে পারছি না। আমি মালিকার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব কি?

বলিয়া লাভ কি হইবে? মালিকাদেবী স্বীকার করিবেন।

বিয়েটা খুব ভুল হয়ে গেল হয়তো।

মহাশয় কি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন?

করলাম।

এরূপ দীর্ঘশ্বাস সারা জীবনে আরও কত ত্যাগ করিতে হইবে তাহা অবগত আছেন কি?

না শাসনবাবু। তবে ভাবছি বিয়ে করাটা বোধহয় ভুলই হল। কিন্তু কি আর করা।

মহাশয়, আপনি আর রামচরণবাবুর পরিকল্পনা বা বক্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু গত রাত্রিতে এই সামান্য তথ্যের জন্য আমাকে পাঁচশত টাকা বাটি যাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। আপনার কৌতূহল কি নিবৃত্ত হইয়াছে?

টাকার কথাটা তুলছেন কেন? ওটা আপনার দক্ষিণা। তবে হ্যাঁ শাসনবাবু, রামচরণবাবুর বক্তব্য নিয়ে আমার আর কৌতূহল নেই।

কেন মহাশয়?

ভাবছি, আমার ভাবী শ্বশুরমশাই যা করার করবেন, আমি ভেবে মরি কেন?

পত্রের কথা কি তিনি জানেন?

না। তবে রামবাবু তাঁর বক্তব্য গোপন রাখেননি।

আচ্ছা মহাশয়, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে।

বিয়ের পর একদিন আসবেন।

আসিব মহাশয়। ব্রাহ্মণ ফলারের আমন্ত্রণ পাইলেই দৌড়ায়।

ফোন রেখে শাসন একটু হাসল।

বেলা তিনটের সময় গুরুচরণবাবুর বাড়ির দক্ষিণের চৌপাথিতে শাসন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আচমকাই মুকুন্দ আর সাজু এসে উদয় হলো।

ঠাকুরমশাই, এসে গেছি।

উত্তম। এক্ষণে আমার সহিত আইস।

গুরুচরণবাবুর বাড়ির সামনের প্রান্তরে ঢুকে শাসন বলল, তোমরা অদ্য মদ্যপান কর নাই তো!

না ঠাকুরমশাই, আমার সন্ধের আগে খাই না।

ভালো। আইস।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি বাগান। মেলা গাছপালার সমারোহ। শাসন একটি নির্দিষ্ট গাছের নিচে অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গী দুইজনও চুপ।

বেশ কিছুক্ষণ পর বুলা এল। তার মুখে উত্তেজনা।

ঠাকুরমশাই!

কী সংবাদ বুলা?

ও পিছন দিকে জায়গা মতো অপেক্ষা করছে।

ভালো। চলো, এইবার যাওয়া যাউক।

বাড়ির পিছনে একটা পুকুর। পুকুরের এক কোণে ছোটো একটা লাকড়ির ঘর। এখন খালিই পড়ে থাকে। ঘরের মধ্যে মালিকা অপেক্ষা করছিল। চোখে ভয়, মুখে দুশ্চিন্তা। শাসনকে দেখেই বলে উঠল, কী হচ্ছে ঠাকুরমশাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝিবেন। শঙ্কা করিবেন না। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

বাবা টের পেলে যে কুরুক্ষেত্র করবেন।

মহাশয়া, আপনার পিতাঠাকুরকে লইয়া চিন্তা করিবেন না। সময় আসিলে তিনি সকলই বুঝিবেন।

কিন্তু আমি এখন কী করব? বাবা যে বলে গেছে বিকেল পাঁচটার সময় আমরা কালীঘাটে পুজো দিতে যাবো!

বটে মহাশয়া? কালীঘাট! তবে তো আমার অনুমান মিলিয়া যাইতেছে।

কী বলছেন?

আমি কহিতেছি, আপনার পিতাঠাকুর অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বুদ্ধিতে আঁটিয়া উঠা কঠিন।

এখনই যে বাড়িতে আমার খোঁজ হবে!

মহাশয়া, আপনাকে অধিকক্ষণ আটকাইব না। তবে আপনার নিকট একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

বলুন।

যদি ঘটনাক্রমে এই বিবাহ না হয় তাহা হইলে আপনি কি সন্তুষ্ট হইবেন?

বলেছি তো, আমার আর ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিছু নেই। সবসময়ে আমার মনে হয় আমি মরে গেছি। শুধু মরা একটা দেহ চলেফিরে বেড়াচ্ছে। কত পাপ যে করেছি তার ঠিক নেই। মাথাটাই আমার গোলমাল হয়ে গেছে।

হাঁ মহাশয়া, ব্যক্তিত্ববান ও স্বাধিকারপ্রমত্ত পিতার অধীনে সন্তানদিগের কিছু ক্লেশ হইয়া থাকে। বিশেষ যদি পিতা বিবেচক না হন।

এখন কী করতে হবে ঠাকুরমশাই?

কহিতেছি। অগ্রে কহুন, সুবিনয়বাবুর প্রতি আপনার মনোভাব এখন কীরূপ?

আবার তার কথা কেন?

তাঁহার কথাই আজ গুরুতর। লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্পষ্টভাবে মনোভাব ব্যক্ত করুন।

বিষণ্ণ মুখে মালিকা বলল, তার প্রতি আমার মনোভাব তো কখনও বদলায়নি। তাকে আমি আজও ভালোবাসি। তার জন্যই জীবনটা নষ্ট করেছি বটে, তবু তাকেই ভালোবাসি।

আর কহিতে হইবে না। বুঝিয়াছি।

এখন কি আমি যেতে পারি?

হাঁ মহাশয়া। আপনার মনোভাবটি জানা অতি গুরুতর ছিল। এইক্ষণে আপনি যাইতে পারেন।

যেতে গিয়েও মালিকা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি কি কিছু করতে চাইছেন?

মহাশয়া, আমরা নিমিত্ত মাত্র। ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝিয়া স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগে কার্য করিয়া থাকি। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

আসছি ঠাকুরমশাই।

মহাশয়া, জীবনের অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। অনুরাগের মূল্য দিতে গিয়া সতীত্বকেও পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। প্রণয় অতি আশ্চর্য বস্তু। আমি কহি কি, মহাশয়া, জীবনে আর একবার মাত্র আমার বাক্য মান্য করিয়া একটি বিপজ্জনক কাজ করিবেন কি?

মালিকা অবাক হয়ে বলে, কী?

মহাশয়া, আমার বাসস্থান খুব দূরবর্তী নহে। আমার বিশ্বস্ত দুই বান্ধব উপস্থিত। বাহিরে, আপনাদিকের বাটির পশ্চাদ্ভাগে একটি দীন শকটও প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি কহি কি আপনি কিছু কালের জন্য আমার বাসস্থানে অবস্থান করুন। আপনি স্থানান্তরিত না হইলে অদ্যই আপনার বিবাহ অভিসারবাবুর সহিত সম্পন্ন হইবে।

কী বলছেন ঠাকুরমশাই?

মহাশয়া, আপনি ইহজীবনে সকল আশা ভরসা বিসর্জন দিয়াছেন। আপনি নিজেই কহিলেন যে আপনি আপনার মৃতদেহ বহন করিয়া চলিতেছেন। ঘটনাপ্রবাহ আপনাকে আর স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা জীবনের ধর্ম নহে। বাঁচিয়া থাকিলে বাঁচিবার শর্তগুলিও পূরণ করিতে হয়। মৃতবৎ জীবিত থাকা অর্থহীন। যদি এরূপ ঘটিতে দিই তাহা হইলে আমাদেরও পাতক হইবে। মহাশয়া, আপনি দুঃসাহসে ভর করিয়া আমার পরামর্শমতো কার্য করুন। দেখা যাউক, মৃতদেহে প্রাণের স্পর্শ ফিরিয়া আসে কিনা।

আপনার বাড়িতে কতদিন থাকতে হবে?

মহাশয়া, আমার অনুমান আপনার অবস্থান স্বল্পকালের জন্যই হইবে। চিন্তা করিবেন না, বুলা আপনার সঙ্গেই যাইবে। উহার বাড়িতে আমি সংবাদ দিয়া রাখিয়াছি।

মালিকা সামান্য একটু দ্বিধা করে হঠাৎ চোখ তুলে বলল, আমার আপনাকে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। জানি না শেষ অবধি কী হবে। ঠিক আছে, যাচ্ছি।

বাহিরে আমার এক যজমানের শকট প্রস্তুত। সঙ্গীরাও আমার বিশেষ বিশ্বস্ত। উদ্বিগ্ন হইবেন না। নিরাপদেই যাইতে পারিবেন। ইহারা প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিবে। আর কালক্ষেপ করিবেন না, অগ্রসর হউন।

মালিকা চলে যাওয়ার পর বুলা বলল, আমিও যাই?

সাজু আর মুকুন্দ পেছনের ফটক খুলে ফেলল। এদিকেও কাজের লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু তারা নিতান্তই কাজের লোক, ঘটনার তাৎপর্য বোঝার মতো কেউ নয়। কাজেই কোনও বাধা হলো না।

শাসন তাদের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বাইরে একটি অ্যামবাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিনা ভূমিকায় কুশীলবরা তাতে উঠে পড়ল এবং গাড়িটি বেরিয়ে গেল।

শাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফটকটা বন্ধ করে ফিরে এল ভিতরে। মালিকাকে সরিয়ে দিলেই কাজ শেষ হবে না। গুরুচরণ অত সহজ মানুষ নয়।

শাসন জানে, অভিসার ছেলে খারাপ নয়। কিন্তু মালিকাকে বিয়ে করছে নিতান্তই লোভে পড়ে। শাসনের সন্দেহ মালিকার কলঙ্কের কথা অভিসারের মা-বাবাও জানেন। কিন্তু নিতান্তই টাকার স্রোতে তাঁদের ভাসিয়ে দিয়েছে গুরুচরণ। টাকার জোরে বিয়েটা দিতে পারলেও অভিসারের সঙ্গে মালিকার ভাবী দাম্পত্য জীবনের পরিণতি ভালো না-হওয়ারই কথা। নানা কূট সন্দেহ, ঘৃণা, অবিশ্বাস দুজনকেই বিষাক্ত করে দেবে।

শাসন চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগল।

শাসন একটু অপেক্ষা করে বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে একটু খোঁজ করে গুরুচরণবাবুর ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তের ঘর। মস্ত ভারী শালকাঠের দরজা। সামনে একজন দারোয়ান টুলে বসে আছে।

কাকে চাই?

গুরুচরণবাবুকে।

উনি জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। এখনই বেরিয়ে যাবেন। দেখা হবে না।

আমার প্রয়োজনটিও গুরুতর।

কাল সকালে আসবেন। বাবুর মানা আছে, আজ কারও সঙ্গে দেখা হবে না।

আমার নাম শাসন ভট্টাচার্য। ভিতরে গিয়া আমার নামটি বলুন, তিনি বুঝিবেন।

কোথা থেকে আসছেন?

নিকটস্থ একটি গ্রাম হইতে। মহাশয়, বিলম্ব করিবেন না।

ঠিক আছে। দাঁড়ান।

এই বলে ভেজানো দরজা ঠেলে লোকটা যখন ভিতরে ঢুকেছে তখন শাসনও তার পিছু পিছু ঢুকে পড়ল। ''আরে! আরে! করেন কি?'' বলে দারোয়ান একটু বাধা দিতে চেষ্টা করল। শাসন তাকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে গুরুচরণবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াল।

সামনের মস্ত টেবিলের ওপাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে গুরুচরণ বসে আছে। রামচরণের সঙ্গে মুখের আদলে মিল থাকলেও অনেক ব্যাপারে দুজনে আলাদা। রামচরণের মতো শরীরের মজবুত বাঁধন গুরুচরণের নয়। গোঁফ নেই, বরং মাথায় টাকের আভাস আছে। কিন্তু গুরুচরণের মুখেও একটি কঠিন ও নির্মম মনোভাবের ছাপ আছে, যা দেখে বোঝা যায় এ যা করতে চায় তা না করে ছাড়ে না।

আর গুরুচরণের টেবিল ঘিরে কয়েখানা চেয়ারে যে সাতজন লোক বসে আছে তাদের চেহারা দেখলেই আর পরিচয়ের দরকার হয় না। অতি উচ্চশ্রেণীর পেশাদার গুণ্ডা এবং খুনী ছাড়া ওরকম তীব্র চোখ দেখা

যায় না।

মোট আটজোড়া জ্বলন্ত চোখ তার দিকে নিবদ্ধ দেখেও শাসন খুবই বিনীত হাসিমুখে গুরুচরণবাবুকে বলল, অভিবাদন গ্রহণ করুন মহাশয়।

আপনি কে?

দারোয়ানটা কাঁইমাই করে বলে উঠল, শাসন না কী যেন নাম বাবু, ঠেলে ঢুকে পড়ল।

দারোয়ানের দিকে হাত নেড়ে গুরুচরণ বলল, তুমি যাও।

দারোয়ান চলে যাওয়ার পর গুরুচরণ ভ্রূ কুঁচকে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বল, শাসন আপনার নাম?

হাঁ মহাশয়।

কে একজন পুরুত সাধু ভাষায় কথা বলে শুনেছি। আপিনই সে?

আজ্ঞা হাঁ।

তা এখানে হঠাৎ কী দরকার?

কথাটি প্রকাশ্যে বলা যাইবে না।

গোপনে বলতে চান? কিন্তু আর তো এখন সময় হবে না। আমি জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এখনই বেরিয়ে যাবো। আপনি দু-তিন দিন পরে আসুন।

তখন আর বলিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

কী এমন কথা! সাহায্য-টাহায্য চান নাকি?

হাঁ মহাশয়।

কিসের সাহায্য? কন্যাদায়?

না মহাশয়, আমার সন্তানাদি হয় নাই।

তবে কি চান?

ব্রাহ্মণকে একটি বাক্য প্রদান করিবেন কি?

কিসের বাক্য?

আপনার কন্যার বিবাহটি স্থগিত রাখুন। স্থির ও শীতল মস্তিষ্কে আরও একটু বিবেচনা করুন, তাহার পর দিবেন।

অসম্ভব। বিয়ে কালই হবে। আপনি আসতে পারেন।

গুরুচরণের গলার থমথমে ভাবটা কানে লাগল শাসনের। সে সাতজন গুণ্ডার দিকে নির্দেশ করে বলল, মহাশয়, এই ভদ্রমহোদয়গণকে কী উদ্দেশ্যে আনাইয়াছেন?

তার কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে নাকি? শুনুন মশাই, আপনার উপদেশ শোনার মতো সময় আমার নেই। এবার বিদেয় হোন।

যথা আজ্ঞা মহাশয়। যাইতেছি। যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই, আপনার কন্যার বিবাহ আগামী কল্য নহে, আপনি আজই দিতেছেন।

চমকে উঠে গুরুচরণ বলল, কে বলেছে?

আমার চরের অভাব নাই। আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি। মহাশয়, বাইরে রামচরণবাবুর গুণ্ডারাও মোতায়েন রহিয়াছে। তাহাদের সংবাদটা দিব কি?

গুরুচরণের মুখ হঠাৎ রক্তিমবর্গ ধারণ করল। প্রায় চিৎকার করে উঠে সে বলল, এত বড় সাহস! আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকেই থ্রেট করা হচ্ছে?

সাতজন লোকের মধ্যে দুজন হঠাৎ উঠে এসে দুদিক থেকে শাসনের দুটো হাত ধরে ফেলল। একজন বলল, মালটি কে গুরুচরণবাবু?

একজন পুরুত বলে শুনেছি। মহা পাজি লোক।

গুণ্ডাদের একজন তার ঘাড়টা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী পুরুতঠাকুর, কী করবে বললে!

শাসন হঠাৎ দুই হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল, মহাশয়গণ, আমাকে ছাড়িয়া দিন...ছাড়িয়া দিন...

দুই গুণ্ডার একজন একটা ঘুঁষি তুলেছিল, কিন্তু আর একজন টপ করে উঠে এসে ঘুঁষিটা আটকে বলল, চিতু, ছেড়ে দে, আমি দেখছি।

চিতু নামের গুণ্ডাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, বিচিত্র জীব!

সতু, তুইও ছেড়ে দে।

দ্বিতীয় গুণ্ডাও শাসনের হাত ছেড়ে দিল।

তিন নম্বর গুণ্ডাটি দানবাকৃতি। ছ'ফুটের ওপর লম্বা এবং মেদহীন পেশীবহুল চেহারা। বাঁ ভ্রূর ওপর সন্দেহজনক একটা কাটা দাগ আছে। চোখে খুনীর শীতল দৃষ্টি। সে গুরুচরণের দিকে চেয়ে বলল, এর ব্যবস্থা আমি করছি। আপনারা কথা চালিয়ে যান।

গুরুচরণ বলল, লোকটাকে ছেড়ে দিও না সুভাষ। ও বোধহয় আমার ভাইয়ের টাকা খেয়ে এখানে ওকালতি করতে এসেছে।

ঠিক আছে, দেখছি।

ঘরের বাইরে এসে ভ্রূ কুঁচকে সুভাষ বলল, চিনতে পারছেন?

না মহাশয়। আপনি কে?

চলুন, একটু তফাতে গিয়ে বলছি।

বারান্দা থেকে নেমে মাঠের এক ধারটায় দাঁড়িয়ে সুভাষ বলল, আপনার গাটস সেই আগের মতোই আছে দেখছি।

শাসন করুণ হেসে বলল, চতুর্দিকে সকল অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিবার মতো শক্তি আমার নাই। শুদ্ধমাত্র অকুতোভয় হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তাহাতে কাজ কতদূর হয় বলিতে পারি না, বিড়ম্বনা বিস্তর জুটিয়া যায়। মহাশয়, আপনার পরিচয় তো দেন নাই?

দশ বছর আগের আমাকে হয়তো চিনতে পারছেন না। তখন আমার বয়স ছিল আঠারো-উনিশ। আপনি আমার বাবার কুলগুরু। বছরে একবার আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাবা আর মা আপনার পা ধুইয়ে দিতেন, সিধে দিতেন। আমার বাবার নাম পরিতোষ মিত্র।

শাসন হাসল, পটুয়াটোলার পরিতোষবাবু তো! তোমার নাম কচি নহে কি?

হ্যাঁ, আমি কচি। যখন আপনি আমাদের কুলগুরু ছিলেন তখন আপনাকে আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। আপনার প্রতি ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখে নিজের বাবা-মায়ের ওপরও আমার রাগ হতো। তারপর আপনি নিজেই ঠাকুরের শিষ্যত্ব নিয়ে গুরুগিরি ছেড়ে দেন।

অবশ্যই। আমার জীবনে একটি শুভ পরিবর্তন আসিয়াছিল। তোমার পিতা-মাতাকেও আমি পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনামে দীক্ষিত করি।

হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, আমি জানি। আমার মা-বাবা ধার্মিক, কিন্তু আমি তত ধার্মিক হতে পারিনি।

বুঝিতেছি। তুমি কি পেশাগতভাবেই কুকার্য করিয়া থাক?

হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। পাপ কিছু কমও করিনি। সে কথা থাক। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোলে পড়ে গেছেন। কী ব্যাপার?

বিস্তারিত কহিবার সময় নাই। তবে বাপু, আমি ইচ্ছা করিয়াই একটু শোরগোল তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম একা হাঙ্গামা বাধাইয়া সকলকে অন্যমনস্ক করিব। নহিলে ঘোর বিপদ।

আপনি কী চাইছেন একটু বলুন তো!

আমাকে সাহায্য করিবে?

কেন করব না? বলুন না।

তাহা হইলে আমাকে প্রহার করিতে থাকো যাবৎ আমি মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া না যাই।

প্রহার! ঠাকুরমশাই, আমার হাত যে লোহার মতো শক্ত। এ হাতের মার খেলে মজবুত মানুষও হাসপাতালে যায়। তাছাড়া আপনার গায়ে কি হাত তুলতে পারি! পাপী হলেও এতদূর নিচে নামিনি।

মূর্খ আর কাহাকে বলে! আসল প্রহার করিতে বলি নাই, নকল প্রহারও তো করিতে পার!

কচি একটু হেসে বলল, ঠাকুরমশাই, এসব ব্যাপার আপনার চেয়ে আমি অনেক ভালো বুঝি। আপনি একটা ডাইভারশান চান তো!

অবশ্যই।

তার জন্য আপনাকে মারধর করার দরকার নেই। অন্য উপায় আছে।

কী উপায়?

আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।

কচি খুব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল এবং ঠিক দু'মিনিট বাদে ফিরে এল। বলল, চলুন ঠাকুরমশাই, গুরুচরণবাবুকে কথা দিয়েছি আপনকে ছেড়ে দেবো না। চলুন, ও ঘরেই চলুন।

কিছু ঘটিবে?

অবশ্যই ঘটবে। পাঁচ মিনিট সময় দিন।

কচি শাসনকে নিয়ে ফের গুরুচরণের ঘরে এসে ঢুকল। গুরুচরণকে বলল, না, এঁর সঙ্গে রামচরণবাবুর সম্পর্ক নেই। ইনি জাস্ট নিজের গরজেই আপনাকে বোঝাতে এসেছিলেন। হাঙ্গামা বাড়িয়ে কী হবে? এঁকে ছেড়ে দিই?

সাতজোড়া চোখ তাদের দেখছিল।

আচমকাই বাইরে প্রবল একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। এত জোর শব্দ যে ঘরটা এই শব্দে কেঁপে উঠল হঠাৎ। চোখের পলকে বসা লোকগুলো লাফিয়ে উঠল, কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল!

অন্য একজন বলল, কোন শালা, শুয়োরের...

দু-তিন জনের হাতে রিভলভার দেখতে পেল শাসন। তারা সবাই হুড়মুড় করে ঘরের বার হতে না হতে উপর্যুপরি বোমার শব্দ হতে লাগল। বাইরে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। প্যান্ডেলের একধারে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, সম্পূর্ণ অরাজকতা।

গুরুচরণবাবু বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগল, এ ওই কালোর কাজ। এ নিশ্চয়ই কালো। আগে ওকে খুন করো, তারপর অন্য কথা। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো আজ...

শাসন শান্তভাবে তার পিছনে দাঁড়িয়ে একটু হাসল। কচির ব্যবস্থা খুবই ভালো। এতটা আসা করেনি সে।

চার

আমি ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করি না। কিন্তু ইহাকেই বোধহয় ইংরাজিতে প্যান্ডেমোনিয়াম কহে।

ইংরিজি আমিও ভালো শিখিনি, তবে প্যান্ডেমোনিয়ামটা জানি। হ্যাঁ, এই হলো সেই প্যান্ডেমোনিয়াম।

কেহ হতাহত হয় নাই তো!

না ঠাকুরমশাই, আমার ছেলেরা অত কাঁচা নয়। তারা কোন কাজ কিভাবে করতে হয় তা ভালোই জানে। কিন্তু আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমার উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই।

গুরুচরণবাবু আপনার ওপর রেগে আছেন। আপনাকে দেখলে হয়তো আবার চণ্ডমূর্তি ধারণ করবেন।

জানি। মনুষ্যটি স্বীয় বৃত্তি-প্রবৃত্তির তাড়নায় কষ্ট পাইতেছেন। যাহাদের অহং প্রবল তাহারাই ক্লেশ ভোগ করে। গুরুচরণবাবুর সর্বাধিক শত্রু তাঁহার নিজেরই অহং।

সে তো বুঝলাম, এখন কী করতে চান বলুন। আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ আমাকে কথা বলতে দেখলে গুরুচরণবাবুর সন্দেহ হবে যে, আমি ষড়যন্ত্র করছি। এখনও অর্ধেক টাকা বাকি।

তোমাদের সহিত গুরুচরণবাবুর চুক্তিটি কীরূপ? কী কার্য করিতে তিনি অর্থব্যয় করিতেছেন?

অ্যাকশন হলে পাল্টা অ্যাকশন। মেয়েকে এসকর্ট করে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা আর কাল বিয়েবাড়ি গার্ড দেওয়া।

আর কোনও দায়িত্ব নাই?

না। আর কী দায়িত্ব থাকবে? তবে চিতু বলছিল, এখানে সুবিনয় নামে কে এক ছোকরা আছে, তাকে নজরে রাখার জন্য তাকে বলা হয়েছে।

শাসনের চোখ বিস্ফারিত হয়েই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কী নাম বলিলে?

চিতু। চিত্তরঞ্জন বসাক।

কীরূপে নজরে রাখিবে?

তা জানি না।

প্রহার করিবার আদেশ দিয়াছেন কি?

তা জানি না। তবে চিতু খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। টক করে হাত-ফাত চালিয়ে দেয়।

তাহা হইলে বিপদ। কচি, আমাকে একটু সাহায্য করিবে কি?

বলুন না। আমি তো আজ দেখছি আপনার হয়েই কাজ করছি।

ততটা করিতে বলি না। সূক্ষ্মভাবে তাহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। শুধু চিতুকে চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে। তাহাকে কিরূপে চিনিব?

সোজা। গায়ে একটা কালো ফুলহাতা শার্ট আছে। চিতু বেঁটে, বেশি মোটাসোটাও নয়। দেখতে ছোটোখাটোই। তবে মাথায় খুব ফাঁপানো কোঁকড়া চুল আছে।

বুঝিলাম।

ঠাকুরমশাই, ওকে ঘাঁটাতে যাবেন না। সঙ্গে আর্মস আছে।

থাকিবারই কথা। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না। এইবার যাইতে হইবে।

আসুন ঠাকুরমশাই।

চারদিকে চূড়ান্ত বিশৃংখলা, ছোটাছুটি, পুলিশের আবির্ভাব সব মিলিয়ে অরাজকতাটা এমনই সম্পূর্ণ যে, অন্দরমহলের খবর এখনও এদিকে আসেনি। সময় যতটা কাটানো যায় ততই ভালো।

চিতু নামের গুণ্ডাটি সুবিনয়ের বাড়ির দোরগোড়াতেই দাঁড়ানো। তবে দূরাগত বোমার শব্দ এবং পুলিশের গাড়ির সাইরেন তাকে কিছু চঞ্চল করে তুলেছে। সে গলির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝবার

চেষ্টা করছিল।

একটা রোগা-পাতলা লোক সেদিক থেকে এক দৌড়ে গলিতে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, পুলিশ গুলি চালাচ্ছে...

চিতু খুব উদ্বিগ্ন হলো না। শুধু জিগ্যেস করল, হাঙ্গামাটা কিসের?

সাতটা গুণ্ডা এসেছে কলকাতা থেকে। তাদের ধরা হচ্ছে।

চিতু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, ফোট শালা!

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল। গলি দিয়ে লম্বা কালোমতো একটা লোকও দৌড়ে এল এদিকে।

পুলিশ গুলি চালাচ্ছে!

এইবার চিতু চঞ্চল হলো। গুলির শব্দ সে পায়নি বটে, কিন্তু সবাই এক কথা বলছে কেন! জামার তলায় কোমরে ডান হাতটা রেখে সে গলির মুখের দিকে এগিয়ে গেল।

গলির মুখে দুদিকেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে। বাঁ-দিকে চেয়ে গণ্ডগোল আঁচ করছে। চিতু একটু উঁকি দিল। কী হল তা সে বুঝতেই পারল না। মাথায় একটা ভারী কী যেন এসে পড়ল। তারপর চোখ অন্ধকার।

ফাঁকা গলিতে একটা ভ্যানগাড়ি ঝকর ঝকর করে ঢুকে পড়ল।

সুবিনয়ের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শাসন ডাকল, মহাশয়! মহাশয়!

সুবিনয় দরজা খুলে অবাক হয়ে বলল, আপনি!

ত্বরা করুন, এইক্ষণেই রওয়ানা হইতে হইবে।

সে কী মশাই! ঘণ্টাখানেক আগে একটা লোক এসে আমাকে পিস্তল দেখিয়ে বলল ঘর থেকে বেরোলে গুলি করবে। সেই থেকে বেরোতে পারছি না।

জানি মহাশয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমি কোথায় যাবো?

অদ্যই আপনার বিবাহ।

সুবিনয় হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, কী বলছেন?

আমি বৃথা বাক্য কহি না। ত্বরা করুন।

অনেক রাতে দুজন দাওয়ায় বসে আছে।

আজ পুন্নিমে নাকি রে সাজু?

হুঁ-হুঁ বাবা, আজ আর ভুল করছি না। ঠাকুরমশাইকে জিগ্যেস করে জেনে নিয়েছি। কী জানলি?

আজ পুন্নিমেই বটে। বিয়ের লগ্নও ছিল।

তা বটে। তবে বিয়েটা ভ্যাতভ্যাতে হলো। শুধু মন্তর। নেমন্তন্ন হলো না।

হবে।

হবে? বলছিস!

নিজের কানে শুনেছি। হবে।

আমাদের হলেই হলো, কি বলিস? কে আসছে রে?

সেই বাবুটাই মনে হচ্ছে যেন!

তোর নেশা হয়েছে।

না গো মুকুন্দদা। নেশা কোথায়? এই তো মোটে দু' নম্বর ভাঁড়।

তোর মাথা! ছ নম্বর চলছে।

বলো কি!

অভিসার সামনে এসে দাঁড়াতেই মুকুন্দ একগাল হেসে বলল, ঠাকুরমশাই যে আজও বাড়িতে নেই।
কোথায় গেছেন?
যজমান বাড়ি। ঘরে তালা।
অভিসার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসল।
সাজু বলল, ধকলটাও তো কম গেল না। বিয়ে দিলেন, বর-বউ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।
ও।
তা সিগারেট হবে নাকি বাবু?
অভিসার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।
মুকুন্দ যত্নের সঙ্গে একটা নতুন ভাঁড়ে ধেনো ঢেলে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবু, ইচ্ছে করুন।
অভিসার হাত বাড়িয়ে ভাঁড়টা নিল।

ছোট গল্প

শশীস্যারের ছেলে

স্কুলমাস্টার শশীশেখর যে চটের পুরোনো ব্যাগটা নিয়ে বাজারে যেতেন সেটাতে অন্তত তিন-চারটে জায়গায় তাপ্পি মারা ছিল। তার কালো ছাতাটা এতই পুরোনো হয়েছিল যে, সাদাটে রং ধরে গিয়েছিল। আর জুতো! শশীশেখরের জুতো বলতে ক্ষয়ে-যাওয়া হাওয়াই চটি, তা-ও সুতো দিয়ে আটকানো। আর এসব মেরামতির কাজ শশীশেখর নিজেই করতেন, স্ত্রী বা কারও ওপর নির্ভর করতেন না। এমন নয় যে, তাঁর স্ত্রী খাণ্ডার বা ঝগড়ুটে ছিলেন। আসলে শশীশেখর কখনও কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো মনের জোর পেতেন না।

গত মঙ্গলবার শশীশেখর মারা গেছেন। বাড়িতে অশৌচ চলছে। শশীশেখরের ছেলে সৌম্যশেখর ধড়া পরে সকালবেলায় ঘুরে ঘুরে বাবার পরিত্যক্ত জিনিসগুলো দেখছিল। সেই চটের থলি, ছাতা, চটি, পুরোনো হয়ে যাওয়া জামা, মোটা ধুতি, সস্তার পাঞ্জাবি। সারাজীবন দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়ে অমিত পরিশ্রমী মানুষটি চিরবিশ্রাম পেয়েছেন। সৌম্য শোকের চেয়েও বেশি অনুভব করছিল একটা অবলম্বনহীনতা। যে-কোনও মানসিক সংকট বা বাস্তব সমস্যায় সে বরাবর বাবার কাছে পরামর্শ নিয়েছে, শশীশেখর বরাবর যথাযথ পরামর্শই দিতেন।

সৌম্য রোগা ভোগা যুবক। শিশুকাল থেকেই নানা অসুখে ভুগে সে কয়েকবার মরো-মরো হয়েছে। পেটের রোগ, অর্শ, হাঁপানি তো তার আছেই। এছাড়া টাইফয়েড এবং জন্ডিসে দুবার সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসব কারণে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও সে জীবনে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ এবং দর্শনেই এম.এ পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, হাই সেকেন্ড ক্লাস। আদালতে কপিরাইটারের

কাজ করে তার সামান্যই আয় হয়। তার চাকরির উন্নতির আশা বা ভাগ্য পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবে না। সে যে বেঁচে আছে এই ঢের।

অসুস্থ এবং রুগ্ন বলেই সে মা-বাবার দয়ায় একটু বেশি আচ্ছন্ন। বাবা চলে যাওয়ায় তার গভীর শূন্যতাবোধ জীবনে একটা নাস্তির তরঙ্গ তুলছে। খুবই অসহায় আর আরও দুর্বল লাগছে নিজেকে।

আজ ঘুরে ঘুরে সে বাবার ব্যবহৃত জিনিসগুলি দেখছে, স্পর্শ করছে, ঘ্রাণও নিচ্ছে।

শোকের বাড়িতে আত্মীয় এবং পরিচিতরা মাঝে মাঝেই আসছে। আসছে শশীশেখরের পঞ্চাশ বছরের শিক্ষক জীবনের ছাত্ররাও। ছাত্ররা অনেকেই বেশ বৃদ্ধ, প্রবীণ, অনেকে আবার নিতান্তই ছোকরা। ছাত্ররা অনেকেই তার মায়ের হাতে টাকা দিয়ে যাচ্ছে জোর করে। গুরুদক্ষিণাই হবে হয়তো।

মা প্রভাময়ী তাকে ডেকে বলল, ওরে টুকু, এ তো অনেক টাকা দেখছি। একটু গুণে গেঁথে দেখ বাবা। মনে হচ্ছে ওঁর শ্রাদ্ধটা ভালোভাবেই করা যাবে।

সৌম্যর অবশ্য কোনও উৎসাহ দেখা গেল না টাকা গোনার।

বিকেলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, বেশ সুপুরুষ এবং মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। বললেন, আমি শ্যামনন্দন লাহিড়ি। মাস্টারমশাইয়ের কাছে দশ বছর পড়েছি। প্রাইভেটও পড়তাম। তুমি কি জানো যে, মাস্টারমশাই এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও কখনও প্রাইভেট পড়ানোর জন্য টাকা নিতেন না!

হ্যাঁ, জানি। স্কুলের বেতন ছাড়া ওঁর কোনও আয় ছিল না।

এক আশ্চর্য মানুষ। শশীস্যারকে দেখে আজ বুঝতে পারি সত্যিকারের কারেজিয়াস ম্যান কাকে বলে।

হ্যাঁ, বাবার চরিত্রে লোভ জিনিসটা ছিল না।

তোমাকে আমি ছোট দেখেছি। খুব রোগা ছিলে। এখনও তোমার স্বাস্থ্য তেমনটাই আছে। শুনেছি রুগ্ন বলে তুমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারোনি!

ঠিকই শুনেছেন। আমার অসুস্থতার জন্য সংসারটা খুব সাফার করেছে।

একটা কথা বলতে চাই, শশীস্যারের কাছে আমরা সবাই ঋণী। স্যার আমাদের টাকা নিতেন না। কিন্তু আমি বুঝি গুরুদক্ষিণা না দিলে অধ্যয়ন সার্থক হয় না। আমি একটা অসম্পূর্ণতার বোধ নিয়ে কষ্ট পাই।

গুরুদক্ষিণার দরকার নেই। আপনি যে বাবাকে শ্রদ্ধা করেন সেটাই গুরুদক্ষিণা।

তবু একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমি গত কুড়ি বছর রাশিয়ায় আছি। আমার হায়ার এডুকেশন সেখানেই। গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকার পর সেখানে বিপুল আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। বাজারও খুলেছে। আমি সেখানে একটা ব্যবসা করি। সফিস্টিকেটেড নানা কনজিউমার আইটেম, যেগুলো রাশিয়ায় আগে পাওয়া যেত না। কিছু ইলেকট্রনিক আইটেমও। আমার নেটওয়ার্ক সারা পৃথিবীতে ছড়ানো। বাইরে থেকে আমি রাশিয়ায় বহু জিনিস সাপ্লাই করি। বিশাল ক্যাপিট্যালের ব্যাপার। কলকাতায় আমার ইস্ট এশিয়ার অফিস। এখানে মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জাপান আর ভারতীয় জিনিসের এক্সপোর্ট অফিস। এখানে আমার একজন সৎ মানুষকে দরকার, যে সাপ্লাই লাইনটা ক্লিয়ার রাখতে পারবে। শশীস্যারের ছেলে হিসেবে তোমার সততা প্রশ্নাতীত। কাজটা করবে?

সৌম্য মৃদু হেসে বলল। আমার কোনও অভিজ্ঞতাই তো নেই।

অভিজ্ঞতা তো কাজ করতে করতে হয়। কম্পিউটার হ্যান্ডেল করতে পারো তো!

সামান শিখেছি।

কোনও চিন্তা নেই। বাকিটুকু শিখতে সময় লাগবে না। শশীস্যারকে তো আর পাবো না, তাঁর ছেলের ভিতর দিয়েই তিনি আমাকে আজ যদি সাহচর্য দেন তাহলেই আমি ধন্য। তুমি কালই আমার অফিসে এসো।

আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন, এখন হয়তো আবেগবশে বলছেন, পরে মত পালটাতে হবে।

যদি হয় তবে পাল্টাবো, কে বলতে পারে হবে!

সৌম্য চিন্তিত হল। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর বসে বসে অনেকক্ষণ বাবার কথা ভাবল সে। সততা আদর্শবাদিতার জন্য কষ্ট করতে হয় ঠিকই, পরিবার কষ্ট পায়, কিন্তু শেষ অবধি তার মূল্যও মেলে। শশীশেখরের মতো জীবনযাপন হয়তো সৌম্য করবে না, কিন্তু শশীশেখরকে নিজের ভিতরে শ্রাদ্ধ করার একটা দায় তো আছেই।

সৌম্য বাবার শ্রাদ্ধটা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করল। আয়োজন সামান্যই কিন্তু আন্তরিকতা কম ছিল না তার।

শ্যামনন্দন আবার এল। বলল তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার। ভারতবর্ষ এত দুর্নীতিতে ভরে গেছে, সৎ মানুষ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে কাজের লোক, টেকনিক্যালি পারফেক্ট অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সৎ-এর সাপ্লাই নেই। তুমি দেখ খুব শিগগিরই সৎ মানুষের একটা হাই ডিমান্ড তৈরি হবে। সৎ, মানে জেনেটিক্যালি সৎ। যারা অসৎ কাজ করতে অক্ষম। তোমাকে আমি সেই দামটুকুই দিতে চাই।

জমির দাম

ভূতোবাবু না?

ভূতোবাবু! আমার নাম ভূতনাথ সরখেল।

মিলে গেছে।

কী মিলে গেছে?

ভূতনাথ সরখেল, ওরফে ভূতো। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, থলথলে চেহারা, গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভুঁড়ো গোঁফ, আর মাথার চাঁদিতে লুচির সাইজের টাক।

আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! চেনা নেই, জানা নেই, ফট করে পথের মাঝখানে এসব কথা তোলার মানে কী?

মানে আছে বই কি। তবে সব কথার মানে তো সবাই বুঝতে পারে না কিনা। তিন দিনের মেহনত আজ সার্থক হল। এই তিন দিন আপনাকে গরু-খোঁজা খুঁজেছি মশাই, পাওয়া না গেলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

সর্বনাশ হয়ে যেত! কেন মশাই, কেন?

খুঁজে বের করতে না পারলে পটলবাবু যে বেজায় রেগে যেতেন! আর পটলবাবুর রাগ তো জানেন! রেগে গেলে উনি খ্যাপা ষাঁড়, ক্ষুধার্ত। বাঘ বা পাগলা হাতির চেয়েও ভয়ংকর।

কে আপনার পটলবাবু! আর তিনি রাগলেই বা আমার কী?

আহা, আপনার আর কী? আপনি তো দিব্যি ছোরা বা গুলি খেয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকবেন। বিপদ তো আমাদের মশাই, যারা বেঁচে থাকব। পটলবাবুর রাগের ঝাঁঝ তো আমাদেরই পোয়াতে হবে।

অ্যাঁ! তার মানে কি আপনি আমাকে খুন করতে এসেছেন?

ছিঃ ছিঃ। আমি খুন করতে যাবো কেন? আমাকে দেখে কি আপনার খুনি বলে মনে হয়? তাছাড়া খুনের কথা তো আমি উচ্চারণও করিনি ভূতোবাবু!

তবে যে বললেন, ছোরা কিংবা গুলি খেয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে যাব!

তা বলেছি বই কি! এ পর্যন্ত পটলবাবুর হুকুমে মোট পাঁচজনকে খুঁজে বের করতে হয়েছে আমাকে। সেই পাঁচজনের কেউ-ই আর ধরাধামে নেই কিনা। কেউ ছোরা খেয়ে, কেউ গুলি—যাক গে মশাই, ওটা আমার লাইন নয়। রক্তারক্তি আমার মোটেই সহ্য হয় না। ওসব কথা বলতেও চাই না খোলসা করে। তবে পটলবাবু রেগে গেলে আমাকে বিস্তর হ্যাপা সামলাতে হয়।

কী মুশকিল! কে কোথাকার পটলবাবু তাই জানি না, তার সঙ্গে কস্মিনকালেও সম্পর্ক নেই, আপনাকেও জন্মে দেখিনি, ব্যাপারটা কী বলুন তো! আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

পটলবাবুর চেয়ে পুলিশ ঢের ভালো মশাই। রুলের গুঁতো-টুঁতো দেয় বটে, হাজতে আটকেও রাখে, তা সেটাই বা মন্দ কী? পটলবাবুর মতো তো আর দিনেদুপুরে—যাক গে, তা পুলিশকেই খবর দেবেন নাকি? তার চেয়ে বরং চিঠিটা পড়ে দেখুন।

চিঠি! কিসের চিঠি?

পড়েই দেখুন না, ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলুন।

পড়ার উপায় নেই, দিন দুই আগে চশমাখানা নাতি ভেঙে ফেলেছে। চশমার যা দাম, চট করে কেনার উপায়ও নেই।

এঃ, আপনি গরিব নাকি মশাই?

গরিবই তো, খুব গরিব।

তাহলে কি পটলবাবু ভুল করলেন? কিন্তু তিনি তো ভুল করার মানুষ নন। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন বলেও মনে হয় না।

আপনি বোধহয় খুব ভুল করে ফেলেছেন। আপনার পটলবাবু মোটেই আমাকে খুঁজছেন না। ভূতনাথ তো কত লোকের নামই হয়। হাটেবাজারে ঘুরলেই দেখবেন ভূতনাথের ছড়াছড়ি।

সে আমি খুব জানি। কিন্তু আপনার হাইট, গায়ের রং, মাথার টাক, ভুঁড়ো গোঁফ, মায় ঠিকানাটা অবধি মিলে গেছে যে! না মশাই, আপনি গরিব হলেও পটলবাবু আপনাকেই খুঁজছেন। চিঠিটা আপনার পড়া দরকার।

তাহলে আপনার পটলবাবুকে বলুন আমাকে একজোড়া নতুন চশমার ব্যবস্থা করে দিন। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কাচ, ফ্রেম আর ডাক্তারের খরচ নিয়ে মোট এগারোশো পঁয়তাল্লিশ টাকা পড়বে।

আহা, তার দরকার কি? চিঠিটা না হয় আমিই পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে। মোটে তো সাড়ে তিন লাইনের চিঠি।

অন্যের চিঠি পড়া কি ভালো?

চিঠিটাও যে আমারই লেখা। পটলবাবু পিস্তল-বন্দুক-ছোরাছুরি বিস্তর ধরেছেন বটে, কিন্তু কলম ধরতে তাঁর বড়ই আলিস্যি। চিঠিপত্র সব তাঁর হয়ে আমরাই লিখে দিই কিনা। তিনি মুখে বলে দিয়েই খালাস।

পটলবাবু লেখাপড়া জানেন না বুঝি?

তা জানবেন না কেন? বিস্তর লেখাপড়া জানেন। এই তো সেদিন দিব্যি বানান করে ব্রজলক্ষ্মী জুয়েলারির সাইনবোর্ডটা পড়ে ফেললেন। তারপর ধরুন ওয়ান টু থ্রি ফোর বা এক দুই তিন চার দিব্যি পড়তে পারেন। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কোনওটাতেই বিশেষ আটকায় না। আর আটকে গেলেই বা কি? আমরা তো আছি ছাড়ানোর জন্য।

চিঠিটা বরং পড়েই ফেলুন। আমার বাড়ি যাওয়ার তাড়া আছে।

আহা, বাড়ি যাওয়ার তাড়া কি আমারই কম? আপনাকে এই নিরিবিলি গলির মধ্যে পাকড়াও করার জন্য তিন ঘণ্টা ওভারটাইম ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছি। ওভারটাইমের পয়সা তো আর পটলবাবু দেবেন না।

পটলবাবু খুব কিপটে লোক বুঝি?

খুব, খুব, বেজায় কিপটে। মাসকাবারে শুধু তোলাবাজি থেকেই তাঁর সাড়ে তিন লাখ টাকা কামাই হয়। সুপারি কিলিং বাবদ তা ধরুন লাশ প্রতি আড়াই লাখ ধরলে মাসে দশ-পনেরো লাখ হেসে খেলে ইনকাম, তাছাড়া মুক্তিপণ, ড্রাগের ব্যবসা, স্মাগলিং ফলাও কারবার মশাই। পটলবাবু টাকায় লুটোপুটি খাচ্ছেন। কিন্তু আমার বরাদ্দ সেই মাসান্তে দু'হাজার তিনশো টাকা আর চার টাকা দিনপ্রতি খোরাকি।

এ তো ভারী অন্যায় কথা।

অন্যায়ই তো। মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

কিন্তু আপনার কি এই অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উচিত নয়?

না মশাই, না। পটলবাবুর বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করা নিষেধ। গর্জন করার অধিকার একমাত্র পটলবাবুরই আছে।

আপনাদের কি ইউনিয়ন নেই? মুখ বুজে দিনের পর দিন এই অবিচার আর অত্যাচার সহ্য করে যাবেন?

দুঃখ আর বাড়াবেন না ভূতোবাবু, তিনমাস আগে মোটে তিনশো টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিলুম বলে পটলবাবুর তিন-তিনটে লাথি হজম করতে হয়েছে। ওসব ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করার কথা ভাবাও পাপ। যাক গে, চিঠিটাই বরং পড়ি।

তা পড়ুন। আমার কিন্তু তাড়া আছে।

এই যে পড়ছি, সবিনয় নিবেদন। মহাশয়, পত্রপাঠমাত্র পত্রবাহকের হাতে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া দিবেন। পুলিশের কাছে গেলে আমরা খবর পাইব এবং আপনার লাশ বৈদ্যবাটিতে পাওয়া যাইবে। কথাটা খেয়াল রাখিবেন। ইতি আপনার শুভানুধ্যায়ী পটল গুণ।

কত টাকা যেন বললেন?

পঞ্চাশ হাজার। একটু বেশি মনে হচ্ছে কি?

না না, কী আর এমন বেশি! যা বাজার পড়েছে, তাতে টাকার কি আর কোনও ভ্যালু আছে মশাই! পঞ্চাশ হাজার টাকাটা ন্যায্যই চেয়েছেন পটলবাবু।

তাহলে আর কি, টাকাটা ফেলে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বাড়ি চলে যান। কেউ আপনার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারবে না।

পটলবাবুর দূরদৃষ্টি দেখে ভারী আশ্চর্য হয়েছি মশাই। আচ্ছা, উনি কি করে জানলেন যে আজ আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকাই আছে?

দূরদৃষ্টি না থাকলে আর পটলবাবুই কেন পটলবাবু হবেন! তা হলে তো যে-কেউ পটলবাবু হয়ে বসতে পারত। পটলবাবু হতে যে পটলোচিত প্রতিভা চাই।

না মশাই, পটলবাবুর তারিফ না করে পারছি না। পটলবাবুর পদবি গুণ, তাই না? সত্যিই উনি সার্থকনামা। গুণ না থাকলে কি কারও পদবি গুণ হয়? কত যেন বললেন!

আজ্ঞে পঞ্চাশ হাজার। একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে কি?

না না, পঞ্চাশ হাজার ঠিকই আছে। আরও পাঁচ-দশ হাজার বেশিও চাইতে পারতেন।

তা তো পারতেনই।

এক লাখ বা পাঁচ লাখ বা দশ লাখ চাইলেই বা ক্ষতি কি?

তা তো বটেই।

তাহলে এখন পঞ্চাশ হাজার দিলেই হবে তো! ভালো করে ভেবে বলুন!

না মশাই, ভাবাভাবির কিছু নেই। পঞ্চাশ হাজার দিলেই হবে।

তবু মশাই যাচাই করে নেওয়া ভালো। আচ্ছা, পটলবাবুর কি মোবাইল ফোন আছে?

তা থাকবে না! এগারোখানা আছে।

তাহলে একবার যাচাই করে নিলে হয় না?

তার দরকার নেই। চিঠিতে যা লেখা আছে সেটাই শেষ কথা। এবার টাকাটা ফেলুন তো মশাই। পটলবাবুর গদিতে টাকা জমা করে আমাকে সেই আবার শিয়ালদা থেকে বনগাঁ লোকাল ধরতে হবে।

আপনি বনগাঁয় থাকেন বুঝি?

আজ্ঞে। কিন্তু আর সময় নেই। আটটা বারোর লোকালটা ফেল করলে বড্ড মুশকিল হবে।

বনগাঁ জায়গাটা কেমন বলুন তো!

বিচ্ছিরি জায়গা মশাই, উপায় নেই বলে থাকা।

বনগাঁয় আমার ভায়রাভাই গদাধর মিত্তির থাকে। চেনেন তাকে?

আজ্ঞে না। কিন্তু—

তা বনগাঁয় জমির দর এখন কত করে যাচ্ছে বলুন তো?

সে অনেক মশাই। সেই বনগাঁ কি আর আছে! জমির দাম হাউ মাউ খাঁউ করে বাড়ছে।

গদাধরও তাই বলছিল বটে।

আমি বরং আর একদিন এসে বনগাঁর জমির দর নিয়ে কথা কইব। আজ বড্ড তাড়া আছে মশাই, পটলবাবুও উসখুস করছেন। তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেললে প্রলয়কাণ্ড বেধে যাবে

যে!

পটলবাবুর পঞ্চাশ হাজার তো! ওটা নিয়ে ভাববেন না। তার আগে বনগাঁয়ের জমির দর নিয়ে কথাটাই বরং হয়ে যাক। আমার মেজো জামাইয়ের বিরাট কারবার। সার, কেমিক্যাল, চাষবাসের যন্ত্রপাতি এইসব আর কি। ইদানীং উত্তর চব্বিশ পরগণায় একটা কোল্ড স্টোরেজ খোলার জন্য বড্ড হন্যে হয়ে উঠেছে। তারও বনগাঁ জায়গাটা খুব পছন্দ।

কতটা জমি লাগবে?

তা ধরুন বিশ-পঁচিশ বিঘে তো বটেই। ন্যায্য দাম দেবে মশাই। আর টেন পারসেন্ট দালালি তো আছেই।

ইয়ে, তা ধরুন বিঘে প্রতি কত দাম দিতে রাজি হবেন উনি?

লাখ তিনেক ধরে রাখুন। কিছু কমবেশি হলেও কথা নেই।

দালালি ওই টেন পারসেন্ট তো। পরে আবার বেগড়বাঁই করলে—

আরে না না, দুজন দালাল লাগানো হয়েছিল। একজন হাজার খানেক অ্যাডভান্স নিয়ে কেটে পড়েছে, আর একজন ভুয়ো দলিল দাখিল করে দাঁও মারার চেষ্টায় ছিল।

সে ভয় নেই মশাই। আমার শ্বশুরেরই বাইশ বিঘে জমি রয়েছে। পাকা দলিল। শরিকি মামলা নেই। পরিষ্কার টাইটেল।

বলেন কি? এ তো মেঘ না চাইতেই জল।

কিন্তু শ্বশুরের জমি বলে আমার টেন পারসেন্ট আবার মার যাবে না তো?

আরে না, না। রীতিমতো লেখাপড়া করে নেবেন। আমার জামাই নিচু নজরের লোক নয়। তাহলে ওই তিন লাখ করেই দর তো!

কথা বলে দেখি। ওরকমই শুনেছিলাম।

তাহলে আপনার দালালি কত দাঁড়াচ্ছে?

ছয় লাখ ষাট হাজার। ওরে বাবা! আমার মাথাটা কেমন যেন একটা পাক খেয়ে গেল।

সামলে মশাই, সামলে! এখন মুচ্ছো গেলে যে পটলবাবু আপনাকে...

গুলি মারুন পটলবাবুকে। থোড়াই কেয়ার করি শালাকে। আজই ওর চাকরি থেকে ইস্তাফা দিলুম।

আহা হা, করেন কি? অমন সোনার চাকরি এ বাজারে ছাড়তে আছে?

দূর দূর! ছুঁচো মেরে আর হাত গন্ধ করে কে? দালালির টাকাটা পেলেই বাবাকেলে সোনার দোকানটা আবার খুলব। দেখবেন যেন কথার নড়চড় না হয়। জমির ব্যাপারে আমি কালই আসব। আজ রাতেই শ্বশুরের সঙ্গে কথা হবে।

বিলক্ষণ। আসবেন বইকি।

সুদ

তা নিয়ে আপনার কী দরকার মশাই?

কী যে বলেন হরিপদবাবু, আপনি ভালো না থাকলে যে আমাদের সমূহ বিপদ।

কেন মশাই, কেন? আমার ভালো-মন্দের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীসের?

আছে মশাই আছে। সাদা চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তলায় তলায় সম্পর্ক আছে বটে। এই আপনার মতো যে-কয়জন আহাম্মক হারু দাসের কাছে টাকা ধার করছেন তাঁদের আশীর্বাদেই তো খেয়ে-পরে বেঁচে আছি মশাই।

সে কী? খোলসা করে বুঝিয়ে বলুন তো—

এই বলছি, আমি হলুম তো শ্রীদাম মণ্ডল। হারু দাসের মহাজন।

ও বাবা, হারু দাসেরও আবার মহাজন আছে নাকি! সেই তো মস্ত মহাজন।

তা বটে, তবে কিনা বাঘের ওপরেও ঘোঘ থাকে কিনা।

সেটা কীরকম?

আজ্ঞে খুবই ধারালো ব্যাপার। হারু দাসের কারবারে আমার টাকাই খাটে কিনা! সেই টাকার সুদেই আমার কারবার চলে। আবার হারু দাস সেই টাকা সুদে খাটায়, তাই দিয়ে হারু দাসের চলে। আবার আমার ওপরেও মহাজন আছে। তাকে আমি সুদ দিই। তাতে তার কারবার চলে। কিন্তু এই এতসব কারবার চলছে আপনাদের মতো কয়েকজন মহানুভব আহাম্মকের জন্যই তো!

বটে!

তবে আর বলছি কী? আপনি যত ভালো থাকবেন ততই আমাদেরও ভালো থাকা।

কিন্তু যদি টাকাটা শোধ দিয়ে দিই।

সেই উপায় নেই মশাই। পানা পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে দেখেছেন কখনও?

তা দেখেছি।

ঢিল মারলে পানাগুলো একটু সরে যায় বটে, কিন্তু একটু বাদেই আবার ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে দেয়। সেইজন্যই আপনার চক্রবৃদ্ধি হারের ওই জটিল সুদকষার ফেরে টাকাটা শোধ হওয়ার নয়। যতই শোধ দিন, ওই আসলের গায়ে লাগবে না। যেই সাড়ে পাঁচশো থেকে ধারটা সাড়ে চারহাজারে নামালেন অমনি বাঁই বাঁই করে সুদ বেড়ে উঠল। ফের পাঁচহাজার ফিরে এল পাঁচহাজারেই। ভারি মজার অঙ্ক মশাই।

তাহলে উপায়?

উপায় হল, ভালো থাকা। আপনার খিদে হোক, ঘুম হোক, কোষ্ঠ পরিষ্কার হোক, আপনি যত ভালো থাকবেন ততই আপনার মহাজনেরা ভালো থাকবে। বুঝলেন কিনা! হেঃ হেঃ।

হরিপদবাবুর বড় বিপদ যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ের সময় ঠেকায় পড়ে হারু দাসের কাছ থেকে চড়া সুদে হাজার পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। হারু দাস লোক বড় সুবিধের নয়। ঘাতকদের কাছ থেকে টাকা সুদে-আসলে আদায় করার জন্য সে একজন গুন্ডাকে পোষে। সেই গুন্ডা হল ট্যারা বিশে। প্রতি মাসে পাঁচশো করে ধারের টাকা আর সেইসঙ্গে আরও পঞ্চাশ টাকা সুদ বাবদ বিশে আদায় করে নিয়ে যায়। হরিপদবাবু দিয়েও দেন। কিন্তু মুশকিল হল গত দশ মাসে পাঁচশো টাকা করে দিয়েও পাঁচহাজার টাকা নাকি আদায় হয়নি। চক্রবৃদ্ধিহারে নাকি ধারণা অনেক বেড়ে গেছে। আরও দশ মাস নাকি শোধের পালা চলবে। হরিপদবাবু একটু গাঁইগুঁই করায় ট্যারা বিশে গতকাল একখানা মস্ত ছোরা বের করে তাঁর পেটে ছোরার ডগাটা ঠেকিয়ে শাসিয়ে গেছে কোনও ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলে তাঁকে ঠান্ডা করার ওষুধ তার জানা আছে।

কাল রাতে হরিপদবাবুর ঘুম হয়নি। দুশ্চিন্তায় খিদে লোপট হওয়ায় রাতে খেতেও পারেননি। তিনি গতকাল হারু দাসের কাছে গিয়েও ধর্না দিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হারু দাস সাফ বলে দিয়েছে, দেখ হরিপদ, আজকাল আমি নিজে আর হিসেবপত্তর দেখার সময় পাই না। আমার আরও পাঁচটা কারবার আছে। সুদের ব্যাপারটা দেখে ওই ট্যারা বিশে আর আমার ম্যানেজার বিষ্টু। তবে কিনা সুদ খুব জটিল ব্যাপার। কখন যে ফস করে বেড়ে বসে থাকে তার ঠিক নেই।

তা বিষ্টুর কাছেও গিয়েছিলেন হরিপদবাবু। বিষ্টু অতি বজ্জাত লোক। রোগা, কালো, কুতকুতে চোখ আর চোয়াড়ে মুখ, বিরসমুখে একটা হিসেবের খাতা বের করে তার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নিজেই দেখে নাও। মাসে মাসে মোটে তো পাঁচশো টাকা আসল আর পঞ্চাশ টাকা সুদ দিচ্ছ। কিন্তু বাকি টাকাটাও তো ততদিনে সুদে বাড়ছে, নাকি?

হরিপদবাবু হিসেবটা ঠিক বুঝলেন না। তবে মস্ত বড় একটা জোচ্চুরি যে চলছে তা বুঝতে পারলেন। কিন্তু এসব লোকের সঙ্গে কী করে পেরে উঠবেন তা বুঝতে পারলেন না। শুধু বুঝতে পারছেন পাঁচহাজার টাকার ঋণ ইহজীবনে শোধ হওয়ার নয়।

সকালবেলায় ভারি বিষন্নমুখে বাজার করতে বেরোলেন হরিপদবাবু।

বটতলার কাছে একটা বেঁটেমতো, লুঙ্গি পরা গাট্টাগোট্টা লোক তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে হাত কচলে বলল, হরিপদবাবুর যে, তা ভালো আছেন হরিপদবাবু?

হরিপদবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ভালো থাকার চেষ্টা করছি।

চেষ্টা করুন হরিপদবাবু, খুব কষে চেষ্টা করুন। খিদে আর ঘুমটা যদি ঠিকমতো হয় তবে ভালো থাকা আটকায় কে! তা আপনার খিদে হচ্ছে তো হরিপদবাবু? আর ঘুম?

একটি রুমাল

'এই যে ম্যাডাম, এই আপনার রুমালটা নিন। পড়ে গিয়েছিল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু রুমালটা মোটেই পড়ে যায়নি, ওটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম।'

'ফেলে দিয়েছিলেন! কিন্তু কেন? রুমালটা তো বেশ দামি।'

'ফেলে দেওয়ার কারণ ছিল।'

''ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুমাল ফেলে দেওয়ার একটা ট্র্যাডিশনাল কারণ অবশ্য আছে। উদ্দিষ্ট পুরুষ যাতে ওটা কুড়িয়ে এনে দেয় এবং সেই সূত্রে ওই সব হয় আর কী।

'কী সব হয় বলুন তো!'

'ও যে ইয়ে আর কী। মেয়ে-পুরুষের মধ্যে যা হয়ে আসছে।'

সেসব আগে হত। যত সব বস্তাপচা, হ্যাকনিড, ইডিয়ট রোম্যান্স। ছেলেগুলো ছিল ভিতু, মেয়েগুলো আনস্মার্ট। আলাপ করার জন্য রুমাল ফেলার দরকার হয় নাকি?'

'আপনার কি মনে হয় রুমালের বদলে এখন অন্য কিছু ফেলা উচিত? যেমন মোবাইল ফোন বা পেন ড্রাইভ বা আইপড!'

'না, আমি বলতে চাই আমাদের সব পুরনো ধ্যানধারণাই ফেলে দেওয়া উচিত। আপনার কীভাবে মনে হল যে, আধুনিক একটা মেয়ে রুমাল ফেলে প্রিমিটিভ পন্থায় তার পছন্দের পুরুষকে ডাকছে? চারদিকে তাকিয়ে আপনার কি মনে হয় না যে, সেসব দিন আর নেই? লজ্জা, ব্রীড়া, সংকোচ, ভয় এসব যে এখন অচল, সেটা কি আপনি জানেন না?'

'দাড়ান ম্যাডাম, দাঁড়ান। স্বীকার করছি, আমি অত বুদ্ধিমান নই। বরং একটু বোকাসোকাই। কবে ফোনটা অচল হয়েছে, তারও ঠিকঠাক হদিশ জানি না। তবে একটা গুণ আছে, কেউ যদি ঠিকমতো বুঝিয়ে বলে, তবে আমি অনেকটা বুঝতে পারি।'

'আপনাকে বোঝানোর দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়।'

'তা তো বটেই। তবে কিনা ছেলেবেলা থেকেই আমার মেয়েদের দেখলে হৃৎকম্প হয়, কথা বলতে গেলে গলা আটকে আসে। মেয়েদের সামনে অনেক সময়ই আমি ভুলভাল বলে ফেলি।'

'তার মানে আপনি একদম সেকেলে এবং অচল।'

'যথার্থ বলেছেন। চোদ্দ বছর বয়সেই অচলার প্রেমে পড়ে যাই। আর সে কী দুরবস্থা! শয়নে, স্বপনে, জাগরণে শুধু অচলা আর অচলা। কিন্তু কী মুশকিল! পথেঘাটে দেখলেই আমার উলটো দিকে ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ধারে কাছে গেলে গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।'

'ইস, কী বোকাবোকা ব্যাপার। কী ধরনের মেয়ে ছিল অচলা?'

'কেমন করে বলি বলুন তো ম্যাডাম? ক্রিটিকের চোখ আমার কোনওদিনই ছিল না। তবে আমার বন্ধুরা আমার উথালপাথাল অবস্থা দেখে বলেছিল, ''এঃ, তুই অচলার মতো একটা খেঁদিপেঁচির জন্য হেদিঁয়ে মরছিস!'' '

'রূপটাই বুঝি মেয়েদের সব?'

'ভুল করছেন ম্যাডাম। কোনও মেয়ের রূপ থাক বা না থাক, তার প্রেমিক তাকে কী চোখে দ্যাখে, সেটাই হল আসল কথা। প্রেমিক যাকে সুন্দর দ্যাখে, সে কুৎসিত হলেও পরমাসুন্দরী।'

'ভুল দেখা বা ভুল ধারণা নিয়ে চলা বুঝি ভালো?'

'তাহলে কিরকম চোখে দেখা উচিত?'

'সংস্কারযুক্ত, আবেগহীন, বাহুল্যবর্জিত, প্র্যাকটিক্যাল চোখে।'

'তাহলে কি প্রেম কেঁচে যাবে না ম্যাডাম?'

'না, বরং প্রেম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'মুশকিলে ফেলে দিলেন ম্যাডাম।'

'কেন, মুশকিলে কী হল?'

'আমি মাখন-টোস্টের কথা ভাবছিলাম।'

'মাখন টোস্ট! অফ অল থিংস হঠাৎ মাখন টোস্টের কথা মনে হল কেন?'

'না ম্যাডাম, এই ভাবছিলাম, টোস্টের ওপর মাখনটা কেন লাগানো হয়? ওটা তো বাহুল্যমাত্র। ভেবে দেখুন ম্যাডাম, টোস্টে মাখন লাগানোর একটাই উদ্দেশ্য, খড়খড়ে টোস্টকে একটু মোলায়েম আর সুস্বাদু করে নেওয়া।'

'উপমা দিয়ে কথা বলার মধ্যে চালাকি আর ফাঁকিবাজি দুই-ই আছে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই ম্যাডাম, মাখন টোস্টের কথায় আমার হঠাৎ বেশ খিদে পেয়ে গেছে। ওই যে মোড়ের মাথায় রেস্তোরাঁটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে একটু খাবেন? যদি আপত্তি না থাকে।'

'না, আপত্তি কিসের? তবে আমার খিদে পায়নি। আমি এক কাপ ব্ল্যাক কফি খেতে পারি। আপনি কি একটু পেটুক?'

'অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে ম্যাডাম, আমি বেশ পেটুক। আর পেটুক বলেই না নন্দিনী আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।'

'নন্দিনীটা আবার কে?'

'জিরাফের মেয়ে।'

'জিরাফ। আপনি কি শেষ অবধি পশুপাখির প্রেমেও পড়েছেন নাকি?'

'আরে না, না। জিরাফ স্যার ছিলেন আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক। গলাটা লম্বা ছিল বলে আমরা ওই নাম দিয়েছিলাম।'

'বুঝলাম, এবার নন্দিনীর কথাই হোক।'

'ভেবে দেখুন ম্যাডাম, একটু স্ন্যাকস বা বেভারেজ কিছু খাবেন কিনা। এই ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁর গুজরাতি ডিশ কিন্তু খুব ভালো।'

'না আমি যখন তখন খাই না।'

'এক প্লেট চিজ পকোড়া নিলে এক-আধটা খাবেন কি?'

'চিজ অত্যন্ত হাই ক্যালরির খাবার।'

'তাহলে বরং দুজনে আসুন ব্ল্যাক কফিই খাই।'

'তা কেন, আপনি যা খুশি খান না।'

'না ম্যাডাম, সেই থেকে নিজের খাওয়ার উপর আমার ঘেন্না এসেছে।'

'সেই থেকে মানে?'

'নন্দিনীর দাদার বিয়ের নেমন্তন্ন যেদিন খেয়েছিলাম, সেই দিন থেকে।'

'কেন?'

'সেদিন আমি বত্রিশ টুকরো মাছ খেয়ে ফেলি এবং ব্যাচের অন্য সবাই নিজেদের খাওয়া ফেলে আমার সেই রাক্ষুসে খাওয়াই দেখছিল। আর সেই থেকে নন্দিনী কথা বন্ধ করে দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে তার বাবার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে রাজিও হয়ে গেল।'

'শুনে তো আমারই গা গুলোচ্ছে। বত্রিশ টুকরো! মাই গড!'

'ভাবলে এখন আমারও গা গুলোয় ম্যাডাম। তবে ভয় পাবেন না। নন্দিনী আমাকে ছাড়ার পর, আমিও মদ ছাড়ি। গত তিন বছর আমি ঘোরতর নিরামিষাশী।'

'ওটা আবার বাড়াবাড়ি। নন্দিনীর বিরহে মদ-মাংস ছেড়ে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। নন্দিনী কী এমন একটা মেয়ে! পুরুষমানুষদের এরকম ন্যাকামি করতে দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

'হ্যাঁ, ওই বাড়াবাড়ির কথাই বলছি। প্রেমে কি সর্বদাই একটু বাড়াবাড়ি থাকে না? বিশেষ করে নন্দিনীর মৃত্যুর পর মদ-মাংস তার স্মৃতিতে উৎসর্গ করে দেওয়াটা আমার যেন যুক্তিযুক্তই মনে হয়ছিল।'

'নন্দিনী মারা গেছে বুঝি?'

'ফিজিক্যাল ডেথের কথা হচ্ছে না। নন্দিনীর আত্মার মৃত্যু হয়েছে। যখনই সে বসাকবাড়ির মতো ঘিনঘিনে বড়লোক বাড়ির ছেলে সর্বজিৎকে বিয়ে করল, তখনই সেই রোম্যান্টিক, স্বপ্নিল, পরাবাস্তবের মেয়েটা শেষ হয়ে গেল। এখন সে দক্ষিণ কলকাতায় ঘ্যামা বুটিকের দোকান খুলেছে। কী ভিড় সেখানে! সারাদিন খদ্দের সামলাচ্ছে, কম্পিউটার সামলাচ্ছে, ডিজাইন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কথা কওয়ার সময় নেই। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসি। চোখে জল আসতে চায়।'

'আচ্ছা ইমোশনাল তো আপনি! মেয়েরা কাজ করলে বুঝি তাদের গ্ল্যামার চলে যায়! ফ্যাশন ডিজাইনিং তো ভীষণ ভালো একটা প্রোফেশন! নন্দিনী মরেনি, বরং বেঁচেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওভাবেও ব্যাপারটাকে দেখা যায় বটে। একটা মেয়ে মাস গেলে লাখ টাকা কামাচ্ছে, সেটা একরকম বেঁচে থাকার লক্ষণ বটে। কিন্তু আমার কল্পনায় যে নন্দিনী ছিল...'

'সেই নন্দিনী একটা ভাবের ঘুঘু। তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না কখনও।'

যথার্থই বলেছেন। আমারও আজকাল তাই মনে হয়। হৃদয়ের শব্দহীন প্রগাঢ় জ্যোৎস্নায় যেসব অলীক ও অচিন পাখি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা কিছু রিয়েল তো নয়। কোন

দুঃখে একটা মেয়ে হতে যাবে বনলতা সেন? হাসলেন নাকি?'

'কই না তো! হাসছি না। তবে আপনার কথাটা ভালো বুঝতেও পেরেছি বলে মনে হয় না। জীবনানন্দের কবিতা টেনে আনলেই কি নিজেকে জাস্টিফাই করা যায় বলে ভেবেছেন?'

'এই যে কফি এসে গেছে। আপনি কি ব্ল্যাক কফিতে চিনি খান?'

'আমি আবার...না থাকগে। চিনি ছাড়াই খেয়ে দেখি।'

'না, ব্ল্যাক কফি চিনি ছাড়াই ভালো।'

'আপনি আপনার রুচিমতো খান না।'

'আমার রুচিগুলো বুদ্ধি বা বিবেচনার দ্বারা গাইডেড নয়। আর তাই আমার মনে হয়, আমি একটা ভুল জীবনযাপন করে চলেছি।'

সেটা আপনার মুখ দেখে বোঝাও যায়।'

'আমার মুখটা একটু ভ্যাবলা মতো, না?'

'একটু আছেন বোধহয়।'

'রুমালটা ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও দেখছি মুঠোয় ধরা। তার মানে কি আপনিও একটু অন্যমনস্ক?'

'না। গারবেজে ফেলব বলে মুঠোয় ধরে আছি।'

রুমাল বিষয়ে দু'একটা কথা জানতে চাইলে রাগ করবেন কি?'

'না, তবে রুমাল বিষয়ে জানার তেমন কিছু নেই বোধহয়।'

'আপনার রুমালটা সুতোর কাজ করা, ফ্যাব্রিকটা নরম এবং বেশ ফর্সা। আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করছে আপনি রুমালটা ফেলে দিয়েছিলেন কেন?'

'ঠিক ফেলে দিইনি। রুমালটা হাত ফসকে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। আর কলকাতার রাস্তা যা নোংরা। খুব জরুরি জিনিস না হলে আমি সাধারণত রাস্তায় পড়ে যাওয়া জিনিস আর কুড়িয়ে নিই না।'

'ভালই করেন।'

'আর কিছু প্রশ্ন করবেন?'

'মানে, ঠিক জেরা নয় কিন্তু অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, রুমালটা আপনাকে ফেরত দেওয়ায় আপনি ব্যগ্রভাবেই সেটা নিলেন। অথচ রাস্তায় পড়ে যাওয়া জিনিস আপনি ধরতে ঘেন্না পান।'

'ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। একজন শিভালরিবশত রুমালটা কুড়িয়ে দিয়েছে, আমি না নিলে বেচারার ইগোতে লাগবে না?'

'অবশ্য, অবশ্য। আপনি খুবই বিবেচক মানুষ। এখনও বিশেষ স্নেহের সঙ্গে রুমালটা আপনার বাঁ মুঠোয় ধরা। এতে আমি এবং রুমাল দু'জনেই যথেষ্ট আপ্যায়িত বোধ করছি। রুমালটায় একটা বিশেষ মাদক গন্ধ আছে। সুগন্ধটার নাম জানতে পারি কি?'

'আমার প্রিয় সুগন্ধর নাম পয়জন।'

'গন্ধটা হিপনোটিক। কিছু যেন বলতে চায়।'

'ওটা আপনার অলস মাথার কল্পনা।'

'আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, স্থানচ্যুত একটি রুমাল ওথেলোর হাতে ডেসডিমোনার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

'রোমান্টিক যুগে ওসব হত। আজকাল হয় না।'

'কুড়িয়ে পাওয়া রুমাল থেকে অনেক কাহিনির জন্ম হয়েছে।'

'আজকাল কাহিনি অত সহজে জন্মায় না।'

'চিনি ছাড়া কফিটা খেতে কিন্তু মন্দ লাগল না।'

'এবার থেকে দুধ-চিনি ছাড়াই কফি খাবেন। কফির সঙ্গে দুধ, চিনি বা ক্রিম মেশানো মানে সত্যির সঙ্গে মিথ্যেকে মেশানো। আপনি যেমন অচলার সঙ্গে কল্পনা, নন্দিনীর সঙ্গে স্বপ্ন মেশান। প্রত্যেকটা পড়ে যাওয়া রুমালেই কিন্তু সংকেত থাকে না।'

'আপনি কি জানেন যে, আপনি বেশ নির্মম?'

'না, আমি নির্মম নই। আমি প্র্যাকটিকাল মাত্র।'

'আপনি ডিমলিশন স্কোয়াডের লোকের মতো।'

'তার মানে?'

'মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আমার ভিতরে বিস্তর ভাঙচুর করে দিয়েছেন। আমার কেমন যেন কাহিল লাগছে, হাতে পায়ে জোর নেই, চারদিকটা অন্যরকম লাগছে।'

'দুর্বলচিত্তদের এরকম মাঝে-মাঝে হয়।'

'যে দিন আপনার হাতে ক্ষমতা থাকবে ম্যাডাম, সেদিন কি দুর্বলচিত্তদের মৃত্যুদণ্ড দেবেন, না নির্বাসন?'

'সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

'উঃ, আপনি খুবই নিষ্ঠুর ম্যাডাম। এবার আমি বাড়ি যাবো।'

'সাবধানে যাবেন। আর কোনও রুমাল কুড়োতে যাবেন না যেন!'

'কেন ম্যাডাম? আপনার রুমালে কোনও সংকেত ছিল না বলে অন্য কোনো রুমালে থাকবে না তা কি হয়?'

'থাকলেও সেই রুমাল কুড়োতে হবে না।'

'কিন্তু কেন ম্যাডাম, কেন?'

'আমার রুমাল কি আপনাকে কিছুই বলেনি?'

'বুঝিয়ে দিন।'

'আমার রুমাল আপনার কাছে জানতে চাইছে, এক জীবনের পক্ষে একটা রুমাল কুড়োনোই কি যথেষ্ট নয়? আমার রুমালও যে কুড়িয়ে পেয়েছে আপনাকে!'

আপনজন

বাবার সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়নি মা। বাবাকে একটু ফোনটা দাও তো!

'তোমার বাবা! তোমার বাবা তো ঘুমিয়ে পড়েছেন!'

'সে কি? এত তাড়াতাড়ি! কলকাতায় তো এখন সবে সন্ধে আটটা বাজে!'

'আজকাল উনি সব সময়ে তো ঘুমিয়েই থাকেন।'

'কেন মা? বাবা এত ঘুমোয় কেন?'

'যত ঘুমোবেন ততই ভালো থাকবেন।'

'ডাক্তার বলেছে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারও বলেছে।'

'তবে বাবার সঙ্গে কি করে কথা বলা যাবে বলো তো! আমার যে বাবার সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে!'

'করবেই তো। পরে কোনও সময়ে বোলো।'

'বাবার শরীর কি খারপ? এনিথিং রং?

'না না। চিন্তার কিচ্ছু নেই। ভালোই তো আছেন। তবে বড্ড ঘুম।

'তুমি কেমন আছো মা?'

'খারাপ কিছু টের পাই না। মনে হয় বেশ ভালোই তো আছি। এখন বর্ষাকাল। জানলা দিয়ে কদমফুল দেখা যায়। তুমি তো দেখতে পাওনা। আমি পাই। কত ফুল ফুটেছে এবার!

'আমেরিকায় কদমগাছ নেই মা। বর্ষাকাল বলেও কিছু নেই।

'হ্যাঁ, তাই তো! অত দূর থেকে কদমফুল দেখবেই বা কি করে?

'আচ্ছা, তোমার রান্নার লোকটি এখনও আছে? সেই যে নমিতা। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ কিন্তু!

'নমিতা! হ্যাঁ নমিতা আছে। এই তো রান্না করে রেখে গেল।

'তুমি কি করছো! টিভি খুলে বসে আছো তো!

'না। আমি উল বুনছি।'

'কার জন্য?'

'কার জন্য বুনবো! না, কারও জন্য তো নয়। শুধু বুনে যাচ্ছি।

'নিশ্চয়ই বাবার জন্য! লজ্জায় বলছো না।

'না। কারও জন্য কিছু বুনছি না তো! শুধু বুনে যাচ্ছি। লম্বামতো একটা ফালি। হাত নেই, গলা নেই, মাপজোখ নেই। প্যাটার্ন নেই।

'সেকি? কেন?

'পুরোনো উল ছিল, সময় কাটাতে শুধু বুনে যাচ্ছি।

'আগে তো কত বই পড়তে! এখন পড়ো না?

বই? হ্যাঁ পড়ি। তবে একটা মুশকিল হয়। পরের পৃষ্ঠা পড়তে গেলে আগের পৃষ্ঠার কিছু মনে পড়ে না। আগের পৃষ্ঠায় কে যেন কাকে কি বলছিল, আবার পরের পৃষ্ঠায় কে যেন কাকে কি বলছে তা আর বুঝতে পারিনা। আবার তাই আগের পৃষ্ঠায় ফিরে যেতে হয়। তাই বই আর শেষ হতে চায় না।

'তোমার কি ডিসলেক্সিয়া হচ্ছে মা? এত ভুলে যাচ্ছ কেন?

'তা হবে হয়তো।'

'তাহলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও না কেন? অমলকাকুই তো কত বড় সাইকিয়াট্রিস্ট, একটা ফোন করলেই এসে দেখে যাবে।'

'একটু একটু ভুলে যাওয়া তো ভালো। সব মনে থাকলে কি কষ্ট হবে না?'

'কী ভুলতে চাও মা?'

'কত কিছু! এই তো কবে যেন আমার কয়েকটা গয়না চুরি হয়ে গেল। সে কথাটা ভুলে যাই বলে আর তেমন কষ্ট হয় না। একটু একটু ভুলে যাওয়াও খুব দরকার।

'সর্বনাশ! গয়না চুরি হয়ে গেছে! বলোনি তো! কি কি গয়না চুরি গেল?'

'দুটো বালা, একটা হার আর বোধহয় একজোড়া দুলও। খুলে এক জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম। পরে দেখলাম নেই।'

'কে চুরি করল?'

'কেউ হবে। দেখিনি তো!'

'নিশ্চয়ই কাজের লোক!'

'তা হতে পারে।'

'পুলিশে খবর দাওনি?'

'না, পুলিশ এসে বড় জেরা করে।'

'তা বলে চুপ করে থাকবে? কাজের লোককে জিগ্যেস করোনি?'

'সে তো করেছি। বলল নেয়নি। আর কি বলব বলো!'

'তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, নইলে আরও যাবে।

'কিন্তু কাজের লোক যে পাওয়া যায় না আজকাল। ঝাড়পোঁছ কে করে বলো। নতুন যে আসবে সেও কি ভালো হবে?

'তুমি বড় চিন্তায় ফেললে আমাকে।'

'না, না, চিন্তা কোরো না। এরকম তো হয়। সেইজন্যই ভুলে টুলে বেশ থাকি।

'বাবাকে বলেছো?

'না তো! ওকে আমি আজকাল কিচ্ছু বলি না। এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কি ওকে জড়ানো উচিত?

'ব্যাপারটা ছোটখাটো নয় মা। বেশ কয়েকহাজার টাকার সোনা।'

'ওই তো! ওসব মনে পড়লেই মন খারাপ হয়। কষ্ট হয়। ওই জন্যই ভুলে থাকা দরকার।

'গয়নাগুলো সব লকারে রেখে দাও না কেন?'

'লকারেই আছে। কয়েকটা বাইরে ছিল। খুব বেশি গয়না তো আমার নেই।'

'সাবধানে থেকো। একটু খেয়াল রেখো চারদিকটা।

'হ্যাঁ, সাবধানেই তো থাকি। রাত দশটা বাজলে সদর দরজা আটকে দিই। এখন তো বর্ষাকাল। এবার খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তুমি কি বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছো?'

'না মা।'

'খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আজ আর কেউ আসবে না।'

'কার আসবার কথা বলো তো।'

'মাঝেমাঝে অফিস-ফেরত টুলটুল আসে তো।

'টুলটুলটা আবার কে?

'ওই একটা মেয়ে। এ পাড়ায় নতুন। মাঝে মাঝে আসে। আজ যা বৃষ্টি, রাস্তায় জল জমে গেছে নিশ্চয়ই।'

'আজ ছাড়ছি মা।'

'আচ্ছা। ভালো থেকো।'

'তুমি কিন্তু আজ কারও কথা জিগ্যেস করলে না। ইচ্ছে বা ইতির কথা!

ওই দেখ! ওইরকমই তো ভুল হয় আমার! সত্যিই তো, কেমন আছে ওরা?

'ভালো আছে মা।'

ফোনটা মুঠোর মধ্যেই মরে গেল। কেটে গেল, না অয়ন কেটে দিল তা খুব ভালো বুঝতে পারল না রমা। অবশ্য একই কথা। কেটেই যাক, আর কেটেই দিক। কত কাজ থাকে ওদের। ওরা তো তার মতো নয়। ঠিক যেন একটা ইস্টিশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর ছাড়ছেই না। চলার ইচ্ছাই নেই আর।

বেশ অনেকক্ষণ বাদে ডোরবেল বাজল। এই একটা শব্দ রমার বেশ ভালো লাগে, সহ্য হয়। ডোরবেল মানেই কারও আসা তো!

হ্যাঁ, টুলটুল। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা, কালো, মুখখানা বড্ড ভাঙাচোরা। দেখতে ভালো নয়, কিন্তু চোখ দু'খানার দিকে চাইলে বোঝা যায় গভীর মায়া যেন মেঘ করে আছে।

'ওমা। এসো এসো। ভেজোনি তো!'

'এই একটুখানি। ছাতা ছিল, পায়ের দিকটা একটু ভিজেছে।

'হ্যাঁ, টুলটুলের স্বরটা ভীষণ ভালো। সুরেলা বলা যায় কী? তাই হবে বোধহয়। রমা শুনেছে, টুলটুল ভালো গান গায়। রমা শুনতে চায়নি কখনও, টুলটুলও শোনায়নি।

'আপনি আজ সারাদিন কি করলেন মাসিমা?'

রমা যেন খুব একটু ভাবার চেষ্টা করে বলে, আজ! আজ আর কিছু করিনি, সারাদিনটা তো বেশ কেটে গেল। সকালের দিকে আজ অনেকক্ষণ জানালার পাশের ওই কদম গাছটাকে দেখলাম। সারাবছর কেমন মনমরা হয়ে থাকে, আর এখন যেন গয়না পরে গুমোর হয়েছে। ভারি ভালো দেখাচ্ছিল।

'ব্যস! আর কিছু করেননি?'

'করেছি তো। স্নান, দুপুরে খাওয়া।'

'ঘুমিয়েছেন?'

'না বাবা, দুপুরে ঘুমোলে রাতে হতে চায় না।'

'আপনাকে না বলেছি রোজ সারাদিন যা করেছেন সব লিখে রাখবেন?

'লিখতে গেলে মনে হয় কিছুই তো লেখার নেই। স্নান করলাম, খেলাম, বসে থাকলাম, শুধু এসব লিখে যেতে কি ইচ্ছে হয় বলো!

'টুলটুল হাসল। বলল, তবু লিখবেন। তাতে স্মৃতিটা ঠিক থাকবে। দাঁড়ান, এবার চা করে আনি।'

নমিতা একবার চা করে খাইয়ে গেছে তাকে। কিন্তু সেই চা-টা তেমন উপভোগ করে না রমা। টুলটুল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ যেটা করে সেটা কে জানে কেন, বেশ ভালো লাগে।

ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি দু'জন চা নিয়ে বসে।

'কাল রবিবার। চলুন, কাল একটু মল-এ ঘুরে আসবেন।'

'কিন্তু জিনিসপত্র কিনতে যে আমার আর ইচ্ছে হয় না। কিছুই তো দরকার নেই আমার।'

'নাই বা কিনলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেও তো মন ভালো হয়ে যায়। তাছাড়া লোকজন থাকে, আলো-টালো থাকে, একটা জমজমাট ব্যাপার তো! কাজ না থাকলেও লোকে আজকাল মল-এ ঘুরতে যায়।

'আগে তো কত দুপুর গড়িয়াহাটে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিয়েছি। আজেবাজে কত কি কিনতাম। বেশ লাগত। এখন কি আর সেরকম লাগবে? তবু তুমি যখন বলছো যাবো।

'আপনার বাড়ির চায়ে একটা বেশ সুন্দর গন্ধ। কোথায় কেনেন?

'এর নাম কেদার।'

'কার নাম কেদার?

'যার দোকান থেকে ওই চা আনা হয়।'

'দোকানটা আমাকে চিনিয়ে দেবেন তো! আমি তো একটু ভালো চা খুঁজে খুঁজে হয়রান। গত সপ্তাহে একটা নাম-করা দোকানে লাইন দিয়ে চা কিনলাম। এক কাঁড়ি দামও নিল। কিন্তু একটুও ভালো লাগল না।

'এটা কিন্তু দামি চা নয়। মাত্র আড়াইশো টাকা কেজি।

'ওমা! তাই?'

'হ্যাঁ তো! তোমার মেসোমশাই বরাবর ওর দোকান থেকেই আনত।

'তাহলে কেদারের চা-ই আনতে হবে।'

'ওর সব বাঁধা দোকান ছিল। আলু কিনবে আদিত্যর কাছে, চাল কিনবে সূর্যির কাছে, বিস্কুট বা পাউরুটি সুকুমারের দোকানে। কিছুতেই অন্য কারও কাছে কিনবে না। এমনকি মাছ, মাংস, ডিম সব বাঁধা দোকান। ওদের সঙ্গে ভাবও ছিল খুব। প্রায়ই বসে এক-একজনের হাঁড়ির খবর বলত। কার মা মারা গেল, কার ছেলে এম এ পাশ করল, কার বউ শাড়িতে ফলস লাগাতে পারে এইসব। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছি। অচেনা লোকের হাঁড়ির খবর শুনতে ভালো লাগে বলো!

টুলটুল হাসিমুখে বলল, বাজারে অনেকক্ষণ সময় লাগত বুঝি?

'ও বাবা! বাজার ছিল ওর প্রাণ। ঘরে সব থাকা সত্ত্বেও ঝড় হোক, জল হোক একবার বাজারে যাওয়া চাই-ই! আর তো বন্ধু ছিল না।'

'আপনারও তো বন্ধু নেই।'

'আছে, আমারও আছে। ওই যে কদমগাছ, এই যে উল আর কাঁটা, এই যে শূন্যতা, এরা বুঝি বন্ধু নয়?

টুলটুল একটু মায়াভরে তাকিয়ে থাকল।

'আমাকে পাগল ভাবছো তো! আমার ছেলেও তাই ভাবে। কিন্তু যা-ই ভাবো, আমার কিন্তু এদের নিয়ে বেশ কেটে যায়। কথাও বলি, একা একা। লোকে তো পাগল ভাবতেই পারে। কিন্তু যার কেউ নেই তারও তো মাকড়সার মতো চারদিকে একটা জালের মতো কিছু তৈরি করে নিতে হয়।'

বউ

আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিগ্যেস করব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না। মনে করার কী আছে?

গত মাসখানেক বা তারও বেশি আমি রোজই বিকেলের দিকে দেখতে পাই যে, আপনি এই লেক-এর ধারে এই বেঞ্চখানায় চুপটি করে বসে থাকেন।

ঠিকই দেখেছেন।

আর ওই গাছতলার বেঞ্চখানায় ওই যে মেয়েটি সে-ও চুপ করে বসে থাকে।

না, আপনার দেখার মধ্যে কোনও ভুল নেই।

যেদিন বেঞ্চে জায়গা না থাকে সেদিন আপনি সামনে ঘাসের ওপর বসেন এবং মেয়েটিও তাই করে। আমি বুড়ো মানুষ, তাই আমার কথায় অসন্তুষ্ট হবেন না, বলছিলাম কি আপনাদের মধ্যে কি একটু রোমান্স চলছে? নইলে দুজনে ঠিক একই সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় একটু তফাত রেখে বসে থাকেন কেন?

এবার আপনার অনুমানটা ঠিক হয়নি। না মশাই, আমাদের মধ্যে কোনও রোমান্স চলছে না।

তাহলে আমাকে মাপ করবেন। আমি বড্ড বেশি আগ বাড়িয়ে ভেবে ফেলেছি, কাজটা ঠিক হয়নি।

মাপ চাইছেন কেন? আপনি আমার বাবার বয়সী, গুরুজন। আসলে উনি আমার প্রাক্তন স্ত্রী।

প্রাক্তন স্ত্রী! প্রাক্তন স্ত্রী মানেটা ঠিক বুঝলাম না।

খুব সোজা। উনি আমার স্ত্রী ছিলেন, এখন আর নেই। ওঁর সঙ্গে আমার বছরখানেক আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

তাই বলুন। আসলে ডিভোর্স জিনিসটা মাথায় খেলেনি বলেই প্রাক্তন স্ত্রী শুনে খটকা লেগেছিল। আমাদের আমলে তো স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স বড় একটা শোনা যেত না।

এখন জলভাত।

আপনার পাশে কি একটু বসতে পারি?

আরে বসুন না, বসুন, অনুমতি নিচ্ছেন কেন?

আমার তো সময় কাটে না, কথা বলারও লোক পাই না। তাই একটু কথা কইতে ইচ্ছে করছে। আপনাদের ডিভোর্সটা হল কেন? বনিবনা হচ্ছিল না নাকি?

না, বনিবনা হলে আর ডিভোর্সের দরকার কি ছিল বলুন!

ঠিকই তো। তবে কিনা আমার এই চুরাশি বছর বয়স অবধি গত আটান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একদিনও বনিবনা হয়নি। খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি, রাগ-অভিমান, এইসব আটান্ন বছর ধরেই চলে আসছে। স্বামী-স্ত্রীর অবনিবনা হলে ছেলে-পুলেরা মানুষ হয় না, জানেন তো! আমাদের ছেলেপিলেগুলোও একটাও মানুষ হল না। তা সে যাকগে। আমি বউকে ডিভোর্স করে উঠতে পারিনি। তা আপনারও কি সেইরকম?

আপনি পিতৃতুল্য মানুষ, আপনাকে বলা যায়। আমার স্ত্রী একজন বড় মানুষের আদুরে মেয়ে এবং একমাত্র সন্তান। ওর বাবা একজন প্রভাবশালী লোকও বটেন। আমি একসময়ে ক্রিকেট খেলতাম, আর চেহারাটাও বেশ ভালো ছিল।

সে কি! আপনি পাস্ট টেনসে বলছেন কেন? আপনার চেহারা তো এখনও অতি চমৎকার। জোরালো পুরুষালি চেহারা।

হ্যাঁ। কিন্তু ওটুকু ছাড়া আমার আর তেমন কোনও গুণ নেই। ক্রিকেটে আমি যেমন শচীন হতে পারিনি তেমনি চেহারার দৌলতে হতে পারিনি উত্তমকুমারও। আর আমাকে ভালোবেসে একরকম জোর করে বিয়ে করার পরই আমার বউ সেসব বুঝতে পেরে রোজই আমাকে বলত, তোমাকে যা ভেবেছিলাম তুমি মোটেই তা নও।

সে তো আমার বউও আমাকে নিত্যদিন বলে।

আপনারও কি লাভ ম্যারেজ?

না। আর ওইটেই বাঁচোয়া। তারপর কি হল বলুন।

না, তেমন কিছু নয়। রেলে আমার সামান্য চাকরি। বাড়িতে আমার অনেক ভাই-বোন এবং বাপ-মা। আমাদের অবস্থা নিতান্তই ছাপোষা। সুতরাং আমার বউয়ের মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। বছর পাঁচেক আগেই, অর্থাৎ বিয়ের এক বছরের মধ্যেই আমার বউ বাপের বাড়ি ফেরত গেল এবং ডিভোর্সের মামলা ঠুকে দিল।

দুঃখের ব্যাপার।

আমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপারও বটে। কারণ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার ওপর পুরুষের পৌরুষেও তো একটা ঘা লাগার কথা।

তা তো বটেই।

ডিভোর্সের মামলায় উকিলের পরামর্শে উনি এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, আমার নাকি পুরুষত্বই নেই।

বলেন কি?

সেইটে আমার খুব আঁতে লেগেছিল। তার ওপর চারশো আটানব্বই ধারায় পুলিশ রিপোর্ট হওয়ায় আমার মা-বাবা সমেত আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম। কাস্টডিতে আমাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনও হয়েছিল।

এঃ হেঃ, আজকাল এসব যে কী হচ্ছে!

তবে আমার এক কাকা মস্ত উকিল এবং প্রভাবশালী মানুষ। তিনি পারিবারিক কেলেঙ্কারি ঠেকাতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ায় আমরা টক করে জামিন পেয়ে যাই। আর তার পরেই আমি নিজের ওপর লজ্জায়-ঘেন্নায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাই মধ্যপ্রদেশ। খুব ক্ষীণ একটা চেনাজানার সূত্রে আমি মধ্যপ্রদেশের একটা খনি অঞ্চলে কিছুদিন পালিয়ে থাকি। তারপর ব্যবসা শুরু করি।

ব্যবসা! কিসের ব্যবসা মশাই?

আমার প্রথম ব্যবসাটা ছিল পুরোনো গাড়ি কেনা-বেচার দালালি। যাদের বাড়িতে থাকতাম তাদেরই একটা পুরোনো অ্যাম্বাসাডার ছিল। ট্রাবল দিচ্ছিল। বেচতে চাইছিল, খদ্দের জুটছিল না। আমি ঘুরে ঘুরে শেষে খদ্দের পাকড়াও করলাম। ভালো দামে গাড়িটা বিকিয়ে যাওয়ায় দু'হাজার টাকা কমিশন পেয়ে যাই।

তারপর?

বছরখানেক গাড়ির দালালি করে কিছু টাকা হাতে এসেছিল। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার মতো। তারপর এক ট্রান্সপোর্টওয়ালার সঙ্গে দোস্তির সুবাদে ধারে তার পুরোনো একটা ট্রাক কিনে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা খুলি। ট্রাক নিজেই চালাতাম বলে মার্জিন ভালোই থাকত। ঝামেলার ব্যবসা। ট্রাক বেচে দিয়ে শুরু করি ঠিকাদারি। খনি অঞ্চলে ঠিকাদারদের খুব রমরমা। টক করে আমার বেশ পয়সা হয়ে গেল। তখন আমি একটা রিসর্ট খোলবার চেষ্টা করি। মধ্যপ্রদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাব নেই। একটা ভালো স্পট দেখে একটা রিসর্ট খুলে ফেললাম। আস্তে আস্তে সেই রিসর্টও আমাকে পয়সা দিতে শুরু করেছে।

তার মানে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই আপনার উন্নতি?

উন্নতি বলব না। পাঁচ বছরে খুব একটা উন্নতি হয় না, তবে হ্যাঁ, বেশ কয়েক লাখ টাকা আমার হাতে এসে গেছে।

কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রসঙ্গটা যে চাপা পড়ে গেল মশাই।

হ্যাঁ। তবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, একেবারেই কাকতালীয়। এরকম ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

কিরকম ঘটনা মশাই?

প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ-গান করতে কলকাতা থেকে একটা দল গিয়েছিল। তারা উঠেছিল আমার রিসর্টেই। সেই দলে আমার বউকে দেখে আমি তো তাজ্জব।

তারপর কী হল মশাই? বউ কি আপনাকে চিনতে পারল?

প্রথমটায় আমিই গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম, সামনে যাইনি। তবে আমার বউ বোধহয় কারও কাছে কিছু শুনে থাকবে। আমার রিসর্টটা খুব একটা পশ রিসর্ট নয়। সুইমিং পুল বা মাল্টি জিম নেই। তবে একটা বিউটি পার্লার আছে। কলকাতা আর ভোপাল থেকে আমি জনা চারেক বিউটিশিয়ানকে রিক্রুট করেছি। এই বিউটি পার্লার থেকেই আমার রোজগার সবচেয়ে ভালো হয়। আমার বউ বোধহয় সেখান থেকেই আমার হদিস পেয়ে যায় এবং আমার সঙ্গে নিজেই যেচে দেখা করার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। আমার সন্দেহ ছিল যে, আমার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবার ফিকির খুঁজছে। কিছুদিন তাকে এড়িয়ে থাকবার পর একদিন সে আচমকাই আমার ঘরে এসে হাজির।

বাঃ, এ তো চমৎকার ঘটনা!

চমৎকার না হলেও চমকপ্রদ। সে প্রথমেই কান্নাকাটি এবং ক্ষমা চাওয়া-টাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে সোজা বলল, আমি তোমার সঙ্গেই জীবন কাটাতে চাই। আমি খুব ঠান্ডা হিসেবি গলায় তাকে বললাম, আমি

তোমাকে বিশ্বাস করি না, তোমার প্রতি কোনও দুর্বলতাও নেই। সুতরাং তোমার সঙ্গে জীবন কাটানোর প্রশ্নই ওঠে না। শুনে খুব ভেঙে পড়ল। খুব কাঁদল, রাগও করল, চেঁচামেচিও হল।

তারপর?

তারপর বলল, আমি তাকে যদি গ্রহণ না-ই করি তবে অন্তত আমার রিসর্টেই তাকে একটু থাকার জায়গা দেওয়া হোক। সে তার বদলে যে-কোনও কাজ করতে রাজি। আমি এ প্রস্তাবেও রাজি হইনি।

আপনি বেশ কঠিন ধাতুর মানুষ।

তা বলতে পারেন। তবে মেয়েটিও বড় কম অ্যারোগ্যান্ট নয়। আমি রিফিউজ করা সত্ত্বেও সে কিন্তু ফিরে গেল না। রিসর্টেই একটা ঘর নিয়ে ভাড়া দিয়ে থাকতে লাগল। পার ডে চারশো টাকা ভাড়া গুনে গত সাত মাস ধরে সে আমার রিসর্টে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তবে বসে থাকে না, ঘুরে ঘুরে চারদিকে কাজকর্ম দেখে, গেস্টদের দেখাশুনো করে, রান্নার তদারক করে, বাগানের পরিচর্যা করে, এমনকি বিউটি পার্লারের দেখভাল এবং অ্যাকাউন্টসের কাজেও নাক গলায়। তবে আমার কাছে আসার বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে না।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

সেটাই তো মুশকিল এবং বিরক্তিকর। দু'মাস আগে আমি ভালো দাম পেয়ে রিসর্টটা বিক্রি করে দিয়েছি। উজ্জয়িনীর একটা পশ এরিয়ায় একটা ভালো স্পট পেয়েছি। এবার সেখানে একটা ভালো রিসর্ট বানাবো। কাজ শুরু হতে দেরি আছে বলে দু'মাসের জন্য মা-বাবার কাছে এসেছি। কিন্তু কমলি ছাড়ছে না।

তার মানে?

তার মানে আমার প্রাক্তন স্ত্রী আমার পিছু ছাড়ছে না। ইতিমধ্যে আমার মা-বাবাকে পটিয়ে ফেলেছে, আমর ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাব করেছে এবং এখন আমাদের বাড়িতেই অন্য ঘরে থাকে। আমার সঙ্গে কথা-টথা বলার বা ভাব জমানোর চেষ্টাও করে না। কিন্তু সর্বত্র আমার পিছু পিছু ছায়ার মতো লেগে থাকে।

বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনবেন? ক্ষমা করে দিন।

ক্ষমা করা কি সোজা কথা? ও মেয়েকে বিশ্বাস কি? ওর সম্পর্কে আমার একটা ভয় কাজ করে। কেবলই মনে হয়, ও আমার বিরুদ্ধে গোপনে কোনও মতলব আঁটছে। মধ্যপ্রদেশে একটি অবাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার একটু ভাবও হয়ে পড়েছিল। হয়তো শেষ অবধি তাকে বিয়েও করতাম। আমার সন্দেহ, ও গিয়ে তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা আর আমার কাছে ঘেঁষে না।

এ তো খারাপ কিছু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

আমার হয়। প্রাক্তন স্ত্রীটিকে আমি তেমন সহ্য করতে পারছি না।

দেখতে কিন্তু ভারী মিষ্টি।

হ্যাঁ, দেখনসই আছে। কিন্তু ভিতরে অনেক গণ্ডগোল। ওর জন্যই আমার ভিতরে

একটা টেনশন তৈরি হচ্ছে। ওই তো দেখুন না, রোজ আমার পিছু পিছু এসে বসে থাকে, বোধহয় আমাকে পাহারা দেয়। এসব কি আর ভালো লক্ষণ! ভাবছি, একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো।

নিরুদ্দেশ হওয়ার ইচ্ছে আমারও খুব হত জানেন। এক-আধবার দু'চার দিনের জন্য হাওয়াও হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি বউ কেঁদে-কেটে, মূর্ছা গিয়ে এবং উপোস করে আধমরা হয়ে গেছে। তাই আর স্থায়ীভাবে নিরুদ্দেশ হওয়া সম্ভব হয়নি। তা সত্যিই কি নিরুদ্দেশ হওয়ার ইচ্ছে?

ভাবছি।

তবে একটা কথা। আপনি বিজনেসম্যান বলেই বলছি। বউকে যদি নিজের কাছে রাখেন তাহলে বিনা বেতনের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী তো পাবেন।

তার মানে?

আপনিই তো বলছিলেন, বউ আপনার রিসর্ট দেখাশোনা করত।

তা বলেছি।

যদি বউকে অগ্রাহ্য না করেন তাহলে সে আরও হামলে পড়ে আপনার সঙ্গে ব্যবসা আগলাবে। একটি পয়সা বেতন না দিলেও চলবে।

কথাটা তো মন্দ বলেননি।

তার ওপর বউ নিশ্চয়ই অন্য কর্মচারীদের মতো অবিশ্বাসী হবে না। আপনার তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। আর বিপদে-আপদে বউ যেমন আগলায় তেমন কি আর কেউ করবে? উপরন্তু মেয়েটি অনুতপ্ত, আপনাকে বোধহয় প্রাণ দিয়ে ভালোও বাসে। না মশাই, আপনি বউটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে ভুলই করবেন।

হুঁ। কথাটা মন্দ বলেননি। কর্মচারীর অ্যাঙ্গেলটা খারাপও নয়। একজন ট্রাস্টওয়ার্দি ম্যানেজারের তো খুবই দরকার।

তাহলে?

দাঁড়ান, ব্যাপারটা ভেবে দেখি।

ভাবুন, ভাবুন, কষে ভাবুন। একটর হেস্তনেস্ত করে ফেলুন তো।

বহরমপুরের বাড়ি

তুমি তো জানোই আমি সতী নই! আমার অনেক ছেলে-বন্ধু আছে। আমি হুল্লোড়বাজ, মদ সিগারেট গাঁজাও খাই ইচ্ছে হলে। আমি তো ভালো মেয়ে নই শানুদা। বউগিরি কি আমার কাজ? তুমি একটা ভালো মেয়ে খুঁজে নাও।

আমি কি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি মিলি?

তবে কি জন্যে এসেছো? এর আগে দু'বার তো বিয়ের কথাই বলতে এসেছিলে। শেষবার গত ডিসেম্বরে। ক্রিসমাস ছিল সেদিন।

হ্যাঁ। কিন্তু আজ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা নয়।

কিন্তু আমাকে উপদেশ দিতে আসোনি তো? উপদেশ আমার একদম সহ্য হয় না। উপদেশ শুনলে শরীর খারাপ লাগে।

তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো আহাম্মক আমি নই। কারণ, ভালো-মন্দ সম্পর্কে তুমি তো কম জানো না। আজকাল ভালো বা খারাপ যে যাই করুক তা জেনে বুঝেই করে।

তবে এই ছুটির সকালবেলায় সেই বহরমপুর থেকে এসে হাজির হয়েছো কেন তা দয়া করে বলবে?

তুমি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তা আমি জানি মিলি। তবু দু-একটা বৈষয়িক কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনলে ভালো হয়। পনেরো মিনিট বড়জোর।

আহা, অত তাড়াহুড়ো করতে বলিনি তোমায়। এমন ভাব করছো যেন আমি তোমাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচি। তুমি বোসো তো, চা-টা খাও। ধীরে-সুস্থে শোনা যাবে। আমি এবেলা কোথাও বেরোবো না।

ঠিক আছে। বসতে বললে বলে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। এক বছর হল তোমার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে তুমি আর বহরমপুরে যাওনি। তোমাদের বাড়িটা খালি পড়ে আছে বলে সেটার ওপর অনেকের নজর পড়েছে। বুঝতেই পারছো, রিয়াল এস্টেটের গুরুত্ব এখন কতটা বেড়েছে।

শানুদা, বাড়িটা দেখাশোনা করার ভার বাবা তো তোমাকেই দিয়ে গেছেন।

সেটা তো অনন্তকালের জন্য নয়। আমাকেও তো রুজি-রোজগারের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়ি আগলে বসে থাকলে তো আমার চলবে না।

তুমি কি করতে বলছো?

ভালো দাম পেলে বিক্রি করে দিতে পারো।

এমা! বিক্রি করবো কেন? ওই বাড়িতে আমার জন্ম, বড় হয়ে ওঠা। ওই বাড়িতে আমার কত গল্প আর স্বপ্ন লুকিয়ে রয়েছে! আমার তো ঠিক করাই আছে, বুড়ো হলে আমি ফের ওই বাড়িতে ফিরে যাবো।

সে তো ভালো কথা। কিন্তু ততদিন বাড়িটা রক্ষা করবে কে?

কেন, তুমি করবে। বরং একজন কেয়ারটেকার রেখে দাও। আমি প্রতিমাসে তার মাইনে পাঠিয়ে দেবো।

সেটা ভালো প্রস্তাব। কিন্তু বিশ্বাসী লোক না হলে মুশকিল। কেয়ারটেকার হয়তো মদের ঠেক বা জুয়ার আড্ডা বসাবে। রিস্ক আছে কিন্তু।

কেন, খুঁজলে ভালো লোক পাওয়া যাবে না? দেশে তো শুনি লাখো লাখো বেকার।

বেশিরভাব বেকারই খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে তো! তাই রিস্ক থাকে। তুমি তো জানোই বাড়িটা বিশাল বড়। একতলা-দোতলা মিলিয়ে বারোখানা শোওয়ার ঘর, হলঘর, গেস্টরুম, বৈঠকখানা, তার ওপর প্রায় দু-বিঘের বাগান। রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ নয়। আর তুমি একথাও ভুলে গেছো যে, অলরেডি একজন কেয়ারটেকার গত দশ বছর ধরে আছে। তোমার বাবাই তাকে রেখেছিলেন। তবে সে এখন বুড়ো হয়েছে, সামলাতে পারছে না। অত বড় বাড়ি ঝাড়পোঁছ করে রাখা কি সোজা কাজ?

সত্যিই তো! আমি বিশুদার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! কেন বলো তো! আমি অবশ্য বিশুদাকে খুব বেশি দেখিনি। বহরমপুর ছেড়েছিও বারো বছর হয়ে গেল! তখন আমার ষোলো বছর বয়স ছিল। কলকাতায় পড়তে চলে এসেছিলাম। হ্যাঁ, বিশুদার কথা কি বলছিলে?

যাক, বিশুকে তাহলে তোমার মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, পড়েছে। কেন যে ভুলে গিয়েছিলাম বুঝতে পারছি না।

বিশু অবশ্য মনে রাখার মতো গুরুতর মানুষ নয়। সামান্য মানুষদের কে আর মনে রাখে বলো। তবে বিশু অত বড় বাড়ি সামাল দিতে পারছে না। পাড়ার একটা ক্লাব তোমাদের আউট হাউসটা দখল করতে চাইছে। প্রোমোটাররা প্রায় রোজই এসে হানা দিচ্ছে। সকলেরই প্রশ্ন এত বড় বাড়ি আর এতটা জায়গা বেকার পড়ে থাকবে কেন?

বাঃ রে, আমার বাড়ি আমি ফেলে রাখলে কার কী? এটা কি মগের মুলুক?

হ্যাঁ মিলি, তুমি হয়তো জানো না যে, এটা মগেরই মুলুক। সংবিধান দেখিয়ে এখানে কোনও কাজ হয় না। এখানে কাজ হয় অর্থবল আর বাহুবলে।

আচ্ছা, তুমিও তো শুনি ওখানকার একজন প্রভাবশালী মানুষ, তাই না? তোমারও তো ফুটবল ক্লাব আছে, জিমন্যাসিয়াম আছে।

তাতে কী হল?

ধরো, বাড়িটা যদি তোমার হত তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই বাড়ি প্রোমোটার বা ক্লাবের হাতে ছেড়ে দিতে না।

বাড়িটা আমার হলে আমি সেখানে বসবাস করতাম। সেক্ষেত্রে কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তোমাদের বাড়িটা এমনি পড়ে আছে, অব্যবহৃত। বাড়িতে লোকজন না থাকলেই মুশকিল।

তুমি কি বলতে চাও, বাড়িটা বাঁচানোর জন্য আমি এখন কলকাতা ছেড়ে বহরমপুরে গিয়ে থাকি? কলকাতায় তো আমি এমনি বসে নেই। ভালো একটা চাকরি করি, গান গাই, একটা এনজিও-র সঙ্গেও আছি।

সেটা আমি জানি মিলি, কলকাতায় তোমার অনেক কাজ। আর এটাও জানি যে, কোনওদিন তুমি আর বহরমপুরে ফিরে যেতে পারবে না। বুড়ো বয়সেও নয়। তোমার জনশূন্য বাড়িকে এতদিন কে আগলে রাখবে

বলো? বিশেষ করে এখন যখন অনেক লোভী লোকের নজর পড়েছে?

আচ্ছা, ধরো যদি একটা-দুটো ঘর নিজের জন্য রেখে বাকিটা অনাথ আশ্রম বা বৃদ্ধাবাস করে দিই?

সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে বৃদ্ধাবাস বা অনাথ আশ্রম চালাতে গেলে একটা সিস্টেমেরও দরকার হয়। রিমোট কন্ট্রোলে তো চলবে না। এবং তার পরেও কথা আছে। বাড়িটা হয়তো বাঁচল, কিন্তু অতটা জমিও ফাঁকা পড়ে আছে। কোনও এক প্রাইভেট পার্টি কিছুদিন আগে জমিটা মাপজোক করেছে বলেও খবর পেয়েছি।

উঃ, তুমি আজ আমার সুন্দর দিনটাই নষ্ট করে দিলে! নতুন একটা টেনশন ঢুকিয়ে দিয়ে গেলে তো মাথায়! আমার পক্ষে যে আর বহরমপুরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় তা আমিও জানি। আমার বাড়িটা বেচে দিতেও মন চাইছে না। কি করবো বলো তো!

সেটা জানবার জন্যই সাতসকালে ছুটে এসেছি। আরও একটা কথা। তোমাদের বাড়িতে অনেক দামি জিনিসপত্র আছে। দামি আসবাব, বাসনপত্র, এসি, ফ্রিজ, টিভি, মিউজিক সিস্টেম। চোর-ডাকাত কেন হানা দেয়নি সেটাই ভাববার কথা। দিলে ঠেকাবারও কেউ নেই কিন্তু।

চোর-ডাকাত কেন আসে না তা আন্দাজ করতে পারছি। তোমার জন্য। তোমাকে সবাই ভয় পায়।

ব্যাপারটা কিন্তু হালকা করে দিও না। আমি কোনও গুন্ডা-মস্তান নই যে, আমাকে চোর-ডাকাতরা ভয় পাবে।

আমি তো তোমাকে গুন্ডা-মস্তান বলিনি। তবে জানি, ওই শহরের সবাই তোমাকে সমঝে চলে। সেটা কেন, তা জানি না।

আমার তোমাকে যা বলার ছিল বলেছি। তোমার বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব এখন থেকে তুমিই নাও। বিশু থাকতে চাইছে না, বয়স হয়েছে, আমারও অনেক কাজ আছে।

তুমি কি আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছো?

প্রতিশোধ! প্রতিশোধের কথা উঠছে কেন? কিসের প্রতিশোধ?

তোমার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি বলে!

না মিলি, আমি ওসব মনে রাখিনি। একসময়ে তোমার প্রেমে পড়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু তুমি বদলে গেছো। তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না কখনও।

আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?

কি কাজ?

বাড়িটা তুমিই কিনে নাও না কেন? আমার জন্য দুটো ঘর রেখো, তাহলেই হবে।

আমি কিনবো। কেন বলো তো? আমারও তো একটা বাড়ি আছে।

লোকের বুঝি একটার বেশি বাড়ি থাকতে নেই?

লোকের হয়তো অনেকের অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমার পৈতৃক বাড়িটা আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার বেশি কিছুর দরকার হয় না। আর আমার সাধ্যও নেই তোমার বাড়ি কেনার।

তোমার কাছে কি বাড়ির দাম চেয়েছি?

তুমি তো স্পষ্টই বললে যে, বাড়িটা যেন আমি কিনে নিই।

বলেছি তো। কিন্তু টাকা দিয়ে কেনার কথা বলিনি।

তাহলে কোন নতুন পদ্ধতিতে তা কিনতে হবে?

বিনা পয়সায় কাউকে কিছু বিক্রি করা যায় না?

না। বিনা পয়সায় হস্তান্তর করলে সেটা দান হয়ে যায়।

ও, তুমি তো বোধহয় আমার দানও নেবে না।

প্রশ্নই ওঠে না। দান করতে চাইলে দানের অনেক পাত্র পাবে। ওই বাড়ির জন্য অনেকেই ওৎ পেতে আছে।

কিন্তু তাদের মধ্যে তুমি তো নেই!

না মিলি। তুমি হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি মারছো, হয়তো বহরমপুরের বাড়িটার প্রয়োজনও তোমার ফুরিয়েছে, এবং হয়তো তোমার টাকার লোভও নেই। যদি তাই হয় তবে তুমি ইচ্ছে করলে তোমার সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে পারো।

আর তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, তাই না?

হ্যাঁ। মেসোমশাই দায়িত্বটা দেওয়ার সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, মিলির বহরমপুরের পাট তো বোধহয় চুকেই গেল রে। শুধু ফোন করে খবর নেয়, কখনও আসে না। আমি চলে গেলে এ বাড়িটার কী হবে কে জানে! তুই একটু দেখিস যেন দেখভালের অভাবে বাড়িটা হাতছাড়া না হয়ে যায়।

ও কথা থাক। তুমি ক'টার ট্রেন ধরেছো আজ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বলোই না।

ভোর রাতের ট্রেন।

তার মানে এখনও সকালের জলখাবারটাও খাওনি।

আমার জলখাবার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি মাত্র পনেরো মিনিট সময় চেয়েছিলাম। চোদ্দো মিনিট পার হয়ে গেছে। এবার আমি যাবো মিলি। তোমার ডিসিশনটা ফোনে বা ই-মেল করে জানিয়ে দিও।

অত রাগ করছো কেন শানুদা? আসলে তুমি অপমানটা ভোলোনি বলে ঘুরিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছো।

বললাম তো প্রতিশোধের কিছু নেই।

তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার সমস্ত শরীরে একটা আক্রোশ ফুটে বেরোচ্ছে।

না মিলি, তোমার ওপর আমার কোনও আক্রোশ নেই।

আছে। আর আক্রোশ থাকার যথেষ্ট কারণও আছে। বিয়ের আগে পুরুষেরা পজেটিভ হয়, আর বিয়ের পর মেয়েরা।

মিলি, আজ কলকাতায় আমার অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট আছে। আমাকে বেরোতে হবে।

এক কাপ চা খাওয়ার সময় তোমার হাতে নেই, এটা আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে ধরে নিতেই হবে তুমি আমার ওপর রেগে আছো।

চা খাওয়ানোর এত তাড়া কিসের? কলকাতায় এক কাপ চা তো রাস্তায় ঘাটেও জুটে যায়। তোমার এই আপ্যায়নের জবরদস্তিটার কি কোনও মানে হয়? এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, আমাকে এগারোটার মধ্যে এক জায়গায় পৌঁছোতে হবে।

তুমি বড্ড কাজের লোক তাই না? আর এর জন্যই তোমাকে আমার কোনওদিন পছন্দ হয়নি। কাজের লোকদের রোমান্টিক দিকগুলো সুইচ অফ থাকে। আমার খুব ইচ্ছে করছে, তোমার মুখোমুখি বসে এক কাপ চা খাই। বসবে একটু?

ঠিক আছে। এক কাপ চা-ই যদি কোনও ব্যাপার হয়ে থাকে তবে তাই সই।

আমি জানি তুমি খারাপ চা খেতে পারো না।

হ্যাঁ। চা সম্পর্কে আমি একটু চুজি। কিন্তু সেটা তো তোমার জানার কথা নয়।

তবু তো জানি। এবার বোসো তো। না না, সোফায় বসতে হবে না। তোমার কোমরে সেই ফুটবল মাঠের চোটটার পর নরম গদিতে বসতে তোমার কষ্ট হয়। এই যে, এই কাঠের চেয়ারটায় বোসো। অমন অবাক হয়ে হাঁ করে থাকার কিছু নেই। তোমাকে পছন্দ করি না বলেই কি খোঁজখবরও রাখবো না?

তাই দেখছি।

রাগ কোরো না, একটা কথা বলবো?

বলে ফেল।

শুভময়ীকে কি তুমি সত্যিই পছন্দ করলে না? নাকি জেদ করে রিজেক্ট করলে?

তার মানে কি মিলি? এসব খবর তোমাকে কে দিল?

আমার পোষা ভূতেরা। তুমি কি জানো যে, শুভময়ীর মতো সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনে আমি একজন ঘোর নাস্তিক হয়েও কালীঘাটে মানত করেছিলাম যেন তুমি শুভময়ীকে অপছন্দ করো।

কেন করেছিলে? এসব আচরণের একটা মানে থাকবে তো!

কি জানি। মানে হয়তো একটা আছে। সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছি। ওরকম গুম মেরে গেলে কেন হঠাৎ?

তুমি আমাকে বাড়িটা বিনি পয়সায় বিক্রি করতে চেয়েছিলে কেন মিলি?

সেটা বুঝতে বোকাদের একটু বেশি সময় তো লাগবেই।

মহুয়া

মহুয়ার যে একজন প্রেমিক আছে সেটা আমি বিয়ের পর পরই টের পাই। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, জটিলতা এবং সাসপেন্স এসব আমি একেবারেই মোকাবিলা করতে পারি না। সবসময়েই যে-কোনও সঙ্কটে আমার লেজে-গোবরে আবস্থা হয়। মহুয়া ফুলশয্যার রাতেই আমাকে ঠারেঠোরে প্রত্যাখ্যানই করেছিল। সেটা আমি লজ্জা বলে ভুল করেছিলাম। আর আমারও তো কিছু লজ্জা এবং সঙ্কোচ ছিলই। ফলে আমি একরকম তার গাত্র স্পর্শ করতে বিরত ছিলাম। একটু-আধটু কথা হয়েছিল মাত্র। আমাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে, কাজেই পূর্ব পরিচয় ছিল না। ফুলশয্যায় সেটাই বরং হল, আলাপ পরিচয় আর কি। মনে হল, মহুয়া বেশ বুদ্ধিমতী এবং তার আইকিউ আমার চেয়ে বেশিই। আমি যে আমেদাবাদে থাকি এটা মহুয়ার বেশ পছন্দই হল। তবে সে জানিয়ে দিল, পিএইচডি করছে বলে সে এখন আমেদাবাদ যাওয়ার কথা ভাবছে না। অর্থাৎ যাবে না। আমি তখন বললাম, আমার কোম্পানী আমাকে কলকাতায় বদলি করতে চাইছে। এতে মহুয়া খুব একটা খুশি হল না। বলল, কলকাতা আর এমন কি ভালো জায়গা! আমেদাবাদই তো ভালো।

এসব কথা থেকে আমি কিন্তু অনুমান করতে পারিনি। আমার তত অনুমানশক্তি নেইও। যাই হোক রাত দুটো নাগাদ নতুন বউয়ের সঙ্গে এক খাটেই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। এবং ঘুমের আগে শুনতে পাই—খুব আবছাভাবে অবশ্য—মহুয়া বাথরুমে ঢুকে মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। চাপা গলা। না, আমার সন্দেহ হয়নি। ঘুমেরও বিঘ্ন ঘটেনি। বিয়ের দু'দিন পরেই মহুয়া বাপের বাড়ি চলে গেল, তার পিএইচডি-র ক্লাস এবং লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার জন্য। আমারও সামান্য ছুটি, চারদিন পরই আমেদাবাদে ফিরে যেতে হবে। এবং এইভাবেই বিচ্ছেদের সূচনা হয়ে রইল।

মাস চারেক বাদে কোম্পানী আমাকে প্রোমোশন দিয়ে তাদের সিঙ্গুরের কারখানায় বদলি করে দেয়।

ফিরে আসার আগে অবশ্য মহুয়ার সঙ্গে আমার রোজই আমেদাবাদ থেকে ফোনে কথাবার্তা হত। খুব দীর্ঘক্ষণ ধরে নয় অবশ্য। কারণ, কথা দীর্ঘায়িত হয় প্রেম ভালোবাসা থাকলে। আমার দিক থেকে যথেষ্ট আবেগ থাকলেও মহুয়ার দিক থেকে ছিল না। বেশ ভদ্রগলায় কথা বলত সে, কুশল প্রশ্ন করত, শরীরের যত্ন

নিতে বলত, মন দিয়ে চাকরি করতে বলত, এমনকি শরীর খারাপ হলে উদ্বেগও প্রকাশ করত। দৈনিক তিন বার বা পাঁচ মিনিট আমরা কথা বলতাম। কিন্তু কোনও ঝড় উঠত না, তরঙ্গ দেখা দিত না। একটু যেন উষ্ণতার অভাব টের পেতাম। মহিলা বিষয়ক অভিজ্ঞতার অভাবে সেটাই স্বাভাবিক বলে ভেবে নিয়েছিলাম।

মহুয়া জানিয়েছিল আমেদাবাদ থেকে ফেরার দিন সে এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জরুরি ক্লাসের জন্য সে আসতে পারেনি। এবং আমি কিছু মনেও করিনি। কলকাতায় ফিরে পরদিনই আমি সিঙ্গুরে জয়েন করি এবং ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

আমার বিচক্ষণ এবং পয়সাওলো বাবা অনুমান করেছিলেন যে, বিয়ের পর ছেলে এবং বউমা আলাদা থাকলেই সংসারে এবং সম্পর্কে শান্তি থাকবে। সেই কারণে তিনি আমার জন্য বেহালায় একটি ফ্ল্যাট কিনে রেখেছিলেন। সাজানো গোছানো প্রস্তুত ফ্ল্যাট, ফার্নিচার, বিছানাপত্র, টিভি, ফ্রিজ—এমনকি বাথরুমে গিজার অবধি সব কিছুই। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠার কোনও মানেই হল না। মহুয়া পরদিন এসে দেখা করল বটে, কিন্তু বলল যে, বাপের বাড়ি থেকেই তার কাজকর্মে সুবিধে বেশি হচ্ছে। দিন দশ-বারো সময় চাইল, তারপর আসবে।

তার এই আড় হয়ে আলগা থাকাটা আমার খুব একটা পছন্দ হল না। আমি বললাম, তুমি তো ভালো করে আমার সঙ্গে মিশলেই না এখন অবধি! কী করে সম্পর্কটা তৈরি হবে বলো তো!

ও বলল, এ কি আর দু'দিনের সম্পর্ক? আর বিরহ তো ভালোই, তাতে আগ্রহ থাকে। কেউ কারও কাছে পুরোনো হয় না, ভালোবাসা বাড়ে।

এসব বাংলা কথা আমি বুঝতে পারলাম। মন্দও লাগল না। তবে ফ্ল্যাটে কয়েকদিন আমাকে একাই বসবাস করতে হল। অফিসের ক্যান্টিনে দুপুরে খেয়ে নিতাম। রাতে হোম ডেলিভারি। দিন দশেক বাদে নিউ আলিপুরে যৌথ পরিবারে ফিরে যেতে হল। এবং সেখানকার পরিবেশে একটা থমথমে ভাবের বিরাজমানতা টের পেতে বেশি দেরি হল না।

আমার বোন ঋতুই একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, বউদি সম্পর্কে একটু খোঁজখবর রাখিস।'

কেন রে?

কিছু আজেবাজে কথা কানে আসছে।

কি কথা?

সেটা বলতে পারব না। গুজবও হতে পারে। বউদির ক্লাসমেট দময়ন্তী আমার এক বন্ধুর খুব চেনা। সে-ই বলেছে। বউদি আদিত্য নামে কোনও একজনের সঙ্গে ইনভলভড।

রাগের চেয়ে আমার বেশি হল ভয়। আমি জটিলতা একদম সহ্য করতে পারি না। এবং ঘাবড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। ঋতুই বুদ্ধি দিল, তুই যে নিজে কিছু পারবি না সেটা আমি জানি। আমার এক ক্লাসমেটের দাদার একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। তারা এসব খোঁজখবর করে পাকা রিপোর্ট দেয়। ফটো বা ভিডিও করেও দেয় শুনেছি।

অগত্যা সেটাই করতে হল। এক বা দেড় মাসের মাথায় তারা সত্যিই রিপোর্ট দিল। ফটো এবং ভিডিও সমেত। আদিত্য সুপুরুষ এবং অতীব স্মার্ট। মহুয়ার সঙ্গে তাকে দুটি রিসর্টে, পুরীতে এবং কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও নাইট ক্লাবে দেখা গেল। ডিস্কোতেও। রিপোর্টে পরিষ্কার জানানো হয়েছে এদের ঘনিষ্ঠতা খুবই গভীর। ফিজিক্যাল রিলেশনও আছে। তারা একাধিকবার রাত্রিবাস করেছে। মাত্র এক বা দেড় মাসেই যদি এতটা হয়ে থাকে তবে তো গভীর গাড্ডা।

মুখোমুখি সংঘর্ষ বা ঝগড়া বিবাদ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পেরেও উঠি না। কিন্তু তা বলে আমি উন্মার্গগামীও নই। আমি ভিডিও এবং ছবির কপি করে সিডি এবং রিপোর্টের জেরক্স কপি মহুয়াকে

ক্যুরিয়ারে পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে একটা ছোট্ট নোট— তোমার এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে কি? যদি না থাকে তবে আপসে ডিভোর্স নিয়ে নাও।

তিন দিন বাদে রাত্রে ফোন করল মহুয়া। প্রথম প্রশ্নটাই ছিল, ব্যাপারটা কি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছ?

তার মানে?

তোমার বাড়ির সবাই কি ভিডিও দেখেছে?

তাতে কী যায় আসে?

না, কিছুই যায় আসে না। মামলাটা কি তুমি করবে?

মামলা তুমিও করতে পারো।

আমার তো কোথাও অভিযোগ নেই। অপরাধী তো আমিই।

বিয়েটা করার তো দরকার ছিল না মহুয়া। এটা করলে কেন?

সেটা এখন আর ব্যাখ্যা করে লাভ নেই। যা বলব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তবে আমি নির্দোষ নই।

আদিত্যর সঙ্গে তোমার প্রেমটা তো দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু একজনের সঙ্গে প্রেম থাকা সত্ত্বেও আর একজনকে বিয়ে করাটা আপরাধ। সেন্স অফ পজেশন ব্যাপারটা বোঝো? মানুষের ওই এক মস্ত দুর্বলতা, কিন্তু ওইটেই তার প্যাশন।

ঠিক আছে। তুমি মামলা করো, আমি ডিভোর্স দিয়ে দেবো। মিউচুয়ালি।

বাই।

বাই।

এইভাবে মহুয়ার সঙ্গে আমার খুব দুর্বল এবং ক্ষীণ বৈবাহিক সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে কোনও শরীর বা মনের মেলামেশা হয়নি বলে বিচ্ছেদটা দুঃখের হল না। তবে মহুয়া ভারি লাবণ্যময়ী মেয়ে ছিল। হয়তো নিখুঁত সুন্দরী নয়, কিন্তু অনেকে সুন্দরী না হয়েও আকর্ষণীয়া তো হতেই পারে। মহুয়া ঠিক তেমনি। তাই মহুয়ার কথা বেশ মনে ছিল।

স্থির করলাম আর বিয়ে-টিয়ের চক্করে যাব না। একটা বিয়েতেই যথেষ্ট অপপ্রচার এবং লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে গেছে। কোম্পানী কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে একটা ট্রেনিং নিতে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দিল। বাঁচলাম।

ফিরে এসে আমি আমার ব্যবসা শুরু করি। গুরগাঁওয়ে আমার ছোট কারখানা খুলে চাকরি ছেড়ে দিই। মন দিয়ে ব্যবসাতে মজে থাকি। এবং ক্রমে ব্যবসা জমে উঠতে থাকে। কারখানা বড় হয়, ঋণ শোধ হয়ে যায় এবং কারখানার আশপাশটায় গড়ে ওঠে ছোটখাটো আমার নিজস্ব উপনগরীর মতো। রীতিমতো বিশেষজ্ঞ আনিয়ে প্রকৃতির চর্চা করে গাছপালা লাগিয়ে জায়গাটা ভারি মনোরম করে তুলতে যথেষ্ট খরচও হয়ে যায় আমার। কিন্তু তৃপ্তিও তো কম নয়।

আমার উপনগরীর বিশাল ভিআইপি অতিথিশালায় কখনও বিশিষ্ট অতিথির আনাগোনার বিরতি ছিল না। অনেকে শুটিং করার জন্যও আসত। কারণ উপনগরীর জাপানি বাগানে ফুলের সমারোহ ও চমৎকার সরোবরের ধারে ধারে নানা নির্মাণের মধ্যে চমৎকার শুটিং স্পটও ছিল। সরোবরটি বেশ বড় এবং তার মাঝখানে চমৎকার একটি দ্বীপও রচনা করা হয়েছে। নানারকম জলযান, স্পিড বোর্টেরও আমদানি করা হয়েছে। এসব দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার আলাদা ম্যানেজার এবং স্টাফ ছিল। মোটামুটি একটা মোটারকম টাকাও আসত ভাড়া বাবদ। নিজের টাকাপয়সা বা সাফল্য নিয়ে আমার কোনও চিন্তাভাবনা বা অহঙ্কার ছিল না। আসলে কাজে ডুবে থাকতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কাজের মধ্যেই আমার প্রাণ।

ঋতুর বিয়ে হয়েছে দিল্লিতেই। ওর বর আমার কোম্পানীতেই চাকরি নিয়েছে অন্য চাকরি ছেড়ে। ভাইবোন কাছাকাছি থাকি বলে ঋতু আমার দেখাশোনাও করে। মাঝে মাঝে মা আর বাবাও এসে থাকে।

বিয়ের প্রস্তাবগুলো আমি অবশ্য ফিরিয়ে দিই। ঋতুর একটা ছেলে হয়েছে। মাত্র দেড় বছর বয়স। আমার ইচ্ছে, ও-ই আমার উত্তরাধিকারী হবে। ওকেই মনের মতো মানুষ করব।

কিন্তু মানুষ যা-ই ভেবে রাখুক না কেন সব তার পরিকল্পনামাফিক ঘটে না।

এক শীতকালে আমার অতিথিশালায় কিছু কর্পোরেট মানুষজন এলো। তাদের কোম্পানীর সর্বভারতীয় কনফারেন্সে। তিন দিনের দিন আমার ম্যানেজার ফিরোজ সিরকা আমাকে জানালো একজন মিস্টার আদিত্য ঘোষ নামে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর বিশেষ দরকার।

আমি বললাম, আমাকে কি তিনি চেনেন?

বোধহয় না। কিন্তু খুব টেনশনে আছেন মনে হয়।

দরকারটা কী?

বলছেন ব্যক্তিগত।

স্ট্রেঞ্জ! ঠিক আছে, ব্রেকফাস্টে আসতে বলো। দশ মিনিট।

যে ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন তাঁর বয়স আমার মতোই। পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ। বেশ ভালো চেহারা, তবে শরীরে মেদ জমেছে।

আমি তাঁকে ব্রেকফাস্টে আপ্যায়ন করতে চাওয়ায় সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি গত পাঁচবছর ধরে আপনার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছি। পারিনি। আপনি বিদেশে গেলেন, আমাকেও যেতে হল। ফিরে আসার পরও আবার নানারকম ইনভলভমেন্টে জড়িয়ে যেতে হল। এতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল। যদিও জানি আর কোনও লাভ নেই। তবু কথাটা আপনাকে জানানো দরকার।

বলুন।

কথাটা মহুয়াকে নিয়ে। আমিই আদিত্য ঘোষ।

ওঃ, হ্যাঁ, আপনাকে একটু চেনা চেনা লাগছিল বটে। মহুয়াকে তো নিশ্চয়ই আপনি বিয়ে করেছেন!

না, করিনি।

কিন্তু আপনারা তো ডিপলি ইনভলভড ছিলেন।

আদিত্য ম্লান একটু হাসল। তারপর বলল, মহুয়ার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং এর ফটোগ্রাফ যে অন্য কথা বলছে।

হ্যাঁ, তাও ঠিক। কিন্তু যা দেখেছেন তা বিশ্বাস করলে ভুল করবেন।

তার মানে কী? বুঝিয়ে বলুন।

এ কথা ঠিক যে, আপনাদের বিয়ের বছর দেড়েক আগে মহুয়া আমার প্রেমে পড়েছিল। তবে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তো, তাদের খুব লজ্জা আর সঙ্কোচ। প্রেমের কথাটা সে অবশেষে একটি চিঠি লিখে আমাকে জানায়। কিন্তু আমি যে তার প্রেমে পড়িনি সেই নিষ্ঠুর সত্যটা তাকে জানাতে আমার ভারি সঙ্কোচ হয়েছিল।

আপনি ওর প্রেমে পড়েননি?

না। পড়া সম্ভব ছিল না। আজ আপনাকে বলতে সঙ্কোচ নেই যে, আমি কিশোর বয়সেই প্রথম টের পেয়েছিলাম যে, আমি হোমো সেক্সুয়াল।

মাই গড!

কোনও মেয়ের প্রেমে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই সত্যটা দুর্বলতাবশে মহুয়াকে সময়মতো বলতে পারিনি বলেই মেয়েটার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।

তখন কি আপনার কথাটা বলে দেওয়া উচিত ছিল না?

একটু দেরি হলেও শেষ অবধি সত্যটা আমি প্রকাশ করে দিই মহুয়ার কাছে। সে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংবা ভেবেছিল আমি এই রোগ থেকে ভালো হয়ে যাব যদি কোনও মেয়ের সংস্পর্শে থাকি। তাই বিয়ে করার জন্য ঝোলাঝুলি করতে থাকে। সেটা সম্ভব নয় জেনে অবশেষে সে অনিচ্ছের সঙ্গেই আপনাকে বিয়ে করে। কিন্তু গ্রহণ করতে পারেনি। আমিই তার সেই শনিগ্রহ।

কিন্তু আপনারা তো রাত্রিবাস করেছেন।

আপনার ডিটেকটিভ এজেন্সি যখন আমাকে আর মহুয়াকে ফলো করতে শুরু করে তখন আমি সেটা টের পেয়ে যাই। মহুয়াটে ব্যাপারটা জানাতেই সে আমাকে বলে যে, এই সুযোগটা কাজে লাগালে তার ডিভোর্স পেতে সুবিধে হবে। সুতরাং আমরাই আপনার এজেন্সির এজেন্টদের ডেকে তাদের সুবিধেমতো ছবি তুলতে সাহায্য করি। যাতে আপনার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র তুলে দেওয়া যায়। মহুয়ার সঙ্গে কখনও শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। রাত্রিবাসের প্রশ্নই ওঠে না। আমি যে হোমোসেক্সসুয়াল তা আমার বন্ধুবান্ধব, পরিবারের লোক এবং আমার বসও জানে। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। মহুয়া শুধু চেষ্টা করেছিল আমাকে এই প্রবণতা থেকে উদ্ধার করতে। পারেনি। ডিভোর্সের পরও কিছুদিন আশায় আশায় থেকে সে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। এখন আর মহুয়ার কথা আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই জানি। কিন্তু একটা মিথ্যে ও ভুল প্রচার থেকে মহুয়াকে মুক্ত করার দরকার ছিল বলে আপনার কাছে আজ সব বললাম।

আমি একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বললাম, তাতে আর কী লাভ বলুন? মহুয়া তো তবু আপনাকে ভালোবেসেছিল। আমি তো তার আনুষ্ঠানিক স্বামী ছিলাম মাত্র। সম্পর্কই হয়নি।

সেটা হয়তো আপনার দিক দিয়ে দেখলে যথার্থ বিচার। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হয়তো অত সহজ এবং সরল অঙ্ক নয়। কারণ মহুয়া আজও কাউকে বিয়ে করেনি এবং তার কোনও বয়ফ্রেন্ডও নেই। মা-বাবার সঙ্গেই থাকে। আমি যতদূর জানি ঘটনাহীন, নিস্তরঙ্গ এবং খানিকটা নিঃসঙ্গ জীবনই সে যাপন করে।

আপনার সঙ্গে তার কি এখনও সম্পর্ক আছে?

সেই অর্থে নেই। প্রথম কথা, আমি ভীষণ ব্যস্ত, প্রচণ্ড ট্যুর এবং নানারকম কমিটমেন্ট থাকে। দ্বিতীয়ত, মহুয়ার সঙ্গে আমার সেন্টিমেন্টাল কোনও অ্যাটাচমেন্ট নেই। ফলে আমাদের বন্ধুত্বটাও একটু আলগা ধরনের। মহুয়ার মোহটাও তো অনেকদিন আগেই কেটে গেছে।

এইসব খবরে আমার আর কোনও আগ্রহ নেই। পাঁচ-ছয় বছর আগেকার ঘটনা। আমি ভুলেও গেছি প্রায়।

স্বাভাবিক। আর আপনিও এখন ফ্যামিলি ম্যান, বউ বাচ্চা আছে। আমি শুধু এই কথাটাই আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে, মহুয়া আর আমাকে নিয়ে যে রটনাটা হয়েছে তার সবটাই আরোপিত। এই সত্যটা আপনার কাছে প্রকাশ করে আমি খানিকটা ভারমুক্ত হলাম আর কি। মহুয়া আপনাকে ঠকিয়েছে বটে, কিন্তু নিজেও বড্ড ঠকে গেছে।

ওর পিএইচডি কি হয়েছিল?

না। সোসিওলজি নিয়ে কাজ করছিল। ডিভোর্সের পরই মানসিক বিপর্যয়ে ওর সব এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুদিন সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টও করিয়েছিল। প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগত। আমি ডিটেলস বলতে পারব না। কিন্তু খুব একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড গেছে শুনেছি। এখন বোধহয় কোনও মন্তেসরি স্কুলে বাচ্চাদের পড়ায়। আর বোধহয় কোনও রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশনের হয়ে কিছু মিশনারি ওয়ার্ক করে। ওসব জেনে আপনার লাভ নেই।

আদিত্য আমাকে কিন্তু দ্বিধায় ফেলে চলে গেল। যদি না মহুয়া সম্পর্কে আমার একটা মনে-পড়া না থাকত তাহলে এ ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহুয়ার কথা আমার আজও বিরলে, বিজনে, অবসরে খুব মনে পড়ে। লাবণ্যময় একটি মুখ এবং নরম সরম কথাবার্তা।

কয়েকদিন ভেবে আমি স্থির করলাম, খোঁজখবর করাটা দরকার। দ্বিধায় থাকা ঠিক নয়।

কলকাতার এসে সেই পুরনো ডিটেকটিভ এজেন্সিকেই ডেকে পাঠালাম। খোঁজ করে দেখলাম পাঁচ বছর আগেকার অপারেটরদের মধ্যে দু'জন এখনও আছে। তাদেরই ডেকে এনে অকপটে জিগ্যেস করলাম, মহুয়া আর আদিত্যের ব্যাপারে তাদের ইনফর্মেশনটা গটআপ ছিল কিনা।

কিছুক্ষণ অস্বীকার করার পর তারা কবুল করল যে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা গটআপ ছিল, কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সফলই হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল তাদের।

আমি বললাম, আমি দু'জন সম্পর্কেই কারেন্ট ইনফরমেশন চাই। এবার কোনও গটআপ হলে চলবে না। পনেরো দিনের মধ্যে প্রথম রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এবং আগামী দু'মাস ধরে অবিরল নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে।

পনেরোদিন বাদে প্রথম রিপোর্টে যা জানা গেল তা নিতান্তই সাদামাটা। অনুত্তেজক। আদিত্য তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাটে থাকে। সে অবশ্য খুবই ব্যস্ত মানুষ। আজ এখানে, কাল সেখানে। আর মহুয়া সম্পর্কেও আদিত্য যা বলেছিল তা সত্য। গ্রিন হাউস নামে একটি মন্তেসরি স্কুলে পড়ায়। সৎসঙ্গের হয়ে কাজ করে। মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করে না। সাদা খোলের শাড়ি ছাড়া কিছু পরে না। সবচেয়ে বড় কথা, কখনও বিউটি পার্লারে বা শপিং-এ যায় না। গাড়ি নেই, বাস বা অটোতে যাতায়াত করে। কাজের সময় ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয় না। মা আর বাবার সঙ্গে থাকে। নিরামিষ জীবন, কোনও পুরুষবন্ধুর খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত।

মাসখানেকের মাথায় একইরকম রিপোর্ট এলো। সঙ্গে ভিডিও সিডি। তাতে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে মহুয়াকে দেখানো হয়েছে। সে সকালে বাজার করছে, অটোতে উঠছে, বাসে বসে আছে। বাড়িতে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। সৎসঙ্গের একটি মাতৃ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছে। ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও ঘটনা নেই।

কিন্তু ঘটনা আছে। সেটা হল মহুয়ার চেহারা। অনেকটাই রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু ভারি স্নিগ্ধ, কৃশ একটা অন্যরকম সৌন্দর্য ফুটেছে তার চেহারায়। সেক্স অ্যাপিল না হলেও বেশ সম্ভ্রম হয় দেখলে। ভালো লাগে। বয়স এখন তিরিশের কাছে পিঠে। দেখলে আরও কম বলে মনে হয়। আর সবচেয়ে ভালো লাগল, পোশাকের পারিপাট্য তেমন নেই। সুন্দর হওয়ার আয়াস প্রয়াস নেই। অল্প বয়সে ঘা খেয়েছে বলেই কি একটা কোনও শুদ্ধিকরণ ঘটেছে মহুয়ার?

পুরো দু'মাসের গোয়েন্দাগিরির ফলে যেসব খবর জমা হল তা তেমন কৌতূহলোদ্দীপক নয়, কিন্তু স্বস্তিকর।

আমি প্রথমে ঋতুকে জানালাম।

ঋতু বুদ্ধিমতী মেয়ে। সব শুনে বলল, আমি বলি তুই বউদিকে নিয়ে আবার ঘর কর।

অতটা আগ বাড়িয়ে ভাবছি না। আর একটু স্টাডি করি, তারপর।

ঋতুর মারফৎ কলকাতায় মা আর বাবাও জানল, এক রাতে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ আমি, ঋতু, মা আর বাবার একটা টেলি কনফারেন্সও হয়ে গেল। সকলেরই মত হল, মহুয়াকেই ফিরিয়ে আনা হোক।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। একটা মেয়েরও তো ইগো প্রবলেম আছে। মহুয়া তো আমার প্রতি প্রেমাসক্ত নয়। আমি চাইলেই সে রাজি হবে কেন? সুতরাং সাবধানে পা ফেলা দরকার।

মহুয়ার মোবাইল নেই, সুতরাং একদিন তার ল্যান্ডলাইনেই রাত দশটা নাগাদ ফোন লাগালাম। একজন বুড়ো মানুষ—বোধহয় মহুয়ার বাবা ফোন ধরলেন, হ্যালো।

মহুয়া আছে?

হ্যাঁ আছে, মহুয়া, তোর ফোন....বলে ফোনটা রেখে দিলেন। জিগ্যেস করলেন না কে বলছেন, আর সেটা আমার বেশ পছন্দ হল।

মহুয়া ফোন তুলে বলল, হ্যাঁ বলুন।

কেমন আছো?

মহুয়া বেশ খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর কেমন স্খলিত তদ্গত গলায় বলল, উঃ! কতদিন পর তোমার গলা শুনলাম?

বুকটা একটু দুলে উঠল, পাঁচ বছর পরও কি মহুয়া আমার গলা মনে রেখেছে? নাকি অন্য কারও গলা বলে ভুল করেছে?

বললাম, আমি কে বলো তো!

মহুয়া একটু হাসল, তারপর বলল, ভুল করিনি গো! ভয় পেও না, আদিত্য একদিন ফোন করে জানাল, তুমি দিল্লিতে আছো, ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। আর খুব নাকি বড়লোক।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। খুব না হলেও মন্দ নয়।

তোমরা তো এমনিতেই বড়লোক ছিলে। এত টাকা দিয়ে কী হবে বলো তো! বেশি টাকা আমার কেন যেন ভালো লাগে না।

টাকার কথা থাক মহুয়া, ওটা কোনও পয়েন্ট নয়। আমার একটা কথা জানার আছে।

বলো। বাকি জীবনটা কীভাবে কাটাবে?

মহুয়া আবার একটু হাসল। বলল, ওটা একটা প্রশ্ন হল বুঝি? জীবন কেটে যাবে, যেমন যায়।

বিয়ে করবে না?

মহুয়া আবার স্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে বলল, সেটা কি সম্ভব?

কেন নয়?

সেটা তুমি বুঝবে না। তোমার মুখ থেকে প্রশ্নটা শুনে আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগল না। আর বোলো না, প্লিজ।

আচ্ছা, আজ ছাড়ছি। বাই।

মহুয়া কিছু বলল না। ফোনটা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

স্তব্ধ টেলিফোনটায় মায়াময় হাত রেখে আমিও অনেকক্ষণ স্মিতমুখে বসে রইলাম। চারদিকে হিরন্ময় অন্ধকার, সোনার গুঁড়ো মেশানো বাতাস।

বিদ্যেধরী

ভোজেনবাবু আজও নাঙ্গা তক্তপোশে উবু হয়ে বসে আছেন। চারদিকে ছড়ানো হাজারটা দরখাস্ত, পোস্টার, ইস্তাহারের বয়ান, নোটিশ, দলিলের কপি। ভোজেনবাবুর চোখে খয়েরি ফ্রেমের পুরোনো চশমা, গালে দাড়ি, গায়ে ময়লা হাতাওলা একটা গেঞ্জি, বাঁ হাঁটুর কাছে একটা চায়ের কাপ শুকনো পড়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। চাওলা ফের চা দিতে এলে ওটা নিয়ে যাবে। ভোজেন কারও নাম হতে পারে না, নয়ও। ভোজেনবাবুর আসল নাম ব্রজেন, ডাকনাম ভজন। এই দুই নামের দোটানায় পড়ে লোকে একটা আপসরফা করে নিয়ে ওই বিটকেল ভোজেন নামটা তৈরি করে নিয়েছে। অসুবিধে হয় না, ভোজেনদা বলে ডাকলে ভোজেনবাবুই সাড়া দেন। তা বলতে গেলে বগলা এই ভোজেনবাবুর হাতেই মানুষ।

বগলার বাপ হল শ্যাম গায়েন। কপালদোষ বলে একটা কথা আছে না! তা সেই কপালের দোষেই হাজারে বিজারে লোক যেমন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা নিষ্কর্মা হয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ, শ্যাম গায়েনও তাই। চার কাঠা মোটে জমি জুটেছিল এক মুরব্বির দোর ধরে। কাঠখড় তবু কম পোড়াতে হয়নি সেইজন্য। কিন্তু সেই চার কাঠারই বা কি বাহার! বছরে একটা চাষও দিতে পারে না। জলই নেই মোটে, তারপর ফের হা-ভাত জো-ভাত। শাকপাতা সম্বল, দানা জোটানো দায়। ভিক্ষেও অমিল। বাড়ির এই অবস্থা দেখে হারা-উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল বগলা। পাঁচ মাইল হেঁটে স্টেশন, বিনা টিকিটে ট্রেন ধরে এই শহরে। গায়ে গতরে বগলা কিছু খারাপ ছিল না। আলুর আড়তে মোট বইল কিছুদিন। হাটখোলা ঝাঁটপাট দিত তারপর শ্রীদাম নস্করের ভ্যান রিক্সা চালানো। সইফুল বলে একজন বন্ধু জুটেছিল, বিড়ি কারখানায় কাজ করত। সে-ই একদিন নিয়ে এল ভোজেনবাবুর কাছে। হাতজোড় করে বলল, এর একটা হিল্লে করে দিতে হবে আজ্ঞে।

যেদিন ভোজেনবাবুর খুব তিরিক্ষে মেজাজ, ফিসফাস শোনা গেল ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা না খেলে নাকি তাঁর কাজে মন লাগে না। তা ভোজেনবাবুর ঘরের উল্টোদিকে করালীর চায়ের দোকান।

দোকানেরও বলিহারি, একটা টিনের খাপড়া, তার কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। একটা গুলের উনুন আর কয়েকখানা কাচের গেলাস আর সসপ্যান। সবক'টারই মরকুটে দশা। সেই করালীই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোজেনবাবুর চা দিত। তা দুদিন হল করালী জ্বরে পড়েছে। চা বন্ধ।

ভোজেন নাক সিঁটকে বগলার দিকে চেয়ে বললেন, চা বানাতে পারিস?

বগলা পারে না। কিন্তু সে কথা কবুল না করে শুধু একখান হু দিল।

যা, তবে ওই উনুনটা ধরিয়ে একটু চা কর তো।

উনুন ধরানোটা বগলার আসে, তা সেটা ধরাতে বেশি মেহনত করতে হল না। প্রথমটায় লিকারটা একটু কড়া হল বটে কিন্তু ভোজেন খুশি।

ভগবানের নানারকম দয়া আছে, সবটা দয়া বলে বোঝা যায় না। বগলার ওপর যে দয়াটা হল সেটা সেইরকম। করালী আর জ্বর থেকে উঠল না। দিন দশেক ভুগে শিঙে ফুঁকল। বগলা চায়ের দোকানে বহাল থেকে গেল।

বিক্রিবাটা তেমন কিছু আহামরি নয়। ভোজেনবাবু দিনে অন্তত চোদ্দ-পনেরো কাপ চা খায়। স্যাঙাতরা খায় ত্রিশ-চল্লিশ কাপ, আর উমেদার যারা আসে তারাও খায় কখনও সখনও। আর ছুটকো ছাটকা বিক্রিও কিছু আছে। তা তাতে বড় কম হয় না বগলার। খরচাপাতি বাদ দিয়ে দিনে শতখানেক আয়। বড় কম কথা নয়। বলতে কি এত টাকা জীবনে তার বাপও নাড়াঘাঁটা করেনি।

পার্টি করতে গিয়ে ভোজেনবাবুর আর বিয়ে বসার সময় হয়নি। তা বলে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের অভাব নেই। মস্ত বাড়িতে বিস্তর লোক। ভোজেনের তিন ভাই, গজেন, নগেন আর বরেন। তাদের কাচ্চা বাচ্চা এন্ডি গেন্ডি মেলাই। ভোজেনের সঙ্গে ভিতরবাড়ির বিশেষ সম্পর্ক নেই। নগেনের বউ ফুলিবউদি একদিন বগলাকে ভিতর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, দিব্যি তো করালীর দোকানটা গাপ করে বসে আছিস, বলি ভাড়াটাড়া দিস?

কার জমি, কার খাপড়া, ভাড়া কাকে দিতে হবে বগলা তার কিছুই জানে না।

মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে ঠিক গাপ করিনি। ভোজেনবাবু বললেন, তাই চা করে দিই আর কি।

ফুলিবউদি চোখ পাকিয়ে বলে, তা শুধু চা বানালেই হবে। আর কিছু বানাতে জানিস না? ফুলুরি, পেঁয়াজি, বেগুনি?

বগলা ভারি আতান্তরে পড়ে বলে, আজ্ঞে সে পারা যায়, কিন্তু—

শোন, বিকেলের দিকটায় আমার একটু ওসব খেতে ইচ্ছে করে, কাল থেকেই শুরু কর, বেশ ঝাল ঝাল, মুড়মুড়ে হয় যেন।

কাকে খুশি রাখতে হবে, কাকে চটালে চলবে না এসব বগলার জানা নেই। তবে সে বিকেলেই কড়াই কিনে আনল, আটাচাক্কি থেকে বেসন আর চালের গুঁড়ো। সরু বেগুন, পেঁয়াজ, নুন সব নিয়ে এল। খুঁজে পেতে ননীর মা বলে এক ঝগড়ুটে আধবুড়িকেও পাকড়াও করল, ননীর মা মুখরা হলেও রান্নার ঘাৎ ঘোঁৎ জানে। বকাঝকা মেলা করল বটে কিন্তু দিব্যি পরদিন দুপুর থেকে এসে খুব যত্ন করে বেসন গুলে লঙ্কাগুঁড়ো-টুঁড়ো দিয়ে ভেজেও দিল তেলেভাজা, সেই গন্ধ পাড়াময় ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। ফুলিবউদি তেলেভাজা খেয়ে খুশি, ওদিকে পাড়ার লোকও এসে জুটল মেলা। দেখ না দেখ তেলেভাজা সাবাড়। ননীর মাকে ঝপ করে ত্রিশটাকা দিয়ে ফেলল বগলা। বলল, রোজ যদি একটু করে দাও মাসি, রোজ পাবে।

ননীর মা টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে আঁশটে মুখে বলে, সে পেরে উঠবো না বাছা, আমার মাজায় ব্যথা।

তবে তাতে আটকাল না বগলার, পরদিন নিজের হাতেই ঝুড়িভর্তি তেলেভাজা বানিয়ে ফেলল, উড়েও গেল দেখতে না দেখতেই।

দিন সাতেকের মাথায় একদিন বেসন ফেটাচ্ছিল বগলা। একটা রোগামতো নীরস মুখের চোদ্দ-পনেরো বছরের ফ্রকপরা মেয়ে এসে দাঁড়াল দোকানের মধ্যে। ভারী মলিন চেহারা।

বগলা হাঁ করে মেয়েটাকে দেখে কড়া গলায় বলে, কী চাও?

মা তাড়িয়ে দিয়েছে, একটা কাজ দেবে?

কী কাজ! এখানে বাপু অসুবিধে আছে, কাজের লোক রাখার পয়সা নেই আমার।

বাসন টাসন ধুয়ে দিতে পারি, বেসন ফেটাতে পারি।

না বাপু, ওসব আমি নিজেই করে নিতে পারি, তুমি অন্য জায়গায় দেখ।

সারাদিন কিছু খাইনি যে, সকালেই বের করে দিয়েছে ঘর থেকে।

তার আমি কী করব? ওই ভোজেনবাবুকে গিয়ে বলো না, উনিই সালিশি করেন।

গিয়েছিলাম।

কাজ হয়নি?

মাকে ডেকে খুব বকে দিয়েছে। কিন্তু মা আমাকে শাসিয়েছে বাড়িতে ঢুকলে কেটে ফেলবে।

মায়েরা রাগের মাথায় ওরকম কত বলে, তা বলে কি আর সত্যিই কেটে ফেলবে নাকি? যাও ঘরে ফিরে যাও।

মাকে তুমি চেনো?

আমি চিনবো কী করে?

চিনলে বলতে না, কেটে হয়তো ফেলবে না, কিন্তু এমন মার মারবে যে বিছানা ছেড়ে ওঠার সাধ্যি থাকবে না। একবার হাত মুচড়ে কবজি ভেঙে দিয়েছিল।

ও বাবা! তোমার মা তো তাহলে খান্ডার। না বাবা, তোমাকে রেখে কি বিপদে পড়বো নাকি?

মেয়েটা অগত্যা দোকানের সামনের গাছতলায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। একটু কষ্ট হচ্ছিল বগলার। কিন্তু ঝুটঝামেলা সে চায় না, সবে পয়সার মুখ একটু একটু দেখতে শুরু করেছে সে। পাড়া প্রতিবেশীকে চটালে কোথা থেকে কোন ফ্যাঁকড়া ওঠে কে জানে বাবা!

তবে সন্ধেবেলা পর্যন্ত মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে বগলা তাকে ডেকে শালপাতায় কয়েকটা চপ আর বেগুনি দিতে চাইল। মেয়েটা কিন্তু মাথা নেড়ে বলল, নেবো না তো, ভিক্ষে দিচ্ছো তো, ওতে আমার দরকার নেই।

অবাক হয়ে বগলা বলে, বাব্বাঃ, তোমার খুব তেজ আছে তো! কোন বাড়ির মেয়ে তুমি?

মেয়েটা একটু অছেদ্দার ভাব করে বলে, আমার বাবা হল অনঙ্গ মিস্তিরি, হাটখোলায় কাঠের কাজের দোকান আছে, নেশাখোর।

খুব চিনি, তা তুমি রাতে থাকবে কোথায়?

গাছতলায়।

এই বয়সের মেয়ে, বিপদ হতে কতক্ষণ? চলো দেখি ফুলিবউদিকে একটু ভজাতে পারি কিনা।

না বাপু, বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে পারবো না। মেয়েমানুষরা বড় পাজি হয়, পেটের কথা টেনে বের করবে।

তাহলে আমার দোকানেই বা কাজ করতে চাও কেন? এও তো সেই ঝিয়েরই কাজ।

তবু ভালো, তুমি তো আর মেয়েমানুষ নও।

ফুলিবউদি লোক খারাপ নয় কিন্তু। গাছতলার চেয়ে তো ভালো।

গাছতলাই বা খারাপ কিসের? আমাকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজের কাজে যাও।

বগলা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। মেয়েটা ভারী একগুঁয়ে, দেখতে রোগাপটকা আর মুখে ভালোমানুষি ভাব থাকলে কী হয়, তেজ বড় কম নয়। সারাদিন একা দোকান সামলাতে বড্ড ধকল যায় তার। তবে তার শরীরে মোষের শক্তি, সহজে কাহিল হয় না, আর তার যা অবস্থা তাতে পয়সা দিয়ে লোক রাখা বেজায় বাবুগিরি। কিন্তু এই জেদি মেয়েটার তো খুব গুমোর, কাজ না করলে পয়সা-কড়ি বা খাবার কিছুই নেবে না। তাই অগত্যা সে বলল, তা গামলা-টামলা, চায়ের বাসন আর গেলাসগুলো ধুয়ে দিতে পারবে? টিউকল থেকে জল আনতে হবে কিন্তু।

মেয়েটা সন্দিহান চোখে চেয়ে বলল, কাজে নিচ্ছো?

তাই না হয় নিলুম। কত দিতে হবে তোমায়?

আমি তার কী জানি? কোনোদিন কাজ করেছি নাকি বাড়ির বাইরে? যা হয় কিছু দিও।

ভাত রাঁধতে পারো?

তা পারবো না কেন?

তাহলে এই দোকানের তক্তপোশেই রাতে শুয়ে থেকো। আমি ভোজেনবাবুর বারান্দাতে শুয়ে থাকবখন।

মেয়েটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েই সে ভোজেনের কাছে গিয়ে ঘটনা সব খোলসা করে বলে দিল।

ভোজেন সব শুনে বলেন, আজ রাতটা যাক, কাল ব্যবস্থা হবে।

পরদিনই ভোজেনের চারজন ঠ্যাঙাড়ে গিয়ে অনঙ্গ মিস্তিরিকে তুলে আনল। অনঙ্গ ভয়ে চিঁচি করছে। ভোজেন বললেন, মেয়েসন্তান বলে কথা, তায় কাঁচা বয়স, কোন আক্কেলে তোর বউ তাকে ঘরের বার করে বলতে পারিস? মাগীকে বলিস, এরকম বেয়াদপি আর দেখলে এ পাড়া থেকে বাস ওঠাতে হবে।

অনঙ্গর বউ ঘণ্টাখানেক বাদে এসে কেঁদেকেটে ভোজেনের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে মেয়েকে বাবা-বাছা বলে নিয়ে গেল, বাঁচল বগলা।

দোকানের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়ে ফেলেছে বগলা। নতুন টিনের ঘর, দুটো বেঞ্চ একটা লম্বাটে টেবিল। দুবেলাই বেশ খদ্দের হচ্ছে। একটা কাজের ছোকরাকেও রাখতে হল, একা পেরে উঠছে না বলে। বাড়িতে মানি অর্ডার করে নিয়মিত টাকা পাঠায়। সেই টাকায় খেয়ে পরেও তার বাপ শ্যাম গায়েন দু বিঘে জমি কিনে ফেলেছে। সবই ভোজেনবাবুর দয়ায়। সময়মতো করালী মরে না গেলে এসব হতও না তার।

কিন্তু কথায় আছে, সব দিন সমান যায় না। সবে বগলা গায়েন একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছে অমনি দেশের হাওয়া বদলাতে লাগল। রাজনীতি ব্যাপারটা বগলা আগে মোটেই বুঝত না। আজকাল ভোজেনবাবুর কাছাকাছি থেকে একটু-আধটু বোঝে। ভোজেনের কাছে যারা আসে-টাসে তাদের কেউ-কেউ তার দোকানে বসেই নানা কথা-টথা কয়। শুনে শুনে বগলা অনেক শিখেছে। ভালো-মন্দ না জেনেই সে ভোজেনের পার্টিকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই কখনও সখনও দু-চার কথা মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়েও

যায়। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ বুঝতে পারছে ভোজেনবাবুর সেই আগের দাপটটা যেন আর নেই। একটু মিইয়ে গেছেন যেন। লোকজনের যাতায়াতও একটু কমতির দিকে। লক্ষণ বড় ভালো নয়।

বগলার অবশ্য দোকানের বাইরের জগৎটা নিয়ে ভাববার ফুরসত নেই। সারাদিন খাটে পেটে, রোজগার করে, দিনান্তে মোষের মতো ঘুমোয়। একদিন বিক্রিবাটার শেষে পরদিন বাজারের ফর্দ করছিল বসে, একমনে। এমন সময় অনঙ্গ মিস্তিরির মেয়েটা এসে হাজির। চেহারাটা একটু ফিরেছে, গায়ে নতুন একটা ফ্রক, কপালে টিপ।

কী করছো তুমি?

বগলা একটু হাঁ করে চেয়ে চিনতে পেরে বলল, অ, অনঙ্গ মিস্তিরির মেয়ে! তা তোমার কী খবর?

ভালো নয়, বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।

সে তো ভালো কথা।

ছাই ভালো, কার সঙ্গে জানো? শয়তান বাজুর সঙ্গে।

বাজু! সে আবার কে?

তোমার তাকে চিনে কাজ নেই।

খুব খারাপ নাকি ছেলেটা?

সুকুমারের ব্যাটারির দোকানে কাজ করে আর চুরি ছিনতাই করে বেড়ায়। রোজ মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

বগলা দুঃখিত হয়ে বলে, তা কী আর করবে। যার কপালে যা আছে, বিয়ের পর বদলেও যেতে পারে।

তোমার কাছে বুঝি হিতোপোদেশ শুনতে এলাম?

তবে কী?

তোমার ওই ভোজেনবাবাকে বলে একটা ব্যবস্থা করো, নইলে রেলে গলা দেবো।

কী জ্বালাতন! মুশকিলে পড়লেই এসে হাজির হও, আমি কি তোমার মুশকিল আসান নাকি?

তা নও তো কী?

ভালো জ্বালা তো! আমার নিজেরই কত ফ্যাঁকড়া দেখছ না!

সেসব আমি জানি না। আমার সাফ কথা, বাজুকে মরে গেলেও বিয়ে করতে পারবো না।

তা সেটা তোমার বাপকে বুঝিয়ে বলো না কেন?

বাপের বুঝতে বয়েই গেছে। বাজুর নাকি আমাকে ভারী পছন্দ। সেই জন্য বাবাকে দু হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে রেখেছে।

বগলা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে বলে, উলটে বরপক্ষই টাকা দিতে চাইছে! কলিযুগ কি শেষ হলে গেল?

মতলব ভালো হলে কি টাকা দিত? আমার বন্ধুরা বলেছে, বিয়ের পর কিছুদিন ফুর্তি-টুর্তি করে তারপর ঠিক দেখো আমাকে বেচে দেবে।

কী সর্বনাশ!

ভোজেনবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলো না, তোমার কথায় কাজ হবে।

অগত্যা ভোজেনের কাছেই যেতে হল বগলাকে।

ভোজেনবাবু শুনে সেই আগের মতো গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন না। বরং ভাবিত হয়ে বললেন, 'মুশকিলে ফেললি রে! মতিন চৌধুরী যে রোজ মিটিং করে আমার নামে কুচ্ছো গাইছে। তার দলের ছেলেরা আড়ে আড়ে আমার দলের ছেলেদের ওপর নজর রাখছে। এখন অ্যাকশন নিলেই পলিটিক্যাল কালার দিয়ে দেবে। সামনেই ইলেকশন, এখন ওসব ঝুট ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। মেয়েটাকে বরং কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বল।

গা-ঢাকা দিয়ে!

হ্যাঁ, আত্মীয় স্বজন নেই ওর? পালিয়ে গিয়ে ক'দিন থেকেই আসুক না। মেয়েটার বয়স কত বল তো?

পনেরো-টনেরো হবে।

তাহলে তো বিয়ে বে-আইনি, ওর বাপকে সেটা বুঝিয়ে বল, বিয়ে দিলে জেল হবে।

বগলা একটু হাসল, ওসব আইন-টাইন বাবু-টাবুদের জন্য, গরীব দুঃখীর পক্ষে কোনও আইন-টাইন নেই। পুলিশ কেসই নিতে চায় না। আর উকিলের পয়সাই বা জোগাবে কে?

ভোজেনবাবু সেটা ভালোই জানেন, কিন্তু হাত ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তাঁর আগের দাপট আর নেই। শোনা যাচ্ছে তার ঠ্যাঙাড়েদের বেশ কয়েকজন মতিনবাবুর কাছে গিয়ে ভিড়েছে।

বগলা শুকনো মুখে ফিরে এসে বলল, তোমার কোনও পিসি বা খুড়ো-জ্যাঠা নেই?

মেয়েটা বেঞ্চে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল। যখন মুখ তুলল তখন কান্নায় চোখ ভেসে যাচ্ছে। মাথা নেড়ে বলল, না, এক পিসি আছে খড়গপুরের তালবাগিচায়। সম্পর্ক রাখে না, আর তার বাড়িও চিনিনা। কেন গো, ভোজেনবাবু কিছু করতে পারবে না?

বগলা একটু রেখে ঢেকে বলে, তা কি আর পারে না! তবে তার কথা, সামনেই ইলেকশন তো, তাই হাঙ্গামায় যেতে চাইছেন না। কিন্তু আইন তোমার পক্ষে, আঠারো বছরের আগে বিয়ে করা বারণ।

আইন দিয়ে কচু হবে, রেলে গলা দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

এই বলে মেয়েটা উঠে একরকম ছুটেই চলে গেল। বগলা তাতে হাঁফ ছাড়ল বটে, কিন্তু মনটা কেমন কেৎরে রইল।

দিনকাল যে পাল্টাচ্ছে তাও মাসখানেকের মধ্যেই টের পেল। বগলাচরণ গায়েন বিকেলে উনুন ধরাচ্ছিল, ঠিক এই সময়ে আট-দশটা বাঘা বাঘা চেহারার ছেলে ছোকরা এসে হাজির, তার মধ্যে দুটো চেনা-মুখও আছে। বিশু আর পিপলে। তারা একসময়ে ভোজেনবাবুর ঠ্যাঙাড়ে ছিল, এখন মতিনবাবুর। বাকিরাও আধচেনা।

সুভাষ নামে সর্দার গোছের একটা ছেলে বলল, এই শুয়োরের বাচ্চা, এটা কি তোর বাপের জমিদারি পেয়েছিস?

তটস্থ বগলা তাড়াতাড়ি উঠে হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে না, করলীদা মারা গেলেন বলে এই দিনকতক সামাল দিচ্ছি।

কার হুকুমে অন্যের দোকান দখল করেছিস? কাকে ভাড়া দিস?

আজ্ঞে হুকুম হলেই দেবো, দখল করিনি।

কালই গিয়ে মতিনবাবুর পার্টি অফিসে দেখা করবি। নইলে দোকান গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবো।

ভোজেনবাবুর নাকের ডগাতেই ঘটনা, চেঁচামেচি সবই তিনি ঘরে বসেই শুনতে পেলেন। কিন্তু উঁকিটিও মারলেন না। হাওয়া যে ঘুরে গেছে তা হাড়েহাড়ে টের পেল বগলা।

রাতের দিকে ভোজেনবাবুকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলায় ভোজেন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এরকমই হওয়ার কথা।

পরদিন বেলা এগোরোটায় ট্যাঁকে হাজারখানেক টাকা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে মতিনবাবুর পার্টি অফিসে গিয়ে হাজির হল। প্রথমটায় তো পাত্তাই দিল না কেউ। বারান্দার সিঁড়িতে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখল। তারপর ডেকে পাঠিয়ে চশমা পরা বাবুদের মতো চেহারার একটা হাড়গিলে লোক তলচক্ষুতে তাকে দেখে নিয়ে বলল, কত কামিয়েছিস?

এমন খ্যানখ্যানে গলা জন্মে শোনেনি বগলা। হাতজোড় করাই ছিল, সেটাই একটু কচলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে সামান্যই।

আমাদের কাছে পাকা খবর আছে, যাক গে। সাত দিন সময় দেওয়া হল। দোকান ছেড়ে দেশে চলে যা! ওখানে আমাদের ইলেকশন অফিস হবে।

আজ্ঞে, তাহলে যে না খেতে পেয়ে মরব।

কেন, তোর ভোজেনবাবাই তো আছে। যা যা, সময় নষ্ট করিস না।

ট্যাঁক থেকে হাজারটা টাকা বের করে টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল। লোকটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, ওসব করে সুবিধে হবে না, টাকা তুলে কেটে পড়। মনে থাকে যেন, ঠিক সাত দিন।

ফিরে আসতেই ভোজেনবাবুর ঠ্যাঙাড়েদের জনা চারেক এসে চড়াও হল তার ওপর। নিমকহারাম, বেজন্মা, বিশ্বাসঘাতক, তারপর উচ্চারণ করা যায় না, মা বাপ তুলে এমন সব গালাগাল। দু-চারটে চড়চাপড়ও পড়ল। ভোজেনবাবু বারান্দায় বেরিয়ে এসে লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে বললেন, ওরে, ওকে মেরে কি হবে? ওর হল পেটের দায়। তোরা বরং পালা করে ঘরটা পাহারা দে। রাতবিরেতে মতিনের ছেলেরা এসে না দখল নিতে পারে।

ব্যবসার যে বারোটা বাজল তা বুঝতেই পারছে বগলা। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক বা নিমকহারাম নয় মোটেই। কোন দল ঠিক দল তাও তো সে জানে না। একবার মনে হয় এ ভালো তো অন্যবার মনে হয় ও ভালো, মতিন ভালো না ভোজেন ভালো একী সে জানে? তার তো অত বুদ্ধি নেই!

মনটা বড় উচাটন হয়ে আছে, খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না। নমো নমো করে সকালে দোকান খোলে রাত দশটায় ঝাঁপও ফেলে দেয়। কিন্তু মাঝখানে কী হয় তা বলতে পারবে না।

সেদিন রাত দশটার একটু পরে ঝাঁপে ধাক্কা পড়ল, কে যেন ডাকছে, বগলা—এই বগলা, দরজা খোল শালা।

বগলা ভয়ে মরে, হাতের কাছে হাতুড়িখান ছিল, সেইটে আড়াল করে আগলটা খুলে দিতেই তিন তিনটে মাতাল ঢুকেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শালা, শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে, বিদ্যেধরীর সঙ্গে আশনাই? বের করছি মজা....

বলে সে কি মার রে বাবা, কে বিদ্যেধরী, কী বৃত্তান্ত কিছুই বুঝতে পারে না বগলা। শুধু মার খেয়ে হাল্লাক হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এরকম তো চলতে দেওয়া যায় না। টিনের বেড়ার সঙ্গে যখন সেঁটে গেছে তখনই একবার মনে হল গায়ে গতরে সেও তো বড় কম ছিল না। কখনও পরখ করা হয়নি বটে, কিন্তু এ যাত্রায় পালটি মার না দিলে প্রাণ বাঁচে না।

সামনের ছোকরা তার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছিল। তাকেই তলপেটে প্রথম হাঁটুর গুঁতোটা মারল সে। তাতে হাত একটু আলগা হতেই পর পর দুটো ঘুঁষি বসাল মুখে। ছোকরা উল্টে পড়ল গিয়ে পিছনে। বেঞ্চের কোনায় মাথাটা লেগে সেই যে ধরাশায়ী হল, আর নড়ল না। দ্বিতীয় ছোকরা তেমন জোয়ান নয়। তাকে হেঁটমুণ্ডে ধরে পিঠে কনুই বসিয়ে দিতেই সে একটা আঁক শব্দ করে বসে পড়ল। তিন নম্বরটা একটা ছোরা জাতীয় কিছু বের করছিল কোমর থেকে, হাতুড়িটা তুলে তার চোয়ালে মারাতেই সে একটা ব্যাঙবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

চেঁচামেচি শুনে লোক জড়ো হয়েছিল মন্দ নয়, এত রাতেও। একজন হাঁ করে পড়ে থাকা তিনজনের দিকে চেয়ে তাকে বলল, করেছিস কি রে বগলা! এ যে বাজু মস্তান, আর ওইটে চেল্টু আর তপন।

সে অবাক হয়ে বলে, এরা সব কারা?

হাটখেলার মস্তান, দিনে দুপুরে মাথা কাটে, ঠেলা বুঝবি বাপ, কাজটা ভালো করিসনি।

গুণ্ডাগুলোর খবর পেয়ে পুলিশ এল। মেলা জিগ্যেসাবাদ হল। পরদিন বগলাকে থানায় যেতে বলে তিন জনকে তুলে নিয়ে গেল।

কেন কে জানে আজ রাতে বগলার খুব খিদে হল। মুখের রুচিটাও ফিরে এসেছে। ডাল ভাত পেট ভরে খেয়ে ঘুমোলোও ভালো। ভাবল দেশেই ফিরে যাবে, শুধু বিদ্যেধরীটা কে তা বুঝতে পারছিল না। অনঙ্গ

মিস্তিরির মেয়েটা নাকি? গুণ্ডাদের একজন যখন বাজু মস্তান, তখন হতেও পারে। কিন্তু বিদ্যেধরীর সঙ্গে তো তার আশনাই নেই!

আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন দুই পার্টিই থানায় গিয়ে এজাহার দিল যে বগলাচরণ গায়েন তাদের লোক। উলটো পার্টির লোকেরা তার ওপর হামলা করেছে। থানা তাই আর বিশেষ ঘাঁটাল না বগলাকে। তিন গুন্ডা জামিনও পেল না।

দিন সাতেক পরের কথা। সন্ধের পর দোকানে খদ্দের ছিল না, খুব বাদলা গেছে সারাদিন। বগলা উনুনে খিচুড়ি চাপিয়ে বসে ফর্দ করছিল, এমন সময় মেয়েটা এসে হাজির। শরীরে ভেজা ভাব, চুল থেকে জল পড়ছে, মুখে বৃষ্টিতে ধোয়া হাসি।

কী করছো?

ও বাবা, তুমি! সাংঘাতিক মেয়ে তো! তোমার জন্য তো আমি খুন হতেই বসেছিলাম।

আহা, আর আমি যে রেলে গলা দিতে যাচ্ছিলাম!

সে তো আর আমার জন্য নয়!

তোমার জন্যই।

তার মানে?

সে তোমাকে বুঝতে হবে না, একটা কথা বলতে এলাম।

কী কথা?

একটা কাজ দেবে?

আবার সেই কথা? দেখ বাছা, আমি গরীব মানুষ, বেতন দিয়ে লোক রাখা আমার পোষায় না। বাসন ধোয়া, ফাইফরমাশ করার জন্য একটা ছোকরা রেখেছি, তাইতেই বেশ খরচ হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা মুখ টিপে হাসছিল। বলল, তা বললে শুনবো কেন? কাজ আমি মেলাই জানি, তুমি ঠকবে না। উনুন ধরানো, ঝাঁটপাট দেওয়া। পাতলা করে বেগুন কেটে দেবো, বেসন ফেটিয়ে দেবো, দুবেলা ভাত রাঁধবো, বিছানা পেতে দেবো, হিসেব রাখবো আর তোমাকে সামলাবো, দেবে না কাজ?

বগলা তেমন বুদ্ধিমান নয় ঠিকই, তবু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকার পর মেয়েটার মুখের বিচ্ছু হাসিটা দেখে কথাটা যেন বুঝতে পারল। তারপর হাঁ বন্ধ করে খিচুড়িটায় হাতা দিয়ে নাড়া দিল খানিকক্ষণ। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, কাজ না দিয়ে উপায় আছে? যা জুলুমবাজ মেয়ে।

দেখা হওয়া

আরে আসুন, আসুন! অনেকদিন পরে দেখা! হ্যাঁ, এই এখানে আমার পাশেই বসুন। জানালার ধারটায় বসবেন কি? আমি বরং সরে বসছি ওদিকটায়।

না না। আজ বাদলার হাওয়া দিচ্ছে। আমার আবার সর্দির ধাত।

তাহলে জানালার কাচটা নামিয়ে দিই?

না না, থাক। জানালা বন্ধ করলে আবার গরম হবে। যাত্রীরা আপত্তি করতে পারে।

ওফ! কতদিন পরে দেখা!

তা বটে, আপনাকে তো ঠিক...

চিনতে পারলেন না তো! না চেনারই কথা, তবে আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। আপনি হলেন কেষ্টবিষ্টু লোক, আমাদের মতো ফেকলু পার্টি তো নয়। আরে মশাই, বাইরের লোকের কথা বাদ দিন, ঘরের লোকই চিনতে চায় না।

আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন। আমি কোনও কেষ্টবিষ্টু নই, নিতান্তই ছা-পোষা মানুষ।

বড় মানুষদের স্বভাব কী জানেন? তারা যে কত বড় একথাটা তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। এই তো সেদিন অক্ষয় গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গেছি। উনি একেবারে আঁতকে উঠে পা দু'খানি এমনভাবে সরিয়ে নিলেন, যেন আমি তাঁর জুতো চুরি করছি। তা বড় মানুষদের এইটেই দোষ, বড় মানুষ বলে নিজেদের টেরই পান না।

তা ইয়ে, এই অক্ষয় গোস্বামী কে বলুন তো, নামটা ঠিক যেন চেনা চেনা লাগছে না।

ওরে বাবা! অক্ষয় গোস্বামী পেল্লায় মানুষ মশাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর। তাছাড়া হস্তরেখাবিদ হিসেবেও তাঁর খুব নামডাক। 'হস্তবীক্ষণ ও ললাটলিখন' নামে তাঁর যে বইখানা আছে তার বাইশটা সংস্করণ হয়ে গেছে।

বলেন কি? বিজ্ঞানের প্রফেসর হয়ে ভাগ্য বিচারও করেন।

তাহলেই বুঝুন, এমনি এমনি তো আর বড় মানুষ হননি। বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে ছাড়ছেন বলেই না তাঁর এত নামডাক।

খুব নাম-ডাক বুঝি। কিন্তু কি, তাঁর নাম বিশেষ শুনেছি বলে তো মনে হয় না।

আসলে কি জানেন, আমাদের মাপে তিনি বড় মানুষ হলেও আপনার মাপে তো আর বড় নন। বড় মানুষদের মাপকাঠি তো আমাদের মতো হয় না। বড় মানুষদের চোখে, বড় মানুষ হতে গেলে আরও বড় হতে হয়।

আপনি যে কেন আমাকে বড় মানুষ ঠাওরালেন সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না মশাই। আমি মোটেই কোনও কেওকেটা নই।

একথা আপনার মুখেই মানায়। এই তো গত বছর যদু মল্লিকের মেয়ের বিয়ের আসরে ক্ষেপুবাবুর সঙ্গে দেখা। লোকে অটোগ্রাফের জন্য ঘিরে ধরেছে। কিন্তু কী বিনয়, কী কুণ্ঠা, কিছুতেই অটোগ্রাফ দেবেন না। কেবল হাত গুটিয়ে রেখে বললেন, আমি কেন, আমাকে কেন....ইতস্তত

এই ক্ষেপুবাবুই বা কে বলুন তো?

চেনেন না। লোকে বলে ক্ষেপুবাবু হলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার মুক্তিসুর্য, কেউ কেউ আবার তাঁকে 'ইছাপুরের গান্ধি'ও বলে, ক্ষেত্রপাল চৌধুরী। বিরাট মানুষ মশাই, নবগ্রাম তন্তুবায় সমিতির সভাপতি, বটকৃষ্ণ স্মৃতি গ্রন্থাগারের সচিব, নারী-শিক্ষা-উন্নয়ন সমিতির সহ-সম্পাদক ইত্যাদি ডজনখানেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। একসময়ে উয়ারি ক্লাবে ফুটবল খেলতেন।

তা হবে।

আজ্ঞে হাঁ, তাই সেই ক্ষেপুবাবুর বিনয়াবনত ভাব দেখে বড় ভালো লাগল। বড় মানুষরা কিছুতেই ধরা দিতে চান না। নিজেদের বড্ড লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। কিন্তু পাকা কাঁঠাল কি আত্মগোপন করে থাকতে পারে? ঠিক কি না বলুন। লুকিয়ে থাকলেই বা লোকে ছাড়বে কেন?

তা তো বটেই। তবে আমাকে আবার আপনার ওই পাকা কাঁঠাল বলে ভুল করবেন না কিন্তু।

আজ্ঞে না, ভুল হওয়ার জো নেই। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। এই তো সেদিন পরেশবাবু বাজারে অতি সাধারণ একজন মানুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে একটা কেলে পাতলুন, গায়ে আধময়লা গেরুয়া পাঞ্জাবি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। দেখে কে বুঝবে যে এই লোকটাই একবার আইনস্টাইনকে ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন।

আইনস্টাইনকে চিঠি? কেন বলুন তো?

চিঠিতে নাকি আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে একটা ভুল ধরে দিয়েছিলেন, তাতে আইনস্টাইন নাকি খুব অবাকও হয়েছিলেন।

চিঠির জবাবে তাই লিখেছিলেন বুঝি।

আরে না। জবাব দেবেন কি, ভয়ে একেবারে গুটিয়ে ছিলেন যে। ভারতবর্ষের একজন লোক তাঁর খ্যাতি কেড়ে নিচ্ছে দেখে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন উনি!

কী করে সেটা জানা গেল?

কথায় কথায় পরেশবাবুই একদিন বলে ফেলেছিলেন। তবে শুধু আইনস্টাইনই বা কেন, দুনিয়ার অনেক বড় মানুষকেই তিনি বহুকাল ধরে চিঠি দিয়ে আসছেন। শুনেছি ডেমোক্রেসির মানে ব্যাখ্যা করে তিনি ইন্দিরা গান্ধিকেও হিন্দিতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সে চিঠির প্রাপ্তিও স্বীকার করা হয়েছে। শুধু কি তাই, দেশের নানা অব্যবস্থা নিয়ে তিনি আনন্দবাজার থেকে শুরু করে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত সব বড় বড় কাগজেই নিয়মিত চিঠি দেন। সেগুলো কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে। দেশের মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বাড়ানোর প্রস্তাব, গোমাংস ভক্ষণের উপকারিতা, কেষ্টপুর খাল সংস্কার কেন জরুরি এই সব নিয়ে।

আমি অবশ্য পড়িনি।

আহা, পড়ার দরকারটাই বা কি। শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, পরেশবাবু লোকটা এলেবেলে নন। অথচ একজন এলেবেলে মানুষের মতোই তিনি ঝিঙের দর জিগ্যেস করছেন, ঢ্যাড়সের ডগা ভেঙে কচি কিনা দেখে নিচ্ছেন, কুমড়োগুলোর সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন, দেখে চোখে জল আসতে চায় মশাই। অত বড় মানুষটার কী বিনয়, কী বিনম্রতা!

তা তো বটেই। আপনি বড় মানুষকে চেনেন তো?

যে আজ্ঞে, সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। এই তো গত রবিবার বেলা এগারোটায় হঠাৎ দেখলাম, সাতচল্লিশের বি বাসে ভিড়ের মধ্যে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলে একজন মান্যগণ্য লোক চলেছেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে তো আমি তাজ্জব, তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে চেঁচিয়ে বললাম, নমস্কার মুরারীবাবু, প্রতি নমস্কার করার মতো অবস্থায় ছিলেন না, তবু বাঁ হাতটা তুলে একটা সেলাম মতো করলেন বটে, একটু ক্লিষ্ট হাসিও হাসলেন। বড় মাপের মানুষ তো, সৌজন্য বোধ প্রবল। কে যাচ্ছিলেন জানেন?

আজ্ঞে না। বললেন তো মুরারীবাবু, তা তিনি কে?

নাম শোনেননি? গত নভেম্বরে শ্যামপুকুর ক্লাবে কদলী ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় এক সিটিংয়ে সাতাশিটা মর্তমান কলা খেয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলেন। মুরারী ঘোষালকে নিয়ে সেদিন মানুষজনের কী নাচানাচি! কিন্তু উনি হাতজোড় করে কেবলই বলতে লাগলেন, এ আর এমন কি...এ তো অতি সামান্য ব্যাপার...ইত্যাদি।

ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলছেন? গিনিসে নাম উঠেছে?

এখনও ওঠেনি। তবে উঠবে। ছবিটবি চেয়ে পাঠিয়েছে শুনলাম। গিনিসে নাম উঠলেই বা কি? বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করে, বিশ্ববিখ্যাত হয়েও উনি ওইরকমভাবেই সাতচল্লিশের বি বা আটচল্লিশের সি বা ওইরকমই কোনও ভিড়ের বাসে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলেই যাবেন। বড় মানুষদের রকমটাই আলাদা কিনা। আপনি কি একটা চুকচুক শব্দ করলেন?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম সাতাশিটা কলা খাওয়া বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার।

খুব, খুব। ক্ষণজন্মা পুরুষ ছাড়া কেউ কি পারে? বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, জানালাটা কি বন্ধ করে দেব? আপনার সর্দির ধাত বলছিলেন।

না, আমার এখন বেশ গরমই লাগছে। তবে আপনার অসুবিধা হলে বন্ধ করে দিতে পারেন।

না মশাই, আমার বেজায় গরমের ধাত। শীতকালেও গায়ে গরম জামা দিতে পারি না।

ও বাবা! আমি কিন্তু খুব শীতকাতুরে।

হতেই হবে। প্রতিভাবান মানুষদের এইটেই লক্ষণ কিনা। তাঁরা বেশিরভাগই একটু শীতকাতুরে। রবিঠাকুরের কথাই ভাবুন, বোলপুরের ওই দুর্জয় গরমেও গায়ে জোব্বাজাব্বা পরে, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে বসে থাকতেন। পরঞ্জয় দত্তকেও দেখেছি, শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই গায়ে আলোয়ান।

পরঞ্জয় দত্তটা আবার কে?

ওঃ ডাকসাইটে কবি মশাই। এক-একখানা কবিতা যেন বোমা। তবে তাঁর ট্র্যাজিডিটা হল, তিনি সারাজীবন নাকি তাঁর বউকে খুশি করার জন্য কবিতা লিখে চলেছেন। আর কারও জন্য নয়, শুধু বউয়ের জন্য। কিন্তু আজ অবধি তাঁর কোনও কবিতাই তাঁর বউয়ের পছন্দ হল না। কত সভা, কত কবি সম্মেলনে ডাক আসে, উনি সব আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বলেন, নিজের স্ত্রীর মুখেই হাসি ফোটাতে পারলাম না, খ্যাতি বা পুরস্কার দিয়ে কী হবে। এরকম পত্নী-নিষ্ঠা কারও মধ্যে দেখিনি মশাই।

নাম করা কবি বলছেন, কিন্তু পরঞ্জয় দত্তের নামই যে শুনিনি।

আহা, আপনি না শুনলে কী হয়, তাঁর নাম যে আমেরিকার বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত জানেন।

বটে! কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কি?

ঘটনাটা অনেকেই জানে। পরঞ্জয় দত্ত একটা কবিতায় লিখেছিলেন, তাঁর জীবনে দুটি সাধ। একটি হল বউয়ের মুখে হাসি, অন্যটি হল চাঁদের বুকে হিসি।

অ্যাঁ। চাঁদের বুকে হিসি? সে আবার কী?

তাঁর নাকি জন্মাবধি একটা সাধ হল, চাঁদে গিয়ে একবার চাঁদের মাটিতে হিসি করে আসবেন। তা কথাটা চাউর হয়ে যাওয়ায় নাসা থেকে তাঁর নামে একদিন চিঠি চলে এল। তাতে তাঁকে পরবর্তী লুনার এক্সপিডিশনে চাঁদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। খরচা সব আমেরিকাই দেবে, তিনি শুধু গিয়ে চাঁদে তাঁর হিসিটা ছেড়ে দিয়ে আসবেন।

বটে? তা শেষ অবধি কী হল?

কী আর হল। আমাদের পাসপোর্ট অফিস তাঁর পাসপোর্ট দিতে এত দেরি করল যে চাঁদে যাওয়ার তারিখটাই গেল হড়কে।

তাহলে কি তিনি এখনও হিসি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

কী আর করবেন বলুন, চাঁদে হিসি, বউয়ের হাসি কোনওটাই না হওয়ায় তিনি নিজেকে ব্যর্থ কবি মনে করে আউল বাউলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, পুরস্কার সংবর্ধনা—কবি সম্মেলন, কোনও প্রলোভনেই পা দেন না, ওই তো বড় মানুষের লক্ষণ কিনা।

বুঝলুম, কিন্তু মশাই, আপনি এই বড় মানুষের দলে আমাকে ধরছেন কেন সেটাই বুঝছি না।

আহা, বুঝতে অসুবিধা কি? আপনার ঊর্ধাঙ্গে গিলে করা পাঞ্জাবি, ফ্যাকাশে করা চুল, দাড়ি কামানো, দেখেই বিশেষ কেষ্টবিষ্টু বলে মনে হয়। কিন্তু নিম্নাঙ্গকে যে আপনি উপেক্ষা করেছেন এইটে দেখেই আমার মনে হল, ইনি সাধারণ মানুষ নন। দেখছি, আপনার নিম্মাঙ্গে একটি আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া আর কিছুই নেই।

অ্যাঁ, আরে তাই তো! ধুতিটা কি পরতে ভুলে গেলুম? নাকি ট্রামে উঠতে গিয়ে খুলে পড়ে গেল...

শোনা ছিল, পণ্ডিতরা সময়ে সময়ে অর্ধেক গ্রাহ্য করেন। তাই ভাবলুম পাণ্ডিত্যের এমন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আর তো দেখিনি। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনার পাঞ্জাবির ঝুল এতই বেশি যে নিম্নাঙ্গের ত্রুটি কারোরই চোখে পড়বে না। আর আজকাল কে-ই বা কাকে লক্ষ্য করে বলুন? আচ্ছা মশাই, আমার স্টপ এসে গেছে। নমস্কার।
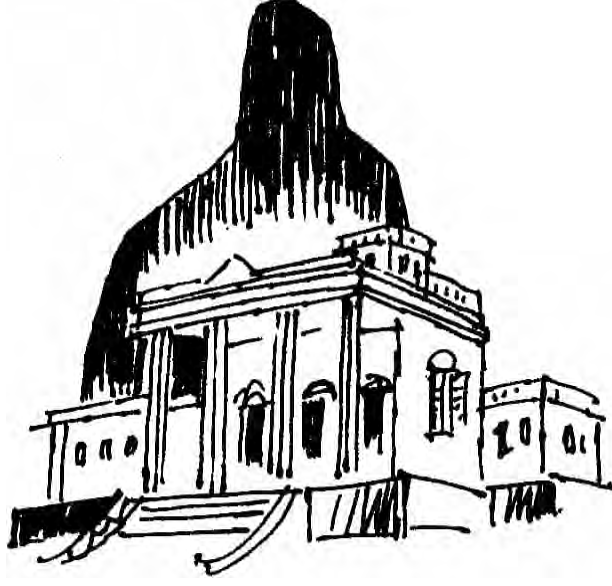
সেই বাড়ি

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই যে উমাশংকর খানিকটা উদাসী হয়ে গেছে তা আর কেউ এখনও টের পাক না পাক, স্নিগ্ধা পায়। ঠিক আশি পেরিয়ে রসময়ী মারা গেলেন। কিছুতেই সেটাকে অপরিণত বয়সের মৃত্যু বলা যায় না। অধিক শোকেরও কিছু ছিল না।

উমাশংকর তেমন চোখে পড়ার মতো শোকও প্রকাশ করেনি, কিন্তু ইদানীং একটু স্তব্ধতায় পেয়ে বসেছে তাকে। চুপ করে থাকে। ভ্রু কুঁচকে ভাবে। কথা বলতে আজকাল ভালোবাসে না। রসময়ী বেঁচে থাকতে উমাশংকর প্রায়ই তাঁকে বলত, তুমি মরলে কিন্তু মা আমি শ্রাদ্ধ-শান্তি করব না। ওসব মিনিংলেস ব্যাপার।

বাস্তবিক, উমাশংকর কিছুই মানে না। ঠাকুর-দেবতা, পুজো-পার্বণ, আচার-বিচার কিছু না। কৈশোরকাল থেকেই সে কাঠোর নাস্তিক। ধর্মে তার মতি নেই বলে রসময়ীর দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু এই ছেলেকে দিয়ে তিনি ঠাকুর-দেবতাকে প্রণামটাও করাতে পারেননি কখনও।

কিন্তু রসময়ীর মৃত্যুর পর উমাশংকর কাঁটায় কাঁটা নিখুঁত অশৌচ পালন করল। ত্রি-সন্ধ্যা স্নান, ভূমিতে কম্বলাসনে শয়ান, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করা—সব সব। স্নিগ্ধা এটা আশা করেনি। তিনদিনে হবিষ্য খেয়েই উমাশংকর কাহিল হয়ে পড়েছিল। পেটটাও ছেড়ে দিল। কিন্তু তাতেও সে দমেনি। শীতকালে ত্রি-সন্ধ্যা স্নান সহ্য হল না। জ্ঞাতিভোজনের দিন বুকে কফ বসে একশো তিন জ্বর উঠে গেল তার।

কিন্তু এসব হয়তো বাইরের ব্যাপার। এগুলো থেকে উমাশংকরের উদাসীনতার প্রকৃতি বোঝা যাবে না। স্নিগ্ধা তার স্ত্রী বলেই জানে, এই পৃথিবীটাকে উমাশংকর আর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার চারদিকে কত কী ঘটে যাচ্ছে, উমাশংকর তা আগের মতো লক্ষ্য করে না।

রসময়ী গত হওয়ার মাসখানেক বাদে একদিন স্নিগ্ধা খুব কোমল গলায় জিগ্যেস করল, তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু অত ভেঙে পড়লে কি চলে?

স্ত্রীর সঙ্গে উমাশংকরের সম্পর্ক মোটামুটি ভালো; কয়েকটা ব্যাপারে উমাশংকরের অযৌক্তিক গোঁয়ার্তুমি। সে স্ত্রীলোককে বাড়ির কাজের লোকের পর্যায়ে ফেলে না, আবার সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকারও স্বীকার

করে না। তবে সে স্ত্রী ও বাড়ির মেয়েদের কষ্টটষ্টগুলি বোঝে এবং তারা যা বলে তা উড়িয়ে না দিয়ে বিবেচনা করে দেখে। অন্য পুরুষ হলে স্ত্রীকে এড়ানোর জন্য হয়তো অন্য কথা বলত। উমাশংকর কিন্তু খুব সরলভাবেই বলল, কেমন যেন ভাবনা হচ্ছে।

কীসের ভাবনা?

—অতীতের সঙ্গে শেষ যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেল তো। কেবলই যেন এমনটা মনে হচ্ছে। মায়ের কোলটা সরে গেল, একটা যুগ আবছা হয়ে গেল, ইতিহাস হয়ে গেল, আর জ্যান্ত রইল না। উমাশংকর সঙ্গে স্নিগ্ধা ঘর করছে আজ বিশ বছর। এই মেজাজি লোকটার সঙ্গে সে একটু ভেবেচিন্তে কথা কয়। সে বলল, সে তো নিশ্চয়ই। আমার মা যখন মারা গেল তখন আমারও ঠিক এরকম হত। উমাশংখর ক্ষীণ একটু হেসে বলল, আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন মাকে মনে করতাম হেড অফ দি ফেমিলি। মার পর আমিই এখন এই পরিবারের প্রধান লোক। মা চলে যাবার পর নিজেকে ভারী বুড়ো বলে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু তুমি তো আর সত্যিই বুড়ো নও।

—সেটা ভেবে দেখতে হবে।

স্নিগ্ধা একটু হেসে বলল, ভেবেচিন্তে জোর করে নিজেকে বুড়ো বলে ভাবতে হবে নাকি গো?

—তা নয়, তবে বার্ধক্য যদি এসেই থাকে তবে তাকে স্বীকারও করতে হবে। এই কথা বলে উমাশংকর পাশ ফিরে ঘুমালো। কিম্বা ঘুমলো না ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। স্নিগ্ধা বুঝল, উমাশংকর আর কথা বাড়াতে চাইছে না। একটা কিছু ভাববে, কিন্তু কী ভাববে? সকালে উমাশংকর তার পুরনো ও প্রকাণ্ড বিএসএ মোটর সাইকেলে বেড়িয়ে পড়ল। অঞ্চলটা জংলা এবং পাহাড়ি।

এখানে উমাশংকরের বাবা বহুদিন আগে কাঠের ব্যবসা খোলে। সে ব্যবসা এখন আর নেই। তবে উমাশংকররা এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু। উমাশংকর ঠিকাদারী করে। তার আয় যথেষ্টরকম ভালো, সে সংসমী, মিতব্যয়ী, সৎ, মোটা ভাতকাপড়ের অভাব তার কোনওদিনই হওয়ার কথা নয়।

মোটর সাইকেলটায় একটা উতরাই ডিঙিয়ে উমাশংকর একটা শালবনের ধারে দাঁড়াল। শীতের শুরু। চমৎকার ঋতু। রোদ এখন মোলায়েম ও উজ্জ্বল। মস্ত মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে উত্তুরে হাওয়ায়। উমাশংকর ভাবপ্রবণ নয়। এসব প্রাকৃতিক দৃশ্যবলী, যে-কোনও সৌন্দর্য বা ঘটনা তাকে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু কখনওই অভিভূত করে না। সে মোটরসাইকেল থেকে শালবনে ঢুকল। বাল্যাবধি পরিচিত সব কিছু তার। এই শালবনে তাকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও সে ঠিক পথ খুঁজে নিতে পারবে।

ছেলেবেলায় এখানে সে কতবার মিছিমিছি শিকার করতে আসত, লুকোচুরি খেলত। তার বাবার ভাড়াটে কাঠুরেরা এই বনে গাছ কাটত। এক-একটা গাছ কুঠারঘাতে জর্জরিত হয়ে মর্মর শব্দে কাত হয়ে যখন পড়ে যেত, তখন আত্মীয় বিয়োগের যত শোক উথলে উঠত বুকের মধ্যে।

আজও কাটা গাছের গোড়া ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। পরিষ্কার বন। অনবরত লোকের যাতায়াত বলে এখন ভালো করে ঘাস বা আগাছাও জন্মাতে পারে না তেমন। কত গাছে উমাশংকর তার নাম লিখেছিল ছেলেবেলায়! কালের বৃষ্টিতে সব ধুয়ে মুছে গেছে। উমাশংকর একটা গাছের তলায় বসল। চুপচাপ।

অবধারিত মনে পড়ল মায়ের কথা। না, শোক নয়। মায়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, একদিন না একদিন তো যেতেই হবে মানুষকে। উমাশংকর ভাবছিল অন্য কথা। একজন গেলেন। সেই জায়গার দিকে পা বাড়াল আর একজন। মায়ের জায়গা এখন নিতে হবে তাকে। সংসারের সে জ্যেষ্ঠতম লোক। এই সংসারে সে আর কাউকে প্রণাম করবে না। প্রাচীনতম হিসেবে সকলের প্রণাম পাবে।

বার্ধক্য? হ্যাঁ, বার্ধক্যের চিন্তাই আজ তাকে ছেঁকে ধরল তিলেতিলে। যৌবন, শক্তির ক্ষমতা, উদ্দীপনার হ্রাস সে কি সইতে পারবে? সে ছিল বন্য উদ্দাম যৌবনের প্রতীক। উদয়াস্ত কঠোর শ্রম করতে পারত, আজও পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ? মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন আশ্চর্যভাবে বয়েসের কথা মনে পড়ত না।

উমাশংকর ভাবপ্রবণ নয়, দুর্বল হৃদয় নয়, তবু আজ এক বিবশ মন নিয়ে বসে রইল সে। জীবন কঠিন, মৃত্যু রহস্যাবৃত, বার্ধক্য দুঃখময়। তার ঈশ্বর বলতেও কেউ নেই, যার দিকে তাকিয়ে জীবনের কঠিন সত্যগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

এই বনে কখনও ময়ূর দেখেনি উমাশংকর। আজ হঠাৎ উপর দিকে চেয়ে সে অবাক হল। নিষ্পত্র একটি শালগাছের ডগায় লেগে থাকা আকাশের চাঁদোয়ায় রোদের বর্ণালি দেখা গেল কি হঠাৎ? আর সেই রঙ মেখে নিয়ে অপরূপ এক ময়ূর নেমে এলো আকাশ থেকে। উমাশংকর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ময়ূরটা গাছের মাথায় বসেছে। বিশাল পালকের রাশি বোঝার মতো ঝুলে আছে নিচের দিকে। অহংকারী ময়ূরটা ঠোঁট দিয়ে নিজের গা খুটছে বসে বসে।

কারও পোষা হবে! উমাশংকর ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকে। ময়ূরটাও মনে হয় তাকে দেখতে পায় উপর থেকে। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হয়।

উমাশংকরের সামনে একটু ফাঁকা জমি। কাঠুরেরা গাছ কেটে নিয়ে গেছে। সেই শূন্যতায় ময়ূরটা নেমে এলো একেবারে উমাশংকরের মুখোমুখি। তার পর কর্কশ দীর্ঘ কেকাধ্বনি শিহরিত করে দিল বনস্থলিকে।

সেই শব্দ উমাশংকরকে প্রায় তার স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে উৎক্ষিপ্ত করে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। এরকম অদ্ভুত গভীর শব্দ সে কখনও শোনেনি।

ময়ূরটা আস্তে আস্তে তার পেখম মেলতে থাকে। পেখমধরা ময়ূর উমাশংকর অনেক দেখেছে। কিন্তু এই বনস্থলিতে একা তার মুখোমুখি একটি ময়ূরের পেখম ধরাকে সামান্য ঘটনা বলে মনে হল না তার। যেন এত আয়োজন শুধু তারই জন্যে! শুধু তারই জন্যে অন্য দেশ-লোক থেকে শরীর ধারণ করেছে এক অলৌকিক ময়ূর।

তার জন্যেই এত পাতাঝরা বনে পেখম ধরেছে সে। শুধু তার জন্যেই। চারধারে রিমঝিম নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি একটি করে শালপাতা খসে পড়ছে, ঢাউস ঘুড়ির মতো। উত্তরের হাওয়ায় বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। দক্ষিণায়ণের সূর্য স্পর্শ করে মধ্যাহ্নের চূড়া পেখম ধরা ময়ূর আর সৌন্দর্যের রহস্যালোক খুলে দিয়ে দাঁড়ায় উমাশংকরের মুখোমুখি। সেই পেখমের বহুচোখ চেয়ে থাকে তার দিকে করুণ, দয়াময়, গভীর দৃষ্টি নিয়ে।

কার চোখ? কার চোখ? অস্থির উমাশংকর সোজা হয়ে বসে। ময়ূরটা ঘুরে ঘুরে নৃত্যপর দু'টি পায়ে চারদিক দেখে। উমাশংকর একটা সংকেত টের পায়, এই মধ্যাহ্নের ময়ূর তাকে কিছু বলতে চাইছে? কী বলতে চাইছে? কোন রহস্যময় গভীর জীবনের বার্তা? কোন সত্য? কোন উপলব্ধি?

উমাশংকর আচম্বিতে উঠে ময়ূরটার দিকে ছুটে যায়। আত্মবিস্মৃতি ছাড়া আর কী?

ময়ূরটা তার পেখম গুটিয়ে নেয়। নৃত্যপর দু'টি পায়ে সরে যায়। তার পর উড়ে যায় উপরের দিকে। উমাশংকর দেখে উপরে এক মায়াবী বর্ণালীর মধ্যে ময়ূরটা মিলিয়ে গেল।

রাত্রে স্নিগ্ধা গায়ে হাত রাখল। ভালো আছো? মনটা কি আজ ভালো নেই?

উমাশংকর পাশ ফিরে স্নিগ্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ আমার মন ভালো আছে স্নিগ্ধা।

আছে? বাঁচলুম। ক'দিন যা চিন্তায় আছি।

কীসের চিন্তা?

তোমার মুখ ভার দেখে আমার যে পায়ের তলার মাটি থাকে না।

উমাশংকর একটু হেসে বলল, একটা বেয়াদপ ময়ূর এসে আজ আমার বয়েস কেড়ে নিয়ে গেল।

তাই নাকি? কী অদ্ভুত কথা!

অপহরণ

পয়সাওয়ালা লোক, বলবান মানুষ আর বিদ্বান ব্যক্তিদের বরাবর ভয় খেয়ে এসেছে অবনী।

তাদের পাশের বাড়িটাই গদাধর সরকারের। পয়সার লেখাজোখা নেই। সরকার বাড়ি আর অবনীদের বাড়ির সীমানার পাঁচিলটা ভেঙে নতুন করে পাঁচিল তুলে দিলেন গদাধরবাবু। আর তুলতে গিয়ে বেমালুম তিন হাত জায়গা দখল করে নিলেন। অবনীর বাবা সুধীর রায় মশাই তেমন ডাকা-বুকো নন। তবুও তেড়েফুঁড়ে একটু চেঁচামেচি করলেন। গদাধরবাবু মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, ও-জায়গাটা আমার পাওনা। দলিলে পরিষ্কার দেখানো আছে।...না মানলে মামলা করোগে যাও, তবে বলে রাখছি এইসব করে সুবিধে হবে না। ইচ্ছে করলে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি, তা জানো তো?

হ্যাঁ, সুধীরবাবু সেটা জানেন, তাই খানিকক্ষণ মিনমিন করে রণে ভঙ্গ দিলেন।

অবনী যখন ক্লাস ফোরে, তখন নন্দলাল নামে একটা ছেলে অন্য ইস্কুল থেকে তাদের ক্লাসে ভরতি হল। বড়সড় চেহারা, কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, নন্দলাল দারুণ মারকুট্টা। রোজই ছুতোনাতায় ঝগড়া বাধিয়ে ক্লাসের পড়ুয়াদের পেটায়। অবনীকে একটা পেনসিল নিয়ে তর্ক করায় এমন পিটিয়েছিল যে, অবনী ভয়ে দুদিন ইস্কুলে যায়নি। এরপর থেকে আর নন্দলালকে কখনও ঘাঁটায়নি সে। কোনও বলবান লোককেই সে আর ভুলেও ঘাঁটায় না।

বিদ্বানদেরও বড্ড সমঝে চলে অবনী। বাবার এক বিলেত-ফেরতা বন্ধু একবার তাদের বাড়িতে এসে অবনীকে ইংরেজি গ্রামারের এমন সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেছিল যে, অবনীর তখন 'ধরণী, দ্বিধা হও' অবস্থা। পালিয়ে বাঁচে না।

শুধু এই নয়, অবনীর আরও নানা ভয়ভীতি আছে। জোরালো, তেজানো, বুক চিতিয়ে চলা লোকজনকে সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। কো-এডুকেশনে বি. কম পড়ার সময়ে তার আরও একটা বিপদ হল। সে টের পেল, মেয়েরা তাকে মোটেই পছন্দ করে না। ক্লাসের সবচেয়ে তেজি আর রোখাচোখা মেয়ে ছিল শুক্লা সিংহ। সে একদিন তাকে মুখের ওপর বলে দিয়েছিল, তুমি বুঝি ভাবো যে, মুখ গম্ভীর করে চুপচাপ বসে থাকলেই তোমার খুব পার্সোনালিটি আছে বলে সবাই ভাববে? তুমি যে একটা হাঁদা গঙ্গারাম তা আমরা সবাই জানি আর তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করি, বুঝলে?

মেয়েদের সেই থেকে খুবই সমঝে চলে অবনী।

হিসেব-নিকেশের মাথা খুব পরিষ্কার বলে সে বি কম, এম কম পাশ করে গেল। দু'বারের চেষ্টায় সি এ-টাও পাশ করে ফেলল। কিন্তু তেমন ড্যাশিং-পুশিং নয় এবং ইন্টারভিউতে গেলে মুখোমুখি কৃতবিদ্য মানুষরা

বসে থাকে বলে বেজায় ঘাবড়ে যায়, ফলে সে তেমন জুতসই চাকরিও পেয়ে উঠল না। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সে অ্যাকাউন্টস সামলায়। কোনো অলৌকিক কিছু না ঘটলে তার যে তেমন উন্নতি হওয়ার নয়, এটা সে হাড়ে হাড়ে জানে।

অবনীর নতুন যে ভয়টা দেখা দিয়েছে তার নাম বলাই মিত্তির। বলাই মিত্তির তার ওপরওয়ালা, হিসাবশাস্ত্র গুলে খেয়েছে। নামের পেছনে মেলা ফরেন ডিগ্রি। তার ওপর বলাই মিত্তির অত্যন্ত রাগী, ভীষণ অন্যমনস্ক, বেজায় খেয়ালি, প্রচণ্ড অহংকারী। বলাই মিত্তিরের দাপটে অবনীর অবস্থা ইটচাপা ঘাসের মতো, যে মাথা তুলে চোখে চোখ রেখে কথাই কইতে পারে না। আর বলাই মিত্তিরের প্রচণ্ড রাগে অফিস থরহরি কম্পমান হলেও অবনী নিতান্তই নিরীহ বলে মিত্তিরের পো তাকে তেমন শাসন তর্জন করেনি, করুণাবশতই হয়তো।

তা সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ জোনাল ম্যানেজার বলাই মিত্তির একদিন হঠাৎ অবনীকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে প্রথমটায় তাকে আগাপাশতলা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন, তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, তোমার হাইট কত?

অপ্রত্যাশিত এইরকম প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে অবনী ঢোক গিলে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কোনো রকমে বলল, পাঁচ দশ। তারপরই ভাবল, এই রে, হাইটের জন্যই চাকরিটা না যায়।

বলাই মিত্তির ভ্রূ কুঁচকে খুবই অপছন্দের চোখে তাকে দেখতে দেখতে বললেন, দৌড়ঝাঁপ বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কিছু করো?

অবনী বসেছিল, তোতলাতে তোতলাতে বলল, ওই স্কুলে একটু করতাম ফুটবল, ক্রিকেট ওইসব আর কী।

আর কিছু নয়?—

অবনী খুব কষে কিছুক্ষণ ভেবে একটা জুতসই ব্যাপার পেয়ে গেল। বলল, আ-আমি সাঁ-সাঁতার কাটতে পারি।

সাঁতার। ফের ভ্রূকুটি করে বলাই মিত্তির বলেন, কোথায় সাঁতার কাটো?

আমাদের বাড়ি স্যার বরানগরে, গঙ্গার কাছেই, রোজ সকালে গঙ্গায় সাঁতরাই।

ব্যাপারটা পছন্দ হল কিনা বলাই মিত্তিরের তা বোঝা গেল না। তবে উনি খুব গম্ভীর বদনে শুধু সংক্ষেপে বললেন, হুঁ।

হিসেব-নিকেশ আর তৎসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করলে অবনীর কাবু হওয়ার ভয় বিশেষ নেই। ওই শাস্ত্রটা সে মোটামুটি জানে। কিন্তু এইসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য, কী তার মাথামুণ্ডু তার বোধগম্য হল না। বলাইবাবু নিশ্চয়ই তাকে অলিম্পিক পাঠানোর কথা ভাবছেন না।

সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এবং অন্যমনস্ক ও ভুলো স্বভাবের বলাইবাবু তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কী যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। মিনিট দশেক বাদে হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে সচকিত হয়ে তাকে লক্ষ করে বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে কী যেন বলছিলাম?

সাঁতারের কথা জিগ্যেস করছিলেন স্যার।

ভ্রূ কুঁচকে বলাই মিত্তির বলেন, সাঁতার। সাঁতার দিয়ে কী হবে? না না, সাঁতার নয়। আগামীকাল সন্ধে সাতটার সময় উত্তর কলকাতার নবকুমার স্ট্রিটের তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির সামনের ফুটপাথে ডাকবাক্সের পাশে তোমাকে হাজির থাকতে হবে। বলো তো কী বললাম?

অবনীর স্মৃতিশক্তি চমৎকার। সে বলে, কাল, আগামীকাল সন্ধে সাতটায় উত্তর কলকাতায় নবকুমার স্ট্রিটের তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির সামনের ফুটপাতে ডাকবাক্সের পাশে আমাকে হাজির থাকতে হবে।

বাঃ, এই তো মনে আছে দেখছি।

যে আজ্ঞে।

বলাই মিত্তির ফের পিছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে সাড়ে সাত মিনিট নিশ্চুপ থেকে হঠাৎ আবার সচকিত হয়ে অবনীকে দেখে বললেন, তাহলে ওই কথাই রইল। মনে থাকে যেন, আর হ্যাঁ, টু বি অন দি সেফ সাইড বাঁ-হাতের কবজিতে একটা সাদা রুমাল বেঁধে যেয়ো।

যে আজ্ঞে।

এ-বার তুমি যেতে পারো।

আমাকে কী করতে হবে স্যার?

খুবই অবাক হয়ে বলাই মিত্তির তাকে পালটা প্রশ্ন করলেন, তুমি! তুমি কী করতে চাও?

আজ্ঞে জানতে চাইছিলাম, নবকুমার স্ট্রিটে আমাকে কী কিছু করতে হবে?

বলাই মিত্তির ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন, না না, তোমার কিছুই করার নেই। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। যা করার তা ওরাই করবে। তুমি এখন যেতে পারো।

এই বলে বলাই মিত্তির তার ফাইলপত্র খুলে মুহূর্তের মধ্যে কাজে ডুবে গেলেন।

অবনী অত্যন্ত দ্বিধান্বিত অন্তরে কম্পিত বক্ষে এবং দুশ্চিন্তিত মাথায় নিজের চেয়ারে ফিরে এসে গলাত গলাত করে এক গেলাস জল খেয়ে ফেলল। কাজকর্মে একেবারেই মন দিতে পারল না। 'যা করার তা ওরাই করবে' বলাই মিত্তিরের এই মন্তব্যের 'ওরাই'টা আসলে কারা, সে-চিন্তায় তার ঘোর উদবেগ হতে লাগল। এই 'ওরাই' শেষ অবধি কী করবে সেটা ভেবে বের করতে পারছিল না সে।

একবার ভাবল, একটা রেজিগনেশন লেটার লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সটকে পড়বে কি না। কিন্তু কাজটা যদি তেমন বিপজ্জনক না হয়, তাহলে তার আমও গেল, ছালাও গেল।

গত মাসে আফ্রিকার তানজানিয়া থেকে একটা চাকরির অফার পেয়েছিল অবনী। মা কান্নাকাটি করায় সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছে। আর আফ্রিকাও কী আর সোয়াস্তির জায়গা, সেখানে সিংহ আছে, ব্ল্যাক মাম্বা নামে ভয়ংকর সাপ আছে, গন্ডার আছে। তার চেয়ে নবকৃষ্ণ স্ট্রিট অনেক নিরাপদ জায়গা।

অনেক ভেবেচিন্তে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে না-পেরে অবশেষে সে আজ সন্ধে সাতটার সময়ে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনের ফুটপাতে নির্দেশিত ডাকবাক্সের পাশে এসে বাঁ-হাতে সাদা রুমাল বেঁধে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

টিভিতে বোধহয় কোনো ওয়ানডে ম্যাচ দেখানো হচ্ছে। তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির একতলা থেকে ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছে। সচিন চুয়াল্লিশ রানে ব্যাট করছে। ভারত এক উইকেটে চুরাশি।

একজন হা-হয়রান লোক এসে তাকে জিগ্যেস করল, মশাই, বাইশের বি বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

অবনী দৃঢ়স্বরে বলল, আজ্ঞে না।

লোকটা হতাশ হয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে একবার দেখে চলে গেল।

সাতটা চার মিনিটে সচিন চার মেরে আটচল্লিশে পৌঁছে গেল। সাতটা ছয় মিনিটে দুই রান নিয়ে পঞ্চাশ।

এজন বুড়ো মানুষ এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে তাকে দেখে নিয়ে বললেন, ইয়ংম্যান, দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটুন, যত হাঁটবেন তত ভালো থাকবেন। এই সাতাশিতেও আমি রোজ নিয়ম করে চার মাইল হাঁটি।

যে আজ্ঞে।

বুড়োটি চলে গেলেন।

—সচিন পঁচাত্তরে পৌঁছাল সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে। সেঞ্চুরি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কি না তা অবনী বুঝতে পারছিল না। পথচলতি লোকেরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে যাচ্ছে।

উদ্বেগের একেবারে শেষ সীমায় যখন পৌঁছে গেছে অবনী, তখনই একটি কোমল নারীকণ্ঠ বাঁ-দিক থেকে বলল, এবার আপনি কবজির রুমালটা খুলে ফেলতে পারেন।

অবনী চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

মেয়েটি হেসে ফেলে বলল, দি আইডিয়া ওয়াজ নট মাইন, কিছু মনে করবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।

কোথায়?

ওই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে 'টয়োটা ইনোভা'। আসুন।

উদ্বেগ অশান্তিতে মাথাটা টালমাটাল করছিল। সে খুব দুশ্চিন্তার গলায় বলে ফেলল, অ্যাম আই বিয়িং অ্যাবডাকটেড?

মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে বলে, অ্যাবডাকশনের কথা উঠছে কেন? ইউ আর বিয়িং গাইডেড। অপহরণের কথা মনে হল কেন আপনার?

অবনী আমতা আমতা করতে লাগল।

গাড়িতে ওঠার পর মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার বাবা একটা কলসালট্যান্সি ফার্ম খুলেছেন। তাতে খুব বাছাই করা লোক নেওয়া হবে। একটা কোলাবরেশনের কথা চলছে। ডিলটা আপনাকে দেখে দিতে হবে। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

অবনীর দুশ্চিন্তা গেল না। শুধু বলল, ও—

আমার বাবা বলাই মিত্র। আমি তার ছোট মেয়ে তানিয়া।

অবনীর বুকের ধুকপুকুনিটা কমল না বাড়ল তা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তবে চমকে উঠে মেয়েটার দিকে একবার চাইল। মেয়েটারা চেহারা কেমন, সেজেছে কিনা এসব তার চোখেই পড়ল না। মেয়েটা এখন তার কাছে একজন রহস্যময় মানুষ এবং ভয়ের জিনিস। বলাই মিত্তিরের মেয়ে মানে কি এই মেয়েটাও অবনীর একরকম ওপরওয়ালাই নয়?

গাড়িটা গিয়ে থামল মধ্য কলকাতায় একটা ঘ্যামা তিন তারা হোটেলে। সেখানে একটা ভারী নিরিবিলি সুইটে বলাই মিত্তির এবং গেরামভারী চেহারার কয়েকজন লোক জমায়েত হয়েছে। একধারে ডিনারের আয়োজনও রয়েছে।

বলাই মিত্তির তার দিকে যথারীতি ভ্রূ কুঁচকে খুব অপছন্দের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ বললেন, পাঁচ ফুট দশ বলছিলে না?

অবনী ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে তাই জানতাম।

সাঁতার কাটো না?

যে আজ্ঞে।

তাহলে নার্ভাস হওয়ার কী আছে? ডিলটা পড়ে দ্যাখো। কোনো ঘাপলা থাকলে বের করো। তানিয়া, ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যা। ফাইলটা পড়তে দে। আর কফি হুইস্কি যা চায় দিতে বল।

পাশের একটা ছোট্ট কেবিনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে ডিলটা মন দিয়ে পড়ল অবনী। তিন জায়গায় দাগ দিল। কফি বা হুইস্কি কিছুই খেল না।

আধঘণ্টা বাদে মিটিং বসল বড় ঘরটায় এবং অবনীর সংশোধনীসহ বিলটা গৃহীত হয়ে গেল। অবনী যেটুকু বুঝল তাতে বলাই মিত্তির কোম্পানি ছেড়ে নিজস্ব কনসালট্যান্সি খুলছেন, তাতে অবনীকে অত্যন্ত দায়িত্বের একটা চাকরি অফার করা হচ্ছে। বেতন কোম্পানির দেওয়া বেতনের চারগুণেরও বেশি এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ।

বলাই মিত্তির ভ্রূকুটি বজায় রেখেই বললেন, কি হে রাজি?

অবনী আমতা আমতা করে বলল, যে আজ্ঞে।

দু-বছর বাদে এক অবিশ্বাস্য রাতে অস্বস্তিকর ফুলের গন্ধ। অনভ্যস্ত গরদের পাঞ্জাবি আর ধাক্কা-পেড়ে ধুতিপরা অবনী যখন বেনারসি আর গয়নায় মোড়া তার বউয়ের মুখোমুখি হল তখনও ভারী অপ্রস্তুত সে। মেয়েটাকে একদম চেনা যাচ্ছে না। অবশ্য ঘোমটার আড়ালে মুখটা দেখাও যাচ্ছে না ভালো করে।

একটু দূরে আড় হয়ে বসে সে একটু গাল খাঁকারি দিল।

ঘোমটার আড়ালে একটা হাসি শোনা গেল একটুখানি। তারপর চেনা একটা গলা বলল, সেদিনেরটা অ্যাবডাকশন ছিল না। এটা কিন্তু 'অ্যাবডাকশন'।

পাত্রী চাই

না, না, পাত্রী এখনও ঠিক হয়নি, তবে আমার মা পুরুত ঠিক করে ফেলেছে।

ওরে বাপু, বিয়েতে পুরুত একটা লাগে বটে, তবে সে না হলেও হয়। কত রকমের বিয়ে আছে হে বাপু। সই-সাবুদের বিয়ে, গন্ধর্ব মতে বিয়ে, রাক্ষস মতে বিয়ে। সেসবে পুরুতও লাগে না। তবে কিনা পাত্রী লাগে।

হ্যাঁ, আর সেটাই হয়েছে মুশকিল। পাত্রীরই বড্ড টানাটানি চলছে মশাই।

সে আবার কীরকম?

কোনও পাত্রীতেই যে কানুখুড়োর গাল উঠছে না। মাধবগঞ্জের পাত্রীটা মোটেই খারাপ ছিল না। রংটা ফরসার দিকেই, মজবুত শরীর, চৌকো মুখ। কিন্তু কানুখুড়ো তো আমাকে শেষ পাতের পান্তুয়াটাও ভালো করে খেতে দিল না। নড়া ধরে টেনে 'আজ আসি' বলে একরকম পালিয়েই এল। দোষের মধ্যে পাত্রীর দাঁত উঁচু। তাতে আমার আপত্তি ছিল না মোটেই। কিন্তু কানুখুড়ো বলল, পাত্রীর দাঁত উঁচু, তোরও দাঁত উঁচু। বিয়ে হলে হামি খাবি কী করে? দাঁত দাঁতে খটাখটি লেগে যাবে যে!

সেটা অবশ্য ভাববার মতো কথা। তোমার কানুখুড়োকে তো বেশ বিচক্ষণ লোক বলেই মনে হচ্ছে হে।

শুধু বিচক্ষণই নয়, ঘোড়েলও বটে।

কেন বাপু, ঘোড়েলের আবার কী দেখলে?

পাঁচথুপিতে যা কাণ্ড করলে খুড়ো, তা বলার নয় মশাই। যাদব দাসের মেজো মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলুম। তারা বেশ পয়সাওয়ালা লোক। মেয়েও চমৎকার। তার বয়সটা একটু ঢলেছে বটে, আর

চেহারাটা ধরুন মোটার দিকেই। ঠিক থলথলে নয়, বরং গোলগাল।

নাদুসনুদুস বলা যায় কি?

তা, তাও বলতে পারেন। মানে বেশ আহ্লাদি চেহারা। আমার তো দিব্যি লাগছিল। পাতে ঘিয়ে ভাজা লুচি, ফুলকপির তরকারি, আলু কড়াইশুঁটির দম, পাঁচরকম মিষ্টি, পায়েস, তার ওপর ওই লক্ষ্মীমন্ত পাত্রী। আমি তো খুব রাজি। কিন্তু খুড়ো আমার কানে কানে বলল, অমন হাঁ করে পাশবালিশটাকে দেখছিস কী? ও তো তোর মাসির বয়সি।

পাশবালিশ! পাশবালিশ মানে হল শরীরে উঁচু-নিচু নেই।

না না, তা ছিল। তবে বেশি খানাখন্দ, ঢিবি, পাহাড়-পর্বত থাকা কি ভালো? আপনিই বলুন।

তা বয়সটা কেমন বুঝলে?

তা বয়স একটু আছে। তা বলে আমার মাসির বয়সি বলাটা খুড়োর ঠিক হয়নি।

তা খুড়োর ঘোড়েলপনাটা কী দেখলে?

সেটাই তো বলছি মশাই। খুড়ো বিয়েটা নাকচ করে দিয়ে এসে মাকে বলল, ও মেয়ে ওর চলবে না। তারপর খুড়ো কী করল জানেন? দিব্যি গোঁফে আতর মেখে, চুল কলপ করে নিজেই গিয়ে যাদব দাসের মেয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ে পাকা করে এল।

বলো কী? তা তোমার খুড়িমা বঁটি নিয়ে তাড়া করল না?

খুড়িমা বেঁচে থাকলে তো কত কিছুই হতে পারত। এতদিনে খুড়োর শ্রাদ্ধ আর আমার বিয়ে দুটোই হয়ে যেতে পারত। এই তো বছরটাক হল তিনি গত হয়েছেন। তিনটে মেয়ের মধ্যে দুটোর বিয়ে হয়েছে, তিন নম্বরটারও হবো-হবো। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে খুড়ো আমার টোপর ধার নিয়ে যাদব দাসের মেজো মেয়েকে দিব্যি বিয়ে করে নিয়ে এল।

বটে, তা তাকে তোমার টোপর ধার করতে হল কেন? আর তোমারই বা টোপর এল কোথা থেকে?

আমার মায়ের আবার সব আগাম ব্যবস্থা। বিয়ের জোগাড়-যন্তর সব আগেভাগেই করে রেখেছে। টোপরটাও বছর দুই আগে কেনা। পড়ে থেকে নষ্টই হচ্ছিল একরকম। চোত-বোশেখে রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে আমি মাঝে মাঝে টোপর মাথায় দিয়ে বাজারহাট করতে যেতুম।

বলো কী? টোপর মাথায় বাজারে?

আজ্ঞে, সবসময়ে নয়। সাইকেল চালানোর সময় মাথায় ছাতা ধরার অসুবিধে বলে টোপরটা কাজে লাগত। কানুখুড়ো চিপ্পুস লোক। বিয়ের দিন সকালে এসে বলল, দে তো, তোর টোপরটা পরে বিয়েটা সেরে আসি। দুঃখের কথাটা একবার ভাবুন। আমার টোপর পরে আমার জন্য দেখা পাত্রীকেই খুড়ো বিয়ে করে আনল। সেই বিয়েতে আমি বরযাত্রীও গিয়েছিলাম। খাইয়েছিল খুব ভালো। পোলাও, কাটাপোনার কালিয়া, মাংস, আলবোখরার চাটনি, ক্ষীরোদ ঘোষের ভাপা দই, মাখা সন্দেশ আর দরবেশ।

তুমি তো বেশ পেটুক দেখছি হে?

আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। কিন্তু মনে দুঃখ-টুঃখ হলে দেখেছি, ভালো-মন্দ খেলে দুঃখটা কেটে যায়। আমারও গেছে। সেই মেয়েকে আমি এখন দিব্যি খুড়িমা বলে ডাকি, পেন্নামও করি।

বুঝলুম। তা না হয় দু-চারটে পাত্রী কেটে গেছে, কিন্তু তা বলে দেশে তো আর আইবুড়ো মেয়ের অভাব নেই।

আমিও তো তাই জানতুম মশাই। আদি সাতগাছি চেনেন কি? মোল্লারচক ছাড়িয়ে ক্রোশ দুই হবে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এবার আর কানুখুড়োর সঙ্গে নয়, আমার হারুমামার সঙ্গে আদি সাতগাছির প্রাণকুমার মণ্ডলের মেয়ে বনানীর সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল। দু'বার বাস বদল করে আদি সাতগাছিতে যখন পৌঁছলাম, তখন ভরদুপুর।

প্রাণকুমারের বেশ বড় বাগানওয়ালা বাড়ি। যাওয়ার সময় দেখি, পুকুরধারে একটা অল্পবয়সি মেয়ে তিন-চারজন বউ মানুষের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছে।

আহা, গাঁয়ে-গঞ্জে ওরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে বাপু।

তা তো বটেই। আমার আবার একটা বদ অভ্যাস আছে। রাস্তায় ঘাটে ঝগড়াঝাঁটি বা মারপিট লাগলে আমি দাঁড়িয়ে যাই। বেশ লাগে কিন্তু।

তা বাপু, সত্যি কথা বললে বলতে হয়, ওই অভ্যেস আমারও একটু-আধটু আছে। তা ঝগড়াটার কথা উঠছে কেন বলো তো?

সেইটেই তো কথা। দেখলুম অল্পবয়সি মেয়েটার যেমন চোখাচালাক চেহারা তেমনই তার জিবের ধার। একাই গলার জোর আর গালাগালের তোড়ে তিন-চারজন কুঁদুলি মেয়েছেলেকে প্রায় পেড়ে ফেলেছে আর কি। আর সে কী ভাষা! বাপ রে! অমুকের হেগো পোঁদ হলদে চিনি দিয়ে চেটে খা। বাপ-ভাতারী, ভাই-ভাতারী...আরও কী সব যেন বলছিল!

বেঁধে বাপু, বেঁধে! ওসব কথা বলবার দরকারটা কী বলো তো? ওয়াক! বাপু, আমার কিন্তু গা গুলোচ্ছে!

আহা, গা গুলোবার কী আছে মশাই? আমি ভেবে দেখেছি, কথা হল বায়ুভূত জিনিস। সে গালাগালই বলুন, ভালো কথাই বলুন কিংবা মন্ত্র পাঠই করুন, সবই হল আসলে বায়ু। উদ্গারও যা, কথাও তা। ঠিক কিনা বলুন দেখি!

কথাটা মন্দ বলোনি বাপু। তবে কিনা একটু রেখেঢেকে বলা ভালো।

তাই বলছি তাহলে। কিন্তু বেশি ঢাকাচাপা দিলে আসল ব্যাপারটা একটু আবছা থেকে যায় কিনা। ওই ঝগড়া শুনে অবিশ্যি মামাও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। আমার কনুই ধরে টানাটানি, ওরে, চলে আয়। ও শুনলে কানে গঙ্গাজল দিতে হবে যে। মামার টানাটানিতে অকুস্থল ছেড়ে প্রাণকুমারের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম। বেশ ফাঁদালো গেরস্থ প্রাণকুমার। আদরযত্ন খুব করল, মাথায় গন্ধতেল মেখে পুকুরে স্নান, নতুন গামছা, সাবান, দুপুরের খাওয়াটিও পরিপাটি হল। গরম ভাতে ঘি, উচ্ছেভাজা, শাকের চচ্চড়ি, মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, পাবদার ঝাল, রুই মাছের ঝোল, আমের অম্বল, দই আর দানাদার।

বাপ রে। এত সব পদের কথা মনে রেখেছ!

আমার বড্ড মনে থাকে। ওইটেও এক জ্বালা। কোনও কথা ভুলতে পারি না বলে ভারি অসোয়াস্তি হয়।

এ তো খাওয়ার কথা হল, পাত্রী কই?

পাত্রী কি হুট বলে দেখতে আছে মশাই? মধ্যাহ্নভোজের পর দিব্যি নরম বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, টেনে ঘুম দিন। মেয়ে দেখবেন বিকেলে, চা খেতে খেতে।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

যে আজ্ঞে। গুরুভোজনের পর তখন একটু গড়াগড়ি না খেলেই নয়। একেবারে পাথরের মতো ঘুম মেরে যখন উঠলুম তখন বিকেল।

বিকেলের দিকেই মেয়ে দেখানোর রেওয়াজ, শুনেছি।

সে কথা ঠিক। বিকেলে নাকি কুচ্ছিতকেও সুন্দর দেখায়। তাই আমরা সেজেগুজে গিয়ে বাইরের ঘরে চেয়ারে বসলুম। সামনে পাঁচরকম মিষ্টির থালা, গরম সিঙাড়া, চা।

বাপু রে, তুমি জব্বর পেটুক বটে! মেয়ে দেখতে গেছ, কিন্তু নজর প্লেটের দিকে! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আজ্ঞে, সবটা ফাঁদিয়ে না বললে খুঁত থেকে যায় যে।

আচ্ছা বাপু, তোমার মতো করেই না হয় বলো।

তাই বলছি। পাত্রী ঘরে আসার আগে পশ্চিমের জানালাটা খুলে দেওয়া হল। শেষ বেলার রোদ্দুরকে নাকি কনে-দেখা আলো বলে। সেই আলোয় মেয়েদের রূপ খোলতাই হয়।

হল নাকি?

তা হয়েছিল। দিব্যি ধারালো চেহারা, কাটাকাটা মুখচোখ। রংটা ফর্সাও বলা যায় না, কালোও বলা যায় না। আঁট করে খোঁপা বাঁধা ছিল বলে মুখটা আরও ফুটে উঠেছিল। আমি এমন মোহিত হয়ে চেয়ে ছিলুম যে, আমার হাঁ করা মুখ থেকে আধখানা সিঙারা খসে কোলের ওপর পড়েই গেল। চটকা ভাঙল যখন হারুমামা আমার কাঁকালে কুনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে চাপা গলায় বলল, ওরে, এ যে সেই কুঁদুলি মেয়েটা!

বটে হে!

যে আজ্ঞে, সেই মেয়েটাই বটে। তা কুঁদুলিই বা খারাপ কী বলুন? সব কিছুরই একটা ভালো দিকও তো আছে! ঝগড়ুটে হওয়ার জন্য দম লাগে। দম না হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সপ্তমে গলা তুলে চেঁচানো যায় কি? তারপর ধরুন ওই চেঁচামেচির ফলে তার গলাও হয় জোরালো আর তেজি। আর গলার জোর থাকলে কত হয়কে নয় আর নয়কে হয় করে দেওয়া যায় ভেবে দেখুন। ঝগড়া করলে একটা ব্যায়াম তো হয়, নাকি! অঙ্গভঙ্গি করা, হাত-পা নাড়া, এসবেরও উপকার আছে। তারপর ধরুন, উপস্থিত বুদ্ধি, অভিনয়ের ক্ষমতা, অন্যকে নকল করে দেখানোর প্রতিভা এসবেরও একটা প্র্যাকটিস হয়। ভাষাজ্ঞান বাড়ে, স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়, মনের ক্লেদ সব কেটে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি বাপু, ঝগড়ার এ দিকটা আমি কখনও ভেবে দেখিনি। তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, ঝগড়ারও বোধহয় কিছু উপকারিতা আছে।

আছেই তো! কিন্তু সেটা হারুমামাকে বোঝায় কার সাধ্যি? প্রাণকুমারবাবু আমার মামার হাত দুটো ধরে কত কাকুতি-মিনতি করে বললেন, ওইটেই আমার একটামাত্র মেয়ে, বড় আদরের। সাত চড়ে রা কাড়ে না। নবকুমারকে জামাই পেলে আমি একেবারে ঢেলে দেব। খাটপালঙ্ক, হিরের আংটি, মোটরবাইক যা চাই। মামা শুধু 'হবে, হবে' বলে পাশ কাটাচ্ছে দেখে, আমিই গ্যালগ্যালে মুখ করে বললুম, আজ্ঞে আমার তো খুব পছন্দ। তাতে মামা রেগে একেবারে কাঁইবিচি।

তা মেয়েটার ভাবসাব কেমন বুঝলে? তোমাকে তার মনে ধরেছিল বুঝি?

তা আর কি ধরেনি! কটাক্ষ বলে কী একটা কথা আছে না?

আছে বইকি। কটাক্ষ খুব বিপজ্জনক জিনিস। ওতে মুনিঋষিদের ধ্যান ভেঙে যায়, বীরের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে, যুদ্ধ লাগে, জাহাজডুবি হয়, স্বয়ং মহাদেব অবধি আঁকুপাঁকু করতে লাগেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হল কটাক্ষ। ও বড় জব্বর জিনিস মশাই। তা মেয়েটা বার কয়েক কটাক্ষ হেনেছিল বটে আমার দিকে। মামা অবশ্য বলছিল যে, ওটা মোটেই কটাক্ষ নয়, কটমট করে তাকানো। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওটা কটাক্ষই ছিল। কটাক্ষ যদি একটু জোরালো হয়, তাহলে কটমট করে তাকানোর মতোই লাগে বোধহয়। আর কটাক্ষ করবে নাই বা কেন বলুন। আমি তো আর ফ্যালনা লোক নই। দিব্যি রাজপুত্তুরের মতো চেহারা।

দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। চশমাটা এঁটে আর একবার ভালো করে তোমাকে দেখে নিই। রাজপুত্তুরের কোন লক্ষণটা তোমার আছে, সেইটে আগে জানা দরকার।

আহা, অতটা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কি চলে? কোনও কোনও ব্যাপারে রাজপুত্তুরের চেয়ে একটু কমা আছি বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে দূর-ছাই করার মতো তো নয়।

তা অবিশ্যি নও। বৃক্ষের অভাবে এরণ্ডও চলে। তাহলে মামাবাবুকে রাজি করতে পারলে না?

সেটাই তো দুঃখের কথা। ফেরার সময়ে বাসে বসে কত বোঝালুম। বললুম, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, জোয়ান অফ আর্ক এঁরাও কি কম তেজি ছিলেন? ঝগড়া তো তুচ্ছ, এঁরা তো সব বন্দুক পিস্তল বোমা নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করেছেন। মামা ঝিমোতে ঝিমোতে শুধু বলল, কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা। চাঁদে আর পোঁদে।

তোমার মামার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি।

আজ্ঞে না। মামা বলল, তোর মায়ের তো ঘটে বুদ্ধি নেই, আর তুইও একটা হাবা গঙ্গারাম, প্রাণকুমারের মেয়েকে ঘরে আনলে ও তোদের দুজনকে ভেড়া বানিয়ে রাখবে।

মামা দেখছি বিচক্ষণ মানুষ।

বিচক্ষণের কী দেখলেন বলুন তো! গেল তো বিয়েটা কেঁচে। এত দিনে হিরের আংটি পরে মোটরবাইক দাবড়িয়ে বেড়ানোর কথা আমার। তা নয়, পুরোনো সাইকেলে চেপে ট্যাংট্যাং করে গাঁয়ের রাস্তায় হয়রান হচ্ছি। আর ভেড়ার কথা বলছেন, পুরুষ সিংহের পাল্লায় পড়লে সব কুঁদুলি মেয়েই টিট হয়ে যায়।

তা যায় বটে বাপু। কিন্তু পুরুষ সিংহের যে বড্ড অনটন দেখছি চারদিকে।

সিংহের চেয়ে একটু কমা আছি ঠিকই, তবে তেজবীর্য কিছু কম নেই মশাই। নিজের মুখে নিজের সুখ্যাতি করতে নেই, নইলে বুঝতেন আমি মেনিমুখো ম্যান্তামারা পুরুষ নই।

আহা, বিস্তারিত নাই বা বললে, দু-চারটে নমুনাও তো শোনাতে পার, নাকি?

যোগেন উকিলকে নিশ্চয়ই চেনেন।

ও বাবাঃ যোগেনবাবুকে চিনব না। বলো কী?

হ্যাঁ। তা সেই যোগেন উকিলের ছোট মেয়ে হল মলিনা।

খুব চিনি। বীণাপাণি স্কুলে বারো ক্লাসে পড়ে। ভারি ভালো মেয়ে।

ছাই চেনেন। ওরকম হাড়ে বজ্জাত মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

তাই নাকি? তা কীরকম বজ্জাত বলো তো?

কিছুদিন আগে দুপুরের দিকে উকিলবাবুর বাড়ির পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। দূর থেকেই দেখলুম, বাগানের নিচু দেওয়ালটায় বসে তিন-চারটে ফ্রক পরা মেয়ে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে টোপাকুল খাচ্ছে আর ফুরুক-ফুরুক করে মুখ থেকে কুলের বিচি ছুড়ছে।

ওই দেখো, টোপাকুলের কথা বলে মুখটা রসস্থ করে দিলে হে!

হয় ঢোক গিলে ফেলুন, না হয় থুথু ফেলে আসুন। কথায় কথায় অত রি-অ্যাকশন হলে কি চলে মশাই?

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা এই বয়সে মাঝে-মাঝে নানা রকম দুষ্টু ইচ্ছে হয়, বুঝলে! ওই টোপাকুলের কথায় যেমনটা হল। তা বাপু, এবার নির্বিঘ্নে বলে যাও শুনছি।

এমন অসভ্য মেয়ে, যখন সামনে দিয়ে যাচ্ছি তখন টক করে আমার বাঁ কানে একটা কুলের বিচি এসে খচ করে লাগল।

খুব তাক বুঝে মেরেছে তো! টিপ আছে বলতে হবে।

তা থাকবেই তো। সারাদিন যারা ওসব করে বেড়ায় তাদের টিপ তো ভালো হওয়ারই কথা। আর এত জোরে ছুড়েছিল যে, কানটা ঝনঝন করে উঠল। অন্য কেউ হলে অবিশ্যি মানে মানে চলে যেত। কারণ, যোগেন উকিল কেষ্টবিষ্টু লোক, থানা-পুলিশ-আদালত সব তার হাতের মুঠোয়।

সে তো বটেই। যোগেন উকিল যে কত লোককে ঘানিগাছে ঘুরিয়েছে, তার হিসেব নেই। ক্রিমিন্যাল কেস করে বলে হাতে গুন্ডা-বদমাশও আছে।

তাই তো বলছি, আমি তো আর ভেড়ুয়া নই। সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বললাম, এটা কী হল?

বললে! তোমাকে বাপের ব্যাটা বলতে হয়।
বেশ বুক চিতিয়েই বললুম।
নাঃ, তোমার সাহস আছে।
ওই তো বললুম তেজবীর্য আমার বড় কম নেই। তা আমি ওরকম রুখে ওঠায় মলিনা ভারি ভালোমানুষের মতো বলল, সরি, আপনাকে দেখতে পাইনি কিনা, আমরা আসলে খুব মজার গল্প করছিলুম। যান, কানে একটু মলম লাগিয়ে নেবেন, তাহলেই ব্যথা সেরে যাবে।
তাহলে একরকম ক্ষমাই চাইল তো।
মোটেই না। কথাগুলো ভালোমানুষের মতো হলে কী হয়, সঙ্গে যে হি-হি করে গা-জ্বালানো হাসিও হাসছিল ওর বান্ধবীরা। হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। কাউকে নিয়ে অমন হাসি-মস্করা হলে তার রাগ হয় কিনা বলুন।
তা হয় বাপু। তা হয়।
তাই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। বললুম, মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা তোমাদের শিখে আসা উচিত। এরকম বাঁদরামি সভ্য সমাজে চলে না।
বললে! বাপ রে, তুমি তো খুনে লোক!
তবে!
মেয়েটা কিছু বলল না বুঝি! মাথা নিচু করে বসে রইল নিশ্চয়ই। হয়তো টপটপ করে চোখ থেকে অনুশোচনার জলও পড়ছিল।
তবেই তাকে চিনেছেন! ওইসব হারমাদ মেয়ের অনুশোচনা বলে কিছু আছে নাকি? উল্টে নির্বিকারভাবে আরও দুটো কুলের বিচি ছুড়ল। তার একটা ফসকাল বটে, অন্যটা লাগল আমার ঠোঁটে। মুখ ভেঙিয়ে বলল, এঃ, আমাদের ভদ্রতা শেখাতে এসেছে! ওই তো ভেটকি মাছের মতো মুখ, আবার আমাদের বলে কিনা বাঁদর!
এ তো রীতিমতো অপমান হে। তোমার মুখ মোটেই ভেটকি মাছের মতো নয়।
যে আজ্ঞে। অপমানে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললুম, ভেটকি মাছ। আর তুমি! তুমি তো একটা হাতি।
এঃ হেঃ, এইটা তো ভুল করে ফেললে! মলিনা তো বেশ ছিপছিপে, বরং রোগার দিকেই। হাতি কথাটা কি তার সঙ্গে মানায়?
তা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা রাগের মাথায় হাতি না গণ্ডার ওসব নিয়ে বাছাবাছি আসে না। যা মুখে এল বলে দিলাম।
তাতে কিছু ফল হল?
হল বইকি। তবে উলটো রকমের। তারা দিব্যি হাহা হিহি করে হেসে ঢলাঢলি করতে করতে এমন সব কথা কইতে লাগল যে, আমি রেগে গিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেলাম।
যাক বাবা, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা গেছে।
অত সোজা নয় মশাই। পরদিনই বীণাপাণি স্কুলের বন্দনাদি এসে বাড়িতে হাজির। আমাকে কী বকুনি, তোকে এতদিন ভালো ছেলে বলে জানতুম। আর সেই তুই কিনা মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করছিস!
তবেই তো ফ্যাসাদে পড়লে হে। বন্দনাদিদি আবার বেজায় নারীবাদী মানুষ। রামভজন তার বউকে ঠেঙিয়েছিল বলে সকলের সামনে প্রকাশ্যে তাকে নাকে খত দিইয়ে ছেড়েছেন। মাতাল সর্বেশ্বর বউকে শালা বলে গাল পেড়েছিল, বন্দনাদি তার তিন মাসের হাজতবাসের ব্যবস্থা করেছেন। দর্পনারায়ণ জমিদারের

তৃতীয় পক্ষের বউ তাঁর পা টিপে দিয়েছিল বলে বন্দনাদি এমন সোরগোল ফেললেন আর মিটিং মিছিল করলেন যে, দর্পবাবু বউয়ের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে তবে রেহাই পান। তা তোমার বেলায় কী বিলিব্যবস্থা হল।

সেইটেই তো দুঃখের কথা। বন্দনাদি নিদান দিলেন যে, মলিনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নইলে আমার দোকান থেকে আর কোনও মহিলা শাড়ি বা কাপড় কিনতে যাবে না। আমার স্টেশনারি দোকানও বয়কট করা হবে। আমার কনস্ট্রাকশনের কাজে কোনও কামিন আর কাজ করবে না। ফলে নমো নমো করে ক্ষমা চাইতে হল।

আরে তাতে কী হয়েছে! ওতে তোমার বীরত্বের কোনও হানি হয়নি। তা ক্ষমা চাওয়ার পর সব মিটমাট হয়ে গেল তো!

তা আর হল কোথায় বলুন। মলিনাকে আপনি কিছুই চেনে না। রোজ কোন ফাঁকে যেন এসে আমার লেটার বক্সে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ফেলে যায়। কোনওটায় লেখা 'বোবা', কোনওটায় লেখা 'হাবা গঙ্গারাম', কোনওটায় একটা ভূতুড়ে মুখ আঁকা থাকে, কোনওটায় হনুমানের ছবি।

বলো কী? ওসব আগে বলতে হয়।

তার মানে?

কবে থেকে কাগজ ফেলছে বলো তো!

তা মাস ছয়-সাত তো হবেই।

আচ্ছা আহাম্মক বটে হে তুমি!

কেন মশাই, আহাম্মকির কী দেখলেন?

আহাম্মকি নয়! ওই সব কাগজ পেয়েও তুমি বোকার মতো পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছ?

পাত্রী খুঁজব না! বলেন কী মশাই? মা যে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল।

ওরে বাপু, পাত্রী তো পা বাড়িয়ে আছে। ওই সাদা কাগজগুলো ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখনি?

দেখার কী আছে?

আছে হে আছে। ওই সাদা পাতাগুলো যে অদৃশ্য প্রেমপত্র।
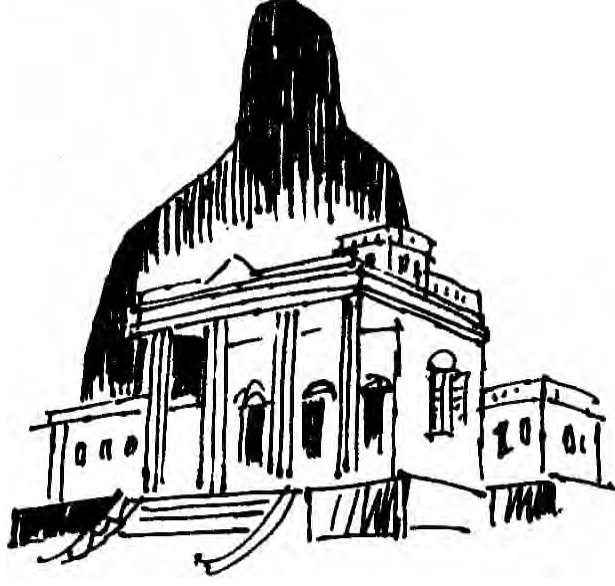
রাক্ষস

মোহনগড়ের জঙ্গলে যে রাক্ষস আছে এটা আশেপাশের সবাই জানে। কেউ কেউ দেখেওছে। সুতরাং ওই জঙ্গলে কেউ একা যায় না। কাঠ কুড়োতে কি ফলপাকুড় খুঁজতে কিংবা মৌচাকের সন্ধানে যেতে হলে দল বেঁধে যায়। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও নেয়। দা, কুড়ুল, বল্লম, ভোজালি, টাঙ্গি যে যা হাতের কাছে পায়।

নন্দরাম অবশ্য রাক্ষসের কথা মোটেই বিশ্বাস করত না। সে হল গাঁয়ের এক সৃষ্টিছাড়া ছেলে। পড়াশুনোয় তার বড়ো একটা মন নেই, আড়বাঁশি বাজিয়ে আর চড়ায় বড়ায় ঘুরে তার দিন কাটে। সে গাছ বাইতে পারে, সাঁতার জানে, হাডু-ডু খেলার দড়, ছবি আঁকে, শুধু পাঠশালা বা ইস্কুলের নামে তার গায়ে জ্বর আসে।

তা সেই ডানপিটে নন্দরামের খুব সাহস। গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে বাজি ফেলে সে একদিন সন্ধের মুখে একাই জঙ্গলে গেল। শোনা যায়, রাক্ষসরা নাকি দিনে ঘুমোয়, রাতে জাগে।

যখন সে জঙ্গলে ঢুকল তখনও বেশ বেলা আছে বটে, কিন্তু বনের ভিতরে এখনই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে। নন্দরাম মোহনগড়ের জঙ্গল ভালোই চেনে। বহুবার ফলপাকুড়ের খোঁজে বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে, তবে গহিন জঙ্গলের দিকটায় কেউ বড়ো একটা যায় না। বাঘ-ভালুকের ভয় আছে, সাপখোপ প্রচুর আর রাক্ষসের রটনা তো আছেই।

নন্দরাম দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছিল। হালকা জঙ্গল পেরিয়ে ঘন বনের মধ্যে ঢুকে ভাঙা দুর্গের দিকে এগোতে লাগল। বাঁ পাশে একটা মস্ত দিঘি। এককালে পদ্মদিঘি নামে খুব বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন হেজেমজে, কচুরিপানায় ছেয়ে দিঘি বলে আর চেনা যায় না।

সেই দিঘির পরেই আচমকা থেমে গেল নন্দরাম। সামনের গাছতলায় কে একটা যেন বসে আছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে তাজ্জব হতে হল নন্দরামকে, রাক্ষসই তো বটে!

রাক্ষসের মাথায় দুটো শিং থাকে, এরও আছে। মুলোর মতো দাঁত হয়, তা এরও তো তাই! পরনে চামড়া দিয়ে তৈরি একটা খাটো জিনিস কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা, আদুল গা। কিন্তু রাক্ষস হলেও এই

রাক্ষসটা খুবই ছোটোখাটো, চার ফুট হয় কি না হয়। তবে বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা।

রাক্ষসটা তার দিকে চেয়ে জ্বলজ্বল করে দেখছিল। হাতের কাছেই একটা মুগুর পড়ে আছে, তবে রাক্ষসটা মুগুর-টুগুর তুলে তেড়ে এল না। বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলল, কী দেখছো হে?

আপনি কি রাক্ষস?

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, চেহারা ছোটোখাটো দেখে কি সন্দেহ হচ্ছে? ছোটোখাটো বলে কী আর রাক্ষস নই? ওরে বাপু, ছোটো হলেও রাক্ষস, বড়ো হলেও রাক্ষস। গায়ে রাক্ষসের রক্ত রয়েছে না? এখনও একটা আস্ত হরিণ খেয়ে ফেলতে পারি।

নন্দরাম মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, কিন্তু আপনাকে দেখে তো আমার মোটেই ভয়টয় করছে না!

রাক্ষসটা গম্ভীর হয়ে বলে, রাক্ষসের কী আর সেই দিন আছে বাপু? আমার বাপ-দাদাদের আমলে রাক্ষসদের তালগাছের মতো ধেড়ে চেহারা হত, পাহাড়ের মতো শরীর। গরু-মোষ চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। এখন দেখছো না বন-জঙ্গল হাফিস হয়ে যাওয়ায় আমাদের লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই, ভরপেট খাবার জোটে না, তাই কমতে কমতে আমাদের এখন এই সাইজ দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা, আপনারা কি মাংস রান্না করে খান না কাঁচা?

রাক্ষসটা দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, না হে, আজকাল কাঁচা মাংস খেতে পারি না, দাঁতের সেই জোর কোথায়? চোয়ালেরও আর সেই শক্তি নেই। তাই কেটেকুটে রেঁধেবেড়েই খেতে হয়। কাঁচা খেলে আবার অম্বলেরও উৎপাত হয় কি না।

তা শিকার করেন কি দিয়ে? ওই ছোট্ট মুগুরটা দিয়ে নাকি?

রাক্ষসটা মুগুরটা হাতে নিয়ে একটু নাচিয়ে নিয়ে ফের রেখে দিয়ে বলল, মুগুর হাতে রাখার একটা নিয়ম আছে বলেই রাখতে হয়। তবে মুগুরের ঘায়ে শিকার করা ভারী শক্ত, আর শিকার করার আছেই বা কি বলো! এ জঙ্গল চষে ফেললেও তুমি জন্তুজানোয়ার খুঁজে পাবে না। শিকার করা এখন শিকেয় উঠেছে হে বাপু, তাই কাছেপিঠে যেসব হাটবাজার বসে সেখান থেকেই খাবারদাবার কিনে আনতে হয়। মাছমাংসের যা দাম হয়েছে তা আর কহতব্য নয়, তাই ডাল ভাত শাকপাতাও খেতে হচ্ছে।

নন্দরাম অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর বলল, রাক্ষসরা শাকপাতা ডালভাত খাচ্ছে! এ যে ঘোর কলি!

লজ্জার কথা আর বোলো না হে, ঘোর কলিই বটে, শাকপাতা খেয়েই তো আমাদের সাইজ একেবারে লিলিপুট হয়ে গেল। ওসব আমাদের তেমন হজমও হতে চায় না।

কিন্তু বাজারহাট করার পয়সা পান কোথায়?

পয়সা? সে আর কোথায় পাবো? দু'চারজন চৌকিদারের কাজ পেয়েছে, কয়েকজন কলকারখানায় মজুর খাটে, কয়েকটা ছেলে-ছোকড়া আছে, তারা চুরি-ডাকাতি করে, আর আমি কাঠকুটো বিক্রি করি।

তাহলে আর আপনারা রাক্ষস কিসের? আপনাকে তো মোটেই রাক্ষস বলে মনে হচ্ছে না?

বলো কী? রাক্ষস নই মানে? ওরে বাপু, যত যাই হোক না কেন, শরীরে রাক্ষসের রক্তটা তো আছে না কী!

গায়ের গন্ধ

'ওই যে, ওই হল আঁচল। সবসময়ে আঁচল ধরে থাকত বলে মা এই নাম রেখেছিল।'

'বটে! তা বাপু তুমি আঁচলের বৃত্তান্ত জানলে কী করে?'

'আজ্ঞে, কানে আসে কি না, বাতাসে কত ফিসফাস ঘুরে বেড়ায় তা জানেন?'

'আমার কানে তো আসে না বাপু?'

'আপনার উঁচু কান, মোটর, ক্যানেস্তারা, হাতুড়ি আর লোহালক্কড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু কি আপনার কানে যায়?'

'কেন, শেতলাপুজোয় মাইক বাজে, চৌপথীতে ভোটের বক্তৃতা হয় সেসব কি আমার কানে আসে না?'

'তা আসে, আবার বেরিয়েও যায়। কোনও কিছু গায়ে মাখেন নাকি আপনি? আপনার গায়ে শুধু তেলকালি, অথচ বাতাসে একসময় এত্ত ফিসফাস শুনেছিলাম, আপনি নাকি এমএসসি পাশ। দেখলে তো পেত্যয় হয় না।'

'ফিসফাসে বিশ্বাস করো কেন? আমি মিস্তিরি মানুষ, খেটেপিটে দুটো ডালভাতের জোগাড় করি, এটাই আসল কথা।'

'দেখুন ভোলাদা, মিস্তিরি আমরাও। তাই বলে দুনিয়া ভুলে দিনরাত গাড়ির কলকবজার মধ্যে ডুবে থাকতে হবে নাকি? আমাদের গাঁয়ের ফটিকচাঁদ পালাগান নিয়ে মজে থাকত। দিনরাত পালা ছাড়া কথা নেই। কিংবা ধরুন দিশেরপাড়ার নস্করবাবু, সকাল থেকে রাত আবধি ওস্তাদি গানের কালোয়াতি করে যাচ্ছেন। তার একটা মানে বুঝি, ওসবের মধ্যে একটা আলাদা রসকষ আছে। কিন্তু গাড়ির কলকবজায় কোন মধু ঘাপটি মেরে আছে একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'কেন বাপু, গেল হপ্তাতেই তো কি যেন একটা বাংলা সিনেমা দেখে এলুম কোথায়।'

সিনেমা দেখুন ছাই না দেখুন ওতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু একটু চোখ তুলে চারদিকটা দেখবেন তো। এখন কোথায় আছেন, বেলা ক'টা বাজে, খিদে-তেষ্টা পেয়েছে কি না এসবও যদি ভুলে মেরে দেন তাহলে আপনার সম্পর্কে অন্যরকম ভাবতে হয়।'

'সে আবার কিরকম শুনি?'

'কিছু মনে করবেন না দাদা, লোকে আড়ালে বলে ভোলাটা পাগলা আছে।'

'কী মুশকিল, একটা কাজ মন দিয়ে করতে গেলে লোকে তো একটু ওরকম হতেই পারে। আমাদের অঙ্কের স্যর হরিহরবাবুরও তো খাওয়াদাওয়ার ঠিক থাকত না।'

'সেইটেই তো বললুম, পালাগান, কালোয়াতি কিংবা অঙ্ক তো শাস্ত্র, কিন্তু অটোমোবিলটা কোন হিসেবে তার সঙ্গে পাল্লা টানে?'

'কেন, গাড়িই বা কি এমন খারাপ জিনিস?'

'মানছি, আপনার মতো গাড়ির মেকানিক কমই আছে।' আড়ালে আমরা বলাবলিও করি, ভোলাদার মতো গাড়ির হাঁচিকাশি বুঝতে পারার মতো বিদ্যে আমাদের নেই। তা বলে গ্যারেজের বাইরের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাতে নেই!'

'আহা, আজ তুমি বড্ড চটে আছো। আচ্ছা, ওই আঁচল মেয়েটাকে নিয়েই বখেরা তো?'

'আপনি তো আচ্ছা লোক ভোলাদা। ব্যাপারটা বখেরা হতে যাবে কেন? বখেরা মানে হল ঝঞ্ঝাট বা ঝামেলা। আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?'

'বাপু হে, সারা জন্ম মাত্র তিন মহিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঠাকুমা, মা আর দিদি। তিনজনেই খান্ডার। ঠাকুমা তো চেলা কাঠ দিয়ে পেটাত, মায়ের অস্ত্র ছিল হাত পাখার বাঁট, কখনও গরম খুন্তি। আর দিদি? ছয় বছরের বড় হওয়ার সুবাদে মাঝে মধ্যেই চুলের মুঠি ধরে উত্তম মধ্যম দিত। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, মা আর ঠাকুমার বুড়ো বয়সে দাপট কমে গেছে। তা বলে আমার আতঙ্কটা তো আর যায়নি। মেয়েমানুষকে বড্ড ভয় পাই বাপু। তাই বখেরা কথাটা মুখে এল।'

'ওটা কথা হল না দাদা। মাসিমাকে খান্ডার বললেই তো হবে না। এই তো সেদিন চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা খাওয়ালেন, মাতৃনিন্দা মহাপাপ।'

'ওটা নিন্দে হবে কেন? মায়ের শাসন ছিল বলেই আমি বখে যাইনি। কথাটা ওভাবে বলা নয়, মা-ঠাকুমার অসুখ করলে আমি অন্ধকার দেখি।'

'এটাকেও বখে যাওয়াই বলে, বয়স কত হল তার হিসেব আছে?'

'বয়স নিয়ে ভেবে কী হবে। বেঁচে থাকলেই বয়সের মিটার চড়তে থাকে।'

'বুড়োবয়সে দেখবে কে আপনাকে?'

'কেন, এই যে এতগুলো ছেলেকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলুম, ওরাই দেখবে। না দেখলে বৃদ্ধাবাস আছে।'

'বলি কি দাদা, বউ যেমন তেমন হোক, ঝগড়ুটে বা খান্ডারনি, সব বউই কিন্তু স্বামীটাকে আগলে রাখেন। দু-চারটে অন্যরকম আছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ মেয়েই নিজের মানুষটার কদর দেয়। ছেলেপুলেও তত আপন হয় না, যতটা বউ হয়।'

'তোমার আজ হল কী বলো তো হরিপদ? আমার মাথাটা খেতে এসেছো নাকি?'

'না দাদা, ভালোর জন্যই বলা! আপনি যে দুনিয়াটার দিকে মোটেই তাকান না।

একটু কোথাও বেড়াতে যান না, সিনেমা-থিয়েটার গানবাজনার শখ নেই, শুধু কলকবজা নিয়ে পড়ে আছেন? রসকষ যে শুকিয়ে যাচ্ছে ভোলাদাদা? ছুপা রুস্তম হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন?'

'রুস্তম মস্ত বীর। আমার তো বুকের পাটাই দেননি ভগবান। তবে বেড়াতে যাই না কে বলল? এই তো গত বছর মা আর ঠাকুমাকে কাশী বিশ্বনাথ দেখিয়ে আনলাম।'

'সেটা তিন বছর আগে আমার হিসেব আছে।'

'তা হবে। আর দিদির বাড়িতেও ঘুরে এলুম বেঙ্গালুরু থেকে।'

'সেও গতবার, তাও দিদি বিস্তর কাকুতিমিনতি করায়।'

'ও-ই যথেষ্ট। আমি না থাকলে গ্যারেজটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ঠিকমতো কাজকর্ম হয় না। লোকে নালিশ করে।'

'গ্যারাজ আর গ্যারাজ। বলি একসময়ে যে ফুটবল খেলতেন, ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট করতেন, তবলা শিখেছিলেন সব কি বিস্মরণ হয়ে গেল?'

'দূর দূর, অল্পবয়সে ও সব কে না করে বলো তো।'

'সেদিন সেই ফর্সাপানা দিদিমনি গাড়ি সারাতে হট করে এসে না পড়লে আপনার পেটে যে এত বিদ্যে তাও কি আমরা জানতে পারতুম?'

'ছাই বিদ্যে, কত ছেলেমেয়ে এমএ, বিএ পাশ করে ফ্যা ফ্যা করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছো না? বিদ্যে দিয়ে কী হয়?'

'বিদ্যেকে অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন না দাদা। মাধ্যমিক পাশ করার ধাক্কায় আমার মৃগী রোগের মতো হয়েছিল। থেকে থেকে কাঁপুনি উঠত, ঘন ঘন জলতেষ্টা আর পেচ্ছাপ পেত, খাওয়ায় অরুচি, অনিদ্রা, বদহজম। মাধ্যমিকের গুঁতোতেই যদি এতটা হয় তাহলে এম এ-র গুঁতোয় আরও না জানি কী কী হত! বাপ রে। তা দিদিমণিটার কী নাম যেন? জয়তী বোধ হয়! তা দিদিমণিটা আপনাকে বলছিল বটে, নবাঙ্কুর তুমি গ্যারাজ চালাচ্ছো! এ যে ভাবা যায় না! কত ভালো ছাত্র ছিলে তুমি, ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস। দিদিমণির বরটা প্রথম প্রথম আপনাকে তুমি তুমি করে বলছিল মনে আছে? বৃত্তান্ত শুনে একেবারে নুতুপুতু হয়ে কেমন আপনি আজ্ঞে করতে লাগল। সব মনে আছে আমার।'

'আজ ভালো জ্বালা হল হে হরিপদ, বলি মতলবটা কী তোমার?'

'সেটা আর খোলসা করতে দিচ্ছেন কই?'

'ওই তো, কী যেন একটা বলছিলে!'

'হ্যাঁ বলছিলাম, ওর নাম আঁচল।'

তাতে কী হল?'

'ওই তো আপনার দোষ। আপনার কিছুতেই কিছু হয় না। কিন্তু আঁচল রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে চারদিকের লোক তাকায়।'

'দেশে কি নিষ্কর্মা লোকের অভাব? যা চোখে পড়ে তাই হাঁ করে দেখে। কেউ কেউ দেখবে দেয়ালে সাঁটা পুরোনো পোস্টারটাও হাঁ করে দেখছে।'

'তাও দেখে। আবার দেখার মতো জিনিস হলে তাও দেখে। রাস্তায় শুধু পুরোনো পোস্টার ছাড়া কি কিছু দেখার থাকে না?'

'বুঝলুম, আঁচল বোধহয় একজন দেখনসই মেয়ে।'

'শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তাই এই গ্যারেজের সুমুখের পথ দিয়েই নিত্যি যাতায়াত।'

'হুঁ।'

'আঁচলের বাবার একখানা পুরোনো ওমনি গাড়ি ছিল। প্রায় ঝুরঝুরে অবস্থা। টেকো পরেশ হিসেবি লোক। গাড়িটাকে ছিবড়ে করে ছেড়েছিল। তারপর আপনাকে এসে ধরে পড়েছিল, ভোলাবাবু, গাড়িটা সামনের জানুয়ারি পর্যন্ত চালু থাকার ব্যবস্থা করে দিন। আমার একটা লাইফ পলিসি ততদিনে ম্যাচিওর করবে, তখন নতুন গাড়ি কিনব।'

'ও হ্যাঁ। পরেশনাথ ঘোষ তো?'

'হ্যাঁ, আর আপনারা মিত্তির।'

'তুমি জ্বালালে হে হরিপদ। ঘোষ মিত্তিরের প্রসঙ্গ ওঠাও কেন?'

'ওঠে দাদা, ওঠে। পরেশবাবুদের বাড়িতেও উঠেছে।'

'সে বাড়িতেই বা উঠছে কেন?'

'সেখানেই তো রহস্য। পরেশ ঘোষের বউ ধ্রুবতারাকে চেনেন?'

'না। আমার কি চেনার কথা?'

'না চিনলেও ক্ষতি নেই। তবে তিনি আপনাকে চিনে ফেলেছেন। উনি জয়তী দিদিমণির পিসি।'

'এ যে বেশ জটিল ব্যাপার দেখছি।'

'রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালিরও নাকি কন্ট্রিবিউশন ছিল। আমারও একটু আছে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, নবাঙ্কুর মিত্তিরের গ্যারাজ থেকে মাসে দেড় থেকে দু লাখ টাকা আয় হয়।'

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

'হল নাকি? কিন্তু আমার হিসেবে কোনও গন্ডগোল নেই দাদা।'

'তুমি আমাকে যে বিপদে ফেলেছো তা বলার নয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, পালিয়ে যাওয়া।'

'তবে পালান। গ্যারাজ থেকে একটু তফাত হলে আপনার মনটা একটু বরং নরম হবে। ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিন। আমি নিজে সঙ্গে গিয়ে আপনাকে হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন কিংবা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব।'

'ঠাট্টা করছি না হরিপদ। আমার একটা গোপন অসুবিধে আছে।'

'কী সেটা?'

'ঠিক বলার মতো নয়। লজ্জা এবং ঘেন্নার কথা। আর সেই জন্যই আমি সর্বদা মরমে মরে থাকি।'

'ভোলাদা, আমাদের মরমে মরে থাকার কারণের কি অভাব আছে?'

'ঠাট্টা না হরিপদ। শুনলে অবশ্য তোমার হয়তো হাসিই পাবে। তুচ্ছ বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।'

'আর একটু খোলসা হলে হয় না? এত ভ্যানতাড়ার কী আছে?'

'ছেলেবেলায় ইস্কুলের বন্ধুরা আমার পাশে বসতে চাইত না। বলত, তোর গায়ে বিচ্ছিরি গন্ধ। ব্যাপারটা একদিনের নয়। ভালো করে সাবান মেখে স্নান করে গেছি। তবু বন্ধুরা গন্ধ পেত। গ্রীষ্মকালেই বেশি হত এটা। সেই থেকে আমি ভারী লজ্জায় পড়ে যাই। মাকেও এসে বলেছি। কিন্তু মা উড়িয়ে দিত। দূর, কোথায় তোর গায়ে গন্ধ? ওসব হিংসে করে খ্যাপানোর জন্য বলে। তা যে নয় তা আমি হাড়ে হাড়ে জানতুম।'

'গায়ের গন্ধ? আপনি যে হাসালেন দাদা? পুরুষ মানুষ খেটেপিটে খায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনত করে, তাদের গায়ে গন্ধ না হওয়াই তো আশ্চর্যের।'

'তুমি যে গন্ধের কথা বলছো এ তা নয়। ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি তখন অপালা নামে একটা নতুন মেয়ে এসে ভর্তি হল ক্লাসে। ভারী ভালো দেখতে। আড়ে আড়ে আমার দিকে চাইত। আমি তখন নিজের গায়ের গন্ধের জন্য মেয়েদের থেকে দূরে দূরে থাকি। কারও পাশে বসি না, মিশিও না মেয়েদের সঙ্গে। ভারী লজ্জা হয় নিজের জন্য।'

'বুঝলুম, তা অপালা কী করল?'

'সে একদিন টিফিন পিরিয়ডে আমগাছের তলায় আমাকে পাকড়াও করল। অ্যাই, তুমি ওরকম আনস্যোশাল কেন? আমি তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাই। আমি ঘাবড়ে গেলাম, ভ্যাবলা নই, আনস্মার্টও নই। কিন্তু নিজেকে নিয়ে বিপন্ন।'

'ভাব হল?'

'একটু হল। কয়েকটা দিন। বোধহয় সেটা ফেব্রুয়ারি-মার্চ হবে। তারপরই একদিন হাফ ছুটির পর ক্লাসে ফাঁকা ঘরে বসে গল্প করছি, দেখি অপালা রুমালে নাক চেপে আছে। একটু বাদে কথার মাঝখানেই বলল, 'আমার গাড়ি বোধহয় এসে গেছে। আজ আসি।'

'ইয়ে তো আজিব সি বাত হ্যায় দাদা।' এমনও তো হতে পারে যে, অপালার সর্দি হয়ে নাক সুড়সুড় করছিল, কিংবা বড়-বাইরে পেয়েছিল।'

'সে তুমি যাই বলো, গায়ের বোঁটকা গন্ধ নিয়ে আমি দিন দিন একা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলাম। লোকজন, বিশেষ করে মহিলাদের কাছে যেতে ভয় করে। খুব সাবধানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে চলি। ব্যাপারটা আমার মনের রোগেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল।'

'গায়ের গন্ধ! শুধু গায়ের গন্ধ কি এত সিরিয়াস কিছু হতে পারে?'

'ঠিক কথা। কিন্তু যার হয়, তার হয়। আর আমার অবসেশনটা এমনই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েছিলাম। প্রথমে ডার্মাটোলজিস্ট, তারপর এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, জেনারেল ফিজিশিয়ান, কেউ কিছু করতে পারেনি। নানারকম টেস্ট করে ছেড়ে দিয়েছিল। ওষুধ দিয়েছিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, গায়ের দুর্গন্ধ ব্যাপারটা সিস্টেমের ডিফেক্ট। অনেকটাই জেনেটিক। কেউ কেউ বডি স্প্রে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিল।'

'আমার যে এক গাল মাছি দাদা। গায়ের গন্ধ নিয়ে যে এমন গন্ধমাদন সমস্যা হতে পারে তা তো আমি একশো বছর ধরে বসে বসে ভাবলেও মাথায় আসত না।'

'ওই যে বললাম, যার হয় তার হয়। কত রকমের আজব আতঙ্ক আছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমারও তাই শেষ অবধি মনে হতে লাগল, বোধহয় পাপী-টাপীদেরই এরকম দুর্গন্ধ বেরোয় গা দিয়ে। নিজেকে পাপী ভাবতে ভাবতে আর একরকমের পাগলামি এল মাথায়। ঠিক করে ফেললাম এরকম দুর্গন্ধ নিয়ে ভদ্রসমাজে মেলামেশার মানেই হয় না। বরং খেটে-খাওয়া মানুষদের সমাজে আমি ততটা বেমানান নই। কারণ গতরে যারা খাটে তাদের গন্ধ-টন্ধ নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই।'

'শুধু গায়ের গন্ধের কথা ভেবেই কি ভদ্রসমাজ ত্যাগ করলেন ভোলাদা?'

'ঠিক তাই। ভেবেছিলাম পিএইচডি করে কলেজটলেজে পড়াবো। রণে ভঙ্গ দিয়ে পিলু মিস্তিরির গ্যারাজে কাজে লেগে গেলাম। পিলু তো ভয়ে মরে। আমার হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। বাবু, এসব আপনাদের কাজ নয়। এসব ছোটলোকি কারবার আপনার পোষাবে না। মা আর ঠাকুমার কানেও কথাটা গিয়েছিল। মা একদিন শলার ঝাঁটা দিয়ে মেরে বাড়ি থেকেই বের করে দিল। দিদি শুনে বলল, 'বেশ হয়েছে।' আর ঠাকুমা নাকি শনি ঠাকুরকে সিন্নি চড়িয়েছিল। কিন্তু আমি খুব খুশি। মনে হল সমাজে আমি আমার সঠিক অবস্থানের জায়গা খুঁজে পেয়েছি। মাথাটা পরিষ্কার, বিজ্ঞানের পাঠ আছে। কাজে মন ছিল। সুতরাং মোটরগাড়ির সব গোপন খবর দেখে নিতে আমার মোটে সময়ই লাগল না। পিলু মিস্তিরি অবধি সেলাম করত।'

'গায়ের গন্ধের জন্য এতটা অধঃপতন?'

'কোন হিসেবে অধঃপতন বুঝিয়ে বলবে? হিসেবে করে দেখেছি প্রফেসারি করে যা রোজগার হত আমি তার থেকে বহুগুণ বেশি কামাই।'

'কিন্তু প্রেস্টিজ? তেলকালি মেখে থাকেন বলে বাবুলোকরা এসে তো আপনি করেও বলে না।'

'তবেই বোঝো, দোষটা মানুষের নয়, তেলকালির। ভালো জামাকাপড় পরে মাঞ্জা মারলেই লোকে ফের আপনি-আজ্ঞে করবে। ওই জন্যই লোকের ওপর আমার কোনও ভরসা নেই। লোক না পোক।'

'বুঝলুম। কিন্তু আসল কথাটা হল, সেই গন্ধ ব্যাটা এখন কোথায়? আপনার গা ঘেঁষে এতকাল কাজ করছি, আজ অবধি তো সেই বিটকেল, বোঁটকা গন্ধটার হদিশ পেলুম না। সে ব্যাটা কোথায় গায়েব হয়ে আছে বের করে দেখান দিকি।'

'তোমরা পাবে না হে। ওইটেই তো আমার স্ট্যাটেজি। ডিজেল পেট্রল মবিল আর কেমিক্যালে গন্ধটা আড়াল হয়েছে মাত্র।'

'চালাকি ছাড়ুন দাদা, বুলাদিদের বাড়িতে শুঁটকি রান্না হলে সেই গন্ধ কি গ্যারেজে মারমার করে ঢোকে না? ইঁদুর পচলে গন্ধ পাঁই, ভ্যাট পরিষ্কার না হলে গন্ধ পাই, ছাতিম ফুটলে গন্ধ পাই, আর আপনার গন্ধটাই শুধু গায়েব হয়ে থাকবে?'

'তুমি চাইছো কী বলো তো?'

'আঁচলের কী হবে?'

'কে আঁচল?'

'ফের কথা ঘোরাচ্ছেন? পরেশের মেয়ে আঁচল, সে আপনাকে ছাড়া বে বসবে না।'

'কেন?'

'বোধহয় গন্ধটা পছন্দ হয়েছে।'

'চালাকি ছাড়ো হরিপদ। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। নিজেকে নিয়ে আমার লজ্জা-ঘেন্নার শেষ নেই। তার ওপর একটা মেয়েকে টেনে এনে কষ্টে ফেলা।'

'আঁচলকে আপনার মায়েরও খুব পছন্দ। তবে উনি নাকি বলেছেন, ''ওই ছোটলোকটাকে কেন বিয়ে করবে মা? বরং একজন ভদ্রলোক দেখে বিয়ে করো।'' '

'ঠিক কথাই তো বলেছে!'

'কিন্তু আঁচল মানছে কই?'

'বুঝিয়ে বললে মানবে।'

'তাহলে একটা কাজ করুন, গায়ের গন্ধটা আঁচলকে একবার শুকিয়ে দিন।'

'ইয়ার্কি কোরো না হরিপদ। এসব শুনে আমার ভালো লাগছে না।'

'আপনি কি নিজের গায়ের গন্ধ পান?'

'পাই বইকি?'

'তাহলে নিজের সঙ্গে থাকেন কী করে?'

'ওটা কোনও কথা হল?'

'হল, নিজের ভালো-মন্দ যা আছে তা নিয়ে পালাব কোথায় বলুন তো! আমাদের কি পালানোর জো আছে?'

ট্যাঙ্গো ও মহালক্ষ্মী

'মেয়েটার নাম ছিল মহালক্ষ্মী।'

'একটু সেকেলে নাম, তবে চলে। আজকাল আবার সেকেলে নামের বেশ চলন হয়েছে দেখছি।'

'নামটা গুরুত্বপূর্ণ ইসু নয় মশাই, আসল হল মেয়েটা।'

'তা তো বটেই, নাম সুপারফিশিয়াল জিনিস। আপনার সব কথারই বেশ একটা ইনারমিনিং আছে।'

'বটে! তা মহালক্ষ্মীর মধ্যে ইনারমিনিংটা কী দেখলেন?'

'এখনও দেখিনি। তবে তলিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই গভীর কোনও তাৎপর্য ধরা পড়ার সম্ভাবনা।'

'আপনার দোষ কি জানেন? আপনি সবসময়েই অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করেন। আমাকে অনর্থক খুশি করে আপনার লাভ কী বলুন তো! আমি আপনার ওপরওয়ালা নই, পয়সাওলা বা ক্ষমতাবান লোক নই, শ্বশুরবাড়ির দিককার আত্মীয় বা কুটুম নই, এমনকী সুন্দরী মেয়ের বাবাও নই যে, আমাকে খুশি করা দরকার।'

'ঠিকই ধরেছেন। আমি বোধ হয় একটু বোকা। লোকে খুশি থাকলে আমি একটু সোয়াস্তি বোধ করি। কিন্তু কেন, তা বুঝতে পারি না।'

'ওই ধারণাটাই ভুল। লোককে খুশি করার দায় কি আপনার? যাকগে, যা বলছিলাম।'

'মহলক্ষ্মীর কথা তো!'

'হ্যাঁ।'

'বলুন শুনি। আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ভরসন্ধেবেলা মস্ত এবং আস্ত চাঁদটা কেমন ঠেলেঠুলে আকাশে উঠে পড়েছে দেখুন! বাড়িতে আজ খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আজ মহালক্ষ্মীরই রাত বটে।'

'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না, রজতবাবু।'

'কেন বলুন তো। কথাটা আমার বাড়ির লোকেও বলে থাকে। ক্ষতিকারক কিছু বলে ফেললুম কি?'

'ক্ষতিকারক নয় বটে, তবে বিঘ্নকারক। আমি যার কথা বলতে চাইছি, সেই

মহালক্ষ্মীর সঙ্গে মা লক্ষ্মী, খিচুড়ি বা পূর্ণচন্দ্রের কোনও অনুষঙ্গ আসে না। সে এক স্বাধীনচেতা, তেজি, নাস্তিক, আবেগহীন, মুডি, রাগী এবং অ্যাগ্রেসিভ মহিলা।'

'ও বাবা! আমি এরকম মহিলাদের খুব ভয় পাই।'

'কে না পায়!'

'কিন্তু আজ এই ভারী মনোরম, মৃদু শীত আর এমন জ্যোৎস্নার রাতে হঠাৎ ওরকম একটা মেয়ের কথা মনে পড়ল কেন আপনার?'

'মনে পড়ার গুরুতর কারণ ঘটেছে বলেই মনে পড়ল।'

'কারণটা কী?'

'কারণটা হল ট্যাঙ্গো।'

'আপনার কথাগুলো আজ যেন আমার মাথার দু'ফুট উঁচু দিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্যাচ করতে পারছি না।'

'পারবেন।'

'বলছেন! কিন্তু মহালক্ষ্মীর সঙ্গে ট্যাঙ্গো, যেন মুরগির সঙ্গে সজনে ডাঁটা।'

'ওই যে বললাম, নামটা ইস্যু নয়। নাম দিয়ে লোককে চেনা যায় না। ট্যাঙ্গো বললে যেমন একজন বেহিসেবি, উদ্দাম যুবকের কথা মনে হয়, আসলে ট্যাঙ্গো হয়তো মোটেই তেমন নয়। সে হয়তো ভিতু, নরম, রক্ষণশীল এবং পেটরোগা।'

'কথাটা খুবই ঠিক। আপনি কি আজ আমাকে ট্যাঙ্গো আর মহালক্ষ্মীর প্রেমের গল্প শোনাতে চাইছেন?'

'আরে না মশাই। মহালক্ষ্মী আর ট্যাঙ্গোর প্রেম হতে পারল কই? ট্যাঙ্গো মহালক্ষ্মীর পিছনে ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে শেষ অবধি সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হয়। ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে-খেয়ে এখন টিমটিম করে বেঁচে আছে।'

'ডিপ্রেশনের ওষুধ খাওয়া খুব খারাপ। যাই হোক, তা হলে ট্যাঙ্গোর সঙ্গে মহালক্ষ্মীর প্রেমটা হয়নি তো!'

'আজ্ঞে না। মহালক্ষ্মী নাকউঁচু এবং অহংকারী। কোনও পুরুষকেই তার পুরুষ বলে মনে হয় না, গায়ে-পড়া পুরুষদের সে ভীষণ ঘেন্না করে। যেসব ছেলেছোকরা তাকে কমপ্লিমেন্ট দেয়, তাদের সে জোকার ভাবে।'

'বুঝেছি। মহালক্ষ্মীর মধ্যে প্রেমের বারুদটাই নেই।'

'যথার্থ কথা। তবে বারুদ নেই বললে ভুল হবে। হয়তো বারুদ ভিজে অবস্থায় আছে। শুকোলে বিষ্ফোরণ হতেও পারে। আর ধরুন দেশে তেমন পুরুষই বা কোথায়?'

'বটেই তো! কিন্তু মশাই বিমলবাবু, একটা কথা বললে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না
তো!'

'কী কথা?'

'আমার প্রশ্ন হল, মহালক্ষ্মীর মতো ব্যাদড়া মেয়ের মনের মতো হয়ে ওঠার জন্য পুরুষদের বা কী এমন মাথাব্যথা পড়েছে বলুন তো? থাকুক না মহালক্ষ্মী নিজের গুমোর নিয়ে, কার কী যায় আসে তাতে?'

'হুঁ, বুঝলুম।'

'আপনি কি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন বিমলবাবু?'

'হলুম। তার কারণ আপনাকে নিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মহিলাদের সম্পর্কে আপনার ওরকম অ্যাটিটিউডের দরুণই বোধহয় আপনার এই চৌত্রিশ বছর বয়স অবধি একটাও প্রেম হয়নি, বিয়েটাও করে উঠতে পারলেন না।'

'দেখুন, প্রেম হল একটা আবেগের ব্যাপার। ইমোশনাল একসেস। তার জন্য ফালতু সময়ও লাগে। আমি সময় পেলুম কোথায় বলুন। ছেলেবেলা থেকেই কঠোর জীবনসংগ্রাম করতে হয়েছে। খেলাধুলো করতুম বলে লেখাপড়াও তেমন হল না। ফলে আবেগ-টাবেগ সব কেটে গেল।'

'আপনার জীবনকাহিনি আমার অজানা নয় রজতবাবু, আপনি টাকেরাণ্ডো না কি মাথামুণ্ডু শিখেছিলেন, তারপর আন-আর্মড ডিফেন্স, জুডো...ট্রেনিংও দেন আজকাল। সবই জানি। আর এও জানি যে, আপনি

গোপনে কবিতাও লেখেন...না, না, লজ্জা পাবেন না। মাসছয়েক আগে আপনি যে ডায়েরিটা লেকের ধারে একটা বেঞ্চে ফেলে রেখে যান, সেটা তো আমিই পরদিন সকালে আবিষ্কার করে আপনাকে ফিরিয়ে দিই। মনে নেই?'

'আর লজ্জা দেবেন না, বিমলবাবু। তবে কবিতা লিখলেও সেসব রোম্যান্টিক কবিতা নয়, দেশপ্রেমমূলক ব্যাপার।'

'জানি। এবং লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে হচ্ছে যে, আপনার কবিতাগুলো খুবই কাঁচা এবং ছন্দের ভুলে ভরা। তবে, এই দুর্দিনেও যে আপনার বেশ একটা জোরালো দেশপ্রেম আছে সেটা প্রশংসারই যোগ্য। আজকালকার ছেলেছোকরাদের ও বালাই নেই কিনা। এখনকার ছেলেছোকরা বা অল্পবয়সি ছুঁড়িরা মোটেই ভারতবর্ষকে তাদের দেশ বলে ভাবে না। তাদের ফিকির হল কী করে আমেরিকা বা ইউরোপে গিয়ে জেঁকে বসবে। সেই দিক দিয়ে আপনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।'

'জানি। এসব বড় দুঃখের কথা বিমলবাবু। আমার ঠাকুরদা স্বদেশি করে জেল খেটেছিলেন।'

'সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেন নাকি?'

'না না! কী যে বলেন! আমার সেন্টিমেন্ট বলতে তেমন কিছু আর নেই। জীবনসংগ্রাম আমাকে কঠোর বাস্তববাদী করে ছেড়েছে।'

'তা ভালো। বাস্তববাদী হওয়া খারাপ নয়। তবে মনের সুকুমার প্রবণতাগুলোকে একেবারে বর্জন করাও ভালো নয়।'

'অতি সত্য কথা। আপনার কাছে বসলেই আমি রোজই কিছু-না কিছু শিখি।'

'আমরা কি ট্যাঙ্গোর প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি না?'

'ট্যাঙ্গো? হ্যাঁ, ট্যাঙ্গো কে যেন?'

'মহালক্ষ্মীর ব্যর্থ প্রেমিক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ট্যাঙ্গোর কথাটা ভুলে যাওয়া আপনার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ ট্যাঙ্গো আপনাকে খুন করার কথা ভেবেছে। এবং ভাবনাকে ফলিত করার জন্য সে একটা রিভলভারও কিনে ফেলেছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী? না না, এ নিশ্চয়ই আপনি ঠাট্টা করছেন। ট্যাঙ্গো আমাকে খুন করতে চাইবে কেন বলুন তো! এর তো কোনও মাথামুণ্ডুই হয় না।'

'হয় মশাই, হয়। এই আধঘণ্টা আগে আমাদের সামনে দিয়েই ট্যাঙ্গো খুব ধীর গতিতে হেঁটে গিয়েছে। প্রথমে ডাইনে থেকে বাঁয়ে, দশ মিনিট বাদে বাঁ থেকে ডাইনে, তারও দশ মিনিট বাদে ফের ডাইনে থেকে বাঁয়ে। লক্ষ করেননি তো?'

'আজ্ঞে না তো!'

'বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। গায়ে নীল টি-শার্ট, পরনে ফেডেড জিনস। পকেটে হাত। আমার সন্দেহ রিভলভারটা ওর প্যান্টের ডান পকেটেই আছে।'

'ওরে বাবা! বন্দুক-পিস্তল যে খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু ট্যাঙ্গোর রহস্যটা কী? আমি ওর করেছিটা কী বলুন তো!'

'কারণ ওই মহালক্ষ্মী।'

'না মশাই, আজ আপনার সব কথাই দেখছি আমার মাথার দশ ফুট উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'উতলা হবেন না রজতবাবু। আমি জানি দেশপ্রেমিকদের সাধারণত মৃত্যুভয় থাকে না। আর এও জানি, লম্বা-চওড়া হলেও ট্যাঙ্গো আসলে একজন কাপুরুষ। খুনের কথা সে বছরের পর বছর ভেবে যাবে, কিন্তু কাজটা করে উঠতে পারবে না। ওই জড়তার জন্যই তো সে মহালক্ষ্মীকে জয় করতে পারল না!'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি চিনা ভাষায় কথা বলছেন। আমি সবিনয়ে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি চাইনিজ ভাষা জানি না।'

'কিন্তু আপনি পারলেন!'

'কী পারলাম?'

'মহালক্ষ্মীকে জয় করতে।'

'মশাই, আপনি কি এখন ল্যাটিন বলছেন? এসব কী হচ্ছে বলুন তো!'

'একটা লিটল ম্যাগাজিনে আপনার ওইসব ছাইভস্ম কবিতা পড়ে মহালক্ষ্মী এত ইমপ্রেসড হয় যে, আপনার হোয়ারঅ্যাবাউটস জানতে নেমে পড়ে। বেশি খাটতেও হয়নি তাকে। গত সপ্তাহেই সে একটা টিভি চ্যানেলের নাম করে আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে আপনার বাড়িতে হাজির হয়। মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তার নাম তো নন্দিনী।'

'নামটা কোনও ইস্যু নয় রজতবাবু।'

'শুনুন বিমলবাবু, যদিও আমি সর্বদাই আপনার কথার সমর্থন করে আপনাকে খুশি করতে চেষ্টা করি, কিন্তু এখন আমাকে একটা বিনীত প্রতিবাদ করতেই হচ্ছে। নন্দিনী মোটেই অহংকারী, রাগী, মুডি বা অ্যাগ্রেসিভ মেয়ে নয়। অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত ও নরম প্রকৃতির মানুষ। আর টিভি চ্যানেলের নাম করেও সে যায়নি, গত সপ্তাহে প্রোগ্রামটা ওই চ্যানেলে দেখানোও হয়েছে।'

'তা হলেই বুঝুন প্রেম কতটা গভীর! মেয়েটা রাতারাতি পালটে গিয়েছে।'

'নন্দিনী মোটেই আমার প্রেমে পড়েনি।'

'নন্দিনীর কথা বলছি না, বলছি মহালক্ষ্মীর কথা। সে যে নন্দিনী সেজে গিয়েছিল সেটা আপনি ধরতে পারেননি। নন্দিনী অবশ্য তার ডাক নাম। সুতরাং নামটা ইস্যু নয় রজতবাবু।'

'আজ আপনি আমাকে একটা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে খুব বোকা বানালেন বটে! কিন্তু এসব কথা আমি একটুও সিরিয়াসলি নিচ্ছি না। আমি একটু বোকা আছি বটে, কিন্তু আহাম্মক নই।'

'সেটা জানি। তবু এখন গা তুলুন। ওই দূরে ফের ট্যাঙ্গোকে দেখা যাচ্ছে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে আসছে। ট্যাঙ্গো কাপুরুষ বটে, কিন্তু প্রেম এবং ব্যর্থ প্রেম বড় ডেঞ্জারাস জিনিস। আর রিভলভারকেই বা বিশ্বাস কি? চলুন একটু পা চালিয়ে কেটে পড়া যাক।'

'তথাস্তু।'

রক্তবীজ

মর্নিং ওয়াক করেন না?

কিংবা একটু হাঁটাচলা? না, ওসব বদ অভ্যাস আমার নেই। বদ অভ্যাস! তা কেন, হাঁটাচলা করা তো ভীষণ' দরকার।

দূর! হাঁটাচলা খুব বোরিং, কোনও ডেস্টিনেশন ছাড়া খামোকা হাঁটা, ফর হেলথস সেক আমার পোষায় না।

তাহলে বরং একটা কাজ করুন। একজন কাউকে সঙ্গে নিন, বেশ গল্প করতে করতে হাঁটবেন, তাহলে বোরিং লাগবে না।

সঙ্গী! প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু সঙ্গীটা হবে কে বলো তো?

কাকে সঙ্গে নেবেন সেটা আপনার চয়েসের ব্যাপার। কাউকে ঠিক করে ফেলুন, টেক দ্য ডিসিশন ইমিডিয়েটলি।

মাধুরী দীক্ষিতকে রাজি করাতে পারবে?

মাধুরী দীক্ষিত!

সে রাজি হলে হাঁটতে আমার আপত্তি নেই।

সেটা একটু শক্ত হবে, তার চেয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটলে কেমন হয়?

তুমি নিজেই একজন ডাক্তার, তবু বলি একজন মাথার ডাক্তার দেখাও। স্ত্রীকে সঙ্গে করে হাঁটব? ঠাট্টা নাকি?

অসুবিধাটা কী?

দিনের মধ্যে তিন-চারবার আমাদের পারস্পরিক বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি দু'ঘণ্টায় আমাদের মতান্তর হয়। মনান্তরটা পার্মানেন্ট ব্যাপার বলে আর উল্লেখ করছি না। রাস্তায়-ঘাটে সিন ক্রিয়েট করাটা কতদূর যুক্তিযুক্ত বলে তোমার মনে হয়?

আচ্ছা, বুঝেছি, স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ হলে কেমন হয়? ধরুন, যদি কোনও সুন্দরী, যুবতী?

আজকাল সুন্দরী কোথায়? সব তো হাড়গিলে!

আপনার কি একটু নাদুস-নদুস পছন্দ?

আরে না, স্লিম আর হাড়গিলে তো এক নয়।

খুব বাছাবাছি যদি না থাকে তবে আমি একজন মহিলাকে রোজ সকালে দু'ঘণ্টার জন্য আপনাকে কোম্পানি দিতে পাঠাতে পারি, তাঁর কাজ শুধু আপনার সঙ্গে হাঁটা। অবশ্য কোম্পানি দেওয়ার জন্য তাঁকে একটা প্রফেশনাল ফি দিতে হবে। পার ডে দুশো টাকা।

বাছাবাছি বলতে কী বোঝাতে চাও?

অর্থাৎ খুব সুন্দরী, তন্বী এসব চাইলে আমি নাচার। তবে যাঁকে পাঠাব, তিনি কুৎসিত নন। স্লিম, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী এবং হেলথ কনশাস। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি প্রগলভা নন।

তোমার কি ধারণা একজন মহিলাকে সঙ্গী পেলেই আমার হাঁটার ইচ্ছে হবে?

কীভাবে হবে সেইটিই তো জানতে চাইছি।

হাঁটলে আমার আয়ু বাড়বে বলছ?

ডাক্তারি শাস্ত্র বলে, হাঁটলে আপনার ফিটনেস বাড়বে, আপনার কোলেস্টেরল বেশি, সুগার বেশি, হাই প্রেশার এবং স্ট্রেস। শরীরের মুভমেন্ট কম বলে আপনার হৃদয়ের প্রবলেম হয়েছে।

সবই জানি। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে কার এত গরজ বলো তো? তুমি কি জানো, বনিবনা হয় না বলে আমার দুই ছেলে আলাদা থাকে এবং আমার মুখদর্শন করে না? আমার একমাত্র মেয়ে মাঝে মাঝে ফোনে আমার কুশলসংবাদ নেয় মাত্র? আমার মোট ছয় নাতি-নাতনি আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার ভালো করে পরিচয় হয়নি। জানো এসব?

জানি। ফ্যামিলিতে আপনি একটু আনপপুলার।

তার কারণ আমি দুর্মুখ, অহংকারী, দাপুটে, আত্মসর্বস্ব একজন মানুষ! তাই না?

না, না, আপনি নিজের প্রতি এত হার্শ হবেন না। মান-অভিমান সব পরিবারেই আছে।

তা আছে, তবে সব পরিবারই যার যার নিজের মতো। অন্যের সঙ্গে মেলে না। ও তুমি বুঝবে না ডাক্তার। তবে এটা জেনে রাখো, আমার পরিবারে এমন একজনও নেই, যার আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গরজ আছে। তাই ভাবছিলাম, আমাকে মর্নিং ওয়াক করানোর জন্য তোমাকে এতটা মোটিভেটেড করল কে? এবং সেই মোটিভেশন এতটাই স্ট্রং যে, তুমি আমার ভ্রমণসঙ্গিনী অবধি ঠিক করে দিতে চাইছ, কোন ডাক্তার এতটা করে বলো তো?

সরি, আমি বোধহয় খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। সরি আগেন।

আরে না। কেউ যদি আমার শরীরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে মোটিভেট করে থাকে, তাহলে তো আমি ভাগ্যবান। কারণ, কেউ যে আমার জন্য উদ্বিগ্ন এটা কি চাট্টিখানিক কথা। কিন্তু ভেবেই পাচ্ছি না লোকটা কে?

বশিষ্ঠবাবু, আপনার এখানে একটা ভুল হচ্ছে, আমাকে কেউ মোটিভেট করেনি, আমার প্রস্তাবটার পেছনে কোনও ষড়যন্ত্রও নেই। আমি নিজেই একজন ডাক্তারের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছিলাম বোধহয়। যাকগে, আমি বলতে চাইছি, আপনার কিছুটা এক্সারসাইজ দরকার। দিনে অন্তত একঘণ্টা হাঁটা, কিছুটা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, মেডিসিন আর ডায়েট চার্ট-ই যথেষ্ট নয়।

ওসব আজকাল কে না জানে বলো তো! আমরা আসলে জ্ঞানপাপী কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা জেনেও ভালোটা অ্যাভয়েড করি এবং মন্দটা অম্লানবদনে করে যাই। ডাক্তাররাও তার বাইরে নয়। কী বলো?

তা তো বটেই।

আর একটা কথা কী জানো? বাঁচারও একটা মোটিভ থাকে। আমি সেই মোটিভটাই হারিয়ে ফেলেছি। আমার আপনজন কেউ কখনও ছিল না, এখনও নেই। কার জন্য বাঁচতে হবে বলো তো?

বেঁচে থাকাটাই কি একটা মোটিভেশন নয়?

হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক। জীবনটা যতই আলুনি হোক, কেউ মরতে তেমন আগ্রহী নয়! কিন্তু কী জানো, বেঁচে থাকার জন্য ওই যে হাঁটো, ব্যায়াম করো, মেপে খাও, ওসবই বা করতে যাব কেন? বেঁচে থাকার জন্য, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য অত ঝামেলা আমার পোষাবে না।

আমি ডাক্তার, আমি তো চাইব আপনি সুস্থ দেহে বাঁচুন। তবে শুধু ফিজিক্যাল বেঁচে থাকা নয়, আনন্দের সঙ্গে।

এইবার পথে এসেছ। গত ছ'মাস ধরে তুমি আমাকে দেখে আসছ, তোমার কি আমার ভেতরে আনন্দের অভাবটা চোখে পড়েনি? ওটার জন্য সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ারও দরকার নেই।

চোখে পড়েছে আর সেই জন্যই আমি একটু চিন্তিত। আপনার খুব একটা র‍্যাপিড হেলথ ডিটিরিওরেশন হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু একটা স্লো ডাউনওয়ার্ডস ট্রেন্ড দেখছি।

হুঁ, সেটা আমিও টের পাই। আজকাল যখন-তখন হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়ি, শারীরিক পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করে না। ঘন ঘন পেচ্ছাপ পায়, খুব তেষ্টা হয়, দুর্বলতা তো আছেই। আর গাঁটের যন্ত্রণা, শরীরের নানা জায়গায় আচমকা ব্যথা। আমি জানি, শুধু ওষুধে এসব সারবে না, কিন্তু সারানোর জন্য মেহনত করারও মানে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি বোধহয় টের পাও যে, বশিষ্ঠ মজুমদার মরে গেলে দুনিয়ায় একটা লোকও কাঁদবে না। অবশ্য মরার পর কে কাঁদল, না-কাঁদল তাতে বড় বয়েই গেল আমার। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলে মাঝে মাঝে ভারী একা লাগে।

আমার হিসেবমতো আপনার বয়স এখন উনষাট, তাই না?

উনষাট থেকে সামনের অক্টোবরেই ষাট হব। মাত্র দেড় মাস বাকি।

এই যুগের পক্ষে বয়সটা কিন্তু একেবারেই বেশি নয়। আজকাল লোকে হেসে-খেলে আশি-নব্বই পর্যন্ত বেঁচে আছে।

তাও কি আর জানি না! খুব জানি। সারা পৃথিবীতে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে। সেদিন তো পঁচাত্তর বছর বয়সি এক জাপানি দিব্যি এভারেস্টেও উঠে পড়ল।

আপনার কোনও আড্ডা নেই?

আড্ডা বলতে বন্ধুবান্ধব তো?

হ্যাঁ, মানে, সমানবয়সিদের আড্ডা।

রক্ষে করো বাপু, বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে বসলে, আমি আরও তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাব। না, আমার আড্ডা নেই। ছিলও না কোনওদিন। কারণ, আমি একটু ঝগড়ুটে টাইপের। যখন-তখন যার-তার সঙ্গে লেগে যায়। অনেক সময়ে নিতান্তই তুচ্ছ কারণে।

বই পড়া? বা সিনেমা দেখা? বা টিভিতে ক্রিকেট-ফুটবল দেখা? একটু-আধটু ব্যাডমিন্টন বা গল্ফ খেললে কেমন হয়?

ওসব তেমন টানে না। আগে খুব নাটক দেখতাম।

এখন দেখেন না?

না, ইচ্ছেই করে না।

শুধু বসে থাকা বা শুয়ে থাকাও তো ভীষণ বোরিং!

তা তো বটেই। বড্ড বোরিং। বোরডম আমার অনেকদিনের সঙ্গী। যখন টাকা রোজগার করতাম, তখনও শুধু লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা রোজগার করাটাও বড্ড একঘেয়ে লাগত। নিজেকে বড়লোক ভেবে আমি

কখনও আনন্দ পাইনি। অথচ বিজনেস স্প্রেড করার জন্য ভূতের মতো খাটতাম। আনন্দহীন, উত্তেজনাহীন পরিশ্রম।

আপনাকে নিয়ে বড্ড মুশকিল দেখছি।

আরে না, আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না।

বাঁচবার একটা প্যাশন না থাকলে আপনার চিকিৎসক হিসাবে আমারই যে একটা পরাজয়!

দূর দূর! অত ফিলোসফিক্যাল হচ্ছ কেন? টেক ইট ইজি। আমি জানি, দীপশিখা নার্সিংহোমে আমার মোটা টাকার ইনভেস্টমেন্ট আছে বলে ম্যানেজমেন্ট আমাকে তোয়াজ করে। নইলে রোজ সকালে আমার বাড়িতে তোমার মতো একজন কৃতী ডাক্তারকে এমন একটা বাজে পেশেন্টকে ভিজিট করতে বাধ্য করত না। আর আমি এও টের পাই, আমার কাছে এই রোজ আসাটা তুমি বিশেষ পছন্দ করো না।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!

তুমি একজন এমডি ডাক্তার, হার্টের স্পেশ্যালাইজেশনও আছে এবং শুনতে পাই তোমার প্র্যাকটিসও রোরিং। আর আমিও তেমন মরণাপন্ন কেন, সিরিয়াস রোগীও নই। তাহলে তোমার রোজ আসবার কোনও মানে হয়?

সে কথা ঠিক। তবে আমার সিনিয়র ডক্টর মাধব সান্যাল আপনার বন্ধু। আমি ওঁর কাছে মেডিক্যাল পড়েছি একসময়ে।

মাধবই কি তোমাকে আমার কাছে পাঠায়? এটা মাধবের ভারী অন্যায়।

ডক্টর সান্যাল আপনাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। ওঁর মত হল, বশিষ্ঠ খুব লোনলি। আর লোনলিরা বেশি বয়সে খুব বেশি ভালনারেবল হয়ে পড়েন।

হুঁ। মাধব—একমাত্র মাধবই আমাকে ঠিকঠাক চেনে। আর চেনে বলেই নিজে না এসে তোমাকে পাঠায়। অবশ্য ইউ আর আ মোস্ট ওয়েলকাম পার্সন। শুধু ভালো ডাক্তারই নও, আ ভেরি ওয়েল বিহেভড জেন্টলম্যান উইথ আ সেন্স অফ হিউমার। সেইজন্য তোমার সঙ্গ আমি পছন্দ করি। কিন্তু ভাবি, এই সময়টায় তুমি হয়তো আরও বেশ কয়েকজন সিরিয়াস রোগীকে অ্যাটেন্ড করতে পারতে।

না স্যার, সব সময়ে রোগী অ্যাটেন্ড করাটাও একঘেয়ে। এই যে আপনার বাড়ির অসাধারণ বাগানখানা, চারদিকে এত সবুজ, এত নির্জনতা, এটাও আমার কাছে একটি উপভোগ্য ব্যাপার। তাছাড়া আপনার বাড়ির মতো এত ভালো চা আমি কোথাও কখনও খাইনি, বিদেশেও না।

দ্যাটস আ ভেরি গুড কমপ্লিমেন্ট। কেউ আমার চায়ের প্রশংসা করলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই। থ্যাঙ্ক ইউ।

আপনার বাগানের প্রশংসা করলেও আপনার মুখ খুব ব্রাইট হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, আগে নিজের হাতে বাগানের কাজ করতাম। সে বড় আনন্দ ছিল, গাছ কথা কয় কীভাবে জানো? তার গ্রোথ দিয়ে, তার পাতাফুল-ফল দিয়ে তারাও কমিউনিকেট করে। পোকামাকড়ের সঙ্গে লড়াইটাও যেন এক বিশ্বযুদ্ধ!

ফের বাগানের কাজ করলে কেমন হয়?

বাগানের কাজ তো বাবুগিরি দিয়ে করা যায় না। উবু হয়ে বসতে হয়, হামাগুড়ি দিতে হয়, এখন হাঁটু নিয়েই তো প্রবলেম। তবে যাকে বাগানের কাজের ভার দিয়েছি, সেই লোকটা ভালো। আমার বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে কাজ করে।

কী সুন্দর বাগানখানা আপনার!

ওই সবুজের জাদুবিদ্যা দেখেই আমার দিন কেটে যায়! বুঝলে ডাক্তার, মানুষের চেয়ে উদ্ভিদই আমার বেশি বন্ধু।

আর হ্যাঁ, আপনার জীবনে দু-একটি বন্ধুরও বড় দরকার।

না হে, ওটা তুমি ঠিক কথা বললে না। এমনিতেই আমার যৌবনকালেও বেশি বন্ধুটন্ধু ছিল না। বুড়ো বয়সে আমার মেজাজটা আরও তিরিক্ষি হওয়ার বন্ধুবান্ধব একদম সহ্য হয় না।

চা-পাতাটা আপনি কোথা থেকে কেনেন?

তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাও যে, আমি খেই রাখতে পারছি না। সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করছ নাকি?

না, না, সেসব নয়। আসলে আমি ব্র্যান্ডেড চা-পাতা কিনি, কিন্তু এত সুন্দর গন্ধ কখনও কোনও দামি ব্র্যান্ডের চায়েও পাইনি। তাই জানতে ইচ্ছে হল।

এই পাতাটা ব্র্যান্ডেড ভ্যারাইটিতে পাবে না। অবিনশ্বর নামে একজন লোক আছে, তার একটা পা একটু খোঁড়া। তার নেশাই হল চা-পাতা। তার কোনও দোকান-টোকান নেই, নানা জায়গা থেকে চা-পাতা আনায়, নিজেই ব্লেন্ড করে আর নিজেই খদ্দেরদের কাছে পৌঁছে দেয়। যারা চায়ের কদর বোঝে, একমাত্র তারাই তার খদ্দের। পয়সা একটু বেশি নেয়, কিন্তু কোয়ালিটিতে কখনও কমপ্রোমাইজ করে না। গত বিশ বছর ধরে সে আমাকে চা সাপ্লাই করে যাচ্ছে। তুমি চাও?

চাইলে কী করতে হবে?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। অবিনশ্বরকে আমি বলে দেব, সে তোমার বাড়িতে চা পৌঁছে দেবে।

খুব ভালো হয় তাহলে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আরে, তুমি হলে আমার আম্পায়ার, ধন্যবাদ কিসের?

আম্পায়ার! আমি আম্পায়ার কেন?

যম আর আমার মাঝখানে তোমার অবস্থান। যম বল করছে, আমি ব্যাট দিয়ে ঠেকাচ্ছি। যেদিন তুমি আঙুল তুলে বলবে—আউট, সেদিনই আমি আউট।

আঙুল তুলতে যাতে না হয়, দেখবেন। মাত্র ষাট বছর বয়সে মৃত্যুচিন্তা করাটা হেলদি ট্রেন্ড নয়।

জানি, ওই যে বললাম, বশিষ্ঠ মজুমদার বেঁচে রইল না মরে গেল, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কাজেই আমি শুধু নিজের জন্যই এই যে বেঁচে আছি, এটাও কেমন যেন ফিউটাইল মনে হয়।

আপনার কোনও প্রিয়জন নেই এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কেন, শক্ত কেন? ভালোবাসা একটা রেসিপ্রোকাল জিনিস! ভালো না বাসলে ভালোবাসা পাওয়াও যায় না। আমি জীবনে ক'টা লোককে নিঃস্বার্থভাবে নন-বায়োলজিক্যালি ভালোবেসেছি বলো তো?

কাউকে না?

উহুঁ।

আপনার উহুঁ-টার মধ্যে যেন একটু দ্বিধা মিশে আছে।

দ্বিধা! আরে না, এ তো হার্ড ফ্যাক্ট। দ্বিধা কোথায়?

কী জানি। আমার তো ওরকমই মনে হল। দিন পনেরো আগে আমি ভিজিট করতে এসে দেখেছিলাম, আপনার পোর্টিকো থেকে একটা বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার ছেলে একটা খুব সফিস্টিকেটেড সুপারবাইক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আপনি বেশ একটু উদ্বেগ নিয়ে ছেলেটার বাইকটার দিকে তাকিয়ে আছেন। যতদূর জানি ছেলেটা আপনার ছেলে বা নাতি নয়। ভারী লাভেবল চেহারা ছেলেটার। বোধহয় বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে।

ডাক্তার, তোমাকে মাঝে-মাঝে একটু বোকা বোকা মনে হলেও আসলে তুমি মোটেই বোকা নও। বরং আজ আমার মনে হচ্ছে তোমার সম্পর্কে আমার আগেকার ধারণা ভুল, তুমি ভীষণ চালাক।

কেন একথা বলছেন?

কারণ আছে। তুমি কি জানো যে, আমার আগে একটা বিয়ে ছিল?

শুনেছি কানাঘুষো।

কানাঘুষো হবে কেন? আমি তো খোলা বই, আমার সম্পর্কে কোনও তথ্যই আমি গোপন করি না। প্রথম যৌবনে আমার চেহারা ভালো ছিল। লম্বা-চওড়া ফিট বডি ছিল। ওয়েট লিফটিং করতাম। জানো বোধহয়?

হ্যাঁ, তা জানি।

তার ওপর স্মার্ট, অ্যাকটিভ। বাবার ছোট মেশিন টুলস-এর ব্যবসা ছিল। অল্প বয়সেই ব্যবসাটা বুঝে নিয়েছিলাম। বুদ্ধি আর কানেকশনের জোরে ধাঁ করে ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলাম। মধুছন্দা তখন সবে সিনেমায় নেমেছে। ভীষণ সুন্দরী। দুটো ছবির নায়িকা হয়েছিল, তার আগে তিনটে ফিলমে ছোট রোল। দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করে ফেলেছিলাম। ব্যস্ততার জন্য দু'জনেরই প্রেম করার সময় হত না। তাই বিয়েই করে ফেললাম।

একটু বোধহয় কুইক হয়ে গেল, তাই না?

হ্যাঁ, বড্ড কুইক। ছয় মাসের পরিচয়ে বিয়ে। তখন আমার ব্যবসার এক্সপ্যানশন হচ্ছে আর মধুছন্দা আউটডোর-ইনডোর শুটিং করে বেড়াচ্ছে। দু'জনেই সাংঘাতিক ব্যস্ত। শুধু কয়েকদিনের জন্য আমরা হংকং-এ হানিমুন করতে যাই। তারপর যে-যার নিজের কাজে সেঁটে গেলাম। এমনকী, দিনের পর দিন ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ অবধি হত না। ওই হংকং-এ সতেরোদিনই যা আমাদের রোম্যান্টিক সময় গেছে। মধুছন্দা অভিনয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনেও কাজ করত। ফলে দিল্লি-বম্বে যেতে হত হামেশাই। আর আমাকে ব্যবসার কাজে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মিডল ইস্ট, ইউরোপ ছুটতে হত। ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছুই প্রায় ছিল না। বছর দুয়েক বাদে মধুছন্দা আমাকে ডিভোর্সের প্রস্তাব দেয়। কারণ, আমাদের বাড়িতে তার

প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে নানা কটুকাটব্য হয়ে থাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাই। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্যাট। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডিভোর্সের দু'বছর বাদে মধুছন্দা একজন এমন লোককে বিয়ে করে, যার কোনও সোশ্যাল স্টেটাস নেই, স্ট্রং পারসোন্যালিটি নেই, ভালো কেরিয়ার নেই এবং যে মধুছন্দার আজ্ঞাবাহী হয়ে তল্পিবাহকের ভূমিকা পালন করবে এবং প্রয়োজনমতো স্ত্রীর সঙ্গে শোবে এবং স্ত্রী অন্যের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করলে কিছুমাত্র আপত্তি তুলবে না।

আপনি কিন্তু বড্ড হার্শ ক্রিটিক!

সবাই তাই বলে। মধুছন্দার সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর আমার ওপরও বিয়ের জন্য চাপ আসছিল। আমি ঠেকিয়ে রাখছিলাম। কারণ, স্ত্রীকে সময়, সহচর্য ইত্যাদি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমার জন্যও একজন গরিব ঘরের শান্ত, নির্বিরোধী, সাত চড়ে রা নেই এমন একটি পাত্রী খোঁজা হচ্ছিল, যে কোনও কারণেই আমার বা আমার পরিবারের অবাধ্যতা করবে না।

সেরকম মেয়ে কি ভূ-ভারতে আছে স্যার?

দুঃখের বিষয়, নেই। তবে যাই হোক, বিয়ে একটা হয়ে গেল। আমার একজন স্ত্রীলোকেরই দরকার ছিল, প্রেমিকা বা পত্নী না হলেও চলবে। কাজেই বিয়েতে মাথা ঘামালাম না। কিন্তু প্যারালাল আরও একজনেরও একটা গল্প আছে—মধুছন্দা। দু'-তিনটে ছবির পর মধুছন্দার বাজার পড়ে যেতে থাকে। সিনেমা বা শো বিজনেস একটা ক্রুয়েল জায়গা। বিজ্ঞাপনও আর তেমন জুটছিল না তার। নায়িকা ছেড়ে সাইড রোলে অভিনয় করছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা একটা ফোন করে দেখা করতে চাইল। জরুরি দরকার। দিন দুই

পর একটা পাঁচতারা হোটেলে মিট করে বলল, আমার একটা সন্তান চাই। আমি তো অবাক। মধুছন্দা সন্তান চায়। কিন্তু আমার কাছে কেন! তখন বলল, ওর বরের কাউন্ট কম, সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোনও একটা ভাবাবেগের কারণে ও আমারই সন্তান ধারণ করতে চায়, অন্য কারও নয়। ভাবাবেগের ব্যাপারটা অবশ্য আমার মাথায় ঢুকল না। কেন ভাবাবেগ, কিসের ভাবাবেগ, কে জানে! মেয়েদের মস্তিষ্ক এক দুর্জ্ঞেয় বস্তু। তবে আমি বস্তুবাদী লোক। ভাবাবেগের ব্যাপারটা সরিয়ে রেখে প্রস্তাবটার মধ্যে কোনও প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা আছে কি না, সেটা ভালো করে ভেবে দেখলাম। তবে এটা ঠিক যে, মধুছন্দার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা বিবাহোত্তর জীবনে কম হলেও খুব একটা তিক্ততা দু'জনের মধ্যে ছিল না।

লাইক গুড ফ্রেন্ডস?

এগজ্যাক্টলি। তবে মন জিনিসটা তো পাপী, হঠাৎ মনে হল আমার সঙ্গে ডিটাচড হওয়ার পর তো ও অন্যরকম জীবনযাপন করেছে। যদি এইচআইভি বা ওরকম কিছু কন্ট্র্যাক্ট করে থাকে!

পাপী মন বলছেন কেন? এটা খুব বিচক্ষণ চিন্তা।

তবে আমি মধুছন্দার চোখ, মুখ, অ্যাটিটিউড দেখে ওকে বিশ্বাস করলাম। লোক চিনতে আমি কমই ভুল করি। এবং তোমাকে কী বলব ডাক্তার, আই ফেল্ট কোয়াইট অ্যান অ্যাট্রাকশন টুওয়ার্ডস হার। তখন বোধহয় আমার ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়স, মধুছন্দাও কাছাকাছি। প্রায় মাসখানেক বাদে আমি মধুছন্দাকে নিয়ে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার চলে যাই। আমার ব্যবসার কাজ ছিল, কিন্তু আমার আর মধুছন্দার প্রেমের এই দ্বিতীয় ইনিংসটা বিদেশে আমি খুব উপভোগ করেছিলাম। মাসখানেকের মতো দু'জনে সুইজারল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ডে ঘুরে বেড়ালাম। তুমি বিশ্বাসই করবে না যে, উই ওয়্যার ইন লাভ আগেন।

আপনার স্ত্রী কিছু সন্দেহ করেননি?

কোনও স্বামীই কখনও তাঁর স্ত্রীর চোখে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। আর পুরুষ জাতটাও তো এক নম্বরের হারামজাদা, কী বলো? শালারা যতই দেবদাস সেজে পারুর জন্য চোখের জল ফেলুক, চন্দ্রমুখীকে পেলেও ছাড়ে না। ঠিক কি না? আর আমি তো তোমাকে বলেই নিয়েছি যে, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রেম বা দায়বদ্ধতা ছিল না। আমাকে তিনি সন্দেহ তো করেনই, সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাও করেন। তবে এ নিয়ে বেশি অশান্তি কখনও করেননি। কারণ, আমি তাঁকে অত সময় দিতাম না। এখন অবশ্য শোধ তুলছেন। একটা কথা কি জানো? মেয়েমানুষকে যদি অবিরল প্রশংসা এবং আশ্বাসবাক্যে পটাতে না পেরে থাকো, তবে প্রচুর টাকা, উপহার এবং গয়না-টয়না দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা শক্ত নয়। আমার স্ত্রী গরিবঘরের মেয়ে। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে এসে খানিকটা হতভম্ব, হকচকিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হওয়ায় আমাকে নিয়ে কাঁটাছেঁড়ার তেমন অবকাশ পাননি। চারদিকে দাসদাসী, যখন খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়, যা খুশি কেনা যায় এবং গরিব বাপের বাড়িতে প্রচুর সাহায্য পাঠানো যায়—এত সচ্ছলতারও তো একটা রেসিপ্রোকাল কৃতজ্ঞতা আছে!

আসল গল্প থেকে কি আমরা অনেকটা সরে গেছি স্যার? আমার দশটায় আউটডোর।

সরে গিয়ে থাকলে সেটা তোমার দোষ। মাঝে মাঝে ফুট কেটে তুমিই তো ডাইভারশন আনছ।

সরি স্যার। আসল কথা, আপনার জীবনটাই এত ইন্টারেস্টিং যে, আমি শেষ অবধি না শুনে উঠতে পারছি না।

শুধু গল্পটা নয়, ওর ভেতরকার কিছু মর্মঘাতী উন্মোচনও আছে।

আছে স্যার, আর সেইজন্যই ইন্টারেস্টিং।

কিন্তু তোমার আউটডোর?

এখন সকাল সাড়ে আটটা বাজে। আউটডোর দশটায়। এখান থেকে হসপিটালের দূরত্ব কুড়ি মিনিট। আর আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, আউটডোরের পেশেন্টদের ধৈর্য অপরিসীম। দশটার ডাক্তার অনেক সময়

বেলা একটাতেও আসেন এবং তার জন্য তেমন কোনও আন্দোলন হয় না।

তুমিও কি তাই করো?

না। আমি খুবই পাংচুয়াল। দশটা তো দশটাই। কিন্তু আমার বয়স চৌত্রিশ। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে আমি বোধহয় করাপ্ট হয়ে যাব। কারণ, সিস্টেম করাপ্ট হলে ইনডিভিজুয়াল বেশিদিন অনেস্ট থাকতে পারে না। অনেস্ট থাকতে দেওয়া হয় না।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য কনফেশন।

ইউ আর ওয়েলকাম। এবার বাকিটা বলুন। ইউরোপে আপনার দ্বিতীয় হানিমুন।

হ্যাঁ। মাসখানেক সময় এবং প্রচুর ডলার উড়ে গেলেও ইট ওয়াজ আ মেমোরেবল টুর। আর ওই রোমান্টিক রি-ইউনিয়নের ফলেই প্রিয়াংশুর জন্ম।

রিলেশনটা কি কন্টিনিউ করেছিলেন স্যার?

না। সেটা সম্ভব ছিল না। সমাজ, পরিবার, দায়িত্ব এগুলো ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে মস্ত বাধা। তার ওপর আছে ভ্যালুজ। এবং তারও ওপরে আছে জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসে থাকা শকুনের মতো অভিভাবকেরা। তুমি কি লুঙ্গি পরে রাস্তায় বেরোতে পার?

না স্যার।

ইচ্ছে করে না?

তা হয়তো করে।

এটাও ঠিক সেরকম। যা ইচ্ছে করে তা আমরা করতে পারি না। অর্থাৎ করতে দেওয়া হয় না।

বশিষ্ঠবাবু, আপনি কি আবার মধুছন্দাদেবীর প্রেমে পড়েছিলেন?

অবশ্যই। তবে ফর আ ব্রিফ পিরিয়ড। যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের মায়া-মমতা-দুর্বলতা থাকলে মুশকিল। তাই ফিরে আসার পর আমরা আবার দূরের মানুষ হয়ে গেলাম। কিন্তু মুশকিল হল কী জানো? ওই প্রিয়াংশু।

মানে, আপনার ছেলে?

হ্যাঁ। ছেলে হওয়ার পর খবর যথাসময়ে আমাকে দিয়েছিল মধুছন্দা। অ্যান্ড শি ওয়াজ এক্সট্যাটিক। ওর হাজব্যান্ড বরুণও নাকি ইকোয়ালি খুশি। বেচারা, সারাজীবন নিজেকে একটা মেয়ের কাছে কেবল বিলিয়ে গেল।

স্যার, আটটা চল্লিশ।

ওহ, তোমার তো আবার আউটডোর! হ্যাঁ, ছেলে হওয়ার খবর আমার কাছে থ্রিলিং কিছু ছিল না। তবে প্রিয়াংশুর যখন এক বছর বয়স, তখন মধুছন্দার বিশেষ অনুরোধে জন্মদিনের পার্টিতে যেতে হয়েছিল। আর বিপত্তিটা ঘটল তখনই।

এটাই বোধহয় ক্লাইম্যাক্স!

সবাই সবসময় ক্লাইম্যাক্স খোঁজে কেন বলো তো?

যে-কোনও গল্পের পিনাকল হল তার ক্লাইম্যাক্স।

কী জানি বাপু, এ তো আর নাটক-নভেল নয় যে, একটা ক্লাইম্যাক্স দরকার হবে। তবে হ্যাঁ, ওই অনুষ্ঠানে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল বটে। সেদিন খুব শীত পড়েছিল বলে প্রিয়াংশুকে ওর মা মধুছন্দা ঠেসে গরমজামা পরিয়েছিল। নতুন মা হলে যা হয় আর কী! কিন্তু পার্টি চলাকালীন বাচ্চাটা খুব কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। মধুছন্দা বা আয়া তাকে থামাতে পারছিল না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, বাচ্চাটার বোধহয় গরম লাগছে। তাই আমি ওকে নিয়ে প্রথমেই ওর গরমজামাগুলো খুলে ফেললাম। তারপর আলাদা একটা ঘরে

নিয়ে গিয়ে পাখা আস্তে চালিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতেই ওর কান্না থেমে গেল। আর সেই যে আমার কোলে সেঁটে রইল, কিছুতেই আর কারও কাছে যাবে না।

তাহলে কি মায়ায় জড়ালেন স্যার? পৌনে ন'টা।

ঘোড়ার জিন দিয়ে এসব গল্প শোনার মানে হয় না।

অপরাধ নেবেন না স্যার। সময়ের মূল্য আপনার চেয়ে ভালো আর কে বোঝে?

মুকেশ অম্বানি বোঝেন, বিল গেটস বোঝেন, রতন টাটা বোঝেন।

সরি স্যার, বলুন। আটটা ছেচল্লিশ।

হ্যাঁ, তুমি মায়ার কথা বলছিলে না?

হ্যাঁ স্যার। আমার গোটা তিনেক ছেলেপুলে রয়েছে। তারা ভালো নার্সিং হোমে জন্মেছে, ট্রেনড আয়া এবং তাদের মা, দাদু ঠাকুরমা, পিসির যত্নে মানুষ হয়েছে। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ঠেকে আছে 'হাই, হ্যালো' গোছের পর্যায়ে। তাদের আমি অপত্য স্নেহই করে থাকি। কিন্তু ঠিক যেন আঠা নেই। কিন্তু সেইদিন সন্ধেবেলা প্রিয়াংশুর আমাকে সেই আঁকড়ে ধরাটা আমার সেই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সে একটা আই ওপেনারের মতো। কী যে হয়ে গেল আমার ভেতরে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার ভেতরে যেন একটা ঘুমন্ত সন্তান-ক্ষুধা লেলিহান হয়ে উঠল। তাতে অবশ্য ওই বিচ্ছুটারও ইন্ধন ছিল। পার্টি থেকে ফিরে আসার পরও সারাক্ষণ আমি যেন আমার শরীরে আমার সন্তানের গন্ধ পাচ্ছিলাম, যা আগে কখনও পাইনি। আর সেটাই যেন হেরোইনের নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল। রোজ সময় হত না। কিন্তু সপ্তাহে অন্তত দু'বার আমি বাচ্চাটাকে দেখতে যেতাম। আর কী বলব তোমাকে, বললে হয়তো বিশ্বাস হবে না, বাচ্চাটাও যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করে থাকত। গেলেই ঝাঁপিয়ে চলে আসত কোলে। আর কিছুতেই আর কারও কাছে যেতে চাইত না। দুনিয়ায় এই প্রথম আমি টের পাচ্ছিলাম যে, আমাকে কেউ ভালোবাসে বা বাসতে চায়। যখন ওকে ওর মা বা আয়ার কাছে দিয়ে চলে আসতাম তখন প্রচণ্ড কাঁদত। তারপর থেকে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে আসতে হত।

প্রিয়াংশু কি আসল কথাটা জানে?

ভালো প্রশ্ন। কিন্তু জবাবটা কঠিন। আমি কখনও বলিনি। মধুছন্দা বলেছে, সেও কখনও বলেনি। বরুণও নয়। প্রিয়াংশু আমাকে আঙ্কল ডাকে, বরুণকে বাবা।

প্রিয়াংশুর সঙ্গে আপনার রিলেশনের তো একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে! সে তো এখন আর টডলার নয়।

সেটাই তো হওয়ার কথা। পৃথিবী এবং সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা বুঝেছি। বাইশ বছরের একটি ছেলে এখনকার যুগে যেমন হয়, প্রিয়াংশু ঠিক সেইরকম। চালাক-চতুর, একটু রেকলেস, ইন্টেলিজেন্ট, মেধাবী।

ডাক্তারি পড়ে কি?

আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে?

জানি না তো! অনুমান।

বাজে কথা বোলো না। কারও চেহারা দেখে সে মেডিক্যাল ছাত্র কি না তা বোঝা যায় না।

ঠিক কথা স্যার। এমনকী কারও হাতে ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্র দেখলেও তাকে মেডিক্যাল ম্যান বলে অনুমান করে নেওয়া ভুল। কারণ, আজকাল আমজনতার অনেকেই প্রেশার মাপতে জানে। আমি সেদিন প্রিয়াংশুর হাতে একটা প্রেশারের যন্ত্র দেখেছিলাম। তাই অন্ধকারেই ঢিলটা ছুড়লাম।

তাই বলো। হ্যাঁ, প্রিয়াংশুর এবার থার্ড ইয়ার।

কোনও মতবিরোধ হয় না?

হয়। একটু বেশিই হয়। এমনকী, ঝগড়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয়াংশুর আমার প্রতি খানিকটা টান আছে। হয়তো বেশিদিন থাকবে না। কারণ, আমি মেজাজি, দুর্মুখ, অহংকারী। কারও সঙ্গেই যখন সম্পর্ক রাখতে পারিনি তখন প্রিয়াংশুর সঙ্গেই কি পারব?

স্যার, একটা কথা বলব? ভয়ে ভয়ে?

ভয়ে ভয়ে কেন? আমাকে তো তুমি ভয় পাও না?

পাই। আপনাকে ভয় কে না পায়?

আমার মনে হয়, কেউই পায় না। যাকগে, বলে ফেলো।

প্রিয়াংশুকে আপনি তার পিতৃপরিচয় জানাননি। আপনার ধারণা প্রিয়াংশুও সেটা জানে না। অথচ আমার কাছে অনায়াসে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলেন। ধরুন, প্রিয়াংশু তো আমার কাছ থেকেও ঘটনাক্রমে ব্যাপারটা জেনে ফেলতে পারে।

পারে? পারে না? আমার ধারণা, প্রিয়াংশু ব্যাপারটা খুব ভালো করেই জানে।

কীভাবে?

বাই সিম্পল ডিডাকশন, ইজি। যে-কোনও বুদ্ধিমান ছেলেই এটুকু বুঝতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

তাহলে ব্যাপারটা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

তোমার আউটডোরের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

না স্যার। আমার এক চোখ সবসময়ে ঘড়ির দিকে। ন'টা বাজতে এখনও তিন মিনিট।

কথায় কথায় তুমি আমাকে একটা জটিল জায়গায় এনে ফেলেছ। একজন ব্যস্ত ডাক্তার এত কথা বলতে সময় কী করে পায়?

কথা! না স্যার, আমার আর কোনও কথা নেই। তবে বলি, কাজটা আপনি ভালো করছেন না।

কোন কাজটা?

নিজের ডাক্তারের কোনও কথাই আপনি গ্রাহ্য করেন না। অবজ্ঞার ভাব দেখান। অথচ....

অথচ কী? ফের হাঁটার কথা বলবে তো?

না। কেননা আমি খবর পেয়েছি, আপনি অলরেডি রোজ ভোরবেলা হাঁটছেন। এমনকী, একজন যোগব্যায়ামের লোকও আপনার কাছে রেগুলার আসছে। স্যার, আমি একজন সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার। তার চেয়ে কি একজন থার্ড ইয়ারের মেডিক্যাল ছাত্রকে আপনার বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

তোমার আউটডোরের রোগীরা কিন্তু এরপর চেঁচামেচি শুরু করবে।

ন'টা বেজে দুই। ঠিক আছে স্যার। আজ আসছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।

জাম্বুবান

দুপুরে জামতলায় বসে তারা যখন ভাত খাচ্ছে তখন নিতাই বলল, ব্যায়াম করলে লোকের তাগড়াই চেহারা হয়। তা আমরা যে সারাদিনই গতর খাটাচ্ছি আমাদের শরীর দড়কচা মার্কা কেন বল তো?

কথাটা ভাববার মতো।

নিতাই বলল, আসলে কি জানিস, এই সাদা ভাত খেয়ে পেটটাই যা ভরে, শরীরে সারবস্তু যায় না। মাছে মাংসে খেলে, দুধ ছানা পথ্যি পেলে তবে শরীরের পোষ্টাই হয়। আমাদের শ্যামাপদ যে শরীর বাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে কি এমনি নাকি? সকালে আধসের ভেজা ছোলা, আধসের দুধ, দুপুরে মাছ-ভাত, রাতে মাংস-রুটি।

নেপু অবশ্য খাওয়া নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। তার ভরপেট হলেই হল। এই আজ যেমন ভাতের পাতে ডাল আছে, ঘ্যাঁট আছে, কুঁচো মাছও জুটেছে একটু। এসব না হলেও তার চলে। ভাতের সঙ্গে নুন আর লঙ্কা দিয়েও তার দিব্যি হয়ে যায়। তাতে পোষ্টাই হয় কি না কে জানে। তবে খেটেপিটে তো আছে।

মথুরাপুর বেশ দূরের জায়গা। তার গাঁ সাতপোঁতা থেকে রোজ যাতায়াত করা যায় না, অবশ্য সাতপোঁতাতেও তেমন সুবিধের কিছু নেই।

বাবা কবেই মরে গেছে, মা-ও বছর দুই হল গত, বাড়িঘর দখল করে আছে তার দুই দাদা। গোপাল আর নারান। বাড়ি বলতে দু'খানা কুঁড়ে ঘর আর কাঠা দশেক জায়গা। মাথা গোঁজাই মুশকিল। একটা বারান্দা চ্যাটাই দিয়ে একটু ঘিরে নিয়ে নেপু তক্তপোষে শোয়। শুতে হয় বলে শোয়া। বাড়ি বলে মনে হয় না। মনও নেই। আজকাল তাই বিশ্বেসবাবুকে বলে সে কাজের জায়গাতেই থাকে। শাটারিং-এর তক্তা মাটিতে পেতে দিব্যি শোওয়া যায়।

এই মথুরাপুর জায়গাটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ঠিক গাঁ নয়। একটু গঞ্জমতো। বিশালাক্ষী নদী আছে। তেমন দোরের নদী না হলেও তাতে নৌকো চলে, জেলেরা মাছও ধরে। তবে বিশ হাতের বেশি চওড়া হবে না। চোত-বোশেখে শুকিয়ে একদম নালা হয়ে যায়। তা হোক, তবু নদী তো। বেশ একটা জমাট বাজার আছে। বড়সড় পুরনো কালীমন্দির আছে। চৌধুরীবাবুরা তার সেবাইত। বর্ধিষ্ণু জায়গা, টাকা থাকলে এখানেই কাঠা খানেক জমি কিনে একটা ঘর তুলে থেকে যেত নেপু।

বিশ্বনাথবাবু এখন চা খাচ্ছেন। সঙ্গে বিস্কুট। এই সময়ে রোজই খান। বেশ ফর্সা সাদা কাপ-ডিশ। ওরকম কাপ-ডিশে একটু চা খেতে পারলে হত। চেয়ারে বসে, আয়েস করে।

পাশেই বিষ্টু। কাজ থামিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, এই যে একটা শুকনোমতো হাওয়া দিচ্ছে টের পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, তা দিচ্ছে বোধহয়।

বিকেলে ঝড় হবে। হাওয়া আমি খুব চিনি।

তা চেনে বিষ্টু। গাছের পাতা কোনদিকে উল্টোলে ঝড় হয় তা জানে।

মিক্সার মেশিনের শব্দ হচ্ছে ঘরঘর করে। আজ চারটে খুঁটির ঢালাই। জোগালিরা ভারি ব্যস্ত। পাথর কুচির স্তূপ উবে যাচ্ছে দেখ না দেখ। বালি আর সিমেন্টের বস্তা চোখের পলকে খালি হয়ে যাচ্ছে। মেশিনের কী খাঁই রে বাবা! আর সামনে কাণ্ডখানাও হচ্ছে জব্বর। বাড়িখানা উঠছেও পেল্লায়। তাতে চৌধুরি পরিবারের লোকেরা সব থাকবে। এ পর্যন্ত দশ-বারোখানা বাড়ি হতে দেখল নেপু। সবই বড় বড় কাজ। বিশ্বনাথবাবু ছোটমোটো কাজ হাতেই নেন না।

নেপু বিড়ি খায় না। প্লাস্টিকের ময়লা বোতল থেকে একটু জল খেল। গরম জল। এই কাঠফাটা রোদে কি আর জল ঠান্ডা থাকে?

নেপু একটু লেখাপড়া জানে। ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে। বাংলা ইংরিজি পড়তে পারে। অঙ্কের মাথাও সাফ। তাই বিশ্বাসবাবু তাকে রোজকার হিসেবপত্র রাখারও একটা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। তাতে নেপুর একটু গুমোর হয় বটে, কিন্তু অন্যেরা ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখে না। তবে নেপু চুপচাপ থাকে, খাড়াখাড়িও নেই কারও সঙ্গে। সে সার বুঝেছে, দুনিয়ায় সদ্ভাব বজায় রেখে বেঁচে থাকতে গেলে মাথা খাটাতে হয়। শুধু দু'নৌকো তো নয়, অনেক নৌকায় পা রেখে চলা চাই। কাজকর্মও শিখেছে মন্দ নয়। ছোটখাটো পাকা বাড়ি তৈরির বরাত পেলে চোখ বুজে কাজ তুলে দিতে পারে। তবে সবই একটু রয়ে সয়ে করা ভালো। হুটোপাটি করতে গেলেই যত গন্ডগোল।

সাতপোঁতায় থাকতে সে নগেন চোরের শাগরেদ হয়েছিল একবার। ভেবেছিল, চুরি আর এমন কী অর্ধমের কাজ! দুনিয়ায় চোর নয় কে? আর নগেনও তার কাজ দেখে দশ মুখে সুখ্যাতি করত। তোর তো পাকা হাত রে! লেগে থাকলে তোর পয়সা খায় কে? সেই শুনে নেপু এমন গরম হয়ে গেল যে, 'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার' অবস্থা। বিরিঞ্চিবাবুর বাড়িতে মেয়ের বিয়ে। আহাম্মকের মতো হানা দিয়ে বসেছিল শেষ রাতে। ধরা পড়ে বেইজ্জতের এক শেষ। পুলিশে ধরে নিয়ে খুব ডলাই-মলাই করেছিল। মাসখানেক হাজতবাসও করতে হল। ভিন গাঁ ছিল বলে রক্ষে। সেই থেকে চুরিতে ইস্তফা দিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিশ্বাসবাবুর কারবারে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। সে বেশ লম্বা চওড়া ছেলে, খাটিয়ে পিটিয়ে আছে। সেই দেখেই বিশ্বাসবাবু কাজে নিয়েছিলেন। তা খাটুনিও আছে বটে। শরীরের রসকষ সব নিংড়ে দিতে হয়। ইট বওয়া, বালি সিমেন্ট মেশানো, ভারা বাধা, শাটারিং লাগানো, ঢালাই, কাজের অন্ত নেই।

বড় মিস্তিরি ইরফান মিয়া এসে বলল, ওরে, তোরা একটু হাত চালিয়ে কাজ কর তো। বেলাবেলি সেরে ফেলতে হবে। আকাশে একটা পাজি মেঘ দেখা যাচ্ছে। ঝড়জল হওয়ার কথা।

যে যার কাজ ভালোই বোঝে। পুরনো লোক সব। ইশারায় কাজ হয়ে যায়।

তবে বে-আন্দাজি ঝড়টা একটু আগেভাগেই এসে পড়ল। তিনটে তখনও বাজেনি, হঠাৎ মাঠঘাট ধুলোয় ঢেকে হালুম বাঘার মতো পাগলা বাতাস এসে চারদিকটা তছনছ করে দিল একেবারে। সদ্য গাঁথা একটা কাঁচা দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। কাঠের খুঁটি উপড়ে পড়ল। গাছ ভেঙে পড়ল মিক্সার মেশিনের উপর, ছাদ ঢালাইয়ের জন্য শাটারিং লাগানো হয়েছিল, এক থাবায় তক্তাগুলো উড়িয়ে নিয়ে কোথায় গিয়ে

ফেলল কে জানে! হ্যাঁ, ঝড়ের মতো ঝড় বটে! দশ-বারোজন মিস্তিরি বিশুবাবুদের বারান্দায় উঠে পড়ল বটে, কিন্তু বৃষ্টির হ্যাঁচলা থেকে মাথা বাঁচানো গেল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে ঝড় থামল বটে, কিন্তু বৃষ্টিটা এল ঝেঁপে। আরও ঘণ্টা দুই ধরে দেদার জল ঢেলে চারদিক একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ল।

ইরফান মিঞা বাবু মানুষ। বৈঠকখানায় বাবুদের কাছে বসে ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, আজ আর কাজ হবে না। তোরা বাড়ি যায়। যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কাল তাড়াতাড়ি এসে সব সারতে হবে।

দুই

বুড়ো চোর ধনেশ ঢাকি আজকাল বাতে ভোগে। চোখে ছানি আসছে, হাত কাঁপে, তার উপর হাঁফানি। তা বলে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না। তা একদিন এসে বেচুকে বলল, তোকে তো এইটুকুন বয়স থেকে দেখে আসছি, কোলে পিঠেও করেছি। তা বাবা খোঁজখবর থাকলে একটু দিস। আজকাল তো আর বড় কাজ সামলাতে পারব না। ছোটখাটো কেস হলে পেরে যাব।

শশব্যস্ত উঠে ধনেশের পায়ের ধুলো নিয়ে বেচু বলল, তা তো বটেই ধনাখুড়ো, আপনাদের হাতেই একরকম মানুষ হয়েছি। তা খুড়ো বিশুবাবুর বাড়িতে যদি আজ রাতে একটু পায়ের ধুলো দেন তাহলে মনে হয় পাঁচ-সাত হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিশুবাবু কাল মিস্তিরিদের দেবেন বলে টাকাটা তুলে রেখেছেন। শিয়রের কাছে কাঠের আলমারিতে রাখা আছে। চাবি টেবিলের ওপরের টানায়।

ধনেশ ভারী খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে বলল, বেঁচে থাক বাবা। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে ক'দিন।

এই যে ধনেশ ঢাকির মতো পোড়খাওয়া পাকা লোকও এসে তার কাছে সুলুক সন্ধান চাইছে এতেই প্রমাণ হয় যে, বেচারামের কদর বাড়ছে। সে ভারী শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত কচলে ঢাকিকে বলল, মরা হাতি লাখ টাকা। বুড়ো হলে কী হয়, আপনার বুড়ো হাড়েও অনেক ভেলকি দেখাতে পারেন। ফুরসত মতো কয়েকটা হস্তলাঘব প্রক্রিয়া একটু শিখিয়ে দেবেন তো খুড়ো।

ধনেশ ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বলল, সে আর বেশি কথা কী! বয়স হলে তো বিদ্যে মরে না। দেব'খন শিখিয়ে।

আসল কথা হল, ধনেশের ছোট মেয়ে শিউলির উপর অনেক দিন ধরেই বেচুর নজর। শিউলি এই সবে ষোলো ছাড়িয়ে সতেরোয় পড়েছে। ভারী জেল্লাদার তার চেহারা। যেমন মুখের মিষ্টি ডৌল, তেমনি ছিপছিপে শরীর। গায়ের রংখানাও ফর্সা। এক কথায় কুসুমপুরে অমন সুন্দরী আর নেই। সেটা শিউলিও ভালোই জানে। ধনেশের আরও দুটি মেয়ে আছে। বড় জনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো জনের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু সকলেরই নজর শিউলির উপর। এমনকী জাত খুইয়েও অনেকে শিউলিকে ঘরে নিতে চায়। বসাকবাড়ির গিন্নিমা তো বলেই রেখেছেন, আমার নবীনের সঙ্গে ওকে ভারী মানাবে। উঁচু অসমবর্ণে তো দোষ নেই। হিদাঁরাম ঘোষের বড় ছেলে যদুপতি তাঁর শালার জন্য শিউলিকে দেখে রেখেছেন। শালার তিনটে ট্রাক, একটা ট্রাক্টর, সুতরাং কমপিটিশন খুব। বেচু মোটে কল্কেই পাচ্ছে না। শিউলির দোষ হল, সে ছেলেছোকরাদের দিকে মোটেই তাকায় না। পাত্তাও দেয় না। অহংকার খুব। বেচুকে সে একরকম চেনেই না। ধনেশকে হাত করতে পারলে বেচারামের একটু হিল্লে হতে পারে। বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে বড় কাজ হচ্ছে। বিশ্বাসবাবুর মতো মস্ত ঠিকাদারকে বরাত দেওয়া হয়েছে। সব খবরই তার নখদর্পণে। কাল মিস্তিরিদের হপ্তা দেওয়া হবে। ধনেশ যদি কাজটা তুলতে পারে তাহলে কাল সকালেই গিয়ে পেন্নাম ঠুকে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলবে বেচারাম।

তিন

শখ করে একটা আলোওয়ালা হাতঘড়ি কিনেছিল নেপু। অন্ধকারেও বেশ দেখতে পাওয়া যায়। বড্ড পেয়ারের ঘড়ি। আজকাল এইসব ঝিকঝাক জিনিস ভারী সস্তায় বিকোয়। তা নেপু টাকা দিয়ে করেই বা কী। মাস গেলে তার হপ্তা যোগ করে প্রায় চোদ্দো-পনেরো হাজার টাকা বেতন দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ সে হিসেব রাখে। তার উপর সাইটে থাকে বলে চৌকিদারি বাবদও কিছু পায়। বলতে নেই, আরও দুই ঠিকাদরবাবুও তাকে টোপ দিয়ে রেখেছেন।

রাতে ঘড়িটা হাতে দিয়ে থাকে সে। সন্ধেবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে রাতের দিকে পাহারা দিতে হয়। ঝিমুনি অবশ্য আসে। তবে তার ঘুম বড্ড সজাগ। তার উপর ঝড়-বাদলার পর আজ একটু ঠান্ডা পড়ায় ভাত-পেটে একটু গাঢ় ঘুমই এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা ঘপাৎ গোছের শব্দ হল কোথাও কাছেপিঠে। পুকুরে বড় মাছের ঘাই মারার শব্দের মতো। সেই সঙ্গে চাপা একটা আর্তনাদও, 'বাপ রে।'

নেপু উঠে পড়ল। আজ দুপুরেই ইট ভেজানোর জন্য একটা বড় গর্ত করা হয়েছিল। সেইটে বৃষ্টির তোড়ে জলে আর কাদায় একবোরে মাখামাখি। টর্চ জ্বেলে নেপু দেখল, কোমর অবধি তাতে গেঁথে গিয়ে একজন বুড়ো রোগা মানুষ আঁকপাকু করছে।

কী হল কর্তা?

পড়ে গেছি বাপু, মাজাটা গেছে।

তা এত রাতে এখানে কী মনে করে? এ তো যাতায়াতের রাস্তা নয়।

সে অনেক কথা বাপু। চোখে কি আর রাস্তাঘাট ঠিকমতো ঠাহর হয়! বৃষ্টির জলে সব লেপে পুঁছে গেছে। দু'চোখেই ছানি।

নেপু সন্দিহান চোখে লোকটাকে দেখল। তারপর চাপা গলায় বলল, এ বয়সে কি ওসব কাজে নামা উচিত কর্তা? রাত আড়াইটে বাজে।

লোকটা জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, হাতি খন্দে পড়লে সকলেরই হিতোপোদেশের চুলকানি ওঠে।

নেপু দুই জোরালো হাতে বুড়োর বগলের নিচে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনল। বলল, এবার বাড়ি যান।

লোকটা পা ছড়িয়ে মাটিতে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থেকেই বলল, কীভাবে যাব?

কেন, হেঁটে।

হাঁটতে পারলে কি বসে আছি বাপু? কোমরের নিচে থেকে যে মোটে সাড়ই নেই।

তাহলে?

বুড়ো মাথা নেড়ে বলে, হাঁটবার সাধ্য নেই বাপু। বাড়িও বেশ দূরে।

কত দূরে?

তা হাটখোলা ছাড়িয়ে আরও বেশ অনেকটা। ভ্যানগাড়ি হলেও বরং হত। কিন্তু—

কী যে সব উটকো ঝামেলা এসে জোটে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু নেপু করেই বা কী, ভেজা শরীরে সারারাত পড়ে থাকলে বুড়ো মানুষ নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে বসবে। দুনিয়ার পাপপুণ্যি বলেও তো ব্যাপার আছে।

সে একটু বিরক্ত হল বটে, কিন্তু দ্বিধা করল না। বলল, ঠিক আছে, পৌঁছে দিচ্ছি। তবে আর এমন কাজ করবেন না কর্তা।

কাঁধে ভাঁজ করা চাদরের মতো বুড়োকে চাপিয়ে নিল সে। ওজনটা খুব একটা বেশি নয়। তবে রাস্তা ভালো নয়, জলে কাদায় ভারী পিছল, হড়হড়ে। কাজেই যথাসাধ্য ঘাসে পা রেখে বুড়োকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল সে। দেরি করা চলবে না। ফিরে এসে বাকি রাত পাহারা দিতে হবে।

বুড়োর বাড়িঘরের অবস্থা তেমন খারাপ নয়। টিনের চালওয়ালা পাকা বাড়ি। বেশ অনেকটা জমিও আছে। বড় উঠোনের ওপাশে ব্যারাকবাড়ির মতো আরও ঘর। একসময়ে বোধহয় রোজগারপাতি ভালোই ছিল।

সাড়া পেয়ে লণ্ঠন আর টর্চ হাতে প্রথমে এক বয়স্কা মহিলা, তার পিছনে দুটি অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘুমচোখে।

এ কী! কী হয়েছে?

যা হয়েছে সংক্ষেপে বলল নেপু।

দু'জনের মধ্যে একটা মেয়ে এত ভালো দেখতে যে, চোখ ফেরানো যায় না। সে-ই বেশ রোখাচোখা। বাপের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলল, এত রাতে বেরিয়েছিলে কেন?

বুড়ো আতান্তরে পড়ে বলে, ঘরে বড্ড গুমোট হচ্ছিল। ঘুম আসছিল না। তাই—

আর মিথ্যে কথা বোলো না তো বাবা। তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। সঙ্গে এই জাম্বুবানটিকে কোত্থেকে জোটালে। নতুন শাগরেদ নাকি?

ভারী রাগ হল নেপুর। বলল, আমি ঠিকাদার বিশ্বাসবাবুর মিস্তিরি। বিশু চৌধুরিদের বাড়ির ইমারত তৈরি করছি। লোকের ভালো করতে গেলেই দেখি আজকাল বদনাম হয়।

বুড়ো মিনমিন করে বলল, আচ্ছা, ওকে বকাইস কেন? কত দূর থেকে ঘাড়ে করে বয়ে এনে দিয়ে গেল।

ঘাড়ের গামছায় মুখের ঘাম মুছে নেপু বলল, আসি তাহলে বুড়োকর্তা!

রাগের চোটে নেপু বড় বড় তেজি পা ফেলে লহমায় নিজের ডেরায় ফিরে এল। সে নাকি জাম্বুবান! সে নাকি চোরের শাগরেদ!

মাথা এত গরম হয়ে গেল যে, সারা রাত আর দু'চোখের পাতা একই করতে পারল না। পরদিনই অবশ্য ঘটনাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। দুনিয়ার কত কী ঘটে!

দুটো দিন বড্ড খাটুনি গেল। দম ফেলার ফুরসত ছিল না।

পরদিন বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি। মিস্তিরিরা যে-যার বাড়ি গেছে। নেপু একা সাইটে পড়ে আছে। তার যাওয়ার জায়গা নেই। তা ছাড়া ডিউটিও তো আছে। পাহারা দেবে কে? চারদিকে লোহার রড, সিমেন্ট, বালি, বাঁশ, তক্তা, ইট। ভাবছিল, আজ নিজেই একটু ভালোমন্দ রেঁধে খাবে। সকালে উঠে সে এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে ঢালাই হওয়া ছাদে বসে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখছিল। মুড়ির লোভে কাকেরা চলে আসছে কাছাকাছি। নেপু তাদেরও খাওয়াচ্ছিল। কুসুমপুরে আজ অনেকগুলি বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে। কোনও মণ্ডপে গিয়ে একটু পেসাদ পেলেও হত। কিন্তু কেউ তো ডাকেনি। তাই নেপুর বড্ড লজ্জা করে। তার থেকে বরং একটু মাছ কিনে এনে ঝোল রেঁধে খাবে।

ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠে আসছিল। কাটা-ঘুড়ি ধরতেই আসছে বোধহয় কেউ। বাচ্চাগুলো তো লগি হাতে সকাল থেকেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

পিছন থেকে একটা মেয়ে-গলা বলে উঠল, এই যে! শোনো!

পট করে ফিরে তাকিয়ে নেপু হাঁ। সেই সুন্দর মেয়েটা না? সুন্দর হলে কী হবে, যা জেদ। আজ পরনে লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি, কপালে চন্দনের টিপ, এলো চুল। মুগ্ধ হওয়ার মতো চেহারা।

মুখের মুড়িটা গিলে সে কোঁচড় ধরে উঠে দাঁড়াল, কী ব্যাপার?

তোমার নাম বুঝি নেপাল নস্কর?

হ্যাঁ।

মা তোমাকে একবারটি যেতে বলেছে, আজ দুপুরে।

নেপু অবাক হয়ে বলে, আমাকে? কেন বলো তো!

তা আমাকে বলেনি। শুধু বলেছে, নেপুকে দুপুরে আসতে বলিস। আজ এখানে দুটো প্রসাদ পাবে।

প্রসাদ। তোমাদের বাড়িতে বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি?

হ্যাঁ। যাবে তো?

ভারী লজ্জা আর অস্বস্তি হল নেপুর। বলল, তা আমাকে কেন নেমন্তন্ন করা হচ্ছে শুনি! আমি সামান্য মিস্তিরি মানুষ। তার উপর জাম্বুবান।

মেয়েটা ভ্রূকুটি করে বলল, জাম্বুবানই তো! জাম্বুবান ছাড়া কেউ দেড়মণি একটা লোককে জলকাদা ভেঙে অতদূর বয়ে নিতে পারে? এসো কিন্তু।

আমি যে রান্না করব বলে ঠিক করেছিলাম!

না এলে মজা বোঝাব। মনে রেখো! আমি আজ মাংস রান্না করছি। মনে থাকে যেন।

তা গেল নেপু। একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন...

নেপু কুসুমপুরে চার কাঠা জমি কিনে ফেলেছে। কারণে-অকারণে সে আজকাল একা একাই হেসে ফেলছে। আর শিউলি? সে আজকাল জাম্বুবানটাকে বড্ড লজ্জা পায়।
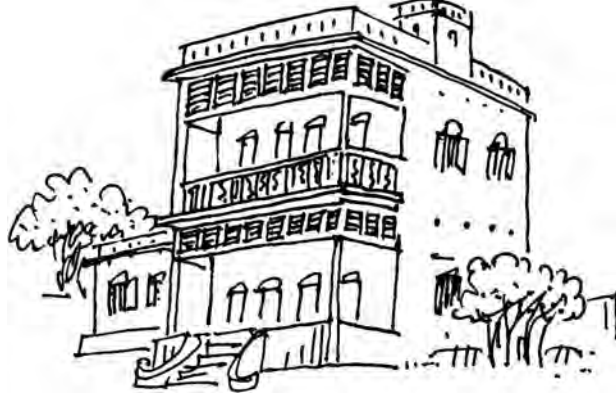
উত্তাল ঝড়ের রাতে

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড় অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়। খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড় সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড় দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড় বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, পৌঁছতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, আজই পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এর পর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু-পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছনোর কথা, পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। ঝড়, বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনও লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে দু'জনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম-গন্ধ নেই। নদীতে বড়-বড় সাঙ্ঘাতিক ঢেউ উঠেছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, 'চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।'

জয়চাঁদ রাজি হল না। বলল, 'তুমি যাও দিনু দাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিনহাত যেতে না যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমি যাচ্ছি।'

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনও মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসাব তার মাথা থেকে উড়ে গিয়েছে। বসে আছে তো বসেই আছে। জয়চাঁদ দু'বার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে-কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনেই ঘুটঘুটি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ-সাত হাত উঁচু বড়-বড় ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছলে আরও পাঁচ-সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীরভাবে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনও ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভালো করে কোমরে বেঁধে নিল। তার পর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনওরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড় দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড়-জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকোটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন-ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে-হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাই-মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, 'কে বটে তুমি?'

'আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।'

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'ওঃ, বড্ড ফাঁড়া গেল আজ! প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তুমি যাবে কোথা?

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'যাব ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।'

লোকটা বলল, 'হু। কেমন অসুখ?'

ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কি না কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাব কি না বুঝতে পারছি না।'

লোকটা বলল, 'মেয়েকে বড্ড ভালোবাসো, না?'

'তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।'

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'চলো তাহলে।'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

'তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'খেপেছেন নাকি? কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাত। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।'

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।'

লোকটার গলায় স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বৈঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝদরিয়ার প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দু'হাতে শক্ত করে নৌকোর দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শালখুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বৈঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তিরগতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ-দিক থেকে, জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'জয়চাঁদ, ভয় পেও না।'

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়।

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, 'এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছের দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া। এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগে।'

'ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।'

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না। ঝড় তো উল্টোদিকে।'

'যা হোক পৌঁছে তো গেছ।'

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, 'আপনি কে?'

'আমি। আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।'

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, 'আপনাকে প্রাণ ফিরে পেতে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?'

'বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'করো কী জয়চাঁদ, করো কী? বাড়ি যাও, জয়চাঁদ।'

'গিয়ে?'

'মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।'

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে?

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোট ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে?
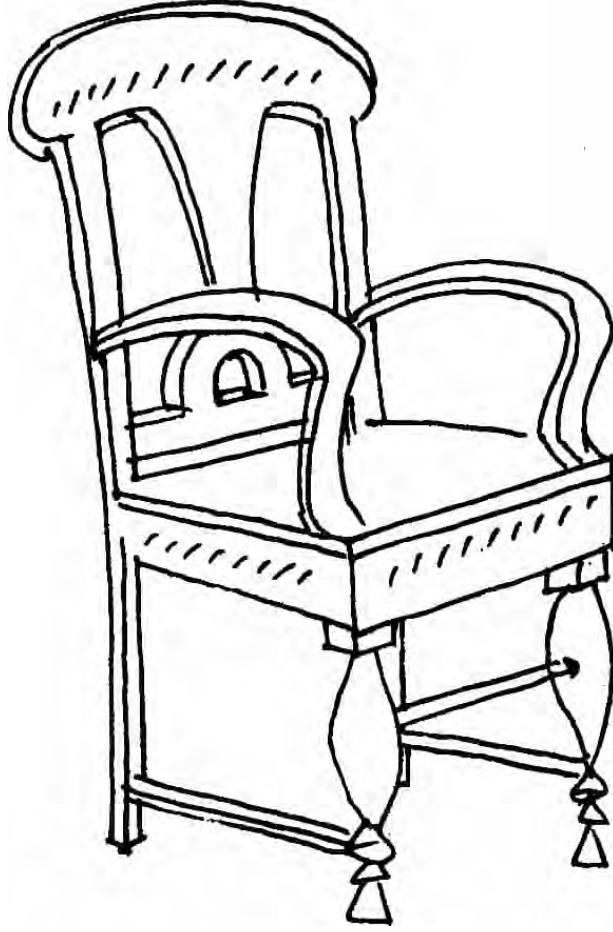
মুখোমুখি

আপনি যে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবেন, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমি ভেবেছিলাম আপনি ফোনে আমার প্রস্তাব শুনেই রেগে যাবেন কিংবা আমাকে অপমান করবেন।

'ম্যাডাম, আমাকে কি আপনার খুব রগচটা, বিচ্ছিরি অভদ্রস্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়েছিল?'

'না, তা নয়। তবে গায়ে পড়ে একটি নাকচ হয়ে যাওয়া মেয়ে ফের দেখা করতে চাইছে—এ ব্যাপারটা তো সন্দেহজনক বলে মনে হতেই পারে।'

'একটু অবাক হয়েছিলাম ঠিকই তবে রেগে যাইনি। বরং একটু কৌতূহল হয়েছিল।

'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। আপনি কি কফি খাবেন? না কি অন্য কিছু?'

'হ্যাঁ, কফি খাবো, তবে একটা শর্তে, বিল আপনি মেটাতে পারবেন না, আমি মেটাব।'

'ও মা, কেন? আপনাকে তো ডেকে এনেছি আমি, আর আমি তো ভদ্রগোছের চাকরিও করি।'

'সেসব আমি জানি, শুধু বড়সড় চাকরিই করেন না, আপনার বাবার লোহা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। কিন্তু আমি যুবক হলেও পুরনো ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত। মহিলারা রেস্তরাঁর বিল মেটালে আমার প্রেস্টিজে লাগে।'

'ঠিক আছে, বিল মেটানোর মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই আমি লড়াই করব না। তার চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার আছে।'

'আপনি ফোনে তাই বলেছিলেন। কিন্তু ম্যাডাম, আপনাদের বাড়িতে আপনাকে পাত্রী হিসেবে দেখতে আমি সদলবলে গিয়েছিলাম বোধহয় মাস দুয়েক আগে। সাত মাস এগারো দিন।'

'তা হবে। কিন্তু এই গুরুতর কথাটা বলার জন্য এত সময় নিলেন কেন? আরও আগেই তো বলা যেত।'

'বলব কিনা তাই নিয়েই একটু দ্বিধা ছিল। আর একটা কথা, আপনাকে পাত্রী হিসেবে অমনোনীত করা হয়েছিল বলে আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জিত। পাত্রী-দেখা ব্যাপারটাই আমার ঘোর অপছন্দ। আপনিই প্রথম ও শেষ। আমি কিন্তু আর পাত্রী দেখিনি।'

'তাতে আপনার বিয়ে আটকাবে না। আগে এদেশে বিয়ের আগে বরের কনেকে দেখার প্রথা ছিল না। এখনও দু'-চার ক্ষেত্রে ওরকম হয়।'

'হ্যাঁ, তা জানি। যাকগে, আমরা নিশ্চয়ই আজ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসিনি।'

'না, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটাই খুব বাজে বলে আমার মনে হয়। সেসব পুরনো কথা আমি মন থেকে ঝেড়েও ফেলেছি। আজ আপনার সঙ্গে আমার অন্য একটা দরকার।'

'বেশ তো, গো অ্যাহেড।'

'আগে কফিটা তো খান। এই রেস্তরাঁর ক্যাপুচিনা কফির খুব নামডাম আছে।'

'রক্ষে করুন। ক্যাপুচিনো আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার জন্য ব্ল্যাক কফি অ্যান্ড নো সুগার।'

'ব্ল্যাক কফিকে অনেকেই মনে করে ম্যাসকুলিন ড্রিংক। আপনিও কি তাই?'

'না ম্যাডাম। আমি খুব ফাঁকিবাজ ছাত্র ছিলাম। সারা বছর আমি ফুটবল খেলে বেড়াতাম। দারুণ খেলার নেশা, ফার্স্ট ডিভিশনে একটা ছোটখাটো ক্লাবের হয়ে নানা টুর্নামেন্টে যেতে হত। পরীক্ষার সময় রাত জেগে না পড়লে উপায় ছিল না। তাই তখন থেকে ব্ল্যাক কফির নেশা।'

'চিনি খান না কেন?'

'চিনি হল হোয়াইট পেরিল। সভ্যতার শ্বেত অভিশাপ। আমার দাদু মিষ্টি খেতে বারণ করতেন। আর ছেলেবেলায় একবার যা মাথায় ঢোকে তা সারাজীবন আর মাথা থেকে তাড়ানো যায় না। তবে এগুলো নিশ্চয়ই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়?'

'না, তবে এসব ছোটখাটো ব্যাপার ওপেনিং হিসেবে খারাপ নয়।

'ওপেনিং বলতে কিছু বোঝাতে চাইছেন কি?'

'হ্যাঁ, মানে কথাবার্তা শুরুর কথা।'

'কথাবার্তা তো আজ আপনি বলবেন, আমি শ্রোতা।'

'না উজানবাবু, আপনিও কিছু বলবেন।'

'নামের সঙ্গে বাবুটা বড্ড কানে লাগছে, শুধু উজান বললেই হবে। আমি বয়সে হয়তো আপনার চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়। কিন্তু ওটা কোনও ফ্যাক্টর নয়।'

'আপনি আমার চেয়ে ঠিক সাত বছর তিন মাসের বড়। মোটেই দশ-বারো বছরের নয়।'

'অত নিখুঁত হিসেব পেলেন কোথায়?'

'পেতে চাইলেই পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলুন তো আত্রেয়ী, আজ কি আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি কিছু হবে?'

'ঝগড়াঝাঁটি? না তো? ঝগড়া হবে কেন?'

'কেন হবে তা জানি না। তবে আমার ওপর তো আপনার রাগ থাকারই কথা। যদি সেই রাগ পুষে রেখে থাকেন তাহলে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

'ক্ষমা একটু আগেই অলরেডি চেয়েছেন। কিন্তু রাগ পুষে রাখার কোনও কারণই তো নেই। আপনি তো আর জানেন না যে, আপনার আগে ও পরে আরও অন্তত তিন পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে এসেছে এবং কোনওবারই আমি পাশ পরতে পারিনি।'

'আপনি ওভাবে বলবেন না, আমার কষ্ট হচ্ছে। এভাবে পাত্রী নির্বাচন খুব অপমানজনক সিস্টেম, এটা ঠিক নয়।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল এই অপমানজনক সিস্টেম আমি মেনে নিয়েছিলাম কেন? আমি একটা ভালো চাকরি করি, বাবার টাকা আছে, লেখাপড়া শিখেছি। তবু আমি কনে দেখার মতো প্রিমিটিভ একটা সিস্টেম মেনে নিচ্ছি কেন, এরকম একটা প্রশ্ন কি আপনার মনে উঁকি দেয়নি?'

'না, ঠিক ওভাবে ভাবিনি। কিন্তু এখন আপনি ধরিয়ে দেওয়ার পর অসঙ্গতিটা বুঝতে পারছি। সত্যিই তো সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে বসবার কথা তো আপনার নয়? আপনি শুধু ধনীকন্যা আর শিক্ষিতা আর চাকরিবতীই নন, রীতিমতো সুশ্রী। আপনার তো পাত্রর জন্য হা-পিত্যেশ করার কথাই নয়।'

'কী যেন একটা শব্দ বললেন? চাকরিবতী না কি যেন?'

'ঠিকই শুনেছেন, আমার বাংলা খুব খারাপ, ভুলভাল বলে ফেলি। আপনি খুব হাসছেন? তার মানে একটা বোকার মতো ভুল কথা বলেছি বোধহয়?

'ভুল কিনা জানি না, তবে কথাটা নতুন। চাকরিবতী শব্দটা আমি আর কোথাও শুনিনি।'

'আমিও শুনিনি, বোধহয় চাকরিরতা বললে ঠিক হত, তাই না?'

'আপনার কি ধারণা আমি আপনার চেয়ে ভালো বাংলা জানি? আমি স্যাটিস্টিক্সের ছাত্রী, বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। চাকরিবতী কথাটা কিন্তু খারাপ নয়, চলতে পারে।'

'হ্যাঁ, কী যেন প্রসঙ্গটা হচ্ছিল?'

'পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুজে গিয়ে বসা নিয়ে। সত্যি কথা হল আমি ওটা ইচ্ছে করেই করতাম।'

'নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে?'

'অবশ্যই। যেসব পাত্রপক্ষ আসছে তাদের মোটিভ, অ্যাটিটিউড, চরিত্র, কথাবার্তা সব কিছু স্টাডি করাই ছিল আমার উদ্দেশ্যা আর গোটা ঘটনাটা গোপনে ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখা হত। আমি মোট চারটি পাত্রপক্ষকে মিট করি। আপনি ছাড়া বাকি তিনজনই আমাকে সিলেক্ট করেছিল। এবং বিয়ের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।'

'কিন্তু এই যে একটু আগেই আপনি বলছিলেন যে, আপনি পাশ করতে পারেননি।'

'সোজা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমি তাদের মনোনয়ন পেলেও তারা আমার মনোনয়ন পায়নি। আর পছন্দ করতে না পারাটাও তো এক ধরনের ফেলিওর!'

'তাই বলুন। আসলে আমাদের কেসটা একটু অন্যরকম। আপনার একটা কথায় আমার কাকা অপমানিত বোধ করায় বিয়েটা নাকচ করে দেন। প্রথম পাত্রী দেখতে গিয়ে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম বলে সব কথাবার্তা ভালো করে শুনিনি। পরে কাকা বলেছিলেন, আপনি নাকি ওঁর একটা ইংরিজি কথার ভুল ধরেছিলেন।'

'বাঙালিরা প্রচুর ভুল ইংরিজি বলে, তবু ইংরিজি তাদের বলাই চাই। এ ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয় বলে, আর বিয়েটা যাতে নাকচ হয়ে যায় তার জন্যও ওই কাণ্ডটা করেছিলাম।'

'আমার কাকা সম্পর্কে আপনি দয়া করে খারাপ ভাববেন না। উনি ভুল ইংরিজি বলতেই পারেন। আরও দু'-চারটে ছোটখাটো নেগলিজিবল দোষ ওঁর আছে বটে, কিন্তু হি ইজ এ জেম অফ এ ম্যান।'

'কাকার কথা এখন থাক, তাঁকে নিয়ে ভাবতে আমি যাবই বা কেন? আমি সে দিনের ঘটনার জন্য আপনাকে ডেকে আনিনি। বলতে কি, আমি ওসব কথা ভুলেই গেছি।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম, ক্যারি অন। এঃ, আমিও ভুল করে একটু ইংরেজি বলে ফেললাম।'

'মাপ করে দিলাম। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, সেদিন আপনার সঙ্গে আপনার এক বউদিও আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন?'

'তা থাকবে না কেন? আমার একটাই দাদা। আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। আগে আমরা একসঙ্গেই থাকতাম। কয়েক বছর হল দাদা ফ্ল্যাট কিনে আলাদা থাকে। তবে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক।'

'আমি সেটা জানি। আপনার বোধহয় মনে আছে যে, আপনার বউদি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিয়ে অন্দরমহলেও গিয়েছিলেন?'

'মনে আছে। বউদি খুব বলিয়ে কইয়ে মহিলা। তবে পেটে কথা রাখতে পারেন না।'

'হ্যাঁ, সেদিন আপনাদের তিনজনের মধ্যে ওঁকেই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল।'

'কিছু মনে করবেন না, আমার বউদি খুব সরল মহিলা। মানে যাঁকে এখনকার বিচারে একটু বোকা বলা হয়। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি, সেদিন বউদি কি আপনার কাছে আমার সম্পর্ক কোনও গোপন কথা বলে গেছেন? আপনার হাসিটা কিন্তু মারাত্মক। হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয়।'

'আপনার কি গোপন করার মতো কিছু আছে?'

'তা আর নেই? আমরা তো দোষে-গুণে মানুষ। গোপন করার কত কী আছে।'

'হ্যাঁ, আপনার বউদি আপনার প্রশংসা করতে গিয়ে সেদিন আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন।'

'এই রে? বউদির তো মাত্রাজ্ঞান নেই। তিলকে তাল করে ফেলেন।'

'আপনার বউদির কাছেই শুনেছি যে, আপনি একজন হ্যাকার। সত্যি নাকি?'

'সর্বনাশ! একথা কি বউদি আপনাকে বলেছেন?'

'ভুল কিছু বলেছেন কি?'

'তা নয়। কিন্তু বউদি কম্পিউটার বিষয়ে কিছুই জানেন না। উনি যদি বলে থাকেন তাহলে উড়ো কথা শুনে বলেছেন।'

'তাহলে কি ধরে নেবো যে, আপনি হ্যাকার নন?'

'মুশকিলে ফেললেন। আমি বিদ্যেটা শিখেছিলাম। ভালোবেসেই শিখেছিলাম। এথিক্যাল হ্যাকিং দোষেরও নয়—'

'আমি আপনার মরালিটি নিয়ে প্রশ্ন করছি না। শুধু জানতে চাইছি।'

'জেনে কি হবে?'

'আপনি এর জন্য একবার বোধহয় খুব বিপদেও পড়েছিলেন?'

'এসব কথা বউদি আপনাকে বলে খুব খারাপ করেছেন।'

'ঘটনাটা কি? আপনাকে একদল লোক গান পয়েন্টে অ্যাটাক করে নিয়ে গিয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কি হয়েছিল?'

'খুব বিপদ হয়েছিল ম্যাডাম। আমরা তো জন্মগতভাবেই কাপুরুষ। বন্দুক পিস্তল দেখা অভ্যেস নেই। আর ওরা প্রফেশনাল ক্রিমিনাল।'

'আপনি যদি আর ডিটেলসে বলতে না চান তাহলে বলার দরকার নেই।'

'ম্যাডাম, আমার লুকোবারও কিছু নেই। তবে পুলিশকে জানালে কিছু ঝামেলা হতে পারে।'

'আমাকে বিশ্বাস কি! আমি তো আপনার কোনও চেনা ঘনিষ্ঠ মানুষও নই। তবু যে জানতে চাইলাম তার একটা কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'শুনলে হাসবেন।'

'সিরিয়াস কথাবার্তার মধ্যে একটু হাসি আমদানি করা গেলে তো ভালোই হয়। আর আপনি মাঝে মাঝে একটু-আধটু হাসেন বটে, কিন্তু বেসিক্যালি গোমড়ামুখো এবং সিরিয়াস টাইপ, তাই না?'

'আপনি বোধহয় গোমড়ামুখো মানুষ পছন্দ করেন না, না?'

'না। গোমড়ামুখোদের আমি ভয় পাই।'

'কি, আমাকে ভয় পাচ্ছেন বলে তো মনে হচ্ছে না?'

'পাচ্ছি ম্যাডাম, খুব পাচ্ছি। তবে মানুষ তো নিজের ভাব গোপন রাখার কুটকৌশল নিয়েই জন্মায়।'

'বাজে কথা। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আর আমি মোটেই গোমড়ামুখো নই।'

'নন? বাঁচা গেল।'

'ঘটনাটা বোধহয় আর বলতে চান না, তাই না?'

'শুনবেন?'

'আমাকে বিশ্বাস করলে বলুন, শুনি।'

'পেশাদার অপরাধীরা কেমন হয় আমার জানা ছিল না। ওরা বাইপাসে আমার গাড়ি আটকায়। তারপর আমার চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। আমার অনুমান, খিদিরপুর অঞ্চলের কোথাও। ওরা একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা সরানোর প্ল্যান করেছিল। আমি রাজি না হওয়াতে তাদের হাতে প্যাঁদানি খেতে হল। আমি এমনিতেই বীরপুরুষ নই, তার ওপর মারধর খাওয়ার অভ্যাসও ছিল না। তবু ফুটবল খেলতাম বলে বডি ফিটনেসটাই যা ছিল। ওদের হাবভাব দেখে বুঝলাম প্রাণে বাঁচাতে হলে এদের কথা না শুনে উপায় নেই। অগত্যা কাজটা করে ছিলাম। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ট্র্যানজ্যাকশন। ওরা ফের আমার চোখ বেঁধে বাইপাসে আমার গাড়ির কাছে এনে আমাকে ছেড়ে দেয়।'

'ওরা আপনাকে কোনও পারিশ্রমিক বা বখরা দেয়নি?'

'আশ্চর্য? এটা তো নিশ্চয়ই বউদি আপনাকে বলেনি। কারণ বউদি এটা জানে না।'

'আমি অনুমান করছি।'

'ইয়েস, ম্যাডাম, ওরা আমাকে একটা ব্যাগে ভরে বিশ লাখ টাকা কমিশন দিয়ে গিয়েছিল। পাপের টাকা ম্যাডাম, এর পরিণাম হয়তো ভালো হবে না।'

'সেই টাকাটা দিয়ে কী করলেন?'

'কী আর করব। অতগুলো বেহিসেবি টাকা তাই খরচ করে ফেললাম।'

'কি ভাবে?'

'খরচের কি মা-বাপ আছে ম্যাডাম?

'কতভাবেই তো খরচ করা যায়।'

'ওটা জানতে চাইছেন কেন?'

'নিছক কৌতূহল।'

'ছেড়ে দিন ম্যাডাম, ও পাপের টাকা।'

'ফকিরা বিবি নামে কাউকে চেনেন? মধ্যবয়সী রোগাভোগা এই ভিখিরি তার বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সি আই টির ফুটপাথে থাকত। আর বিষ্ণু নস্কর নামে একজন অন্ধ মানুষ, যার বাস ছিল সোনারপুর স্টেশনের প্লাটফর্মে? মনে পড়ছে?'

'বাপ রে! এ যে অলৌকিক ব্যাপার?' আপনি এদের কথা জানলেন কি করে?'

'আজাদগড় কলোনিতে আপনি সস্তায় একটা বাড়ি কিনে এই দুটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠিক তো? ফকিরা বিবির ছেলে এখন স্কুলে যায় বিষ্ণু আর তার বউ এখন ধূপকাঠি বিক্রি করে। ঠিক বলছি?'

'আমাকে আপনি ভারী চমকে দিয়েছেন ম্যাডাম! এসব তো আমার বাড়ির লোকেও জানে না।'

'আমার বাবা জানতে চেয়েছেন, আপনার এরকম আর কোনও ক্ষ্যাপাটে প্রোগ্রাম আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তিনি আপনাকে খুব খুশি হয়ে মদত দেবেন।'

'ম্যাডাম, শুনুন, আমি তেমন ভালো লোক নই। ওই অ্যান্টিসোশ্যালদের টাকা পেয়ে আমি সেটা দিয়েই একটু পরোপকার করেছি। এতে কোনও মহত্ব নেই ম্যাডাম।'

'আচ্ছা, আমি কি আর কিছু শুনতে চেয়েছি?'

'না, আপনি হয়তো ভুল একটা ধরাণা করে নিয়েছেন?'

'ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে চান তো?'

'হ্যাঁ, চাই। ভীষণভাবে চাই?'

'তাহলে মাঝে মাঝে আমাদের মিট করা দরকার। বুঝলেন।'

'হ্যাঁ, এটা একটা ভালো প্রস্তাব।'

'সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন? কখনও কফি শপে, কখনও অন্য কোথাও।'

'ডান, সরি, ইংরিজি বলে ফেললাম।'

'মাপ করে দিলাম।'

সেয়ানে সেয়ানে

আপনি কে বলুন তো!

চিনতে পারলেন না? আমি বিশ্বেস।

বিশ্বেস, বিশ্বেসটা আবার কে?

আজ্ঞে, আমি বিশ্বেশ্বর বিশ্বেস। এবার চেনা ঠেকছে?

না তো! আমি বিশ্বেশ্বর বিশ্বেস বলে কাউকে চিনি না।

বড্ড মুশকিলে ফেললেন! এখন কী দিয়ে যে চেনাই? বেশিদিনের তো কথা নয়, মাত্র বছর তিনেক আগে আমার মেয়ে পটলক্ষ্মীর বিয়ে হল, মনে পড়ে?

আপনার মেয়ের বিয়ে হল তাতে আমার কী বলুন তো?

সে তো বটেই। তবে কিনা আমার মেয়ের বিয়েটার কথা আপনার মনে থাকতেও পারে বলছিলাম আর কি। কারণ মেয়ের বিয়ের জন্য আপনার কাছে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলুম কিনা।

অ্যাঁ। বলেন কী? দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন? তা এতক্ষণে সেটা বলতে হয়। কই, বের করুন তো দশ হাজার টাকা।

আহা, অত উতলা হবেন না, আপনার দশ হাজার বহাল-তবিয়তে আছে। কিন্তু আমাকে আপনার মনে পড়ছে না কেন বলুন তো? মনে না পড়লে আমাকে ধরে নিতে হবে যে আমি ভুল লোকের কাছে এসেছি।

আরে না, না, ভুল লোকের কাছে আসবেন কেন? ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন। আমিই সেই লোক, যার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে আপনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, টাকাটা শোধ দিতে চান তো? তা শুভস্য শীঘ্রম, দিয়ে ফেলুন।

হবে হবে, সবুরে মেওয়া ফলে। বুঝলেন কি না। টাকাটাও তো বড়ো কথা নয়। দশ-দশটি হাজার। চাট্টিখানি কথা? তা আপনার বেশ স্পষ্ট করে মনে পড়েছে কি?

তা আর পড়বে না! কী যে বলেন।

তাহলে আপনি মন্মথবাবুই তো। মন্মথ কানুনগো।

তা আর বলতে! আপনার কি ধারণা আমার নিজের পৈতৃক নামটাও আমার মনে পড়বে না? আমিই হলুম মন্মথ কানুনগো।

আর ঠিকানা হল সাতাত্তরের বি সতু দত্ত লেন।

হেঁ হেঁ আপনি তো সবই মনে রেখেছেন দেখছি।

যে আজ্ঞে। আমার ওই একটা দোষ। সব মনে থাকে।

তবে আর সময় নষ্ট করে কী লাভ? টাকাটা শোধ দিয়ে যে করে ঋণমুক্ত হয়ে গেলেই তো হয়।

কিন্তু প্রমথবাবু টাকা শোধ দেওয়ার আগে একটা কথা বলে নিই। আপনি তো বেশ ভুলো মনের মানুষ, টাকাটা যে শোধ হল সেটা আবার ভুলে যাবেন না তো?

পাগল। ওসব কি আর ভোলার জিনিস? বিশ্বেশ্বরবাবু?

তাহলে আপনি সত্যিই বাহাত্তরের সি সুবল দত্ত লেনের প্রমথ হালদার? ঠিক কি না?

খুব ঠিক, কোনো ভুল নেই। এবার টাকাটা বের করলেই তো হয়।

টাকা? কীসের টাকা মশাই?

কেন, সেই যে মেয়ের বিয়ের বাবদ দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন?

মেয়ের বিয়ে? হাসালেন মশাই, আমার মেয়ে কোথায়? আমার তো তিন ছেলে। মেয়ে নেই বলে আমার ভারি দুঃখ।

কেন, ওই যে বললেন, আপনার মেয়ে পটলক্ষ্মীর বিয়ের জন্য দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন! এর মধ্যেই ভুলে গেলেন বিশ্বেশ্বরবাবু?

বিশ্বেশ্বর? কে বিশ্বেশ্বর মশাই? আমি তো পটল প্রমাণিক।

এঃ, আপনি তো বেশ সেয়ানা লোক দেখছি!

যে আজ্ঞে, তা কোলাকুলিটা হয়ে যাবে নাকি? হয়ে যাক।

পার্ট টাইমার

স্ত্রীর প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সর্বদাই অস্বস্তিকর। এটা বিশ্বজনীনভাবেই স্বীকৃত। তবে বলতে হবে, রাহুল মানুষটি অতিশয় ভদ্র এবং একটু ভিতু আর নরম প্রকৃতির। দেখা হওয়ার পরই আমি বুঝতে পারি, আমার চেয়ে রাহুলই বরং একটু বেশি নার্ভাস।

দেখাটা হল কোথায়?

একটা ককটেল পার্টিতে। কলকাতায় কিছু বনেদি পুরোনো ক্লাব আছে জানেন তো! সেগুলোর মেম্বারশিপ পাওয়া খুব কঠিন। আমাদের এক বন্ধু সেইরকম একটা ক্লাবে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে মেম্বারশিপ পেয়ে যায়। সেই আনন্দেই সে ককটেল পার্টি থ্রো করেছিল।

এসব পার্টিতে খরচ কত হয় বলুন তো!

আমি জানি আপনি এসব পার্টিবাজি পছন্দ করেন না। খরচের কথা শুনলে আরও বিরক্ত হবেন। কিন্তু মানুষের নানারকম জীবনযাপন আছে। এইসব পার্টিতে লক্ষাধিক টাকা খরচ হওয়াটা অনেকের কাছে তেমন কোনো ব্যাপারই নয়।

এই বিপুল অপচয়কে কি আপনি সমর্থন করেন?

একসময়ে করতাম না। তবে দেখেছি, আমাদের মতো মার্চেন্ট বা কর্পোরেট কর্তাদের কাছে এইসব পার্টি যোগাযোগের অনেক সুযোগ তৈরি করে দেয়। আপনি কতটা মদ বা ক্যালোরি গ্রহণ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু পার্টিতে যাওয়াটা অনেকের জীবিকার পক্ষে একটা মাস্ট। আমার তো বিভিন্ন পার্টিতেই বিস্তর কন্ট্র্যাক্ট হয়েছে।

বুঝলাম, আপনার কাছে জীবন মানেই হল শুধু জীবিকা।

যে আজ্ঞে, আসলে জীবিকাটা এত ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে, জীবনকে আর আলাদা ভাবে তেমন টের পাই না। তার দরকারই-বা কী বলুন!

আপনি রাহুলের বিষয়ে কিছু বলছিলেন।

হ্যাঁ, রাহুল একজন বেশ মানুষ। বয়স, এই ধরুন, পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ। তেমন ম্যাচো চেহারা নয়। কিন্তু মুখখানা ভারী কমনীয়। ঠিক যেন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের মানুষ নয়। ওপর-চালাক, চটপটে, স্ট্রিট স্মার্ট যাকে বলে, তাও নয়। শুনেছিলাম সে একটু ভাবুক প্রকৃতির। তবে সে একজন বাঘা বড়লোকের ছেলে। বাপের একাধিক কারখানা। একটা গুরগাঁও, আর-একটা হরিয়ানায়।

আপনার কাছে মানুষের পরিচয় কি শুধু তার পিছনে কত সম্পদ রয়েছে সেটা?

তাছাড়া মানুষের আর কোন পরিচয় আছে বলুন।

যাকগে, যা বলছিলেন সেটা কন্টিনিউ করুন।

হ্যাঁ, এই রাহুল সম্পর্কেই বলছিলাম আর কী। আমার স্ত্রীর ফার্স্ট হাজব্যান্ড।

আপনি পরস্ত্রীকে বিয়ে করেছেন তো!

কী যে বলেন স্যার! তিনি পরস্ত্রী হবেন কোন দুঃখে? আমি যখন তাকে বিয়ে করি তখন তিনি একলাই ছিলেন। মানে ডিভোর্সি।

আপনি কি তার প্রেমে পড়ে বিয়েটা ভেঙেছিলেন?

না স্যার। ব্যাপারটা ওরকম নয়। বছর তিনেক আগে আমি বিজনেসের ব্যাপারে দুর্গাপুর গিয়েছিলাম একবার। ফেরার সময়ে রাত হয়ে যায়। শীতকাল। বর্ধমান ছাড়িয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকবার মুখেই আমি দেখি একটা বেশ বড় বিএমডব্লিউ গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ভদ্রমহিলা গাড়ির পাশেই দাঁড়ানো, ড্রাইভার বনেট খুলে টর্চ জ্বেলে কী সব খুটখাট করছে। মনে হয়েছিল, ভদ্রমহিলা বেশ সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী।

বিএমডব্লিউ গাড়ি কি আপনি দেখলেই চিনতে পারেন?

পারি স্যার। গাড়িই আমার হবি কিনা।

বুঝেছি, বলুন।

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, এনি প্রবলেম? উনি বিষণ্ণ মুখে বললেন, হ্যাঁ, ভীষণ প্রবলেম। গাড়ি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুবই ব্যাপক। বুঝলাম, গাড়ি ক্রেন করে কোনো ভালো সারাইয়ের গ্যারাজে নিতে হবে। যাই হোক, টু কাট এ লং স্টোরি পার্ট, ওই গাড়ি থেকেই আমাদের আলাপ। আমি ভদ্রমহিলাকে লিফট দিলাম, তার গাড়ি গ্যারাজে পাঠানোর বন্দোবস্তও করেছিলাম। সেই আলাপ।

প্রথম দর্শনেই প্রেম?

না স্যার। আমি মার্চেন্ট, প্রথম দর্শনের প্রেমে বিশ্বাসী নই। মহিলাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল বটে, তবে তা কতটা মেকআপ আর বিউটিফিকেশনের গুণে তা কে জানে! তাই আমি দিন চারেক বাদে হঠাৎ একদিন সকাল ন'টায় ভদ্রমহিলার আয়রনসাইড রোডের ফ্ল্যাটে হানা দিই। ওই সময়ে মেয়েদের শরীরে মেক-আপ থাকার কথা নয়। ছিলও না।

কী দেখলেন?

ভদ্রমহিলা নিজেই দরজা খুলে আমাকে দেখে হাঁ। মানে লিটারেলি হাঁ। আমি ওই অপ্রস্তুত অবস্থায় ওঁকে দেখে বুঝলাম, সেদিন রাতের মতো অতটা না হলেও রিচা সুন্দরীই। বেশ ট্রিম, স্মার্ট, অভিজ্ঞ।

এবার প্রেমে পড়লেন তো!

না স্যার। আমার কাছে প্রেমও একটা হিসেবনিকেশ। একে দিয়ে আমার কাজ কতটা হবে, ব্যবসার সুবিধে হবে কিনা, কন্টাক্ট বাড়বে কিনা, সোশ্যাল ল্যাডার পাওয়া যাবে কিনা, এসবও মাথায় রাখতে হয়। বউ তো শুধু বউ নয়, একটা ইনভেস্টমেন্টও বটে।

ওহ, হ্যাঁ, তাই তো!

ফলে পরিচয়টা একটু একটু করে প্রসারিত করতে হল। প্রায় মাস ছ'য়েক পরে আমার মনে হল, রিচা ইজ কোয়াইট স্যুটেবল। ওর বাবা একজন টাইকুন, ও নিজেও একজন আইটি প্রফেশনাল। নিজের অফিস আছে, ফ্ল্যাট আছে, দুটো গাড়ি।

বিয়ে হয়ে গেল?

যে আজ্ঞে। আমরা সুইজারল্যান্ডে হানিমুন করেছিলাম।

মাই গড। তারপর? হ্যাপি ম্যারেড লাইফ?

কী যে বলেন স্যার! আমাদের হ্যাপি ম্যারেড লাইফ বলে কিছু নেই। উনি ওঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমি আমার কাজ নিয়ে। দেখাটেখা হয়, হাই-হ্যালো হয়, একটু-আধটু সেক্সও হয়।

নো প্রেম?

স্যার, প্রেমের কনসেপশনটাও তো নানা রকমের। তবে মেঘদূত বা রোমিও জুলিয়েট তো আর হয় না স্যার। তবে এও একরকম প্রেম।

রাহুল থেকে আমরা সরে এসেছি অনেক দূর।

না স্যার, এটা তো রাহুলেরই গল্প।

তা সেটাই শুনি।

সেই পার্টিটার কথা স্যার। আমি সাধারণত মদ-টদ খাই না। পার্টিতে গেলে একটা হুইস্কি বা বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

আপনি মদ খান না?

না স্যার। তবে আমার স্ত্রী খান। আর আমি অভিনয় করি।

আপনি খান না কেন?

বুদ্ধিমান বলে। মদ খেয়ে টিপসি হয়ে গেলে আমার চলে না স্যার। সোবার থাকাটা আমার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। তাই আমি গ্লাস মুখে তুলি লোক-দেখানোর জন্য। খাই না।

হুঁ, আপনি সত্যিই চতুর।

যে আজ্ঞে, আমার স্ত্রীই সেদিন হঠাৎ আমার কাছে এসে আমার বাঁ-হাতটা খামচে ধরে বললেন, উড ইউ ফিল জেলাস? ওই যে গ্রে রঙের স্যুট পরা, ফর্সা, হ্যান্ডসাম লোকটাকে দেখছ, ও হল রাহুল মজুমদার। মাই ফার্স্ট হাজব্যান্ড। আলাপ করবে?

রাজি হলেন?

একটু দোনোমোনো হচ্ছিল। তবে স্পোর্টিংলিই বললাম, হোয়াই নট? তারপর রিচা আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে রাহুলের সামনে হাজির করে বলল, হাই রাহুল ডার্লিং, মিট মাই হ্যাজব্যান্ড মনোময়। তখন অবশ্য রিচা দু'তিন পেগ খেয়ে ফেলেছে, একটু হাই ছিল। রাহুল দেখলাম বেশ ভদ্র, সংযত। একটু লজ্জার হাসি হাসল, নমস্কার করল, হাতও ধরল। আমার বেশ ভালোই লাগল ওকে।

একটু জেলাস ফিল করলেন কি?

সেটাই অবাক কাণ্ড স্যার, আমি একটুও জেলাস ফিল করলাম না। শুধু তাই নয়, রিচা হঠাৎ যখন আমাকে ছেড়ে রাহুলের কাঁধে হাত রেখে খুব হেসে হেসে আগড়ম বাগড়ম বকছিল, তখনও আমার কান গরম হয়নি, বুকে কোনও জ্বলুনিও নয়।

হওয়ার কথাও তো নয়। আপনাদের তো প্রেমই হয়নি।

না স্যার, প্রেম হয়নি বলবেন না। প্রেমের নানারকম প্রকারভেদ আছে। শুনেছি আজকাল নাকি কয়েক ঘণ্টার জন্যও প্রেম হয়। একটা ছেলে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল, হুড়ুম দুড়ুম ভালোবাসাবাসি হল, ঘণ্টা চার-পাঁচ পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যে যার মতো চলে গেল।

এটা অভিনব। আমি সত্যিই চার-পাঁচ ঘণ্টার প্রেমের কথা শুনিনি।

জীবনটা এতই ক্ষণস্থায়ী স্যার, যে, প্রেমের জন্য খুব বেশি সময় খরচ করার উপায় নেই।

দুনিয়াটা কি সেই কারণেই উচ্ছন্নে যাচ্ছে?

দুনিয়াটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে কিনা সেটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। অনেকের ধারণা, দুনিয়াটা ঠিকঠাক অভিমুখেই যাচ্ছে, যারা এই প্রগতি পছন্দ করছে না তারা পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের সেই বির্তকে যাওয়াটার কি খুব দরকার আছে স্যার?

না, তা নেই, আপনি বরং আপনার চটজলদি প্রেমের কথাটাই শেষ করুন। আমার অভিজ্ঞতা একটু বাড়ুক।

না স্যার, আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ, ও কথা বলবেন না।

জ্ঞানী? দূর, নিজেকে আজকাল আমার আস্ত একটা আহাম্মক বলে মনে হয়।

কী যে বলেন স্যার, আপনার কাছে আমার কত কিছু শেখার আছে। যাকগে, যা বলছিলাম, কথাটা হচ্ছে রাহুলকে নিয়ে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাহুল।

বিশ্বাস করবেন না স্যার, রাহুলকে পেয়ে আমার বউকে অনেকদিন বাদে আমি ভারী আহ্লাদিত হতে দেখলাম। আমাকে একরকম ভুলে গিয়ে সে রাহুলের সঙ্গে খুব ঢলাঢলি করছিল। বারবার জড়িয়ে ধরা, অন্তহীন কথা কওয়া, অর্থহীন হাসি, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকা, এমনকী ফুলদানির আড়ালে তাদের আমি পরস্পরকে প্যাশনেটলি চুমু খেতেও দেখে ফেললাম।

মাই গড!

হ্যাঁ স্যার। কিন্তু কেন যেন স্যার আমার একটুও জ্বালাপোড়া হল না। কোনো জেলাসি ফিল করলাম না।

সে কী মশাই?

খাজুরাহো দেখলে কি জেলাসি ফিল করে কেউ? আমার যেন ওই খাজুরাহো দেখার মতোই আনন্দ হল। ফেরার সময় গাড়িতে বসে রিচাকে বললাম, তুমি কি এখনও রাহুলকে একটু-আধটু ভালোবাসো? রিচা কী বলল জানেন? বলল, আই নেভার সিজড টু লাভ রাহুল। আমি বরাবর তো ওকেই ভালোবাসি। আমি বললাম, তাহলে তুমি বরং ফের রাহুলকেই বিয়ে করো। রিচা খুব হেসে বলল, তোমার অত ত্যাগ তিতিক্ষার দরকার নেই। আমরা তো সবাই পার্টটাইমার। রাহুলকে খানিকটা করে পেলেই আমার চলে যাবে।

আপনি ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন?

আপনি কি পার্টটাইমার কথাটা লক্ষ করলেন? এ কথাটার মধ্যে কি ফিলজফি লুকিয়ে নেই?

তা থাকতে পারে। তবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো এটাকে ব্যাভিচার বলে মনে হচ্ছে।

ঠিক তাই স্যার। ব্যাভিচারকে সদর্থে দেখুন, আমার দেহ, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আমি যা খুশি করব, যাকে খুশি দেব, তাতে কার কী? তাই মানুষের সভ্যতার নতুন স্লোগান তৈরি হচ্ছে, ব্যাভিচার জিন্দাবাদ।

নীলা আর অনিলা

একদিন নীলা চলে গেল।

একদিন না একদিন চলে যাওয়ার কথাই ছিল নীলার। তাই না-যাওয়া এবং যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাত হল না। সুবোধ নিজেই গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে নীলাকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায়-মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর যেমন কথা হয় তেমন কিছুই হল না। রুমাল উড়ল না, চোখের জল পড়ল না, এমনকী গাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন জানালায় নীলার উৎসুক মুখও দেখা গেল না।

নীলা গেল তার বাপের বাড়ি মধুপুরে। সেখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে তার কিছুই জানল না সুবোধ, শুধু জানল, নীলার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই; অনেকদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরকমটাই হবে। খুব শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খুব যে খারাপ লাগল সুবোধের—তা নয়। ভালোও লাগল না অবশ্য। তার সম্মানের পক্ষে, পৌরুষের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়। কত লোকের কত জিজ্ঞাসাই যে এখন তার ঘরে উঁকি মারবে তা ভাবতেও ভয় লাগা উচিত। তবু সব ভেবেও সুবোধের মন শান্তই রইল। খুবই শান্ত। বাসে জানালার ধারের বসবার জায়গায় গঙ্গার সুন্দর হাওয়া এসে লাগছিল। এখন বসন্তকাল। কলকাতায় চোরা-গরম শুরু হয়ে গিয়েছে। বাতাসটুকু বড় ভালো লাগল সুবোধের। লোহার প্রকাণ্ড জালের মধ্যে দিয়ে সে উৎসুক চোখে গঙ্গার ঘোলা রূপ, নৌকো, জাহাজের মাস্তুল আর কলকাতার প্রকৃতিশূন্য আকাশরেখায় প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর জ্যামিতিক শীর্ষগুলি দেখল। মনোযোগ দিয়ে দেখল, দেখায় কোনও অন্যমনস্কতা এল না। ভালোই লাগল তার। এমন অলসভাবে আয়েসের সঙ্গে অনেককাল কিছু দেখেনি সে। বিয়ের পর থেকেই তার মন ব্যস্ত ছিল, গত দশ বছর ধরে সেই ব্যস্ততা, সেই উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতা নিয়েই সে সবকিছু দেখেছে। আজ দশ বছর পর সেই ব্যস্ততা হঠাৎ কেটে গেছে। বড় স্বাভাবিক লাগে সবকিছু। বহুকালের চেনা পুরনো কলকাতার হারনো চেহারাটা হঠাৎ তার চোখে আবার ফিরে এসেছে আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চলল বাস। ট্রাফিকের লাল বাতি, মন্থরগতি ট্রাম, রাস্তা পেরনো মানুষের বাধা। সময় লাগল, কিন্তু অস্থির হল না সুবোধ। কোনওখানে পৌঁছনোর কোনও তাড়া নেই বলে জানলার বাইরে তাকিয়ে ঘিঞ্জি ফুটপাথ, দোকানের সাইনবোর্ড, দোতলা বাড়ির জানলায় কোনও দৃশ্য—কত কী দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধের মুখে ঘরে এসে তালা খুলল সে। বাতি জ্বালল, জামাকাপড় ছাড়ল, হাতমুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, তারপর একখান চেয়ার টেনে জানালার পাশে বসে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে দেখার কিছু নেই। ঢাকুরিয়া বড় ম্যাড়মেড়ে জায়গা। প্রায় আট বছরের টানা বসবাসে এ জায়গায় সব রহস্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চেনাশুনোও বেড়েছে অনেক। এবার জায়গাটা ছাড়া দরকার। দু'এক মাসের মধ্যেই। যতদিন নীলার বাপের বাড়ির থাকাটা লোকের চোখে স্বাভাবিক দেখায় ততদিনই নিরুদ্বেগে থাকতে পারে সুবোধ। তারপর অচেনা একটা পাড়ায় তাকে উঠে যেতে হবে।

ঘরের দিকে চেয়ে দেখল সুবোধ। জিনিসপত্র বেশি কিছু নিয়ে যায়নি নীলা, কেবল তার নিজস্ব জিনিসগুলি ছাড়া। এই ঘরটা যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। কেবল আলনায় নীলার শাড়িগুলোর রঙের বাহার দেখা যাচ্ছে না, আয়নার টেবিলে রূপটানের শিশি-কৌটোগুলিও নেই। তাই তফাতটা খুব চোখে পড়ে না। যেমন নীলার থাকা এবং না-থাকার মধ্যে নিজের মনের তফাতটাও সে ধরতে পারছে না।

না, ব্যাপারটা মোটেই ভালো হল না। গভীরভাবে ভাবলে এর মধ্যে লজ্জার-ঘেন্নার অনেক কিছু খুঁটিনাটি তার লক্ষে পড়বে। মন-খারাপ হওয়ার মতো অনেক স্মৃতি। তবু কি এক রহস্যময় কারণে মনটা হাল্কাই লাগছিল সুবোধের। জানলার কাছে বসে রইল, সিগারেট খেল। নীলা থাকলে এখানে বসেই এক কাপ চা পাওয়া যেত। সেটাই কেবল হচ্ছে না। মাত্র এক কাপ চায়ের তফাত। তবে চা করার একটা লোক রাখলেই তো তফাতটুকু বুজে যায়। ভেবে একটু হাসল সুবোধ। হাতঘড়িতে প্রায় আটটা বাজল। তাদের রান্নার লোক নেই, নীলাই রাঁধত। সুবোধ ভেবেছিল হোটেলে খেয়ে আসবে। তারপর ভাবল, হোটেলে খেতে গেলে তফাতটুকু আরও বেশি মনে পড়বে। তাই সে ঠিক করল রান্নার চেষ্টা করলেই হয়।

রান্নাঘরে একটা প্রেশার কুকার ছিল। কেরোসিনের স্টোভে সেইটেতে ভাতে-ভাত রান্না করে খেল সুবোধ। দেখল এই সামান্য রান্নাটুকুতেই সমস্ত রান্নাঘরটা সে ওলটপালট করে দিয়েছে। আবার সেই তফাত। সুবোধ আপনমনে হাসল। তারপর বিছানা ঝাড়ল, মশারি টাঙাল, বাতি নেভাল—এই সব কাজই ছিল নীলার। শুয়ে শুয়ে সে অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে সিগারেট খেল সবাধানে। ঘুম এল না। নীলা মাঝরাতে পৌঁছবে আসানসোলে। সেখানে ওর জামাইবাবুকে খবর দেওয়া আছে, ওকে নামিয়ে নেবে। কয়েকদিন পরে যাবে মধুপুরে। নীলার এখন বোধ হয় সুখের সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে খুব। এখন এই রাত এগোরোটায় নীলা কোথায়! কী করছে নীলা! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কাল থেকে তার ঝরঝরে একার জীবন শুরু হবে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়স, এখনও নতুন করে সব কিছুই শুরু করা যায়। সময় আছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে তার মনে পড়ল সারারাত সে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন দেখেছে। অধিকাংশ স্বপ্নেই নীলা ছিল। একটা স্বপ্নে সে দেখল—সে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসে দেখছে ঘরের দরজা ভিতরে থেকে বন্ধ। সে দরজার কড়া না নেড়ে দরজার গায়ে কান পাতল। ভিতরে নীলা আর একটা পুরুষ কথা বলছে। মৃদু স্বরে কথা, সে ভালো বুঝতে পারছে না, প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করল সে। বুঝল কথাবার্তার ধরন খুবই অন্তরঙ্গ। ভয়ংকর রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সুবোধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার হাত এত দুর্বল লাগছিল যে মোটেই শব্দ হল না। ভিতরে কথাবার্তা তেমনই চলতে লাগল। সে চিৎকার করে নীলাকে ডাকল—দরজা খোলো। বলতে গিয়ে সে টের পেল, সে মোটেই চিৎকার করতে পারছে না। 'দরজা খোলো' বলতে গিয়ে সে ফিস ফিস করে বলছে 'জোরে কথা বলো।'। এরকম বারবার হতে লাগল। এত হতাশ লাগল তার

যে ইচ্ছে করছিল দরজার সামনেই সে আত্মহত্যা করে। ভাবতে ভাবতে সে একই সঙ্গে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশেষে দরজায় মৃদু শব্দ হল, থেমে গেল ভিতরের অন্তরঙ্গ কথা, তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বিশাল শরীরওলা একজন পুরুষ দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। চমকে উঠল সুবোধ। চেনা লোক—মনোমোহন। তার অনেকদিন আগেরকার বন্ধু। হায় ঈশ্বর! মনোমোহন কোথা থেকে, কী করে যে এল! রাগে দুঃখে ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠে মনোমোহনের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু পারল না। পা আটকে যাচ্ছিল, যেন এক হাঁটু জল ভেঙে সে দৌড়বার চেষ্টা করছে। মনোমোহন দু'তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পিছু ফিরে দেখল, নীলা অসম্বৃত শাড়ি পরে দরজায় দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ মুখে তার খোলা চুলের ভিতরে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াচ্ছে। কাকে যে আক্রমণ করবে সুবোধ, তা সে নিজে বুঝতে পারছিল না। রাগ দুঃখ ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা আনন্দকেও সে টের পাচ্ছিল। পাওয়া গিয়েছে, নীলাকে এতদিনে সুবিধে মতো পাওয়া গিয়েছে। এইরকম স্বপ্ন আরও দেখেছে সে রাতে। কখনও নীলাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা গেল, কখনও বা দেখা গেল নীলা এরোপ্লেনে বা নৌকোয় দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে সুবোধ স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে সামান্য জ্বালা অনুভব করল বুকে। বস্তুত নীলার সঙ্গে কারও প্রেম ছিল এটা এখনও পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ। মনোমোহনের স্বপ্নটা একেবারেই বাজে। কারণ নীলার সঙ্গে তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয়। মনোমোহনের সঙ্গে আর দেখা হয় না সুবোধের। মনোমোহন বোধহয় এখন পুলিশে চাকরি করে,—তার ঘর সংসার আছে, সে নিরীহ মানুষ। স্বপ্নে যে কত অঘটন ঘটে!

তবু বুকে মনে কোথাও একটু জ্বালার ভাব ছিলই সুবোধের। স্টোভ জ্বেলে সে চা করল। চা-টা তেমন জমল না, লিকার পাতলা হয়েছে, চিনি বেশি। সেই চা খেয়ে সকালবেলাটা কাটাল সে। ঝি এসে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে গিয়েছে, তবু নিজে আজ আর রান্না করবে না সুবোধ। আজ ছুটির দিন—রবিবার। দুপুরে গিয়ে কোনও হোটেলে খেয়ে আসবে, সকালবেলাটায় সে ঘরের কোথায় কী আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখল। এখন সবকিছুই তাকেই দেখতে হবে। নিজেকে নিজেই চালাতে হবে তার। ব্যাপারটা যে খুব সুবিধেজনক হবে না—তা বোঝা যাচ্ছিল। বিয়ের আগে সে ছিল মা-বোন-বউদিদের উপর নির্ভরশীল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই গড়পাড়ের সেই যৌথ সংসার ছেড়ে চলে এল ঢাকুরিয়ায় নীলাকে নিয়ে। কখনও সে একা থাকেনি বিশেষ। যে কয়েকবার নীলা একটু বেশিদিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছে, সে কয়েকবারই মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সুবোধ। কাজেই এখন একা একা সংসারের মতো কিছু চালানো তার পক্ষে মুশকিল। মাকেও আর আনা যায় না—বাতে—অম্বলে এই বুড়ো বয়সে মা বড় জবুথুবু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মাকে আনলেও স্থায়ীভাবে আনা যায় না, গড়পাড়ের সংসার ছেড়ে মা এখানে থাকতেও চাইবে না বেশিদিন। এর উপর আছে মায়ের অনুসন্ধানী চোখ—এক লহমায় বুঝে নেবে যে নীলা আর আসবে না।

নীলা আর আসবে না ভাবতেই সকালবেলায় একটু কষ্ট হল সুবোধের। কষ্টটা নিতান্তই অভ্যাসজনিত। দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসের ফল। নীলা না থাকলে হরেকরকমের অসুবিধে। সেই অসুবিধেটুকুই বাদ দিলে মনটা বেশ তাজা লাগল তার। বেলা বাড়লে রাতের স্বপ্নগুলোর মধ্যে একমাত্র মনোমোহনের স্বপ্ন ছাড়া আর কোনও স্বপ্নই তার মনে থাকল না। মনোমোহনের সঙ্গে নীলার কিছুই ছিল না—সুবোধ জানে। তবু স্বপ্নটার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আছে বলেই তার মনে হচ্ছিল। হয়তো এই ঘরে, তার এই সংসারের মধ্যে থেকেও নীলা কখনও ঠিক পুরোপুরি সুবোধের ছিল না। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই সুবোধের এইরকম ধারণা শুরু হয়। গড়পাড়ের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অভাব ছিল না। দুই দাদার

গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে। তাদের মধে যাদের বুদ্ধি তেমন পাকেনি তাদের কাছে সে প্রায়ই গোপনে জিগ্যেস করত, সে অফিসে চলে গেলে নীলা কী কী করে, বিকেলে ছাদে যায় কি না, নীলার নামে কোনও চিঠি এসেছিল কি না। বস্তুত কেন যে সে সব জিজ্ঞাসা করত সুবোধ তা স্পষ্টভবে নিজে আজও জানে না। বাপের বাড়ির কোনও লোক এসে নীলার খোঁজ করলে সে বিরক্ত হত। কখনও কখনও ঠাট্টার ছলে সে নীলাকে জিগ্যেসও করেছে, বিয়ের আগে নীলার জীবনে কে কে পুরুষ এসেছে। সুবোধের মনের গতি তখনও ধরতে পারেনি নীলা, তাই ঠাট্টা করেই উত্তর দিত—ছিল তো, সে তোমার চেয়ে অনেক ভালো-ঠাট্টা জেনেও মনে মনে ম্লান হয়ে যেত সুবোধ। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা গন্ডগোল শুরু হল মেজদাকে নিয়ে। মেজদার কারখানায় গন্ডগোল হয়ে লক-আউট হয়ে গেল। ছ'মাস পরে কারখানাটা হাত বদল হয়ে গেল। মেজদা পুরোপুরি বেকার তখন। লোকটা ছিল বরাবারই একটু বন্য ধরনের, হইচই করা মাথা মোটা গোঁয়ার মানুষ। চাকরি গেলে এসব লোকের সচরাচর যা হয় তাই হল। বাংলা মদ খেয়ে রাত করে বাসায় ফিরত। গোলমাল বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করত অনেক রাত পর্যন্ত। তিন ঘরের ছোট্ট বাসাটায় ঠাসাঠাসি লোকজনের মধ্যে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। মেজদার মদ খাওয়ার স্বভাব ছিলই, কিন্তু আগে মাত্রা রেখে খেত, পুজো পার্বণ বা অন্য উপলক্ষে বেশি খাওয়া হয়ে গেলে বাসায় ফিরত না। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর লোকটাকে রোজই মাত্রার বেশিই খেতে হত, আর বাসা ছাড়া অন্য জায়গাও ছিল না তার। প্রতি রাতে মেজদাকে গালাগাল করত সবাই, মা বলত—ওকে রাতে ঘরে ঢুকতে দিস না। বউদি সামলাত বটে, কিন্তু কিছুদিন পর বউদিরও ধৈর্য থাকল না। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে গেল বউদি। সে সময় সত্যিই মুশকিল হল মেজদাকে নিয়ে। তাকে সামলানোর লোক কেউ রইল না। মাঝে মাঝে সদরের বাইরেই সারা রাত শুয়ে থাকত মেজদা। দরজা খুলত না কেউই। সে সময়ে এক বৃষ্টির রাতে নীলা উঠে গিয়ে মেজদাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। সুবোধ জেগে থাকলে নীলাকে এ কাজ করতে দিত না। যখন জাগল তখন নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলছে। রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ধরল সুবোধ—কোথায় গিয়েছিল? নীলা দুর্বল গলায় উত্তর দিল—মেজদাকে দরজা খুলে দিতে। ভীষণ রেগে গিয়ে সুবোধ চেঁচিয়ে বলল—কী দরকার তোমার? মাতাল, লোফার, লুম্পেন ওই ছোটলোকটার কাছাকাছি তুমি কেন গিয়েছিলে? সে কেন তোমার গায়ে হাত দিল? নীলা এবার অবাক হয়ে বলল—গায়ে হাত দিল! কই, না তো! সুবোধ তবু চেঁচিয়ে বলল—আমি নিজে দেখেছি সে তোমার হাত ধরে আছে। অন্ধকারে নীলার মুখের রং দেখা গেল না, নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল—চেঁচিও না। বিছানায় চলো। বলে দরজায় খিল দিল নীলা। সুবোধের সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। সে বলল—কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বারণ করিনি ওই লোফারটার কাছাকাছি কখনও যাবে না? নীলা সামান্য হাঁফ ধরা গলায় বলল—দরজা খুলে না দিলে উনি সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতেন। সুবোধ ছিটকে উঠল—তাতে কী হত। মাতালের সর্দি লাগে না। কিন্তু তাকে তুমি প্রশ্রয় দাও কেন? এ বাসায় তার আপনজন কেউ নেই? লোফারটা তোমার হাত...। সামান্য কঠিন হল এবার নীলার গলা—তুমি নিজে দেখেছ? বাস্তবিক সুবোধ কিছুই দেখেনি, সে উঠে দেখেছে নীলা ঘরে ফিরে আসছে, তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিল ওরকম কিছু একটা হয়েছে। তাই সে গলার তেজ বজায় রেখে বলল—হ্যাঁ, দেখেছি। নীলা আস্তে-আস্তে বলল—উনি মাতাল অবস্থাতেও চিনতে পেরে আমায় বললেন—তোমাকে কষ্ট দিলাম বউমা। আমার হাতে ওঁর হাত লাগেওনি। সত্যিই কি তুমি নিজে দেখেছ। সুবোধের আর তেমন কিছু বলার ছিল না, তবু সে খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করল। সারারাত ঘুমের মধ্যেও ছটফট করল। জ্বালা যন্ত্রণা হিংস্রতার এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। হাতের কাছেই নীলা, তবু কেন নীলাকে দূরের বলে মনে হচ্ছে কে জানে! পরদিন থেকে ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিল। রাতে সুবোধের চিৎকার সবাই শুনেছিল। সম্ভবত হাত সম্বন্ধে তখন ওরকম কোনও ব্যাপারই অবিশ্বাস্য ছিল না। সুস্থ

অবস্থায় সম্ভবত মেজদাও বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না। তাই পরদিন থেকেই মেজদা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের বেলাতে আর বাসায় থাকতই না। নীলা সুবোধকে এ ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করেনি, কিন্তু তখন থেকেই আলাদা বাসা করার জন্য সুবোধকে বলতে শুরু করে নীলা। তাই বিয়ের দু'বছরের মাথায় সুবোধ আলাদা হয়ে এল।

তবু শান্তি ছিল না সুবোধের। যাতায়াতের পথে দেখত রকে বসে পাড়ার ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি দিচ্ছে, পথে-ঘাটে দেখত সুন্দর পোশাক পরে সুপুরুষ মানুষেরা যাচ্ছে, কখনও বা বন্ধুদের কাছে শুনত চরিত্রহীনতার নানা রংদার গল্প। সঙ্গে সঙ্গেই নীলার কথা মনে পড়ত সুবোধের। পৃথিবীতে এত পুরুষ মানুষের ভিড় তার পছন্দ হত না। তাই ইচ্ছে হত নীলাকে সে সম্পূর্ণ পুরুষশূন্য কোনও এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসবাস করে। অফিসে বেরিয়ে বোধহয় সে অনেকবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মনে বিষের যন্ত্রণা। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে চুপিচুপি ফিরে এসেছে বাসায়। নিঃসাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছে দোতলায়, দরজায় কান পেতে ভিতরে কোনও কথাবার্তা হচ্ছে কিনা শুনতে চেষ্টা করছে। তারপর আস্তে আস্তে দরজায় কড়া নেড়েছে। প্রায়ই দরজা খুলে নীলা অবাক হত—এ কী, তুমি! খুব চালাকের মতো হাসত সুবোধ, বলত—দূর রোজ অফিস করতে ভালো লাগে? চলো আজ একটা ম্যাটিনি দেখে আসি। শেষের দিকে নীলা হয়তো কিছু টের পেয়েছিল। আর তাকে দেখে অবাক হত না। শক্ত মুখ আর ঠান্ডা চোখে চেয়ে একদিন বলেছিল—চৌকির তলাটলাগুলো ভালো করে দেখে নাও।

ধরা পড়ে মনে মনে রেগে যেতে সুবোধ। নিজের সঙ্গে নিজেই বিজনে ঝগড়া করত— কিছু একটা না হলে আমার মনে এরকম সন্দেহ আসছে কেন! আমার মন বলছে কিছু একটা আছেই। বাইরে থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়।

তবু নীলা চোখের জল ফেলেনি কোনওদিন। ঝগড়া করেনি। কেবল দিনে দিনে আরও গম্ভীর, শীতল, কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সুবোধের ধরাছোঁয়ার বাইরেই চলে যাচ্ছিল নীলা। বছর চারেক আগে পেটে বাচ্চা এল তার। তখন আরও রুক্ষ আরও কঠিন দেখাল নীলাকে। হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে সে খুব শান্ত গলায় একদিন সুবোধকে বলছিল—শুনেছি মেয়ের মুখে বাপের ছাপ থাকে। আমার যেন মেয়ে হয়। সুবোধ অবাক হয়ে বলল—কেন? নীলা মৃদু হেসে বলল—তাহলে প্রমাণ থাকবে যে সে ঠিক বাপের মেয়ে। মুখের আদল তো চুরি করা যায় না। মেয়েটা বাঁচেনি। বড় রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মেছিল। আটদিন পর মারা গেল। মুখের আদল তখনও স্পষ্ট হয়নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা এখনও খচ করে বেঁধে সুবোধের। নীলা কথাটা যে কেন বলেছিল।

তারপর থেকেই সুবোধ জানত যে নীলা চলে যাবে। আজ কিংবা কাল। আজ কাল করে করেও বছর তিনেক কেটে গেল। খুব অশান্তি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। বাইরে শান্তই ছিল তারা। ভিতরে ভিতরে বাঁধ তুলে দিল কেবল। অবশেষে নীলা চলে গেল কাল।

সারা সকাল কাটল নির্জনতায়, ঘরের মধ্যে। একরকম ভালোই লাগছিল সুবোধের। দশ বছরের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, রাগ—এখন আর তেমন অনুভব করা যায় না। কোনও দুঃখও বোধ করে না সে! সন্দেহ হয় নীলাকে সে কোনওদিন ভালোবেসেছিল কি না। সে বুঝতে পারে না ভালো না বেসে থাকলে নীলার প্রতি ওরকম অদ্ভুত আগ্রহই বা তার কেন ছিল। গত দশ বছরে নীলার কথা সে যত ভেবেছে তত আর কারও কথা নয়।

দুপুরের দিকে ঘরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে যেমন হঠকারি দায়িত্বহীন সুন্দর সময় সে কাটিয়েছে সে রকমই সুন্দর সময় আবার ফিরে এসেছে আজ। বাধাবন্ধনহীন। মনটা ফুরফুরে রঙিন একটি রুমালের মতো উড়ছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স তার, সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন—দায়দায়িত্বহীন। তার

চাকরিটা মাঝারি গোছের। উঁচু থাকের কেরানি। তাদের দু'জনের মোটামুটি চলে যেত। এবার একা তার ভালোই চলবে। নীলা টাকা চাইবে না বলেই মনে হয়। চাইলেও দিয়ে দেওয়া যাবে। মোটামুটি নীলার ভাবনা থেকে মুক্তিই পেয়েছে সে। এবার পুরোনো আড্ডাগুলোয় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এবার গ্রীষ্মে প্রতিটি ফুটবল খেলাই দেখবে সে। রাতের শোয়ে দেখবে সিনেমা। ছুটি পেলেই পাড়ি দেবে কাশ্মীর কিংবা হরিদ্বারে, দক্ষিণ ভারত দেখে আসবে। এবার থেকে সে মাঝে মাঝে একটু মদ খাবে। খারাপ মেয়েমানুষদের কাছে যায়নি কোনওদিন, এবার একবার যাবে। আর দেখে আসবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মুক্তি—মুক্তি—তার মন নেচে উঠল।

হোটেলে খেয়ে আর ঘরে ফিরল না সুবোধ। সিনেমায় গেল। দামি টিকিটে বাজে বই দেখে বেরিয়ে গেল কলেজ স্ট্রিটে। ঘিঞ্জি পুরোনো একটা চায়ের দোকানে আট-নয় বছর আগেও তাদের জমজমাট আড্ডা ছিল। সেখানে পরপর কয়েক কাপ চা খেয়ে সন্ধে কাটিয়ে দিল সুবোধ। পুরোনো বন্ধুদের কারওই দেখা পেল না। বেরিয়ে পড়ল আবার।

সন্ধে সাতটা। কোথায় যাওয়া যায়!

অনেকদিন আগে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে শখ করে মদ খেয়েছে সুবোধ। সঙ্গীছাড়া কোনওদিন খায়নি। মদের দোকানগুলোকে সে ভয় পায়। তবু আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। উত্তেজনার বড় অভাব বোধ করেছিল সে।

বাসে ট্রামে ভিড় ছিল বলে সে হেঁটে হেঁটে এসপ্ল্যানেড এল। অনেক মদের দোকানের আশপাশে ঘুরে দেখল। বেশি বাতি, বেশি লোকজন, হই-চই তার পছন্দ নয়। অনেকগুলো দেখে সে গলিঘুঁজির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকান পছন্দ করে ঢুকল। ভিতরে আলো কম, দু'চারজন লোক বসে আছে এদিক-ওদিক। কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে—আবছা আলোয় তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েগুলোর দিকে বেশি তাকাল না সুবোধ। ফাঁকা একটা টেবিলে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। বেয়ারা এলে একসঙ্গে তিন পেগ হুইস্কির হুকুম করল সে।

বেশিক্ষণ লাগল না। অনভ্যাসের মদ তার মাথায় ঠেলা মারতে থাকে। আস্তে আস্তে গুলিয়ে যায় চিন্তা-ভাবনা। শরীরের মধ্যে একটা অবোধ কষ্ট হতে থাকে, পা দুটো ভারী হয়ে ঝিন ঝিন করে। এই তো বেশ নেশা হচ্ছে—ভেবে সুবোধ কাউন্টারের কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি পরিচিতার মতো হাসে। সুবোধ হেসে তার উত্তর দেয়। পরমুহূর্তেই গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে সে দেখে মেয়েটি তার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটি কালো, মোটা থলথলে, বয়স ত্রিশের এদিক-ওদিক। মেয়েটি বলল—বাব্বা, তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু খাওয়াও তো।

কোনও কোনও বন্ধুর কাছে এদের কথা শুনেছে সুবোধ। তাই অবাক হয় না। মেয়েটির জন্যও এক পেগের হুকুম দিয়ে সে জিগ্যেস করে—তোমার ঘর কোথায়?

'কাছেই। যাবে?'

'মন্দ কী?'

'তবে আরও দু'পেগের কথা বলে দাও। তাড়াতাড়ি বলো। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে।'

সুবোধ আরও দু'পেগের কথা বলে দিয়ে হাসল—মদ খাও কেন?

'তুমি খাও কেন?'

'আমার বউ চলে গেছে।

'আমারও স্বামী চলে গেছে। বলেই মেয়েটি ভ্রু কুঁচকে বলে—শোনো, ঘরে যেতে কিন্তু ট্যাক্সি করতে হবে। হেঁটে যেতে নেশা থাকে না।

ট্যাক্সি। হাঃ হাঃ। বলে হাসল সুবোধ। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।

বলল—আমার বউয়ের গল্প তোমাকে শোনাব আজ—

'খুব ছেনাল ছিল?'

'না না। ছেনাল নয়, তবে অন্যরকম—

'চলে গেল কেন?'

'সেটাই তো গল্প।'

'ওরকম আকছার হচ্ছে। তোমার বউয়ের দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব।

'দুঃখ! বড় অবাক হল সুবোধ। দুঃখের কোনও ব্যাপারই তো নয় নীলার চলে যাওয়াটা। তবু নেশার ঘোরে এখন তার মনটা হু হু করে উঠল। দুঃখিত মনে সে মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, খুব দুঃখের গল্প।'

—কেটে যাবে। বিলটা মিটিয়ে দাও।

বিল মেটাল সুবোধ। তারপরও গোটা ত্রিশেক টাকা রইল ব্যাগে। মেয়েটা আড়চোখে দেখে বলল—তুমি কি আমার ঘরে সারারাত থাকবে?

'মন্দ কী? সুবোধ হাসল।'

'ত্রিশ টাকায় হবে না কিন্তু।'

'হবে না?'

'হয়! বলো না, এই বাজারে ত্রিশ টাকায় ঘণ্টা দুই, তার বেশি না।'

'না। ত্রিশ টাকায় সারারাত।'

'পাগল!'

'তবে কেটে পড়। আমি কেরানির বেশি কিছু না।'

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। গ্লাস নিঃশেষ করে আঁচলে মুখ মুছল।

বলল—মদ খাওয়ালে, ভালোবাসবে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

'কেটে পড়ো।'

'ঠিক আছে। চলো ত্রিশ টাকাতেই হবে। আহা, তোমার বউ চলে গেছে।—না? ঠিক আছে। চলো তো দেখি তোমার বউ ভালো না আমি ভালো। বলতে বলতে সুবোধকে হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটা।

ট্যাক্সিতে সুবোধ মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখেছিল। সস্তা প্রসাধন আর তেলের বিশ্রী গন্ধ। তবু মুখ সরিয়ে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালাকে নানা জটিল পথে নিয়ে যেতে বলছে। কথা আর কথায় বুক ভরে আসছিল সুবোধের। সে অনর্গল কথা বলছিল— নীলার কথা, কাল রাতের স্বপ্নের কথা, মেজদার কথা, মরা মেয়েটার কথা। কখনও সে বলছিল, সে এবার বেড়াতে যাবে হরিদ্বারে, যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল ম্যাচ দেখবে। একা একাই থাকবে সে। মেয়েটি কোনও কথাতেই কান দিল না। শুধু মাঝে মাঝে বলল—শুয়ে পড়ো না বাপু গায়ের উপর। পুরুষমানুষগুলো যা ন্যাতানো হয়, একটু দুঃখ-টুঃখ হলেই গড়িয়ে পড়ে। কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সুবোধ। দুঃখ! কিসের দুঃখ! মেয়েটি জানেই না তার মন রঙিন একখানা রুমালের মতো উড়ছে।

ট্যাক্সি যেখানে থামল সে জায়গাটা সুবোধ চিনল না। শুধু টের পেল, গোলকধাঁধার মতো খুব জটিল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি, সরু বারান্দা, আবার সিঁড়ি—বিচিত্র অচেনা লোকজন, মাতাল, বেশ্যা, ফড়ের গা ঘেঁষে মেয়েটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে নীলার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। অথচ জানে না দুঃখই নেই আসলে। ভেবে সে হাসল—ভালো জায়গায় থাকো তুমি—কী যেন নাম তোমার।

মেয়েটি বলল—অনিলা।
হাসল সুবোধ—চালাকি হচ্ছে?
'কেন?'
'আমার বউয়ের নাম তো নীলা।'
'ওমা! তাই নাকি। বলোনি তো!'
'বলিনি?'
'না মাইরি...'
চালাকি হচ্ছে? অ্যাঁ।
মেয়েটি হাসে, সত্যিই আমি অনিলা। তোমার বউয়ের উল্টো। দেখ প্রমাণ পাবে। খুব সুন্দরী ছিল তোমার বউ? ফর্সা?
'না। কালোই। মন্দ না।
'খুব কালো?
'না। শ্যামবর্ণ। এই আমার গায়ের রং।'
'ওমা তুমি তো ফর্সাই।'
—যাঃ—হাসল সুবোধ। লজ্জায়।
ঘরখানা ভালোই। ছিমছাম। বসতে ঘেন্না হয় না। পরিষ্কার বিছানাটা আগে চোখে পড়ল সুবোধের। ভারী মাথা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল—মদ খেয়ে কিছু হয় না। উত্তেজনা লাগছে না।
'আর খাবে।'
না। পয়সা নেই।'
পয়সা না থাক, ঘড়ি আংটি আছে। জমা রেখে খেতে পারো, পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।
'না। আর খেলে ঘুম পাবে, বমিও হবে।'
'তবে থাক।'
'সুবোধ মেয়েটিকে অনাবৃত হতে দেখেছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হল, জিগ্যেস করল— আজ কী তোমার আর খদ্দের আছে? তাড়াতাড়ি করছে কেন?'
মেয়েটি হাসল—আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি? তোমাকে আলাদা বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পাবে না।
'পাব না?'
'না।'
মেয়েটি কাছে আসে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সুবোধ—তুমি তো অনিলা।
'হু।'
'দূর। তাহলে হবে না। বলে হাই তোলে সুবোধ।'
'কেন?'
সুবোধ উত্তর দেয় না। অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে। নীলা! নীলা এখন কোথায়! তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ। তার মধ্যে নীলা একা কোথায় চলে গেল? কী করছে এখন নীলা?
মেয়েটি বলে—আমার দিকে তাকাও। দেখ না আমাকে।
সুবোধ গরুর মতো নিরীহ চোখে তাকায়। হাসে। বলে—দূর। তোমার দ্বারা হবে না।

'কেন?'
'তুমি তো পরিষ্কার মেয়ে। কিচ্ছু লুকানো নেই তোমার। তোমাকে একটুও সন্দেহ হয় না।
'বাঃ। তা তুমি চাও কী?'
'সন্দেহ করতে। বলতে বলতে হাসে সুবোধ। হেসে চোখ ফিরিয়ে নেয়।'
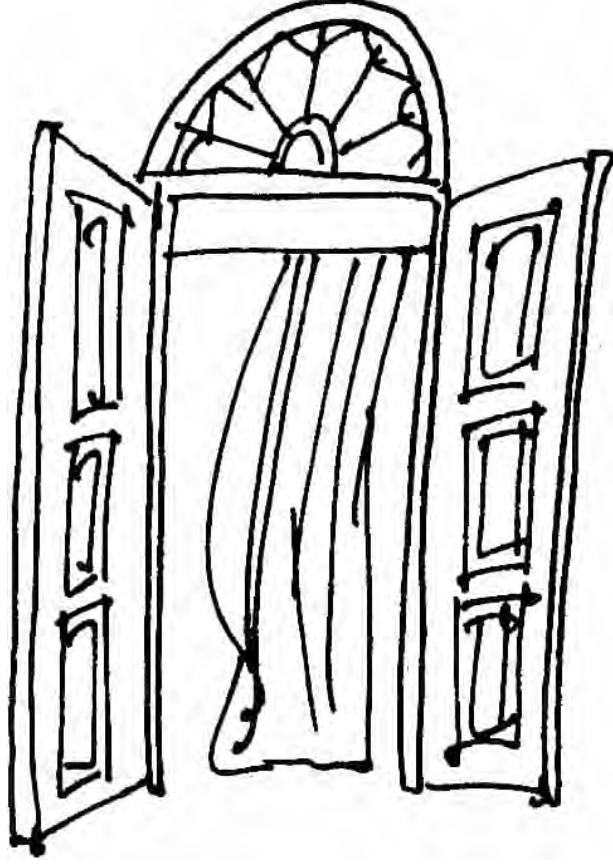
বলাইবাবুর দিদিশাশুড়ি

নতুন বাসায় ভাড়া এসে প্রথম রাত্তিরেই একটু বিপাকে পড়ে গেল দিবাকর। মাঝরাত্তিরে ঘরের মধ্যেই খুটখাট শব্দ আর চলাফেরার আওয়াজ। তবে খুব মৃদু। দিবাকর বলবান লোক। ভীতুও নয়। চোর ঢুকছে মনে করে তেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। কে যেন বলল, চুপ করে শুয়ে থাকো। বীরত্ব দেখাতে হবে না।

গলার স্বর শুনে দিবাকরের হাঁফ ছাড়বার উপক্রম। চোর ঢুকেছে বটে। তবে মেয়েমানুষ চোর। দিবাকরের আবার পৌরুষের ষোলোআনা অহংকার। চোর ধরতে হলে সাপটে-জাপটে ধরতে হয়। কিন্তু মরে গেলেও দিবাকর মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

কেউ কোনো জবাব দিল না। শব্দও আর হচ্ছিল না। দিবাকর উৎকণ্ঠিত হয়ে দুশ্চিন্তা নিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে ফের উঠতে যেতেই আবার সেই কণ্ঠস্বর, বারণ করেছি কিন্তু!

দিবাকর আচ্ছা মুশকিলে পড়ে গিয়ে বলে, দেখুন, আমি কিন্তু এবার চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

চোর মহিলা বলল, চ্যাঁচাবে! চ্যাঁচাবে কেন?

আপনি যে চুরি করতে ঘরে ঢুকেছেন।

এ-ঘরটা আমার ঘর। তুমি ঢুকেছ কেন?

কী মুশকিল! এটা যে আমি মাসে পাঁচশো টাকায় বলাইবাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। এ-ঘর আপনার হয় কোন সুবাদে?

চুপ করে শুয়ে থাকো, আমার অনেক কাজ আছে।

দিবাকর কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার ঘরে অবশ্য চুরি করার মতো বিশেষ কিছু নেইও। কয়েকটা অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোশন, একটা লোহার কড়াই, কয়েকটা জামা-প্যান্ট আর বড়োজোর হাজারখানেক টাকা। চুরি গেলেও তেমন ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু তা বলে চোরকে তো প্রশ্রয়ও দেওয়া যায় না।

দিবাকর ফের গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, চুরি করা কিন্তু অপরাধ।

অন্ধকার থেকে জবাব এল, আগে চুরিটা হোক তো!

বেশ কথা, চুরি হবে আর আমাকে বসে বসে দেখতে হবে! এটা তো জুলুম হয়ে যাচ্ছে!

কত টাকায় ভাড়া নিয়েছ বললে?

মাসে পাঁচশো টাকা।

বিনোদ পাল তিনশো টাকা ভাড়ায় ছিল।

তা জেনে আমার কী হবে? আপনি এবার আসুন। রাতবিরেতে মেয়েদের ঘরের বার হওয়াটা ঠিক নয়। বুঝেছেন? অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

তোমাকে নিয়েই তো বিপদ। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে বলো তো বাপু! তোমার মতলবখানা কী?

দিবাকর ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, উড়ে এসে জুড়ে বসতে যাব কেন? আমি আমার কাজেই এসেছি।

চোর বলল, আর জায়গা জুটল না? মরতে এ-বাড়িতে কেন?

চোরের কাছে জবাবদিহি করতে আত্মসম্মানে লাগল দিবাকরের। সে বেশ ঝাঁজালো গলায় বলে, আপনার অত জানার কাজ কী? চুরি করতে ঢুকেছেন, কাজ সেরে মানে মানে চলে যান। আমাকে ঘুমোতে দিন।

ও বাবা, খুব মেজাজ দেখছি তো! তো চুরি করার মতোই বা কী আছে তোমার শুনি! দেখেশুনে তো মনে হয় তুমি একটা হাড়হাভাতে। কোথা থেকে এসে জুটলে?

দিবাকর সেটা জানে। তাই গম্ভীর হয়ে বলল, তা বলে চোরের জন্য কি সোনাদানা সাজিয়ে বসে থাকতে হবে না কি?

বেকার না কি হে বাপু তুমি?

কেন, চাকরি দেবেন না কি?

বলি, পেটে বিদ্যে-টিদ্যে কিছু আছে? না কি নন-ম্যাট্রিক! চেহারাটা তো মন্দ নয়, কিন্তু রাঙামুলো হয়ে তো লাভ নেই।

দিবাকর ভারি চটে গিয়ে বলে, বেকারও নই, হাড়হাভাতেও নই। আর পেটে যথেষ্ট বিদ্যেও আছে।

ও বাবা! আবার ফোঁস করে যে!

করব না? যা খুশি বলে গেলেই হল? চোরেদের এত আস্পর্ধা মোটেই ভালো নয়।

কেন, চোর বুঝি মনিষ্যি নয়? উচিত কথা কওয়ার হক সকলেরই আছে। তা ঘরদোরের এমন ছিরি কেন? ট্যাঁকের জোর নেই যে, তা তো বুঝতেই পারছি। তা কী করা-টরা হয় শুনি!

তা আপনাকে বলতে যাব কেন?

বলতে হবে না, ছিরি-ছাঁদ দেখে বুঝে নিয়েছি। বলাইবাবুরও বলিহারি যাই। মোটে পাঁচশো টাকার লোভে অজ্ঞাতকুলশীল, হাঁড়ির হাল লোক এনে জুটিয়েছে।

দিবাকর ফুঁসে উঠে বলে, যা খুশি বললেই হল? অজ্ঞাতকুলশীল আবার কে? এই ফলসাডাঙার বিশ্বাসবাড়ি একসময় লোকে এক ডাকে চিনত। আজ ভিটেমাটি হেজেমেজে গেছে বলে তো আর আমরা ভেসে আসিনি।

আমি আমাদের পুরানো ভিটেতেই আবার দালানকোঠা তুলব বলে এসেছি। বিশ্বাসবাড়ির ছেলে শুনলে আজও লোকে খাতির করে।

বিশ্বাসবাড়ি! মনো বিশ্বাসের বাড়ির কথা বলছ না কি বাপু?

মনো বিশ্বাস নয়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস। আমার দাদুর বাবা।

তাহলে তুমি হলে ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি?

ন্যাড়া আমার ঠাকুরদার ডাকনাম ছিল। ভালো নাম দৃকপতি বিশ্বাস। এবার বুঝলেন তো মোটেই অজ্ঞাতকুলশীল নই!

ওঃ। ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি বলে খুব যে দেমাক! তা ন্যাড়া বিশ্বাস যেমন জমিদার ছিল তেমনি আবার ওকালতি পাসও ছিল। তা তুমি কোন লবডঙ্কা শুনি? ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি বলেই কি লোকে সেলাম ঠুকবে?

মোটেই তা বলিনি। আমি ইংরেজিতে এম এ। কলেজে পড়াই। শ্যামপুর কলেজে চাকরি পেয়ে এসেছি। নিজেদের গাঁয়ে থেকে চাকরি করব।

বাপ রে! তবে তো বিদ্যের জাহাজ বলতে হয়।

ঠাট্টা করছ না কি?

পাগল! একে ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি, তার উপর পেটে বিদ্যে একেবারে গিজগিজ করছে। বলি একাই এসেছে, না সঙ্গে পরিবারও আছে?

পরিবার আবার কীসের? মা-বাবা শহরে থাকেন। দু-বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা রিটায়ার করে মাকে নিয়ে এখানেই চলে আসবেন।

অ্যাত্ত ধেড়ে বয়সের ছেলে, বিয়ে করনি যে! আইবুড়ো থাকবে না কি?

থাকলে আপনার কী? তাতে কি কারও গায়ে ফোসকা পড়ছে?

তোমার ভালোর জন্যই বলা বাপু। কাঁচা বয়সের মেয়েরা বাপের আড়ায় আড়ায় নজর রাখবে। বদনাম হতে কতক্ষণ?

এবার আপনি যান তো! যা পেয়েছেন পোঁটলা বেঁধে নিয়ে এবার বিদেয় হোন। জীবনে কখনও কোনো চোরকে গেরস্তের সঙ্গে এত কথা বলতে দেখিনি।

বলি, ক'টা চোর দেখেছ জীবনে? চোর নানারকম হয়। আর সবাই কিন্তু ছ্যাঁচড়া চোর নয়।

চোর মানেই ছ্যাঁচড়া। যারা অন্যের রোজগারে ভাগ বসায়, নিজে পরিশ্রম করে রোজগার করে না, তারা ছ্যাঁচড়া না তো কি?

ওঃ! মুখে যে একেবারে তত্ত্বকথার ফুটকড়াই ফুটছে। ন্যাড়া বিশ্বাসের নাতি আর এমএ পাস বলে মাথা কিনে নিয়েছ না কি?

মোটেই মাথা কিনে নিইনি। জিগ্যেস করলেন বলেই বলা। আপনার কাজ হয়ে থাকলে এবার দয়া করে আসুন গিয়ে। কাল সকালে আমাকে কাজে যেতে হবে।

যাব কোন চুলোয়! এটাই তো আমার ঘর। গত তিরিশ বছর ধরে এখানেই থানা গেড়ে বসে আছি। বলাইবাবুর আক্কেলও বলিহারি, আমার ঘরে উটকো লোক ঢুকিয়ে পয়সা রোজগার করছেন!

তার মানে! এ ঘরে আপনিও থাকেন না কি?

তবে?

কিন্তু বলাইবাবু যে বললেন—

সে বাপু অনেক কথা। ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বেশি জেনে কী হবে?

কালই বাড়ি ছেড়ে দেব।

দিবাকর সকাল সকাল বলাইবাবুর কাছে হাজির হল।

এ যে বড়ো মুশকিল হল বলাইবাবু। রাত-বিরেতে আমার ঘরে যে চোর ঢুকে পড়ছে। তার উপর মেয়েমানুষ! যদিও কাল কিচ্ছুটি নিয়ে যায়নি।

বলাইবাবু অতি সজ্জন মানুষ। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দিবাকরকে চেয়ারে বসিয়ে ভারি অপরাধী মুখ করে বললেন, খুব অসুবিধে হয়েছে বুঝি?

তা হবে না? চোর তো চোর, তার উপর বেজায় মুখরা। মাঝরাত অবধি তেড়ে ঝগড়া করে গেল আমার সঙ্গে। শুধু কি তাই! আবার এও বলল যে, ওই ঘরটা না কি ওরই। তার ঘরে সে থাকবে। এরকম হলে তো আমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হয় বলাইবাবু।

আহা, ব্যস্ত হবেন না। উনি মানুষ তেমন খারাপ নন। আমারই দিদিশাশুড়ি গঙ্গাজলি দেব্যা।

আপনার দিদিশাশুড়ি! তা তিনি রাত-বিরেতে আমার ঘরে চড়াও হন কেন?

ওইটেই তো হয়েছে বিপদ। বছরদশেক আগেই মারা গেছেন, কিন্তু ঘরটার মায়া কাটাতে পারেননি। নতুন লোক এলে প্রথমটায় একটু বাজিয়ে দেখে নেন আর কি, ক'দিন পর দেখবেন আর সাড়শব্দ পাবেন না।

অ্যাঁ! সর্বনাশ! উনি কি তাহলে ভূত? জেনেশুনেই কি আপনি আমাকে একটা ভূতুড়ে ঘর ভাড়া দিলেন?

বলাইবাবু হেঁ-হেঁ করে হাত কচলে বিগলিত মুখে বললেন, আরে ভূত বলে কি মানুষ নয়! আর ভাড়ার কথা যদি বলেন, তাহলে বলি ফলসাডাঙায় এখন একখানা ঘরের ভাড়াই আটশো-হাজার থেকে দু-হাজার অবধি। তা ওই ঘরখানায় একটু দোষ আছে বলেই অর্ধেক ভাড়ায় দিয়েছি।

ভাড়া কম বলে কি শেষে ভূতের হাতে মরব?

বালাই ষাট, মরবেন কেন? গঙ্গাজলি দেব্যার শুধু শরীরখানাই নেই, আর সব আছে। সেই জেদ, সেই দাপট, সেই গলার জোর। দেখবেন আপনার ঘরে কখনও চোরডাকাত আসবে না, সাপ বা বিছে ঢুকবে না, বিপদ-আপদ হলে আগাম টের পাবেন। এইসব বাড়তি সুবিধে এ বাজারে কে দেবে বলুন?

কিন্তু রাতবিরেতে ঝগড়া করলে ঘুম হবে কী করে?

কিছু মনে করবেন না দিবাকরবাবু, আসল কথাটা হল কোনো কারণে আপনাকে বুড়ির ভারি পছন্দ হয়েছে। অন্য সব ভাড়াটেদের তো বুড়ি হুড়ো দিয়ে দু-দিনেই তুলে দেন। ভয়টয়ও দেখান। কিন্তু আপনার বেলায় মনে হয় তেমনটি করার ইচ্ছে নেই। ঘরটা ছাড়বেন না, আমি না হয় আরও একশো টাকা ভাড়া কমিয়েই দিচ্ছি।

দোনোমনো করে দিবাকর রয়েই গেল।

মাঝরাত্তিরে আবার গেরো। সদ্য চোখের পাতা লেগে এসেছে, এমন সময় আবার সেই চেনা গলা, উঁঃ, খুব তো বলাইয়ের কাছে আমার নামে লাগিয়ে এলি। তাতে লাভ হল কিছু?

আবার জ্বালাতে এলেন বুঝি?

তা জ্বালাব না? কাল তো চোরছ্যাঁচড় কত কী বললি, তারপর নালিশ ঠুকে এলি। কেন রে হতভাগা, তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি?

দেননি? রোজ রাতে যদি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে ঝগড়া শুরু করেন তাহলে টেকা যে দায় হবে।

ঝগড়া আমি করি, না তুই করিস?

আমি আবার কোথায় ঝগড়া করলুম?

ঝগড়া না হয় না হল, মুখে-মুখে কথা তো বলিস। তোর বড্ড চোপা।

কথার পিঠে কথা তো আসবেই।

হ্যাঁরে, চাকরিতে জয়েন দিলি নাকি?

দিলুম তো।

মাইনে কত বল তো?

তা মন্দ নয়। কেন, মাইনে কত জেনে কী করবেন?

জেনে রাখা ভালো কিনা। তুই যে বলাইয়ের বাড়ির এই একটেরে ঘরটা কেন ভাড়া নিলি, তা বুঝি আমি জানি না?

তার মানে? ঘর তো লোকে থাকার জন্যই ভাড়া নেয়।

তা নেয় বটে। কিন্তু মদনবাবুর বাড়িতে এর চেয়ে ঢের ভালো ঘর ছিল। প্রতাপ ঘোষের বাড়ির একতলাটা তো ভারি সরেস, নগেন মিত্রের বাসাও খারাপ ছিল না। সেসব ছেড়ে এ বাড়িতেই থানা গেড়েছিস কেন, তা বুঝি জানি না ভেবেছিস?

কী মুশকিল, এটা পছন্দ হয়েছিল তাই। আলো-হাওয়া আছে, ঘরখানাও ভালো।

আর বুঝি কিছু নেই?

আর কী থাকবে?

কেন, টুকুস। বলাইয়ের ছোট মেয়ে। ভাড়া নিতে এসে আড়ে আড়ে যখন চাইছিলি তখনই বুঝেছিলুম ফাঁদে পড়েছিস। ওসব কি আর বুঝতে বাকি থাকে রে?

দিবাকরের কানটান গরম হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধকধক! বলল, যাঃ! বাজে কথা। কে বলেছে, ওসব? না না, মোটেই ওসব নয়। আপনি তো ভারি ইয়ে দেখছি।

ওরে, আর লজ্জা পেতে হবে না। তোর বয়স আমারও একদিন ছিল।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!

সত্যি কথা বল তো, টুকুসকে তোর ভারি পছন্দ কি না!

যাঃ। আপনি মানুষকে ভারি লজ্জায় ফেলেন তো!

চুপিচুপি তোকে একটা কথা বলে যাই, টুকুসেরও তোকে ভারী পছন্দ।

কী করে বুঝলেন?

বলব কেন? হিঃ হিঃ হিঃ...।

কথাবার্তা

আজকের চাঁদটা দেখেছেন? এত কাছে নেমে এসেছে যে, মনে হচ্ছে একটা দমকলের মই লাগালেই হাতে ছোঁয়া যাবে।

হুঁ, ঠিকই বলেছেন, চাঁদটাকে আজ বেশ বড়োসড়োই দেখাচ্ছে বটে। আমার একটু ভয়-ভয়ও করছে কিন্তু।

কেন? ভয় কীসের?

চাঁদটার মতলব ভালো বলে মনে হচ্ছে না। বহুকাল ধরে ব্যাটা পৃথিবীর চারধারে ঘুরঘুর করছে। এখন যদি পট করে হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের ওপর নেমে আসে তাহলে কী অবস্থা হবে ভেবেছেন? একটা হালকা পলকা উল্কা সেই কতকাল আগে এসে পড়েছিল, তাতেই হুলুস্থুলু হয়ে, সুনামি ইনামির চোটে ডায়নোসর জাতটাই গেল লোপাট হয়ে। ছোটো একটা উল্কাতেই যদি ওই কাণ্ড হয় তবে এত বড়ো চাঁদটা এসে পড়লে কী কাণ্ড হবে ভাবুন।

তা অবশ্য ঠিকই, তবে ঘুরঘুর করলেও চাঁদ অতটা করবে বলে আমার মনে হয় না। চাঁদ হচ্ছে ভীতু প্রেমিকের মতো। উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।

তাহলে কি আপনি বলছেন চাঁদ প্রেমিক এবং পৃথিবী প্রেমিকা? একজন পুং এবং একজন স্ত্রী লিঙ্গ? যতদূর জানি ইনস্যানিমেট অবজেক্টকে স্ত্রীলিঙ্গই ধরা হয়। সেক্ষেত্রে দুজনেই স্ত্রীলিঙ্গ এবং তাদের মধ্যে সমকামের সম্পর্কটা কী বলেন?

চাঁদ বা পৃথিবী কেউই যখন জানে না তারা কোন লিঙ্গ এবং তারা যখন কোনো কথাতেই রি-অ্যাক্ট করে না তখন যা খুশি একটা ভেবে নেওয়াই যায়। তবে দুজন পুরুষমানুষ পাশাপাশি লেকের ধারে বসে চাঁদ দেখছে এটা ঠিক জমছে না।

বুঝেছি। আপনি বোধহয় চাঁদ বিষয়ে কথা বলতে বিশেষ পছন্দ করেন না।

ঠিক তা নয়, চাঁদ নিয়ে মানুষের অ্যাদিখ্যেতা বড্ড বেশি, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, ঝলসানো রুটি, কাণ্ডের মতো চাঁদ। সেই তুলনায় বরং আপনার প্রসঙ্গটা অনেকটা প্র্যাকটিক্যাল, চাঁদ যদি হঠাৎ পৃথিবীর সঙ্গে মিশে যেতে চায় তাহলে বড্ড ভয়ের কথা।

আরও আছে মশাই, সেই যে জ্যোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি, গলি দিয়ে চলে যায়, তা ওই গলি দিয়ে চলে যায়, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি কি পারেন?

আজ্ঞে না, বুঝবার দরকারই বা কী? গল্পে, কথায়, কবিতায় মানুষ কত কি বলে যাচ্ছে।

হুঁ, মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই বলছেন, আচ্ছা আপনার বয়স তো বোধহয় সাতাশ-আঠাশের বেশি নয়?

হঠাৎ বয়সের কথা কেন?

আমার আটান্ন, আর দুবছর বাদে রিটায়ার। ভাবছিলাম, আমি একজন বুড়ো মানুষ না হয় রোজ নিষ্কর্মার মতো এসে লেকের ধারে বসে থাকি, কিন্তু আপনি তো ইয়ং ম্যান। এই বয়সে সন্ধেবেলায় তো কত কি করার থাকে, আড্ডা, খেলাধুলো, গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার।

ঠিকই বলেছেন, আমার বয়স আঠাশ না হলেও প্রায় ত্রিশ, আর আপনার স্বাস্থ্যটিও তো বেশ ডগমগে, মনে হয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করেন তাই না?

হুঁ, তা একরকম বলতে পারেন, কিন্তু বয়স কম এবং স্বাস্থ্য ভালো হলেই যে লোকে ভালো থাকে তা তো নয়।

আজ্ঞে না, তো নয়। কিন্তু আপনার ভালো না থাকার কারণ কী মশাই? চাকরি নিয়ে গোলমাল, না প্রেমে ব্যর্থতা?

সবরকমই। আমার ব্যর্থতার লিস্টি বেশ লম্বা।

সেইজন্যই রোজ শুকনো মুখে এসে চুপচাপ জলের ধারে বসে থাকেন বুঝি? সমস্যাগুলো কি খুবই জটিল এবং সমাধানের অতীত?

তাই তো মনে হয়...

আপনার কী চাকরি তা জানতে পারি?

আমি একটা দোকানে কাজ করি।

দোকান! কিসের দোকান বলুন তো? বিল্ডিং মেটেরিয়ালস আর হার্ডওয়্যার, সে তো বেশ ফলাও কারবার।

হ্যাঁ, দোকানটা বেশ বড়োই, চারটে ব্রাঞ্চ...

ও বাবা, বেতন তো ভালোই হওয়ার কথা।

বেতন? না বেতন নিয়ে তেমন সমস্যা নেই।

তাহলে? মালিকের সঙ্গে বনিবনা হয় না নাকি?

হুঁ, মালিক কঠিন মানুষ, বনিবনা হওয়ার নয়, চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছি, কিন্তু ছাড়া যাচ্ছে না।

এ বাজারে চাকরি ছাড়বেন কেন? লেগে থাকলে উন্নতি তো হবেই।

ঘাপলা আছে মশাই, আমি আসলে একজন মেটালার্জিস্ট। শিবপুর থেকে পাশ করেছিলাম, আমার কি দোকান সামলানোর কথা? কিন্তু মালিক যে কথা শুনছেন না।

সে কি মশাই, এ কি মামাবাড়ির আবদার নাকি? উনি আপনাকে আটকে রাখার কে?

সেটাই তো দুঃখের কথা। বেঙ্গালুরুতে আমি পঞ্চান্ন হাজার টাকা বেসিক পে-তে চাকরি পেয়েছি, পার্ফম টার্ফম মিলিয়ে এক লাখ টাকার কাছাকাছি বেতন, বিদেশে যাওয়ার সুযোগ, তবু মালিক ছাড়ছে না।

না না, এ তো অত্যন্ত অন্যায় কথা, আপনি মামলা করুন।

না সেটা ভালো দেখাবে না।

কেন মশাই? ভালো দেখাবে না কেন? আপনি তো আর ক্রীতদাস নন?

একরকম তাই, আর এরও ওপর আছে, মালিকের এক বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। বলুন তো যাকে দেখিওনি, জানিওনা, তাকে বিয়ে করতে যাব কেন? কিন্তু মালিক নাছোড়বান্দা, ভীষণ চাপাচাপি করছেন।

এ তো ভালো কথা নয়। এটা তো ব্ল্যাকমেল, চলুন তো, আজই আমার সঙ্গে চলুন, আমার এক বন্ধু পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। গিয়ে তাকে খোলসা করে সব বলুন। ঠিক ব্যবস্থা হবে।

তা হয় না মশাই, মালিক একটু কড়া ধাতের লোক হলেও আমাকে পালন পোষণও তো করছেন।

কিন্তু এখানে আপনার ভবিষ্যৎ কী? দোকানের কর্মচারী বইতো নয়। আর অত বড়ো চাকরির অফার কী চাট্টিখানি কথা! আর বন্ধুর মেয়েকেই বা বিয়ে করতে হবে কেন? খেঁদি পেঁচি একটা এনে গলায় ঝুলিয়ে দিলেই কি হল?

সেই তো; কে কাকে বোঝাবে বলুন। তবে মেয়ে নাকি দেখতে ভালোই।

বুঝতে পারছি। আপনি খুব নরম মনের মানুষ। লড়িয়ে লোক নয়। কিন্তু এরকম হলে তো জীবনে তেমন কিছু আর করতে পারবেন না।

পারছি না বলেই তো রোজ এসে জলের ধারে বসে থাকি। সকাল থেকে বিকেল অবধি চারটে দোকানে ছোটাছুটি করতে হয়, বিকেল পাঁচটায় মালিক এসে হাল ধরলে আমার ছুটি। আনন্দ ফুর্তি আমার জীবন থেকে চলেই গেছে।

আমার তো আপনার জন্য বড্ড মায়া হচ্ছে।

হওয়ারই কথা।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি আপনার মালিকের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?

পারেন, নম্বর হল...

যা, এ নম্বর তো আমার চেনা মশাই। আমার বন্ধু পীযূষ বসুর নম্বর। প্রায় রোজই তার সঙ্গে কথা হয়।

তা হবে, পীযূষ বসুই আমার মালিক।

কী কাণ্ড! দাঁড়ান, ফোন করে এখনই বিহিত করে দিচ্ছি...ওহে, ও পীযূষ, এই রত্নাকর বসু বলে কি তোমার এক কর্মচারী আছে?...না? নেই? সে কী? এই তো রত্নাকর আমার পাশেই বসে আছে।

উনি আমাকে সোমদেব বলে জানেন।

সোমদেব! সোমদেব! আরে, সোমদেব তো পীযূষের ছেলে! আর তার সঙ্গে যে আমারই মেয়ে রত্নাবলীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে...কী কাণ্ড!
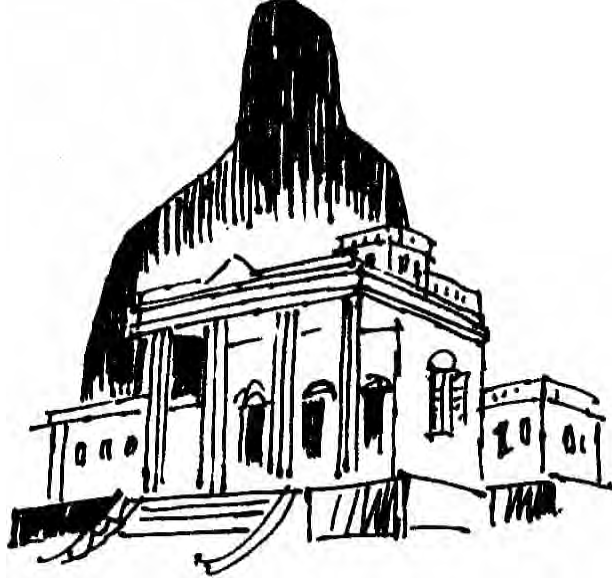
রহস্য

নতুন রাজ্যের অভিষেক উপলক্ষে রাজ্যে যে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল তারই কিছু প্রসাদ লাভ করল কারাগারের বন্দিরা। বহুদিন যাবৎ যারা কারাবাস করছে এমন কতিপয় বন্দির কাছে কারাধ্যক্ষ স্বয়ং রাজার পরোয়ানা পৌঁছে দিতে এলেন।

বন্দিরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল, মুক্তি? মুক্তির চেয়ে সুস্বাদু আর এই মানবজীবনে কী-ই বা থাকতে পারে? মুক্তি এক স্বচ্ছ ফল, মুক্তি এক প্রারম্ভিক আনন্দ, মুক্তি এক অফুরান গতি।

শুধু একজন বন্দিই নিরুত্তাপ, নিরাবেগ, প্রতিক্রিয়াহীন। কারাধ্যক্ষের হাত থেকে পরোয়ানাটি অবহেলায় গ্রহণ করলেন। পড়লেন। তারপর পারোয়ানাটি দুমড়ে মুচড়ে নিক্ষেপ করলেন কারাকক্ষের কোণে। বন্দি বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফ তাঁর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে আছে। মেদহীন দীর্ঘ চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়লেও তা শক্তিহীন নয়। দুই চক্ষুর দৃষ্টি এখনও ঈগলের মতো তীকষ্ন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি একাদিক্রমে কারাগারে রয়েছেন। সহবন্দিরা তাঁকে ভয় পায়, কারারক্ষীরা তাঁকে সমীহ করে, কারাধ্যক্ষ তাঁকে সহজে ঘাঁটান না।

মুক্তির আদেশ পেয়েও এই বয়োজ্যেষ্ঠ বন্দিকে অনুত্তেজিত দেখে বিস্মিত কারাধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আনন্দিত নন?

বন্দি কারাধ্যক্ষের দিকে এক নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, এখন বন্দিত্ব আর মুক্তি দুই-ই আমার কাছে সমান। তোমার রাজাকে বলো, আমার মুক্তি বহুকাল আগে আমি নিজেই অর্জন করেছি। আমি বন্দি নই। তাই মুক্তির আদেশ বাহুল্যমাত্র।

কারাধ্যক্ষ আর প্রশ্ন করলেন না। ফিরে গেলেন।

কিন্তু নবীন রাজার কানে যথাসময়ে পল্লবিত হয়ে ঘটনাটা নিবেদিত হল।

অভিষেকের উদ্যোগে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাঁর হাজার কাজ, হাজার ঝামেলা, হাজারো সমস্যা। তবু রাজা এই ঘটনাটির কথা মনে রাখলেন। কোনো কোনো সামান্য ঘটনা কীভাবে যেন মনকে বিদ্ধ করে রাখে।

বৃদ্ধ রাজা দেহরক্ষা করেছেন। তিনি কঠোর হস্তেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। নিজে ছিলেন অতি সংযত ও কঠোর চরিত্রের মানুষ। নবীন রাজা তাঁর মতো অত কঠিন কাঠোর নন। তাঁর হৃদয় কোমল, কল্পনাপ্রবণ, রহস্যপ্রিয়। সম্ভবত তাই এই সামান্য ঘটনাটি তিনি ভুলতে পারলেন না।

অভিষেকের আগে রাজ্যে চলেছে সাজো-সাজো রব। রাজপ্রাসাদে শতেক পণ্ডিত যাগযজ্ঞ পূজা পাঠে অহোরাত্র ব্যাপৃত রয়েছেন। দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি সমাগম শুরু হয়েছে, তাঁদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ব্যাপক ও জাঁকজমকপূর্ণ। আসছেন গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, নানা বিদ্যায় পারদর্শী নানা গুণী ও জ্ঞানী। রাজার তিলার্ধ সময় নেই।

অভিষেকের দুই রাত্রি আগে নবীন রাজা পরিশ্রান্ত ও চিন্তিতভাবে শয্যায় আরোহণ করে উপাধানে মাথা রেখে নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শরীর অত্যাধিক শ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও নিদ্রাবেশ হল না।

রাজা উঠে বসলেন এবং বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত চরাচরের দিকে বাতায়ন পথে চেয়ে রইলেন। অকস্মাৎ আকাশের বিশাল প্রসার ও রাত্রির ব্যাপ্তি দেখে তাঁর মুক্তির কথা মনে পড়ল। কে এমন যে, এই বিশাল পৃথিবীতে মুক্তি চায় না?

রাজা একজন দূতকে পাঠালেন কারাধ্যক্ষকে ডেকে আনতে।

কারাধ্যক্ষ ছুটে এলেন, আজ্ঞা করুন মহারাজ।

যে প্রবীণ বন্দি মুক্তির পরোয়ানাকে অবজ্ঞা করেছে তার অপরাধ কী তা বলতে পারেন?

কারাধ্যক্ষ নত মস্তকে বললেন, তিনি রাজাদেশ অমান্য করেছিলেন।

নবীন রাজা ধীর স্বরে বললেন, রাজাদেশ অমান্য করা ঘোর অপরাধ, কিন্তু তিনি রাজার কোন আদেশ অমান্য করেছিলেন?

মস্তক কণ্ডুয়ন করে কারাধ্যক্ষ বললেন, মহারাজ বয়োজ্যেষ্ঠ এই বন্দির বিচার করেছিলেন আপনার পিতা স্বর্গত মহারাজ, গুপ্তকক্ষে বিচার হয়েছিল। বন্দির অপরাধের কোনও বিবরণ কোথাও নথিভুক্ত নেই। তবে অপরাধ বিশেষ গুরুতর হওয়ারই সম্ভাবনা।

নবীন মহারাজ বললেন, বন্দি নিজে কিছু স্বীকার করেননি?

কারাধ্যক্ষ মাথা নেড়ে বললেন, না, তিনি বাক্যালাপ কমই করেন। তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্ভব নয়।

তিনি কি দাম্ভিক এবং দ্রোহভাবসম্পন্ন?

তাঁর মুখশ্রী গম্ভীর এবং বিষাদযুক্ত বটে, কিন্তু তাঁর মনোভাব অনুমান করা কঠিন। প্রস্তরবৎ একধরনের ভাব আছে মাত্র।

নবীন রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমাকে এই বন্দীর সকাশে নিয়ে চলুন।

নবীন রাজা যখন কারাকক্ষে উপনীত হলেন তখন প্রবীণ বন্দি প্রস্তরময় প্রাচীরগাত্রে দেহভার কিছুটা অর্পণ করে উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

রাজা সপ্রশ্ন নয়নে কারাধ্যক্ষের দিকে তাকালেন।

কারাধ্যক্ষ নিম্নস্বরে বললেন, উনি কখনও শয্যায় শয়ন করেন না।

এই সামান্য কথাটুকুর শব্দেই বন্দি জেগে উঠে রাজার দিকে তাকালেন। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, চোখে যেন সপ্তসূর্যের জ্যোতি বহ্নিমান। সেই চোখের সামনে নবীন রাজা কিছু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, তারপর

কারাধ্যক্ষকে ইঙ্গিতে বিদায় করে বয়স্ক মানুষের প্রাপ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে রাজা বললেন, আমি আপনার দর্শনাথী।

বন্দি সরলকাণ্ড বৃ,ক্ষের মতো ঋজু হয়ে বসলেন, তারপর ধীর স্বরে বললেন, আমাকে দেখার কিছুই নেই। আমি মৃত, মুক্ত, কলুষহীন।

নবীন রাজা মাথা নেড়ে বললেন, অবশ্যই কোথাও কোনও ভুল হয়ে থাকবে। আপনাকে অপরাধী বলে মনে হয় না। ভদ্র, দীর্ঘ কারাবাসে আপনি অনেক ক্লেশ সহ্য করেছেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, আপনি যদৃচ্ছা যেতে পারেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন, আপনি নিজেকে মৃত বলছেন কেন?

বন্দী তাঁর তীকষ্ন ও আক্রমণকারী দৃষ্টিতে রাজার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর বললেন, মৃত্যু কতরকম হয় তা কি আপনি জানেন, নব্যযুবা? আপনার দেহে রাজপুরুষের লক্ষণ প্রকট, সম্ভবত আপনি এ রাজ্যের ভাবী রাজা। এই নবীন বয়েসে আপনি মৃত্যুর রহস্য কতটুকুই বা উপলব্ধি করতে সক্ষম?

জ্যেষ্ঠ, আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শ্রবণ করতে চাই। আপনি মৃত্যু বিষয়ে বলুন।

প্রবীণ ধীর স্বরে বললেন, আপনার পিতা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেননি, কারণ তাতে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হত। তিনি আমাকে দেন দীর্ঘ কারাবাস, যাতে আমার যন্ত্রণা বহুগুণ হয়। এই বেঁচে থাকা যে মৃত্যুর চেয়ে কতদূর দুঃসহ তা শুধু ভুক্তভোগী জানে। নব্যযুবা, বহুদিন ধরে তিল তিল পরিমাণ বিষভক্ষণ করে গেলে যে ধীর-মৃত্যু মানুষকে আচ্ছন্ন করতে থাকে আমার দণ্ড তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু আপনার অপরাধ?

প্রবীণ মাথা নাড়লেন, আমার অপরাধ কোথাও নথিভুক্ত নেই। আমি তা বলতে অক্ষম।

ভদ্র, আমি কোনও স্বীকারোক্তি দাবি করছি না, সামান্য কৌতূহল নিবারণের আগ্রহ ছিল মাত্র। আপনার বলতে ক্লেশ হলে বলবেন না। আপনি এখন মুক্ত।

আমি চিরকালই মুক্ত। কারাগারেও মুক্ত, কারাগারের বাইরেও মুক্ত।

একথার অর্থ কী ভদ্র?

প্রবীণ মৃদু একটু হাস্য করলেন। বললেন, যে দহন এতকাল আমাকে দগ্ধ করেছে তা-ই ক্রমে অমলিন করেছে আমার আত্মাকে। যন্ত্রণার ভিতর দিয়েই কলুষ উদ্বারী হয়েছে। আজ এক প্রসন্নতায় আমার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত। আমার দেহটি কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে তা আর বড় কথা নয়।

নবীন রাজা উদার এক মহিমা বিকীরণ করে বললেন, জ্যেষ্ঠ, কারাগারের বাইরে আপনার স্বজনেরাও নিশ্চয়ই অপেক্ষামান। স্ত্রী পুত্র কন্যা?

প্রবীণ ভ্রূকুঞ্চন করলেন। তীকষ্ন দৃষ্টিতে রাজাকে অবলোকন করে বললেন, তারা কেউ কখনো আমার উদ্দেশ করেনি। তারা কেউ আছে কি নেই তাও আমি জানি না। অন্তর থেকে তাদের স্মৃতিও আমি অবলুপ্ত করেছি। আমি এখন একা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নবীন রাজা প্রশ্ন করলেন, আপনার গৃহ?

আমার গৃহ বলে এখন আর কিছু নেই। এই কারাগারই আমার গৃহ ছিল, এবার হয়তো গৃহ হবে বৃক্ষতল।

রাজা বিনীতভাবে বললেন, জ্যেষ্ঠ, যদি স্পর্ধা মনে না করেন তাহলে আপনি রাজঅতিথিদের বিশ্রামগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। আপনাকে বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আপনি বৈরাগ্যেও উপনীত হয়েছেন। আপনি ইচ্ছে করলে রাজকর্মেও নিযুক্ত হতে পারেন।

প্রবীণ সন্দেহাকুল নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আমার প্রতি আপনার এই দাক্ষিণ্যের কারণ কি নব্য রাজা? দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্য তো অনেক প্রার্থী রয়েছে আপনার চারপাশে।

নবীন রাজা তাঁর সরল দুখানি উজ্জ্বল চক্ষুতে চেয়ে বললেন, জ্যেষ্ঠ, আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বৈরাগ্য আমাকে আকর্ষণ করছে।

প্রবীণ কাঠোর কর্কশ কণ্ঠে ঈষৎ উচ্চগ্রামে বলে উঠলেন, আপনার পিতা দূরদর্শী এবং বহুদর্শী ছিলেন। আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য। আমার অপরাধ কী তা-ও আপনি ভালো করে জানেন না।

নবীন রাজা এতক্ষণ শান্ত ও স্থির ছিলেন। এখন কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে বললেন, জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রবীণ বন্দি অট্টহাস্য করে উঠলেন হঠাৎ, বললেন, জানলে আপনি ভ্রমক্রমেও আমাকে রাজকার্যে নিয়োগের প্রস্তাব করতেন না। বরং আমাকে নির্বাসন দিতেন।

নবীন রাজা বললেন, সেটাও অনুমান সাপেক্ষ।

প্রবীণ হঠাৎ নবীন রাজার দিকে চকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, স্বর্গত রাজার কোনও পুত্রসন্তানদি ছিল না। আপনি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। নবীন রাজা, আপনি কি জানেন, কোন রহস্যে আবৃত আপনার জন্মবৃত্তান্ত?

নবীন রাজা কোষবদ্ধ তরাবারিতে হাত রাখলেন। তাঁর চোখে সপ্ত সূর্যের জ্যোতি প্রতিভাত হল। তিনি প্রবীণ বন্দির দিকে চেয়ে অস্থালিত কণ্ঠে বললেন, মূর্খ, সে রহস্যের আভাস যদি অনুমানই না করতাম তাহলে এই দীন বন্দীনিবাসে নিশুতি রাত্রিতে আমার আগমন ঘটবে কেন?

প্রবীণ রাজার এই ভাবান্তরে এবং কথায় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। বাক্য স্ফুরিত হল না মুখে। তবে তাঁর চোখ দুখানি ধীরে ধীরে কোমলতায় আচ্ছন্ন হল। বাষ্পাকুল হয়ে গেল। নবীন রাজার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তেজ আছে বটে। না হবে কেন? পুত্রেরা পিতার মতোই হয়ে থাকে।
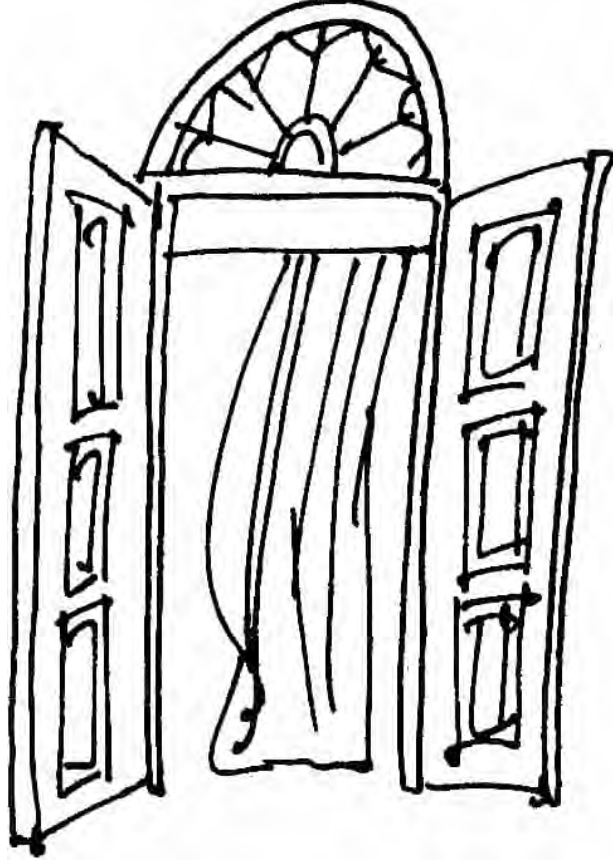
কথোপকথন

সকাল বেলায় একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েকে বাগানের ফটকের সামনে দেখতে পেল জগন্নাথ। সে একজন গোয়েন্দা এবং ছোটোখাটো বৈজ্ঞানিক। বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

খুকি, কী চাও?

তুমি কি ডিটেকটিভ?

হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

কাল রাতে একজন লোককে আমার বাবা খুন করেছে, জানো?

তোমার বাবা! জগন্নাথ খুবই অবাক হয়ে বলে, কাকে খুন করেছেন?

বুধুদাকে।

বুধুদা, সে কে?

আমাদের বাড়িতে কাজ করত। খুব ভালো লোক। রাত্তিরে চোখে দেখতে পেত না। একটা পা একটু খোঁড়া। কী সুন্দর যে পুতুল গড়তে পারত!

তাকে তোমার বাবা খুন করল কেন?

ঠোঁট উল্টে মেয়েটা বলে, কে জানে? বাবা ভীষণ রাগী তো।

তোমার নাম কী?

অপরাজিতা।
তোমার বাবার নাম?
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।
কোথায় থাকো তোমরা?
সাহেব বাগান, কাছেই। কামারপাড়া দিয়ে একছুটে চলে যাওয়া যায়।
তোমার বাবা কী করেন?
অ্যাস্ট্রোলজার।
জ্যোতিষী?
হ্যাঁ।
এসো, আমার বাড়িতে এসো। তোমার কাছে সবটা শুনি।
তুমি কি বাবাকে ধরে পুলিশের হাতে দেবে?
আগে তো ঘটনাটা শুনি।
মেয়েটা জগন্নাথের পিছু পিছু আসে। বাইরের ঘরের সোফায় বসে নিঃসঙ্কোচে। তারপর চারদিকে চেয়ে চেয়ে অবাক চোখে দেখতে থাকে দেয়ালের হরেক ছবি, হরিণের সিং, শো কেসের পুতুল।
জগন্নাথ তার মুখোমুখি বসে বলে, বুধুদাকে তুমি খুব ভালোবাসতে বুঝি?
খুব। ভীষণ।
কী করে খুনটা হল?
বাবা বুধুদাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিল।
কেন?
তা তো জানি না, বোধ হয় বুধুদার ওপর খুব রাগ ছিল।
ঘটনাটা কখন ঘটেছে?
কাল রাতে।
তখন ক'টা বাজে জানো?
না, তবে অনেক রাত।
তুমি তখন কী করছিলে?
ঘুমোচ্ছিলাম।
তাহলে কী করে খুনটা দেখলে?
বুধুদা খুব চিৎকার করেছিল যে। আমার বিছানার পাশেই জানালা, সেটা খোলা থাকে। বুধুদা পড়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলল, অপু, আমাকে তোমার বাবা ঠেলে ফেলে দিল। আমি পড়ে যাচ্ছি।
তারপর?
বুধুদা পড়ে গেল।
মরে গেল?
ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেলে মরবে না? আমি উঠে জানালার ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম বুধুদা নীচে পড়ে আছে। এমন সময় বাবা গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে বলল, অপু, শুয়ে পড়ো। তুমি স্বপ্ন দেখেছো।
সত্যিই স্বপ্ন নয় তো?
না, না।
সকালে উঠে বুধুদার লাশটা আর দেখতে পাওনি?

না, বাবা নিশ্চয়ই সেটা সরিয়ে ফেলেছে।
কোথায়, তা জানো?
না, আমি বাবার বকুনি খেয়ে তক্ষনি ঘুমিয়ে পড়ি।
ঘুম এল?
এল। নইলে বাবা বকবে যে।
বাবাকে কি তুমি খুব ভয় পাও?
খুব। বাবা ভীষণ রাগী।
বাবার সব কথা শোনো?
শুনি।
তোমার বাড়িতে আর কে আছে?
কেউ নেই। শুধু বাবা, বুধুদা আর আমি।
তোমার মা নেই?
না, মাকে তো বাবা কবেই মেরে ফেলেছে।
বলো কী?
সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। মা আমাকে সন্ধেবেলায় ঘুম পাড়াচ্ছিল। বাবা পা টিপে টিপে পিছন দিক থেকে এল। আমাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বলল। বাবার হাতে একটা হাতুড়ি। তারপর দুম করে মার ঠিক মাথার ওপর বাবা হাতুড়ি দিয়ে এমন মারল যে মা একটাও কথা বলতে পারল না।
তোমার চোখের সামনে?
হ্যাঁ।
তুমি তখন কী করলে?
কিছু না, বাবা আমাকে চুপ করে থাকতে বলল, আমি তাই চুপ করে রইলাম।
তোমার মার মৃতদেহটা বাবা কী করল?
বাথরুমে রেখে দিয়ে এল। লোকজন জড়ো হলে সবাইকে বলল, মা পা পিছলে পড়ে গেছে।
তুমিও তাই বললে?
হ্যাঁ, বাবা আমাকে যা করতে বলে আমি তাই করি।
বাবাকে কি তুমি ভালোবাসো?
হ্যাঁ, খুব।
ভয়ও পাও?
হ্যাঁ, খুব পাই।
এবার বলো তো, আমার কাছে তোমাকে কে পাঠিয়েছে?
অপরাজিতা তার সুন্দর মুখখানা ভাসিয়ে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, কেউ না। আমি নিজেই এসেছি।
আমি যে গোয়েন্দা তা তোমাকে কে বলেছে?
আমার ইসকুলের বন্ধুরা।
তোমার বাবাকে যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তাহলে তোমার কেমন লাগবে?
অপরাজিতা একটু চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

যদি তোমার বাবার ফাঁসি হয়, তাহলে?
আমি খুব কাঁদব।
তবে তুমি কেন বুধুদা আর তোমার মায়ের খুন হওয়ার কথা আমার কাছে বললে?
কারু কাছে তো বলতে হবে।
তাই নাকি? আজ সকালে বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে, না? সত্যি করে বলো তো?
অপরাজিতা গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, বাবা আমাকে থাপ্পড় মেরেছে।
কেন, তুমি কি করেছিলে?
বাবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পিঁপড়ে দেখছিলাম।
পিঁপড়ে! কোথায়?
আমাদের বাগানে করবীগাছের তলায়। এক জায়গায় মাটি কোপানো আর সেখানে অনেক পিঁপড়ে। বাবা এসে একটা চড় মেরে আমাকে তুলে নিয়ে এল। বলো, রাগ হবে না?
তুমি খুব কাঁদলে বুঝি?
হ্যাঁ।
বুধুদা ছুটে এসে তোমাকে কোলে নিল না?
নিল, বলেই অপরাজিতা জিব কাটল।
জগন্নাথ একটু হাসল, তারপর বলল, তোমার মা সত্যিই বাথরুমে পড়ে গিয়ে মারা যান, তাই না?
অপরাজিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
বাড়ি যাও। বাবার ওপর অত রাগ করতে নেই।
অপরাজিতা লজ্জিত মুখে উঠল। তারপর এক ছুটে পালিয়ে গেল।
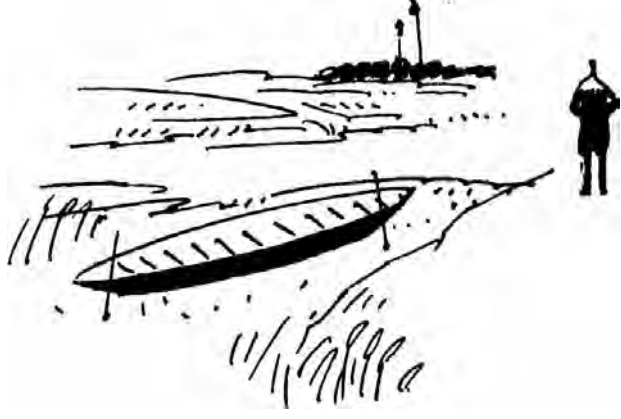
খুনি

শুভঙ্করকে যদি খুনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে কিছু তথ্যগত ত্রুটি থেকে যাবে। কারণ, বস্তুত শুভঙ্কর এখনও কাউকে খুন করেনি। কিন্তু তাকে যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানে তারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে শুভঙ্করের মধ্যে যাকে কিলর ইনস্টিংট বলে, তা আছে। সবচেয়ে বেশি জানে সে নিজে।

শুভঙ্করের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ডান হাতে ঘড়ি বাঁধে। ঘড়িটা খুব শক্ত করে বাঁধে না। ঢিলে চেন-এ বাঁধা ঘড়িটা ঢলঢল করে। হাত নাড়লে ছপাৎ করে চেন-এর শব্দ হয়। বাঁ-হাতে স্টেনলেস স্টিলের একটা বালা, যেমন শিখদের হাতে থাকে। সে লম্বা চুল আর জুলপি রাখে, গোঁফ রাখে না। বিশাল তার কাঁধ, অসম্ভব পেশিবহুল হাত। জামার বুকের ওপরের তিনটে বোতাম সে কখনও আটকায় না। ফলে তার রোমশ এবং ফরসা বুক দেখা যায়। খুব চাপা প্যান্ট পরে। ফলে উরু ফুলে থাকে প্যান্টের ওপরে। শক্ত আর ভারী জুতো পরতে সে ভালোবাসে। অনেকটা লম্বাও শুভঙ্কর। ফরসা, বলিষ্ঠ, আক্রমণাত্মক চেহারা।

চরিত্র অবশ্য খুবই সরল—হাসির ব্যাপার ঘটলে হাসতে-হাসতে বেহেড হয়ে যায়। ফুটবল বা ক্রিকেটের মাঠে দর্শক হয়ে গিয়েও সে তুলকালাম চেঁচায় হা-হা করে। অল্পেই ভীষণ উত্তেজিত হয়, আবার অল্পেই ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রচণ্ড আড্ডা মারতে ভালোবাসে। খাওয়া তার প্রচণ্ড প্রিয় বিষয়। যখন খায় তখন মনে হয় জিঘাংসাবশে খাচ্ছে। সে সময়ে কারও দিকে তাকায় না, কথা বলে না, অন্যমনস্ক হয় না। ঘুমও তার অসম্ভব প্রিয়। যখন ঘুমোয় তখন অতলে তলিয়ে যায়। ছুটির দিন হলে, কাজ না থাকলে একঘেয়েমি লাগলে সে সোজা গিয়ে বিছানা নেয়। ঠিক একমিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড সিনেমাও দেখে সে। সপ্তাহে তিনটে-চারটে। বেশিরভাব নাইট-শো। আর তার প্রিয় হচ্ছে মহিলাবৃন্দ। কোনও বিশেষ মহিলার প্রতি নয়, কিংবা কেবল সুন্দরীদের প্রতিই নয়, সাধারণভাবে যে-কোনও মেয়েই তার জীবনপথে রাস্তা পার হয় তার প্রতিই সে মনোযোগী। অবশ্য এ-কথাও সত্য, যে, মহিলাদের মধ্যে কাউকেই সে কখনও তেমন করে পায়নি। বার-দুই দুজন মহিলা তাকে কারণবশত চড় মেরেছিল বলেও শোনা যায়। আবার প্রেম নিবেদন করছে, এমনতর মহিলাও আছেন।

হোসেন নামে এক বন্ধু আছে শুভঙ্করের। অবশ্য বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হোসেনের বয়েস শুভঙ্করের চেয়ে অনেক বেশি। হোসেনের চুল এবং দাড়ি যথেষ্ট পাকা, চলন-বলন ধীরস্থির। রোগা এবং আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মানুষ সে। কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাথে তার একটা বইয়ের দোকান আছে, আর আছে একটা ছোটমতো বই-বাঁধাইয়ের কারবার। পাজামা আর শার্ট পরে শীত-গ্রীষ্ম,

খালসিটোলায় দিশি খায়, মাথার টাক ঢাকতে একটা মুসলমানী এবং মাড়োয়ারির মাঝামাঝি কায়দার কালো টুপি পরে। লোকে বলে, সে আসলে কায়েতের ছেলে, দেশের গ্রামে এক নষ্টচরিত্র ঘটনা ঘটার পর থেকে নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতার জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তা হোসেন বেশ ভালো জ্যোতিষী। পুরোনো পুঁথিপত্র ঘেঁটে সে বিস্তর জ্যোতিষ শিখেছে। তার সংগ্রহে অন্তত পঞ্চাশখানা দুর্লভ জ্যোতিষশাস্ত্রঘটিত বই আছে। সে সকলের হাত আর কোষ্ঠী বিচার করে।

শুভঙ্কর তার দোকান থেকে কয়েকবার বই কিনেছিল। খুব সহজেই শুভঙ্করের বন্ধু হয়ে যায় অচেনা লোক, তুই-তোকারির সম্পর্কে এসে যায়। হোসেনও সেরকমভাবেই বন্ধু হয়েছিল।

সেই হোসেনই একদিন তার হাত দেখে বলে, দ্যাখ শুভ, তোর সব ভালো কিন্তু তোর মধ্যে খুনির ইনস্টিংট আছে।

কী করে বুঝলি?—বলে শুভঙ্করও নিজের হাত দেখতে থাকে।

রেখা তো আছেই। তার ওপর তোর দুটো হাতের বুড়ো আঙুলের আকার দেখেও বোঝা যায়।

খুন করব নাকি রে?

করবি।

যাঃ।

মাইরি। সাবধানে থাকিস।

কথাটা উড়িয়ে দেয়নি শুভঙ্কর। ছিটেফোঁটা সত্য ওর মধ্যে আছে। সে নিজেও ছেলেবেলা থেকে টের পায় যে, কাউকে-কাউকে তার প্রায়ই খুন করতে ইচ্ছে হয়।

হোসেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, অবশ্য ভেবেচিন্তে খুন করা নয়। কোল্ড ব্লাডেড বা প্রিমেডিটেটেডও নয়। দুম করে রাগের বশে করে ফেলতে পারিস। রাগ করতে সাবধান।

রাগটা অবশ্য শুভঙ্করের কিছু বেশি। রাগলে সে পাগলের মতো চেঁচায়। রাগলে সে নাচে। রেগে গেলে পৃথিবীটাই তার কাছে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

হোসেন তাকে খালাসিটোলায় নিয়ে গিয়ে দিশি মদের মজা শেখাল। সে ভারী মজা। প্রথম ঝাঁঝ আর স্বাদ পার হয়ে মদের হৃদয়ে পৌঁছে যেতে পারলে এক কেরিকেটেড জগৎ— কথাটা হোসেনই তাকে বলেছিল।

তুই যে বলিস আমি খুন করব, সে কি সত্যি?—শুভঙ্কর একদা দিশি মদে তার ভেলা ভাসিয়ে কেঁদে বলেছিল, সকলের সামনে।

পাশে একটা ভিতু ঠেলাওলা বসে ছিল। কথাটা কানে যেতে সে উঠে অন্যপাশে সরে বসে।

হোসেন গম্ভীরভাবে বলে, সত্যি।

করবই?

করবিই।

শুনে শুভঙ্কর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তবে শালা—।

হোসেন হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলে, আজ থাক।

না, আজই। করব যখন, এখনই করে ফেলি।

পরে করিস।

শুভঙ্কর বায়না করতে থাকে, না, আজই।

হোসেন বিরক্ত হয়ে বলে, মজাটা নষ্ট করিস না। এতগুলো লোক তেষ্টা মেটাতে এসেছে, এখানে ব্লাডশেড করলে সবাইকে তেষ্টা নিয়েই পালিয়ে যেতে হবে।

না, এখানেই। একটা খুন, মাত্র একটা!—শুভঙ্কর প্রায় কেঁদে ফেলে।

হোসেন গম্ভীর হয়ে বলে, কী দিয়ে করবি? ছোরা-টোরা আছে?

না তো!

তবে? বসে যা। ভালো করে খা, ফেজটা কেটে যাবে।

গেলও।

শুধু হোসেন নয়, আরও কয়েকজন বলেছে। যেমন কুমকুম নামে একটি মেয়ে একবার বলেছিল, আপনার যা চেহারা ঠিক গুন্ডার মতো।

নাকি।

সত্যি, আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি, আপনি টগরকে গলা টিপে মেরে ফেলেছেন।

সত্যি?

বিশ্বাস করুন। স্বপ্ন যদিও, কিন্তু স্বপ্ন তো লোকে এমনি-এমনি দ্যাখে না? কিছু একটু সত্যি থাকেই।

টগরকে খুন করার অবশ্য কোনও কারণ নেই। টগর শুভঙ্করদের বাড়ির পুরোনো চাকর। তার বয়স আশির ওপরে। সে চোখে ভালো দ্যাখে না। কানে শোনে না। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এ-বাড়িতে চাকরের কাজ করার পর সে ঝিম মেরে গেছে। ভুল বকে, ভুল করে, ভুল শোনে। এমনিই একদিন মরে-টরে যাবে। ভীমরতি খুব হয়েছে এখন। তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে শুভঙ্কর। বাড়ির সবাই বাসে। শুভঙ্করের মা তাকে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খাওয়ায়। তবু শুভঙ্কর ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখে। একটু ভয় হয়। নিজের দু-হাতের বুড়ো আঙুল নিয়ে চিন্তা করে, হাতের রেখা নিয়ে ভাবিত হয়। তার ভিতরে অবিশ্বস্ত খুনি কি সত্যিই লুকিয়ে আছে?

শুভঙ্কর সম্প্রতি একটা বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে। এ-গ্রেড কোম্পানির জুনিয়র অফিসার। প্রচুর টাকা কামায়। চাকরিটা অবশ্য ধরা-করা করে হয়েছিল। তার এক বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী জ্যাঠামশাই আছেন। আত্মীয় নন, ডাকের জ্যাঠামশাই। তিনি অনেককে চাকরি দিয়েছেন, শুভঙ্করকেও। শুভঙ্কর প্রচুর টাকা মাইনে প্রায়, কিছু করার নেই অত টাকা দিয়ে। সে ওড়ায়।

মাসের প্রথম দিকে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গিয়ে হাল্লা-চিল্লা আর খানা-দানা করে। মেয়েছেলেদের নাচ দেখে। একদিন একটা বড় রেস্তরাঁর বেয়ারা টিপস নিয়ে তাকে সেলাম দেয়নি। শুভঙ্কর এত রেগে গিয়েছিল যে বলার নয়।

সোজা উঠে গিয়ে সে বেয়ারাটার ঘাড় ধরে টেবিলের সামনে হিঁচড়ে নিয়ে এল, মাথার টুপি ফেলে দিল ঝাপড় মেরে। মাথাটা নুইয়ে ধরে প্রচণ্ড ঘুষি তুলেছিল। বন্ধুরা ধরে ফ্যালে।

সেই ঘটনার সাক্ষী সুদেব পরে নেশা কেটে গেলে ওই একই কথা বলে, তোর ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর ক্রুয়েলটি আছে।

সেই রেস্তরাঁর গোলমালটা অবশ্য অনেক দূর গড়ায়। সব বড় রেস্তরাঁতেই ভাড়া-করা কিছু মস্তান থাকে, মাতালদের সামলায়। শুভঙ্করের সেই কাণ্ডের পর তারা এসে তাকে দলবলসুদ্ধ প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

অপমানটা শুভঙ্কর ভোলেনি। বলে, কেন?

রেস্তরাঁর বেয়ারাটা আর-একটু হলে খুন হয়ে যেত।

যাঃ!

সত্যি। তোকে পুরো খুনির মতো দেখাচ্ছিল।

দুর!—শুভঙ্কর উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

সুদেব সিরিয়াসভাবে বলে, উড়িয়ে দিও না বাপ, আর-একটু হলে খুনটা হয়ে যেতে পারত।

কীভাবে?—শুভঙ্কর অবাক হয়ে বলে, কী ভাবে হত? একটা ঘুষি খেয়ে লোকটা মরে যেত নাকি?

ঘুষি নয়, চাঁদু—তোমার হাতে খাওয়ার ছুরিটা ছিল যে।

ছিল?

আলবাত। সেটা নিয়েই তো তুই উঠে গেলি। লোকটাকে ধরে ছুরিসুদ্ধ হাত ওপরে তুলেছিলি মারবার জন্যে।

শুভঙ্কর শিউরে ওঠে। খুব বেঁচে গেছে সে। সে নিজের হাতের বুড়ো আঙুল দুটোর দিকে চেয়ে থাকে। আঙুল দুটোর মাথা মোটা, চওড়া—অন্য আঙুলগুলোর সঙ্গে সে-দুটোর অনেক পার্থক্য।

সানি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে লেক-এ বসেছিল শুভঙ্কর। সন্ধেবেলা। এই সময়টার শুভঙ্করের অবসরপ্রাপ্ত বাবাও আরও কয়েকজন বুড়োমানুষের সঙ্গে লেক-এর ধার ধরে হাঁটাহাঁটি করেন। এখন হেমন্তকাল। তাই কিছু হিম পড়ে। বুড়োমানুষদের পক্ষে ঠান্ডাটি ভালো নয়। উপরন্তু লেক-এর গাছগাছালি থেকে বিশ্রামরত পাখিরা আচমকা গায়ে-মাথায় পুরীষ বর্ষণ করে। তাই শুভঙ্করের বাবা একটা ছাতা নিয়ে যান। সেইটে মাথায় ধরে হাঁটলে, ঠান্ডাও লাগে না, পাখিদের অবিমৃষ্যকারিতা থেকেও আত্মরক্ষা চলে।

সানিকে নিয়ে লেক-এ বসে প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা বলার সময়ে সে হঠাৎ বাবাকে দেখল। ছাতা মাথায় কয়েকজন বুড়োর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখে সতর্ক হওয়ার কিছু নেই। ছানি-কাটা চোখে এখন আর অতটা দৃষ্টিশক্তি নেই। তার ওপর শুভঙ্কর সানিকে নিয়ে একটু অন্ধকার ঘেঁষে বসেছে। বাবা বুঝতে পারবেন না।

শুভঙ্কর সানির কানে-কানে বলল, সানি, ওই তোমার হবু শ্বশুর যাচ্ছে।

কই, কোথায়?—বলে সানি কৌতূহল দেখায়।

এরকম অনেক মেয়েকেই বলে শুভঙ্কর। শেষ পর্যন্ত তার বাবা যে কার শ্বশুর হবেন সে-বিষয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা আছে।

ওই যে, ছাতা মাথায়।

অনেককে দেখছি—চার-পাঁচজন। ওরা সবাই কি শ্বশুরশিপের জন্যে অ্যাপ্লিক্যান্ট নাকি?

যাঃ!—লজ্জা পেয়ে শুভঙ্কর বলে, ওই যে রোগা মতো—সামনের জনের পরে যে যাচ্ছে।

তোমার বাবা?—সানি এই বলে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দেখবার চেষ্টা করে। ঠিক এসময়ে কতগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া ওপাশ থেকে বুড়োদের উদ্দেশ করে সুর করে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর...।

বুড়ো মানুষরা এই আওয়াজ শুনে দ্রুত হাঁটেন। একজন ম্লান স্বরে অন্যজনকে বলেন, নাতিরা কী বলছে শুনছেন?

অন্যজন, অর্থাৎ শুভঙ্করের বাবা উত্তর দেন, ওরা বুঝবে কী? বয়েস হলে বুঝবে ছাতার কেন দরকার হয়।

কিন্তু অপমানটা সহ্য করতে পারেনি শুভঙ্কর। বিশেষত যখন সানি সঙ্গে রয়েছে এবং সবই শুনতে পাচ্ছে।

ছোঁড়াদের আওয়াজ শুনে সানি হেসে ফেলে, কী বলছে শুনেছ? মা গো। পারেও দুষ্টু ছেলেরা বুড়োদের খেপাতে।

শুভঙ্কর সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারে যে, তার ভিতরে সত্যিই খুনি ইনস্টিংট আছে।

এই শালা!—বলে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল সে।

ডান হাতে ঘড়ি, বাঁ-হাতে বালা, লম্বা, ঝাঁকড়া চুল মাথায়। তার চেহারাটা তখন সাংঘাতিক দেখাচ্ছিল। সে প্রায় ছেলেগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সব ছেলেই কিছু ষণ্ডাগুন্ডা নয়। এই ছেলেগুলো ভিতু টাইপের ছিল। শুভঙ্করের চেঁচানি শুনে পালাল তারা।

বাবাকে অপমান! অ্যাঁ, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা!

ছেলেগুলো দৌড়ঝাঁপ করে পালিয়ে গেল। সন্ধেবেলাটা খাট্টা হয়ে গেল একেবারে। সানি পরে বলল, শুভ, তোমাকে বিয়ে করতে ভয় হয়।

কেন?

তুমি বড় হুট করে রেগে যাও যে!

এরকম অপমান দেখলে রাগব না? বাঃ!

সানি গম্ভীর হয়ে বলে, অত রাগবার মতো কিছু বলেনি তো ছেলেগুলো। রাস্তাঘাটে এর চেয়ে অনেক খারাপ আর অপমানকর কথাবার্তা আমাদের কানে আসে।

শুভঙ্কর কিন্তু লজ্জিত হয়েছিল, বলল, হুঁ।

ছেলেগুলো ভালো।—সানি বলে, অন্যরকম ছেলে হলে তোমাকে ছেড়ে দিত না। শুভ, যখন সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকে, তখন ওরকম বেহেড হতে নেই। মারপিট লাগলে আমি কী করতাম?

হুঁ!—শুভঙ্কর চিন্তান্বিত হয়ে বলে।

এটুকুতেই যদি এত রাগ হয়, তো সত্যিকারের তেমন কিছু হলে তো তুমি খুনও করতে পারো।

শুভঙ্করের বুকটা চমকে ওঠে। সেই যন্ত্রণা। হোসেন তাকে বলেই দিয়েছে, সে একদিন খুন করবে। কথাটা কি অমোঘ?

ঘটনাটা ঘটল এভাবে।

একটা মেঘলা ছুটির দিনে দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে শুভঙ্কর আর বন্ধুবান্ধবীরা ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে গেল। দুটো গাড়ির মধ্যে একটা হচ্ছে দামি শেভ্রলে, তার মালিক জয়ন্ত। জয়ন্তর সঙ্গে শুভঙ্করের খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক নয়। জয়ন্তকে শুভঙ্কর সহ্য করতে পারে না। ও বড়লোক, ভালো ছাত্র, ভালো স্পোর্টসম্যান, মেয়েরা জয়ন্তকে সামনে পেলে আর কারও দিকে তাকায় না। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু স্বাভাবিক জন্মগত গুণ জয়ন্তর আছে। তার স্বভাব চমৎকার। সবসময়ে হেসে কথা বলে, কথায় ভরা থাকে সহৃদয়তা, ক্ষমা, দয়া ও মমতা।

এ-ছেলেকে কি সহ্য করা শুভঙ্করের পক্ষে সম্ভব? তাই জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলার সময় সবসময়েই শুভঙ্করের কথাবার্তায় একটা ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ এসে যায়। যেমন জয়ন্ত যখন গাড়িটা মনোযোগ দিয়ে চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে, তখন পিছন থেকে শুভঙ্কর বলল, জয়, তোর গাড়ির ইঞ্জিনে একটা শব্দ হচ্ছে কেন রে?

কীসের শব্দ?

গোলমেলে শব্দ।

আমি পাচ্ছি না। জয়ন্ত বলে।

আমি পাচ্ছি। —শুভঙ্কর বলে।

মানময়ী নামে যে অসাধারণ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে জয়ন্তর প্রেম, সে সামনের সিটে ওর পাশে বসে ছিল। সে হঠাৎ কৌতুকের চোখে সানগ্লাসটা খুলে পিছু ফিরে শুভঙ্করের দিকে চেয়ে বলে, আপনি কি গাড়ির এক্সপার্ট?

শুভঙ্করের ভয়ঙ্কর রাগ হল। না, সে গাড়ি চালাতেও জানে না। সে মাথা নাড়ল।

মানময়ী হেসে বলল, কোনও ভয় নেই, শুভঙ্করবাবু। গাড়ির কোনও ডিফেক্ট নেই। আমিও তো গাড়ি চালাই, তাই জানি।

পিকনিকের জায়গায় গিয়েও নানারকম ঝামেলা হচ্ছিল। যেমন, শুভঙ্কর ভালো সাঁতারু নয়, আর জয়ন্ত দুর্দান্ত সাঁতার দেয়। জলে নেমে জয়ন্তর সঙ্গে কমপিট করতে গিয়ে সে নাকানি-চোবানি খেল। অকারণেই প্রায় তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল।

মেয়েরা সঙ্গে আছে বলে মদের ব্যবস্থা ছিল না। এককেটে সফট ড্রিংকস আনা হয়েছে।

শুভঙ্কর ঠাট্টা করে বলে, জয়ন্তটা মেয়েছেলে হয়ে গেছে। এই কোক কিংবা লেমনেড তো মেয়েদের ড্রিংকস।

আবার মানময়ী ঠাট্টা করে বলে, আপনি খুব মস্ত পুরুষ নাকি! ড্রিংক করলেই পুরুষ হয়?

না, না, তা বলিনি।

যান না, গাঁয়ের দিকে গেলে চোলাই পেয়ে যাবেন।

ঝগড়া নয়, কিন্তু সকলের সামনেই একটা অপমান।

জয়ন্ত দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। শুভঙ্কর গান জানে না। কিন্তু মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে জয়ন্তকে ঘিরে আছে। তার মধ্যে সানি বা কুমকুমও রয়েছে। শুভঙ্কর বুঝতে পারে, তার চেহারা বা গুণাবলী জোর মার খেয়ে যাচ্ছে জয়ন্তর কাছে। তাই সে একসময়ে দলছুট হয়ে গেল অভিমানে। একা একা গঙ্গার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বেড়াতে লাগল। শীতের নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে নৌকোয়। একটা হালকা মেঘ দূরে ঘুড়ির মতো স্থির হয় আছে আকাশে। ওপারে বনরাজিনীলা। কিন্তু প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করে না। ভেতরে ভেতরে একটা অসম্ভব ফাটো-ফাটো প্রতিশোধস্পৃহা।

যখন সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, পাতা শতরঞ্চিও তোলা হয়ে গেছে, তখনও জয়ন্ত আর তিনটে ছেলে ঘাসে বসে তাস খেলছিল। তাগাদা দিতেই তারা বলে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আর পাঁচমিনিট, এই ডিলটা শেষ হলেই—।

সকলেই বিরক্ত। সন্ধে হয়ে আসছে। প্রচণ্ড শীত। ওরা তার মধ্যে একটা ডিল শেষ করে আর-একটা শুরু করে দিল।

শুভঙ্করের রাগটা ছিলই। সে ধমক দিয়ে বলল, দু-মিনিটের মধ্যে না উঠলে সব হাঁটকে মাটকে দেব।

খেলোয়াড়দের একজন বলে, তাই নাকি? দে না। জিওগ্রাফি পালটে যাবে। বারো টাকা হারছি, ইয়ার্কি নয়।

জয়ন্তও বলে, তোরা অন্য গাড়িটায় চলে যা। আমরা পরে যাব।

কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শুভঙ্কর মনে করল যে, এটা তাকে ইচ্ছাকৃত অপমান। আবছাভাবে তার নিজের কিলার ইনস্টিংটের কথা মনে হল। রাগে অন্ধ হয়ে গেল বোধ বুদ্ধি।

সে লাফিয়ে পড়ে দুই লাথিতে ছিটকে দিল সকলের হাতের তাস। জড়ামড়ির মধ্যে একটা নির্ভুল লাথি কষাল জয়ন্তর পেটে। সবাই অবাক। তারপরই লাফিয়ে উঠে সবাই তাকে ধরতে চাইছিল।

শুভঙ্কর এক ঝটকা মেরে ছুটে গেল। মস্ত একটা ডেগের মধ্যে, বঁটি, ছুরি, হাতা-খুন্তি সব ভরা হয়েছে—ডেগটা তোলা হয়েছে গাড়ির ক্যারিয়ারে। শুভঙ্কর গিয়ে সেটার ভেতর থেকে মাংসকাটা ছুরিটা টেনে নিয়ে এল।

সবাই বাধা দিচ্ছে, জয়ন্ত লাথি খেয়েও উঠে দাঁড়িয়েছে অবাক হয়ে। শুভঙ্কর সকলের হাত ছাড়িয়ে তার দিকেই ছুটে গেল।

কিছুই হয়নি।

হোসেনের কথাটা ফলেনি আজও।

কী করে ফলবে? ছুরি হাতে যখন ছুটে যাচ্ছিল শুভঙ্কর, তখনও নিশ্চিত সে জানত, আজই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটবে। যা কখনও ঘটেনি, কিন্তু ঘটার অপেক্ষায় আছে।

সে তাই নিশ্চিত সেই পরিণতির দিকে বইয়ে দিয়েছিল নিজেকে। দৌড়ে গিয়ে সে জয়ন্তর সামনে একটা হাত তুলে কী একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠেছিল।

জয়ন্ত তার ব্যথাতুর মুখখানায় সামান্য হাসি হেসে বলল, দুর শালা, ওভাবে লাথি মারতে আছে! খুব লেগেছে রে!

মানুষ এরকম নরম সহৃদয়ভাবে তার আক্রমণকারীর সঙ্গে কথা বললে মারা যায়?

সবাই শ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজে যখন রক্তপাত এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছে তখন জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে শুভঙ্করের কাঁধ ধরে বলল, আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যা।

শুভঙ্কর হতভম্ব হয়ে বুঝল, সে পারেনি। জোর বেঁচে গেছে।

হোসেন বলে, খুব সাবধান, শুভ। তুই একদিন খুন করবি।

শুভঙ্কর বলে, যাঃ।

হোসেন বলে, করবিই।

শুভঙ্কর বড় ম্লান হয়ে যায়, আবার ভাবে, আমার মধ্যে যে অচেনা লোকটা আছে, যে খুনি, তাকে একবার পেলে হত।

শুভঙ্কর বলে, করব। শুভঙ্করকে।

জ্বালানী

নগেন সামতাবেড়ের গো-হাটায় যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল। উঠোনে তার পটল তৈরি হয়ে আছে। পটলখানা গত বছরই কিনেছে নগেন। পেল্লায় সাইজ। পিছন দিকে চারখানা স্লট আছে, তাতে চারখানা বড় সড় গরু অনায়াসে এঁটে যাবে।

দৈ-চিঁড়ে খেয়ে ঠাকুর-প্রণাম সেরে কাঁধে লাল টুকটুকে গামছাখানা ফেলে নগেন যখন রওনা হচ্ছে তখন তার বউ দাক্ষী এসে বলল, ওগো, আমাদের যে এফ-টু ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে।

রওনা হওয়ার মুখেই খিটকেল। এফ-টু হচ্ছে ফুয়েল নম্বর দুই। তা এই দু'নম্বর জ্বালানী গাঁ গঞ্জের মানুষের জন্যই তৈরি হয়। রান্নার আগুন থেকে ঘরবাড়ির আলোর ব্যবস্থা সব ওই এফ-টু থেকে। একখানা থান ইট সাইজের জিনিস একটা চেম্বারে ঢুকিয়ে একটা সুইচ টিপে দিলেই হল। দু'বছর হেসে খেলে চলে যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, এই অঞ্চলে এফ-টুর এজেন্ট হল হরিরাম। নগেনের ছেলে লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে হরিরাম তার মেয়ে সরস্বতীর বিয়ে দিতে চায়। নগেনের একটু আপত্তি হচ্ছে তাতে। হরিরামের সঙ্গে বর্ণগোত্রের কোনও অমিল হচ্ছে না, কিন্তু সরস্বতী মেয়েটা হল এনার্জি ইনজিনিয়ারিং আর নন-কনভেনশনাল ফুয়েল রিসার্চে ডক্টরেট। থাকে দক্ষিণমেরুতে। নগেনের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। সে থাকে ভিয়েনায়। এই দুজনের মিলমিশ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে নগেনের সন্দেহ আছে। তাই সে আপত্তি তুলেছে। ফলে হরিরাম তার ওপর খুব চটা। এফ-টু জিনিসটার উৎপাদন কম, সরবরাহ ভালো নয়। আসেও মেলা দূর থেকে। প্রচণ্ড চাহিদা। হরিরাম যদি দিলে দিল, না দিলে কিছুই করার নেই।

নগেন একটু বিরক্তি হয়ে দাক্ষীকে বলল, তা এসব আগে বলতে হয়। এফ-টু পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! হরিদা যদি বেঁকে বসে তাহলেই তো হয়ে গেল। দেখি কি করা যায়। দুর্গা, দুর্গা!

নগেন পটলের ভিতর ঢুকে পড়ল। পটল হয়ে ইস্তক যাতায়াতের দুঃখ ঘুচেছে। সময়ও মেলা বেঁচে যায়।

সামতাবেড়ে বেশি দূর নয়। সুতরাং নগেন পটলকে মাত্র একশো কিলোমিটার স্পিডে সেট করে চালু করে দিল। পটল বাবাজী সামনের দিকটা আকাশমুখো তুলে চোঁ করে শূন্যে উঠে পড়ল দু হাজার ফুট ওপরে ওঠার পর সেন্ট্রাল কন্ট্রোল থেকে নানারকম নির্দেশ আসতে লাগল। এই নির্দেশটা খুবই জরুরি। কারণ আকাশে হাজারে বিজারে পটল, আলু, কুমড়ো, শিশি-বোতল, বাটি, বাক্স নানা আকারের গগন-যান ওড়াউড়ি করছে। কার সঙ্গে কার ধাক্কা লেগে যায় কে জানে! ধাক্কা অবশ্য বিশেষ লাগে না। কারণ প্রত্যেকটা গগন-যানেই কম্পিউটার এবং সেনসর রয়েছে। ধাক্কা লাগার অবস্থা হলে নিজেরাই সরে যায়।

নিচের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর শোভা দেখছিল নগেন। আগে মেলা রাস্তা ছিল, বড় বড় সব পাকা রাস্তা। বড় বড় শহর ছিল। ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের তার টানা ছিল। এখন সেসব পাট চুকে গেছে। রাস্তা বলতে এখন ক্ষেত খামারের ভিতর দিয়ে আল-পথ। বেশি চওড়া নয়। ফুট দুয়েক হবে। তবে তা বেশ মসৃণ। ওপরে একটা টেফলন কোটিং দেওয়া থাকে। হাঁটা-চলা করা যায়। দু'চাকার যানবাহন কিছু এখনও চলে। তবে এ হল গগন-যানের যুগ। ছোট-বড় নানা কাজেই এখন গগন-যানই প্রধান ভরসা।

সামতাবেড়ের আকাশে একখানা চক্কর দিয়ে নগেন গো-হাটার সামনে নেমে পড়ল। পটলটা পার্কিং লটে রেখে দশতলা গো হাটায় ঢুকে পড়ল সে।

ব্যবস্থা খুবই ভালো। বড় বড় শো-কেস। কাচের পেছনে স্লটে সব গরু দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। পেল্লায় সাইজ। কে কত দুধ দেয় বা কোনটার কত দাম সব বোর্ডে লেখা আছে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বনমালীর সঙ্গে দেখা।

নগেন যে! গরু কিনবে নাকি?

সেরকমই ইচ্ছে।

তা এখানে যা সব গরু রয়েছে সবই তো অতি-গরু। এসব গরুর দুধে কি আর স্বাদ আছে? চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলো করে দুধ দেয়। শুনলেই তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। গত মাসে আমি মেলবোর্ন থেকে একটা দিশি গরু এনেছিলাম, দুধ বেশি নয়, কিন্তু স্বাদ কী! আহা!

নগেন মাথা চুলকে বলে, আমার যে ঘি আর মাখনের ব্যবসা আছে। কম দুধে তো হবে না।

তাহলে নাও। সত্তর কিলোর দুধেল গাইও পাবে। তবে বাঁট থেকে বেরোবে তো সাদা জল। সেই দুধ মেরে মাখন করো, ঘি করো, সবই হবে ওই জলের মতোই। না স্বাদ, না গন্ধ। অস্ট্রেলিয়ানরা তো তাদের গরু আমাদের দেশে চালান দিলে, আর আমাদের গরুগুলো পটাপট কিনে ফেললে। কারণটা বোঝো না? দিশি গরুর প্রোডাকশন কম হলে কী হয়, দুধখানা যে একেবারে খাঁটি।

তা বটে। বলে নগেন মাথা চুলকোলো। বনমালীর এই একটা রোগ আছে। সব জিনিসের মধ্যেই সে কেবল খাঁটি খুজে বেড়ায়। তর্ক করে লাভ নেই।

চারটে দুধেল গাই পছন্দ করে ক্রেডিট কার্ড মেশিনে ঢুকিয়ে দিল নগেন। একটা রোবট এসে স্লট খুলে গরু চারটে বের করে দড়ি ধরে নিয়ে গেল নগেনের পটলে। পটলের পিছনের দরজা খুলে পটাপট স্লটে ঢুকিয়ে দিল। নগেন ফের আকাশে উঠল।

পলতাবেড়ের মোড়ে হরিরামের দোকানের সামনে নেমে নগেন একটু ইতস্তত করল। মস্ত কাচে মোড়া দোকানঘরে বসে আছে হরি। মেলা খদ্দের। ফোনও আসছে ঘন ঘন। রমরম করছে ব্যবসা। দু-হাতে পয়সা লুটছে হরিরাম।

কাউন্টারের কাছে গিয়ে হরিরামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু গলা খাঁকারি দিল নগেন। হরিরাম মুখ তুলে চাইল।

এই যে নগেন ভায়া, খবর টবর কী?

নগেন একটু ঘাবড়ে আছে। হরিরামকে এখনও সে বিয়ের ব্যাপারে সোজাসুজি না বলেনি বটে, কিন্তু হরি ঘোড়েল লোক। বুঝতে পারছে ঠিকই।

নগেন শুকনো গলায় বলল, এই এলাম একটু।

এফ-টু লাগবে তো? তা অত লজ্জা পাচ্ছো কেন। দাক্ষী ফোন করেছিল একটু আগে। তা আমি তো বলেই দিয়েছি দু'মাস বাদে পাঠিয়ে দেব।

নগেন স্খলিত গলায় বলে, মরে যাব হরিদা। এফ-টু ছাড়া সবই যে অচল।

হরি উদাস গলায় বলে, দেখছ তো অবস্থা। যেন পাকা কাঁঠালে মাছি পড়েছে। ওদিকে সাপ্লাই নেই। এ তো আর এখানে তৈরি হয় না। মঙ্গল গ্রহের খনিজ তুলে সেখানে প্রোডাকশন হয়ে দু'মাস বাদে বাদে চালান আসে।

সবই জানি হরিদা, তুমি ইচ্ছে করলেই পারো।

ওই তো দুমাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

হরিরাম এমন ফিচেলের মতো হাসল যে, গা জ্বলে গেল নগেনের। কিন্তু পাঁচশো মাইল রেডিয়াসের মধ্যে হরিরাম ছাড়া এফ-টু দেওয়ার কারবারি আর নেই। বাইরে থেকেও আনা বারণ।

নগেন হতাশ হয়ে একখানা বেলুনের ওপর বসে পড়ল। আজকাল মোড়ার বদলে এই বেলুন-চেয়ারই চালু হয়েছে।

হরিরাম তাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, লাতন হয়ে পড়লে যে!

বড় বিপদে পড়লুম যে হরিদা—

হরিরাম জাবদা খাতা আর কম্পিউটার আর তার বারো তেরোটা রোবট কেরানি নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ পাত্তা দিল না নগেনকে।

বিপদটা এমন যে আর কোনও বিকল্প নেই। আগের দিনের মতো এখন আর থার্মাল বা হাইডেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নেই, গ্যাস সিলিন্ডার বা পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ইলেকট্রিসিটি বা গ্যাসের একমাত্র বিকল্প হল ওই এফ-টু। এফ-টু ছাড়া বেঁচে থাকাই কঠিন। তার যে পটলখানা আকাশ দাবড়ে বেড়ায় তার জ্বালানী হল এফ-ফোর। কিন্তু এফ-ফোর দিয়ে এফ-টু বা এফ-থ্রির কাজ চলবে না। সব আলাদা আলাদা গ্রুপ।

সে করুণভাবে হরিরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ও দাদা, শুনছ?

শুনছি হে শুনছি। কানে তো আর কালা নই। এই তো দেখ স্বয়ং ফিনান্স মিনিস্টার তিন হাজার এফ-টুর অর্ডার ঠুকে দিয়ে বসে আছেন। তাঁরটা না দিয়ে তোমাদের দিলে কি আর ঘাড়ে মাথা থাকবে ভেবেছ?

আমারটা যে আর টেনে মেনে দুটো দিন চলবে। তারপর যে একেবারে চোখে আঁধার দেখতে হবে।

হরিরাম একগাল হেসে বলে, আঁধার দেখার উপায় কী বলো। এখন তো আকাশ থেকে আয়নায় আলো ফেলে চারধারে ফুটফুটে দিনমান করা হচ্ছে। ভাবনা কীসের? আর নাগেট পাওয়া যায়। সিনথেটিক নাগেট জ্বেলে রান্না করতে বলো গে দাক্ষীকে।

নগেন বুঝল, হরিরামকে বাগে আনা শক্ত। চটে আছে খুব। বলছে দুমাস বাদে দেবে। আসলে আরও ঘোরাবে।

নগেন তার ফতুয়ার পকেট থেকে একখান ক্ষুদে টেলিফোন বের করে ক্ষুদে ক্ষুদে বোতাম টিপল কয়েকটা। একটু বাদেই লক্ষ্মীকান্তর গলা পাওয়া গেল, হ্যালো।

লক্ষ্মী নাকি রে? আমি তোর বাপ নগেন।

হ্যাঁ বাবা, বলো!

নগেন একটা ঢোঁক গিলে চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ রে, লক্ষ্মী, হরিরাম হালুইয়ের মেয়ে সরস্বতীকে দেখেছিস তো! কেমন মেয়ে?

লক্ষ্মীকান্ত যেন লজ্জা পেয়ে বলল, ভালোই তো! কেন বাবা?

বিয়ে করতে রাজি আছিস?

এখনই বিয়ে কি?

আহা, কথাটা এগিয়ে থাকতে পারে তবে। পাল্টি ঘর।

লক্ষ্মীকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার যা ইচ্ছে।

তাহলে প্রস্তাবটা নিয়ে ফেলি? হরিদা বড্ড ধরেছে।

তোমার ইচ্ছে।

নগেন ফোনটা পকেটে রেখে গামছায় মুখ মুছে বলল, বলি, ও হরিদা!

বলো।

তাহলে কথাটা হয়ে রইল কিন্তু।

কোন কথাটা?

সামনে অগ্রহায়ণেই পাঁজি দেখে দিনটা ঠিক করে ফেলো।

অ্যাঁ! বলে হরিরাম হাঁ করল, সত্যি বলছ?

তবে কি মিথ্যে? ছেলে রাজি হয়েছে।

হরিরাম দু-হাত তুলে লাফিয়ে উঠল, জয় নিতাই। জয় গৌর। হরি হে। তা কতগুলো এফ-টু চাই তোমার অ্যাঁ? ক'টা চাই?

নগেন হাসল, একখানাই তো দাও।

হরিরাম একগাল হেসে বলল, চারখানা দিয়ে দিচ্ছি। ও দাম টাম দিতে হবে না। নিয়ে যাও। বলে তার এক রোবটকে ডাকতে লাগল হরিরাম, ওরে ও গোবিন্দ। কোথায় গেলি? আয় শিগগির এদিকে—

নয়ন

মাতাল হরিদাস নিশুত রাতে বাড়ি ফিরছিল। চুড়চুড় মাতাল, পা টলছে, মাথাটা বড্ড গোলমেলেও লাগে। রাস্তাঘাট ঠাহর হয় না, দিশা হারিয়ে যেতে থাকে, জলে গেলে তফাত বোঝা যায় না।

সঙ্গে অবশ্য নয়ন ঢালি আছে। সে মাতাল নয়, সে হল বাবুর খাস চাকর। রোজই এই অবস্থায় বাবুকে বাড়ি পৌঁছে গিন্নিমার হেফাজত করে দেয়। তারপর তার ছুটি।

গিন্নিমা জাঁদরেল লোক। তাঁর দাপটে বাড়ি থরহরি বটে, কিন্তু হরিদাসের নেশাটা তিনি ছাড়াতে পারেননি। ওই একটা জায়গায় গিন্নিমা গো-হারা।

হরিদাস গিরি দড়ির ব্যবসায় লাল। পাট, নারকোল, নাইলন আর সুতো, দড়ির পাইকার হরিদাসের মহকুমা জুড়ে খদ্দের। প্রায় একচেটিয়া কারবার। লাখো লাখো টাকার লেনদেন। লোকে নামই দিয়েছে দড়িহরি।

সারাদিন ভূতের মতো খেটে রাত ন'টার পর হরিদাস একটু জলকেলি করতে আসে কদমতলায়। রায়বাবুদের পুরোনো মদের ঠেক। দিশি বিলিতি দু'রকম বন্দোবস্তই আছে। সামনেই চাটের দোকান। ন'টার পর এখানেই হরিদাসের দু-চারজন ইয়ারদোস্ত আসে। সবাই মিলে খায়, কিন্তু কেউ কাউকে খাওয়ায় না। হিজ হিজ হুজ হুজ। রাত গভীর হলে টলতে টলতে ফেরা। কাজটা নয়নের খারাপ লাগে না। বাবু যতক্ষণ খায়, ততক্ষণ সে বাইরে লম্বা বেঞ্চখানায় শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। চাটওলা গিরিধারীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাও হয় কোনও কোনও দিন।

বাবুর আজ নেশাটা বড্ড জোর হয়েছে। হাঁটু ভেঙে বার দুই বসেই পড়ল। নয়ন গিয়ে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দেয়।

—দেখেশুনে চলুন বাবু।

মাতাল হলে হরিদাসের মুখ খারাপ হয়। আজ কিন্তু হরিদাস কথাই বলতে পারছে না। বড্ড চুপচাপ!

রাস্তাটা খুব নির্জন। গাঁ-গঞ্জ জায়গা, এত রাতে লোক চলাচল থাকার কথাও নয়। পুরনো গোরস্থানের গা ঘেঁষে বিশাল বটগাছ। এই জায়গাটা একদম ফাঁকা। লোকবসতির বালাই নেই। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় এখনও বর্ষার জল জমে আছে। এই জায়গাটা রোজই বাবুকে ধরে পার করতে হয়। আজও পার করছিল নয়ন। আর পার করতে গিয়েই পাপচিন্তাটা ধাঁ করে মাথায় এল। তার বাঁ হাতটা হরিদাসের কোমর ধরেই টের পেল, বাবুর ট্যাঁকে আজ মেলা টাকা। অন্যদিন ছেলে বিপ্রদাসের হাতে দিনমানের লেনদেনের টাকা বাড়ি পাঠিয়ে

দেয়। আজ বিপ্রদাস গেছে মধুগঞ্জের শ্রাবণী মেলায়। টাকাটা বাবু আজ ট্যাঁকেই বেঁধে এনেছে। পাঁচ দশ, এমনকি বিশ হাজার টাকাও হতে পারে।

নয়ন ভাবল, ক্ষতি কী? টাকাটা সরিয়ে সে যদি এই রাতে হাওয়া হয়ে যায় তাহলে তার টিকিরও কেউ নাগাল পাবে না। এ গাঁয়ে তার কেউ নেই, সে ভিন গাঁয়ের লোক। কিন্তু সেখানকার হদিস হরিদাসের জানা নেই। সুতরাং এরকম মওকা আর পাওয়া যাবে না।

নয়ন ঢালি চারপাশটা দেখে নিল। হাতে জোরালো টর্চ আছে। কেউ কোথাও নেই। আজ বাবু বড্ড কাৎরে পড়ছেন। শরীরের ভার বইতে পারছেন না। প্রায় হেঁচড়ে নিতে হচ্ছে। নয়ন ভাবল, মাসান্তে একটা টাকা আর দুবেলা ভাতের টানে পড়ে থাকার মানেই হয় না। টাকাটা হাতিয়ে সে সাতপুরার বাজারে একখানা দোকান দেবে। পান-বিড়ি আর টুকিটাকি জিনিস। সাতপুরা জায়গাটা তার বড় পছন্দ। একখানা মাঝারি নদী আছে, গাছগাছালি মেলা, বিস্তর পুকুর, জিনিসপত্রও সস্তা। দু-চারজন পুরোনো ইয়ার দোস্তও আছে সেখানে। সাতপুরায় একসময়ে জন খেটেছিল নয়ন। বটগাছের তলায় রাস্তায় মস্ত খোঁদল। গতকালও একটা ইটবোঝাই গরুর গাড়ি ফেঁসে গিয়েছিল। হরিদাস সেই খোঁদলে পা ঢুকিয়ে দমাস করে পড়ল। পড়ার সময় কেমন একটা মটাৎ করে শব্দও হল যেন। নয়ন বাবুর ভারী শরীরের টালটা রাখতে পারেনি। সেও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ কথা ছিল না হরিদাসের। পড়ার পর হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, বাপরে!

পা...পা...

ব্যস আর কথা নেই।

নয়ন উঠে টর্চ মেরে যা দেখল তা সুবিধের নয়। বাবুর মুখ দিয়ে ফেনার মতো বেরোচ্ছে। পা-টা অস্বাভাবিকভাবে মুচড়ে আছে যেন। নিচু হয়ে নয়ন দেখল, ডান পা গোড়ালির কাছটাতেই ভেঙেছে মনে হচ্ছে। বাবুর জ্ঞান নেই।

নয়ন উঠে পড়ল। আর দেরি করার মানে হয় না। টর্চটা জ্বেলে আর একবার চারদিকটা দেখে নয়ন পা বাড়াল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ একটা কাতর শব্দ করে হরিদাস ক্ষীণ স্বরে ডাকল, নয়ন।

জবাব না দিলেও হত। কিন্তু অভ্যাসবশে বসে ফেলল, আজ্ঞে।

'ওঃ নয়ন! কী হল বল তো!'

'কী হল বাবু?'

'এত ব্যথা কেন রে? এত ব্যথা।'

'আপনি পড়ে গেছেন যে।'

'আমি কোথায় পড়েছি রে? বড্ড ব্যথা যে।'

'রাস্তায় পড়েছেন।'

'আমি কি মরে যাবো?'

'না, মরবেন কেন?'

হরিদাস হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ওঃ বড্ড ব্যথা যে নয়ন। এত ব্যথা হচ্ছে কেন?

'ঠিক হয়ে যাবে বাবু।'

'মরে যাব না তো। বুকটা কেমন করছে।'

'পায়ে একটু চোট হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুই দুরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাছে আয়। আমাকে ধরে তুলবি না?'

'আমি লোক ডাকতে যাচ্ছি। আপনাকে হাঁটিয়ে তো আর নেওয়া যাবে না।'

'কোথায় নিয়ে যাবি?'

'কেন বাড়ি যাবেন না?'

'বাড়ি!' বলে ফের হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে হরিদাস, 'বাড়িতে কে আছে আমার বল তো।'

'কেন বাবু, আপনার কে নেই? গিন্নিমা আছে, ছেলেপুলেরা আছে।'

'ওরা কি আমাকে চায়? ওরা টাকা চায়, ধনদৌলত চায়। ওরা আমার কেউ নয় রে। ওঃ, বড্ড ব্যথা যে!'

'একটু সয়ে থাকুন বাবু, ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।'

'পরে দিস, এখন একটু কাছে এসে বোস।'

নয়ন অগত্যা অভ্যাস বশে প্রভুর ডাকে ভৃত্যের মতোই এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসল সামনে।

হরিদাস তার ডান হাতখানা দুর্বল হাতে ধরে বলল, 'কেন এত ব্যথা বল তো?'

'পা-টা ভালোই জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে বাবু।'

'শুধু পা নয়, সর্বাঙ্গে ব্যথা, আমি এত ব্যথা সইতে পারি না।'

'শরীর থাকলেই ব্যথা-বেদনাও আছে বাবু, কী আর করবেন।'

আবার হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে হরিদাস। নয়ন তার মনিবকে কখনও কাঁদতে দেখেনি। হরিদাস শক্তপোক্ত মানুষ, হাজার রকমের মানুষ চড়িয়ে খায়। সহজে ভেঙে পড়ার লোক নয়। এমনকি মদ খেয়েও তাকে কখনও কান্নাকাটি দেখেনি নয়ন।

হরিদাস তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতেই বলে, এত যন্ত্রণা হচ্ছে কেন বল তো? আমার শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে এত ব্যথা এতদিন কোথায় ছিল?

নয়ন আতান্তরে পড়ে গেল। এতক্ষণ তার গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়ার কথা। যেতে সে পারেও, হরিদাস তো আর ভাঙা পায়ে পিছু নিতে পারবে না। কিন্তু সে যেতেও পারছে না। হরিদাসের মাথাটা কাঁধে নিয়ে সে বলল, বাবু, কাঁদেন কেন? কান্নার কী আছে? ভালো হয়ে যাবেন।

হরিদাস মাথা নেড়ে বলে, এই যন্ত্রণা থেকে ভালো হওয়া যায় না রে।

'বাবু, আমাদেরও কি কম দুঃখ?'

হরিদাস তার ভাঙা পা'টা টেনে আনার চেষ্টা করল, পারল না। উঃ, বলে ফের হাল ছেড়ে দিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর জীবনটা আমাকে ধরে দিবি?'

'কী যে অলক্ষুণে কথা বলেন বাবু।'

'টাকার গেঁজেটা তো নিয়েছিস। নিয়ে যা, ভালো করে কয়েকদিন ফুর্তি-টুর্তি কর, তারপর আমার কাছে ফিরে আসিস, তখন তোকে আমার দুঃখের কথা বলবখন, ফিরে আসতে ভয় পাস না বাবা, কিছু বলব না তোকে।'

নয়ন একটু স্থির হয়ে গেল। তারপর বলল, 'তার আর দরকার নেই বাবু। আমার কপালে যে সুখ নেই, তা বুঝেছি। একটু কষ্ট করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ভর দিন। চাকর জন্ম আর ঘুচল না।'

প্রবন্ধ। খেলা

ধন্য ধোনি

ক্ষুরধার বৌদ্ধিক নেতৃত্ব এবং দু'জন প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন আগ্রাসী ব্যাটিং এবারকার আইপিএল ফাইনালের খেলাটাকে বড্ড একপেশে করে দিল।

শেষার্ধটা হয়ে গেল এলেবেলে আর বিবর্ণ এবং বড়ই প্রত্যাশিত। লড়াইয়ের অভাব ঘটলে টি টোয়েন্টিও কত জোলো হয়ে যায় সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল চেন্নাই সুপার কিংস-এর সঙ্গে রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই খেলাটি। অথচ ঠিক এমনটি হওয়ার কথাই ছিল না। মাত্র আগের দিনই মুম্বই ইন্ডিয়ানসদের বেশ দুরমুশ করেছিল বেঙ্গালুরু। সচিন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাটসম্যান বটে, কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে যাচ্ছেতাই। একরকম তার দোষেই প্রতিপক্ষ ঘাড়ে চেপে বসে।

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি বস্তুজ্ঞানসম্পন্ন, শীতলমস্তিষ্ক ও ধূর্ত অধিনায়ক। যা যা করলে বেঙ্গালুরুর দলটিকে কোণঠাসা করে ফেলা যায় ঠিক তাই করে গেল। টস জিতে ব্যাটিং নিতে দ্বিধা করেনি। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স মাত্র আগের দিনই চেন্নাইয়ের সাংঘাতিক গরম আর অসহনীয় আর্দ্রতায় মুম্বইয়ের সঙ্গে খেলে হা-হয়রান হয়েই ছিল। এদিন আবার প্রথমেই ফিল্ডিং করে তাদের দম আরও নিকেশ হয়ে গেল। উপরন্তু হাসি এবং মুরলী বিজয় তাদের প্রারম্ভিক ইনিংসে যে-অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করল, তা বহুকাল এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে দেখিনি। সত্য বটে, এবারকার আইপিএল-কে তার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে স্মরণীয় করে

রাখল ক্রিস গেল। কিন্তু গেল-এর খেলায় হনন এবং আত্মহনন দুটোই প্রায় সমান মাত্রায় থাকে। যেমন প্রচণ্ড পেটাচ্ছে তেমনই হুট করে আউটও হয়ে যাচ্ছে। মুরলী বিজয়ের ব্যাটিংয়ে এদিন আত্মহননটা ছিল না। এমন আত্মবিশ্বাসী এবং ক্রিকেটের শাস্ত্রসম্মত মার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কখনও মনে হয়নি, এই রে, এই বুঝি আউট হয়ে গেল! প্রায় একইরকম নিশ্চয়তার গভীর প্রত্যয় ছিল হাসির খেলায়। প্রতি ওভারে তাদের গড় রান ছিল দশের আশেপাশে। আর দেড়শো ছাড়িয়েও দুজনেই সমান সাবলীল, একটিও উইকেটের পতন ঘটেনি। খেলার শেষে ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার নিয়ে মুরলী বিজয় যখন বলল, নিজের ইনিংসটা সে তার মাকে উৎসর্গ করতে চায় তখন বুক ভরে গেল। এই মাতৃভক্তি অটুট থাকলে বিজয়ের বিজয়রথ থামায় কে?

বস্তুত প্রথম দশ ওভারেই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রানের ওই গতি রোধ করার সাধ্যই হল না বেঙ্গালুরুর। দেড়শো ছাড়িয়ে যখন হাসি আউট হয় তখন মুরলী বিজয় নব্বইয়ের কোঠায়। কিন্তু চেন্নাইয়ের গরম ও আর্দ্রতা আর সেইসঙ্গে ব্যাটিংয়ের পরিশ্রম, সব মিলিয়ে ছেলেটি বেশ কাহিল। ক্লান্তি ফুটে উঠছিল তার শরীরী ভাষাতেও। পঁচানব্বই থেকে একশোতে পৌঁছানো ওই অবস্থায় বুঝি আরও একটি সেঞ্চুরি করারই শামিল। বিজয় পারেনি। তুলে মারতে গিয়ে আউট হয়। ওই পাঁচ রানের ঘাটতি তাকে কিন্তু পরবর্তী জীবনে পূরণ করতে হবে। নিজেকে আরও বেশি প্রয়োগ করা ছাড়া পন্থা নেই।

দুশো পার হতে চেন্নাইকে যে শেষ বল অবধি অপেক্ষা করতে হল এটাই বিস্ময়ের। হাসি আর বিজয় যে-ভিত তৈরি করে দিয়েছিল, তাতে দুশো ছাড়িয়ে আরও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ রান হতেই পারত।

ধোনি ধন্য। কারণ বেঙ্গালুরু ব্যাট করতে নামলে সে গেলের বিরুদ্ধে প্রথম ওভারেই আনে অশ্বিনকে। একেবারে বাঘা সিদ্ধান্ত। বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে অফ স্পিনার। আর অশ্বিন চমৎকার বল ঘোরাতে পারে। তার ওপর তার বলে আছে নানা রকমফের। তার প্রথম তিনটে বলেই গেল-এর চোখে আতঙ্ক এবং ব্যাটে জরাগ্রস্ত দোলাচল দেখা গেল। বল ছুঁতেই পারল না তার ব্যাট। চতুর্থ বলটাকে ছুঁল এবং ব্যাটের প্রাণপাখি উড়ে গিয়ে জমা পড়ল তৎপর ধোনির দস্তানায়। ম্যাচের ওটিই সেরা ক্যাচ, লাখ টাকা দামের।

গেল-নির্ভর দলটির তখনই প্যাভিলিয়নমুখী যাত্রার শুরু। বিরাট কোহলি, সৌরভ তিওয়ারি কয়েকটা চার বা ছক্কা মেরেছে বটে, তবে তা উটের মুখে জিরে। রান রেট তাড়া করার তেমন তাগিদ বা রোখ কোনওটাই ছিল না। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ধরেই নিয়েছিল, ম্যাচ তারা অবধারিত হারছে। এই মনোভাবটা তাদের খেলার মধ্যেও সঞ্চারিত হওয়ায় আশাহত হয়েছি! ক্রিস গেল আউট হলেই সব শেষ, এই মনোভাব তো একটা দলের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। আরও কেউ কেউ তো বিপদের মধ্যে গেল হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত! করেনি! আর সেই জন্যই শেষার্ধটা বড়ই রক্তশূন্য, বিবর্ণ ও একঘেয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু তাক লেগে গেল শেষটায়। যখন পুরস্কার বিতরণীতে লাখো লাখো টাকার ছড়াছড়ি দেখছিলাম। এক মঞ্চে, এক রাতে কত কোটি টাকা যে হস্তান্তর হল তার হিসেব রাখা মুশকিল। টি টোয়েন্টির চেয়েও বেশি উত্তেজক ওই টাকার খেলা!

নবাব

প্রিয় ছিল দর্শনের বই, সিগারেট, উত্তম সুরা। আড্ডাবাজ ছিলেন না। বকাবাজ তো নয়ই! একটু আত্মমগ্ন স্বভাবই বরং ছিল তাঁর। বিশেষ লম্বাচওড়া ছিলেন না পটৌডি। ফরসা। দেহটি খাটো। মেদহীন চেহারা। ফিট থাকার জন্য যে খুব একটা কসরৎ করতেন, এমন কথাও শোনা যায়নি। তবু কভারে যে-ব্যাঘ্রবিক্রমে ফিল্ডিং করতেন, সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বল ধরা এবং ছুড়ে উইকেট কিপারের কাছে পাঠানো—ঘটত প্রায় একটিমাত্র অ্যাকশনে। হায়! তখন এই দেশে টিভি ছিল না, তাই অ্যাকশন রিপ্লে দেখার ভাগ্য আমাদের হয়নি।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে সাসেক্স কাউন্টির হয়ে খেলার আগে উইনচেস্টারে স্কুল-দলের হয়ে খেলেছেন। মারকুট্টা, ডাকাবুকো ব্যাটিংয়ের জন্য তাঁকে ইংরেজরাই 'টাইগার' নাম দিয়েছিল আর সেই স্কুল-দলে খেলার সময়ে দলপতি তো ছিলেনই, ১৯৫৯-এ মরসুমে সর্বাধিক ১০৬৮ রান করে ডগলাস জার্ডিনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। এরপর অক্সফোর্ড। সেখানেও উজ্জ্বল কৃতিত্বে ব্যাটিং-বোলিংয়ে।

পটৌডি যখন উদিত হচ্ছেন, যখন বোঝা যাচ্ছিল যে, ক্রিকেট-বিশ্বে এক অনন্যসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার আবির্ভাব হতে চলেছে, তখনই ১৯৬১ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইংল্যান্ডের হোভ-এ মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর ডান চোখে কাচের টুকরো ঢুকে যায়। স্থায়ীভাবেই দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হল। চোখটির সেই অবস্থায় কারও ক্রিকেট খেলার কথাই নয়। কিন্তু টাইগার খুব সাধারণ মানের মানুষ ছিলেন না। চোখে দুটি করে বল

দেখতেন বলে, মাথার টুপি দিয়ে ডান চোখে ঢেকে বাঁ-চোখে, শুধুমাত্র বাঁ-চোখেই খেলতে শুরু করলেন ফের! দুনিয়ায় আর কেউ এক চোখে উচ্চতম পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেছেন কিনা জানা নেই, তবে টাইগার তাঁর টেস্ট ক্রিকেটের জীবনই শুরু করলেন একটি মাত্র চোখ নিয়ে। কত বড় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে তাঁকে কী বিপুল লড়াই করতে হয়েছে, তা অনুমান করতেও মাথা নত হয়। দুর্ঘটনার মাত্র ছ'মাস পরই তিনি ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন এবং ১৯৬১-র ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে তাঁর অভিষেক ঘটে। মাদ্রাজে তৃতীয় টেস্টে তিনি শতরান করেন এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জয়ে তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব, বিক্রম, বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের জন্যই বোধহয় ছোকরা নবাবকে ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক করে দেওয়া হয়। অধিনায়ক নরি কন্ট্র্যাক্টর।

সেই সফরে তৃতীয় টেস্টে চার্লি গ্রিফিথের বলে মাথায় আঘাত পেয়ে কন্ট্র্যাক্টর অবসৃত হন। চতুর্থ টেস্টে মাত্র একুশ বছর বয়সে টাইগার ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হলেন। ভারতের সর্বকালের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক।

মোট ৪৬টি টেস্ট খেলেন। এর মধ্যে ৪০টিতেই ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। একটি ডবল সেঞ্চুরিসহ মোট ছ'টি শতরান। এক চোখে খেলে তিনি ৩৪.৯১ গড়ে মোট ২৭৯৩ রান করেছেন। দু'চোখে খেললে আমাদের অনেকেরই ধারণা, দুনিয়ায় কিংবদন্তি বহু ব্যাটসম্যানকেই ছাড়িয়ে যেতে পারতেন।

নিজস্ব একটি ঘরানা ছিল তাঁর। মেরে খেলতে ভালোবাসতেন। অধিনায়ক হিসেবেও ছিলেন বেশ আগ্রাসী। জনশ্রুতি যে, অধিনায়ক হিসেবে দলের সকলের শ্রদ্ধা সহজেই আদায় করতে পেরেছিলেন। দলের শৃঙ্খলাও তাঁর আমলে অটুট ছিল।

দুঃখের বিষয়, পটৌডির সময় ভারতীয় দলে একজনও পাতে দেওয়ার মতো জোর বোলার ছিল না। স্পিনার ভরসা। চারজন। বেদি, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন ও ভেঙ্কটরাঘবন। ব্যাটেও তেমন আহামরি কে-ই বা ছিল, এই দল নিয়েই যেটুকু লড়ার লড়েছেন। খারাপও কিছু হয়নি তাতে। সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যায়ক্রমে ঘটে যেত। আর আমরা যারা তাঁর খেলা ভালোবাসতাম, তাদের দুঃখ হত, দুটি চোখ থাকলে নবাব কত কী-ই না করতে পারতেন!

শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে বহুল প্রচারিত ঘটনা। তবু যতদূর শুনতাম, নবাব আত্মগত জীবনযাপন করেন। বেলেল্লাপনা থেকে দূরে থাকেন। মেয়েদের প্রতি ঝোঁকা নন। প্রেমট্রেম করেন না! তবে শেষ পর্যন্ত তিনিও যে পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছেন, এটি জেনে আমাদের মজাই লেগেছিল! কন্যা সাবা ছাড়া তাঁর অপর দুই সন্তান স্যাফ আলি খান, সোহা বর্তমানে চিত্রতারকা। স্ত্রী শর্মিলাও প্রাক্তন চিত্রতারকা। তবু নবাব প্রচার থেকে, হই-হট্টগোল থেকে, ভিআইপি-পনা থেকে বরাবর দূরে থেকেছেন। মনে হয় একটু দার্শনিক প্রকৃতিরও ছিলেন। ক্রিকেটের ফাঁকে-ফাঁকে শক্ত-শক্ত বই পড়তেন। আড্ডা, হুল্লোড়, নিশিযাপন থেকে দূরে থাকতেন। 'স্পোর্টসওয়ার্ল্ড'-এর সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর কয়েকটি রচনা পড়ে দেখেছি, খেলাটি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি কী গভীর ও অভ্রান্ত! অসাধারণ ইংরেজি লিখতেন। রচনাশৈলীও চমৎকার। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় পড়ার জন্য অপেক্ষা করত এক অদম্য কৌতূহল।

সত্তর বছর বয়স কম নয়। আবার এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতমানের কথা ভাবলে বেশিও নয়, কিন্তু কোনওকালেই নবাবের খুব একটা শরীর বা স্বাস্থ্য-সচেতনতা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর মৃত্যুকে অকালমৃত্যু হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেও পারতেন!

ক্রিকেটে তাঁর অবদান ঠিক পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করা যাবে না। তাঁর মূল্যায়ন হবে মাঠে তাঁর দৃপ্ত উপস্থিতি, তাঁর বৈদ্যুতিক নড়াচড়া, তাঁর ভয়শূন্য ব্যাটিং এবং প্রতিবন্ধকতা ঢেকে রেখে নিজেকে প্রয়োগ করার ভিতর দিয়ে। মনসুর আলি খান পটৌডি তাই ইতিহাসের শরিক, পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। এবং

সত্যিকারের এক কিংবদন্তি। হাল আমলে যত্রতত্র যাকে-তাকে কিংবদন্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার যে রীতি অনুসৃত হচ্ছে, তার চেয়ে অন্তত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকুক টাইগারের ক্ষেত্রে।
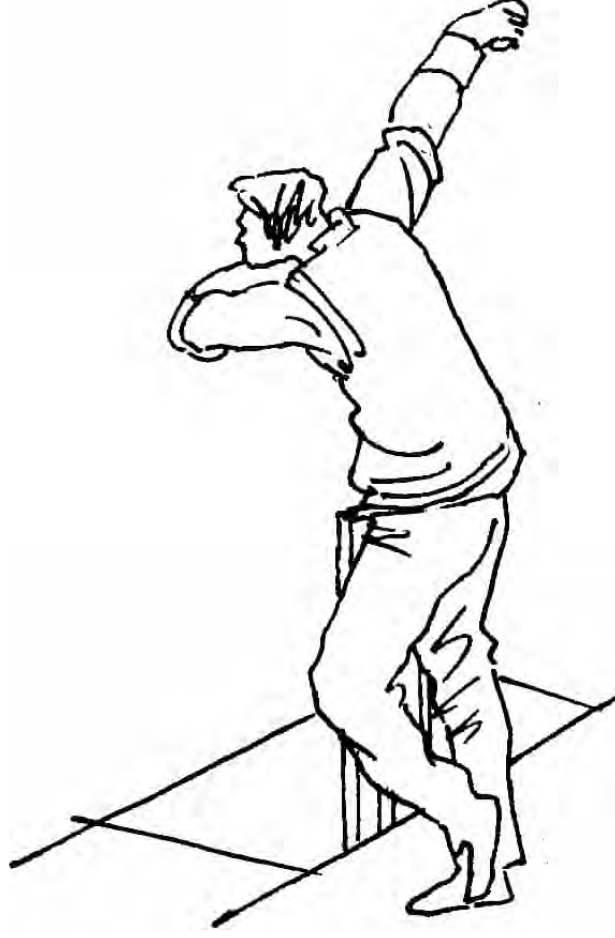
অবসর নিলেন রাহুল 'দ্য ওয়াল' দ্রাবিড়

রাহুল দ্রাবিড় কি এবার গৃহস্থ হলেন! ছেলেকে হোমটাস্ক করাবেন, স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে টিভি দেখবেন, সকালে বাজার করবেন! হয়তো এসব করবেন না, তবে তিনি আর রাহুল দ্রাবিড়ের মতো থাকবেন না, গৃহস্থ হতে চাইছেন তিনি। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে মনে হয়, ক্রিকেটের মাঠেও তিনি গৃহস্থই ছিলেন। সুশৃঙ্খল, হিসেবি, শীতলমস্তিষ্ক, নিপুণ এক গৃহস্থ, কোনও বোহেমিয়ানিজম নেই, অ্যাডভেঞ্চার নেই, পাগলামি নেই, স্পর্ধা নেই। বিনীত, নিবেদিত, নিয়মনিষ্ঠ, আইনমানা এক ব্যক্তি।

লর্ডস, ১৯৯৬। এক বাঙালি ও এক কর্নাটকির টেস্ট অভিষেক। বাঁহাতি সৌরভ তাঁর প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে অন্যদের পালের হাওয়া কেড়ে নিলেন। আর বিনয়ী দক্ষিণ ভারতীয়টি দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র পাঁচ রানের অভাবে বঞ্চিত হলেন। পরের টেস্টেও সৌরভ সেঞ্চুরি, দ্রাবিড় আশির ঘরে আউট, সৌরভকে নিয়ে হই-চই হল, দ্রাবিড়েরও জুটল মৃদু পিঠ চাপড়ানি। কিন্তু যখন অতি সম্প্রতি রিটায়ার করলেন, তখন তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা সৌরভের দ্বিগুণেরও বেশি। সচিনের কাছাকাছিই। সেঞ্চুরি মালিকদের মধ্যে বিশ্বের চতুর্থ জন। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এত রান করলেন কবে দ্রাবিড়? তাঁর আরও দুর্ভাগ্য যে, এমন সময়ে তিনি ক্রিকেট খেলেছেন যখন তাঁর পাশাপাশি বর্ণময় এমন কত খেলোয়াড় খেলছেন যাঁদের জেল্লা বেশি। সচিন, সৌরভ, সহবাগ, এমনকী বিরাট কোহলি অবধি। তাঁর সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট, নির্ভরযোগ্যতা। তার চেয়ে বেশি

কিছু নয়। দুদ্দাড় রান করতেন না বলে একসময়ে তাঁকে ভারতীয় ওয়ান ডে টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অধিনায়ক সৌরভের ব্যাপারটা মনঃপূত হয়নি বলে তিনি তাঁকে উইকেটকিপার হিসেবে টিমে সামিল করেন। রাহুল দ্রাবিড় বর্ণময় ছিলেন না বটে, কিন্তু কর্মময় ছিলেন। কাজের কাজটুকু দাঁতে দাঁত চেপে করে গেছেন। ক্লাসের গুডবয়রা যেমন হয়, অনেকটা তেমনই। দুষ্টুমিহীন, বইমুখো, মনোযোগী, ভালো ছেলেদের সম্পর্কে মানুষের উদ্বেগও থাকে না, কৌতূহলও থাকে না। তাই রাহুল মাঠে নামলে দর্শকদের তেমন গগনভেদী উচ্ছ্বাস শোনা যেত না। তা বলে কি তাঁকে ভালোবাসেনি মানুষ? বেসেছে। কিন্তু নাচানাচি করেনি।

রাহুল আদ্যন্ত একজন ভালো মানুষ, এটা তাঁর মুখশ্রীতেই মুদ্রিত রয়েছে। ওই সরল হাসি, স্নিগ্ধ চাউনি, নম্র কণ্ঠস্বর সবই ওই ভালোমানুষিরই দ্যোতক, সহ-খেলোয়াড়দের কাছে খুবই প্রিয় মানুষ তিনি, কিন্তু একজন ভালো মানুষ যে ভালো অধিনায়কও হবে, তা নয়।

যেমন সচিন, দুর্দান্ত খেলুড়ে, ভীষণ ভালো মানুষ। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে দিশাহারা, আর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁর নিজের খেলাটাও গেল চটকে। রাহুলের ক্ষতিটা করেছিলেন গ্রেগ চ্যাপেল। সৌরভ-রাহুল বিভাজন ঘটিয়ে, টিমটাকে ঘেঁটে-মেটে গোটা ভারতীয় ক্রিকেট দলটির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন। এটা তাঁর বোধগম্যই হল না যে, রাহুলের ভিতরে নেতৃত্ব দেওয়ার জোরালো ব্যক্তিত্ব নেই। ভালোমানুষদের সেটা থাকেও না। গ্রেগ-এর জমানায় সৌরভের অপসারণের পর অধিনায়ক হয়ে রাহুল নাজেহাল বড় কম হননি।

ভারতের এখনকার দলটিতে যে-বেমানান তিনজন সিনিয়র ছিলেন তার মধ্যে একজন রাহুল, আর দু'জন সচিন আর লক্ষ্মণ। বেমানান হলেও পরিহার্য ছিলেন না। আরও দু-এক বছর খেলতেই পারতেন রাহুল। তরুণতরদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া তেমন জোরালো বিকল্প তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবু তরুণদের কাছে সিনিয়ররা হয়তো ততটা প্রার্থিত নন, কারণ তাঁরা জায়গা জুড়ে থাকেন, পথ আটকান। তার ওপর অস্ট্রেলিয়ায় দলের যাচ্ছেতাই কাণ্ডের পর বিরূপ সমালোচনাটা ভদ্রলোক রাহুলের তেমন সহ্য হয়নি। অবসরের চটজলদি সিদ্ধান্ত সেজন্যই। ভালোই করেছেন তিনি। কটুকাটব্য অপমান এবং অকৃতজ্ঞতা সয়ে কেরিয়ার টেনে যাওয়ার মানেও হয় না। সবাইকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একসময়ে, এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হয়। বিশেষ করে, যাঁর ঝুলিতে ৩৬টা সেঞ্চুরি, সর্বাধিক ২১০টা ক্যাচ এবং গড় রান পঞ্চাশের ওপর, তাঁর আর নতুন করে নিজেকে প্রমাণের কী-ই বা থাকে? ক্রিকেটের বাইরের জীবনও তো আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মতো নয়। নানা উপঢৌকন নিয়ে সেই জীবনও কোল পেতে আছে। বিদায়, রাহুল দ্রাবিড়। স্বাগত, রাহুল দ্রাবিড়।

মন্টি, ভাইটি! এত নির্দয় তুমি?

কেউ নিরামিষাশী শুনলেই আমি ভারী খুশি হয়ে পড়ি। নিজের দল ভারী করার মতলবই হবে! তবে আরও একটা কারণ হল, আমার বদ্ধমূল ধারণা, নিরামিষাশীদের অ্যাগ্রেশন কম, হিটলারের মতো দু-চারটে সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমি আজ অবধি নিরামিষাশী গুন্ডা-মস্তানের কথা বিশেষ শুনিনি। যার কথা বলতে যাচ্ছি, সেই লোকটি অতিশয় দীর্ঘাকৃতি, হাড়ে-মাসে মজবুত চেহারা, একশো পঞ্চাশ কিমি গতিতে বল করার মতো বৃষস্কন্ধ। ইনি ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু চোখ দুটো দেখুন, যামিনী রায়ের পটচিত্রের মতো অবিশ্বাস্য আয়ত এবং অ্যাগ্রেশনহীন। বলও করেন কুটিল স্পিন, যা ভারতীয়রা হেলাফেলা করে খেলে। মন্টি পানেসরকে তাই অ্যাগ্রেসিভ বা মাঠের গুন্ডা বলা যায় না। কিন্তু নিয়মিত গুরুদ্বারে হাজিরা দেওয়া এই ধার্মিক শিখ যুবকটির অ্যাগ্রেশন তাঁর আস্তিনে লুকোনো, পঞ্জাবে তাঁর জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে শুনলাম। তাই বলতে ইচ্ছে যায়, ভাই মন্টি, ভারতের প্রতি এতটা নির্দয় হওয়ার কি খুব দরকার ছিল? এটা তোমার বাপের ঘরও বটে, ভাবী শ্বশুরঘরও বটে!

মোহালির শুরুটা বিশেষ খারাপ হয়েছিল না। খেলা দেখে অনেকের ধারণা হল, এই সিরিজে ইংরেজদের চুনকাম অবধারিত, কিন্তু ঘাসের মধ্যে লুকনো সাপটাকে তখনও আন্দাজ করা যায়নি। আন্দাজে আরও একটা ভুল, পিচে নিজের পছন্দমতো কারুকাজ। বল জোরে ধেয়ে এলে চলবে না, আচমকা লাফিয়ে উঠলে চলবে না। মাথা নিচু করে বশংবদ নিরীহ প্রজার মতো আসবে, ঠ্যাঙানি খেয়ে বাউন্ডারির বাইরে পালাবে। আমাদের বীরেরা গতির বেয়াদপি বা লাফানো বলের আস্পর্ধা মোটেই পছন্দ করেন না।

সবই ঠিকঠাক ছিল। মুম্বইয়ের রঙ্গমঞ্চ ইংরেজ-বধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কে জানত নাটকের মাঝখানে নায়কের কোমরের বেল্ট খুলে পোশাক খসে পড়বে? বাঘের ঘরে ঘোগ বাসা বেঁধেছে, এ যে অবিশ্বাস্য! অশ্বিন, ওঝা, ভাজ্জির যা করার কথা, তা যে উল্টে করে দেখাচ্ছে পানেসর সোয়ানরা। আর স্লো উইকেটেও অ্যান্ডারসন যে কী বাড় বেড়েছিল! কতিপয় বয়স্ক, ক্লান্ত, ছন্দহীন খেলুড়ের বোঝা পিঠে নিয়ে টগবগে ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা টানার সাধ্যই ছিল না ভারতীয় দলের। বাবুরাম সাপুড়ের সাপ্লাই করা গোবেচারা নিরীহ সাপেরা যে এহেন মারমূর্তি ধরবে কে জানত?

টি-টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে খেলে খেলে খেলুড়েদের বারোটা বেজেছে বললে চলবে কেন? ওসব তো ইংরেজরাও খেলে। টি-টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে টেস্ট ক্রিকেটের ধ্রুপদী চরিত্রকে নষ্ট করছে, এমনতরো অভিযোগ বিশেষজ্ঞরাও করে থাকেন। হয়তো ঠিকই বলেন, তবে সেখানেও একটু বক্তব্য থেকে যায়।

বক্তব্যটা হল, আমাদের বয়স যখন নিতান্তই কম ছিল তখন দেখতাম, বেশির ভাগ টেস্ট ম্যাচই ড্র হয়ে যেত, পাঁচ দিনের আলস্যজড়িত খেলায় আবার একদিন থাকত বিশ্রাম। টুকুস-টুকুস ব্যাট করে ব্যাটসম্যানরা পেল্লায় রান তুলে খেলতেন। তাড়াহুড়োর ব্যাপারটাই ছিল না মোটে। এমনও হয়েছে, পাঁচ টেস্টের সিরিজে পাঁচটাই ড্র থেকে গেল। দিনকাল এবং বোধবুদ্ধি সবই এখন পাল্টে গেছে! এইটা অন্তত বোঝা গেছে যে, টেস্ট ম্যাচকে বাঁচাতে গেলে তাতে আবশ্যিক হার-জিতের উত্তেজনা সঞ্চার করা দরকার, যা ঘুমন্ত ক্রিকেটে সম্ভব নয়। এবং তার জন্য প্রয়োজন দ্রুত রান তোলা। পুরাকালের টেস্ট ম্যাচে ছক্কা মারার ঘটনাটা কমই ঘটত। কপিবুক ক্রিকেটের খুব কদর ছিল তখন। কিন্তু কপিবুক ব্যাপারটারও তো বদল এবং সময়োপযোগী করার দরকার আছে, নাকি?

ইদানীং টেস্ট সিরিজে বিরক্তিকর ড্র হ্রাস পেয়েছে। উত্তেজক লড়াই হচ্ছে, মীমাংসাও। এর নেপথ্যে কি টি-টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে-র যথেষ্ট অবদান নেই? শাস্ত্রসম্মত স্ট্রোক না হলে কুলীন যোদ্ধারা আগে ভ্রূ কোঁচকাতেন, কিন্তু বাপু হে, কেউ যদি স্ট্রোক-বৈচিত্রে নতুন সৃজনশীলতা এনে শাস্ত্রটাকে বদলে দিতে চায়, তাহলে তাকে কোন নিয়মে পাশ কাটানো যাবে?

এই সিরিজেই তিন-তিনটে টেস্ট দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, এরকম উত্তেজক হলে মানুষ আবার টেস্টমুখো হবে। টি টোয়েন্টি বা ওয়ান ডে-র কাছে গোহারান হারতে হবে না টেস্ট ক্রিকেটকে।

মুম্বই আর কলকাতায় ভারতের হার নিয়ে টিভি চ্যানেল আর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ শোনা এবং পড়ার পর মনে হল, সবাই ঠিকঠাক এবং যুক্তিসঙ্গত কথাই তো বলছেন! ভারত কেন হারছে, সেই বিশ্লেষণের আগে এটা কবুল করা দরকার, টেস্ট ম্যাচে যে ফয়সালা হচ্ছে এতেই আমাদের মতো কিছু উজবুক ভারী খুশি। কারণ, বহুকাল আগে একসময়ে ঢাকনাহীন আধখ্যাঁচড়া রঞ্জি স্টেডিয়ামে বসে সারাদিন চনচনে রোদে ভাজা ভাজা হয়ে আমরা বিস্তর গড়ানে ক্রিকেট দেখেছি। রাত থেকে লাইন দিতে হত, মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়ার তাড়া খেতে হত, ব্যয় করতে হত অতি মহার্ঘ পকেটমানি। বলা বাহুল্য, পোষাত না। একবার পঙ্কজ রায় আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, জানেন মশাই, আমাদের আমলে টেস্ট ম্যাচে খেলে আমরা দৈনিক মোটে একশো পঁচিশ টাকা পেতাম। প্রবীণ বয়সে পঙ্কজ হয়তো-বা সবিস্ময়ে ভাবতেন, ক্রিকেটে এত বন্যার মতো টাকা হঠাৎ আসছে কোথা থেকে? এবং কেনই বা?

হকিতে পয়সা নেই, তিরন্দাজিতে পোড়া কপাল, অলিম্পিক পদকজয়ী মুষ্টিযোদ্ধাকে বউয়ের সাধ-আহ্লাদ মেটানোর পয়সা মেটাতে সিনেমায় নামার ফিকির খুঁজতে হয়, কুস্তিগিরের চাকরি না জুটলে না-ভাত জো-ভাজ, শুটারকে স্পনসর জোটাতে হিমশিম খেতে হয়, কিন্তু ক্রিকেটে জাতীয় দল তো দূরস্থান, শুধু আইপিএল খেললেই টাকার পাহাড়। টিভি, স্পনসর, জনগণ সকলের আশীর্বাদপুষ্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের খানিকটা সর্বনাশ কি এই বিপুল অর্থ সমাগমের জন্যই?

দুনিয়ার বোধহয় ভারতীয় ক্রিকেটাররাই সর্বাধিক ধনী! আমার কেন যেন মনে হয়, অতি অর্থ অনেক সময়ই মোটিভেশন নষ্ট করে দেয়। পেটে আর-একটু খিদে থাকারও দরকার ছিল বোধহয়।

ভারতীয় দলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করারও কিছু নেই। ক্রিকেটটা কী করে খেলতে হয়, তা এরা জানে। মুশকিল হল বুড়োরা, আনফিটরা, ছন্দহীনরা বসতে নারাজ। এতই তাদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা যে, তাদের বসিয়ে দেওয়ার সাহসও নেই কারও।

আর যেসব উন্মুখ তরুণরা অপেক্ষা করছে, তাদের বয়সও তো কিছু বসে নেই। এই অচল অবস্থা থেকে কে যে উদ্ধার করবে এদের!

আমার আপনার ক্রিকেট দর্শন

ক্রীড়াভূমি আর ক্রীড়াক্ষেত্র আমার কাছে বরাবর সম্মোহক। খেলাধুলো আমার কাছে একটি ধর্ম বলে মনে হয়। খেলার মধ্যে মানুষ আনন্দ আর মুক্তির স্বাদ পায়। দাড়িয়াবান্দা, হাডুডু, ডাংগুলি, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, দৌড়, লাফ, পোলভল্ট— আমার বাল্য-কৈশোর-যৌবনে কিছু বাদ ছিল না। টেবিল টেনিসটা সত্যিই ভালো খেলতাম। তা বলে কোনও কৃতবিদ্য খেলোয়াড় হওয়ার বাসনা ছিল না। কিন্তু খেলা আমায় বুঁদ করে রাখত। এমনকী, এক সময়ে বডি বিল্ডিংয়ের লোভে জিমনাসিয়ামেও ভর্তি হয়েছিলাম। খেলাধুলো এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি।

এক সময়ে কলকাতায় মাঠে গিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট দেখেছি। এখনও দেখি টিভিতে। শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল, বক্সিং, টেনিস, সাইকেল রেস, গল্ফ পর্যন্ত। বলতে কী, খেলার চ্যানেলগুলিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। এখনও পথচলতি পথের ধারে মাঠেঘাটে খেলা হচ্ছে দেখলে, সে যে-কোনও খেলাই হোক, একটু দাঁড়িয়ে যাই। একবার আমেরিকায় এরকমই পথের ধারে সাত-আট বছর বয়সি ছেলেদের ফুটবল খেলা হচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভারী অবাক হতে হয়েছে। ওইটুকু-টুকু বাচ্চাদের বল কন্ট্রোল আর গতি আর প্রশিক্ষিত খেলা আমাকে ধন্দে ফেলে দিয়েছিল। আমাদের দেশের বাচ্চাদের এত যত্ন করে শেখাবে কে? আর তাদের মজবুত স্বাস্থ্যও ছিল দেখার মতো।

অস্ট্রেলিয়ায় যেবার গিয়েছিলাম সেবার মেলবোর্নে আমি যে-বাড়িতে ছিলাম, তার কাছেই একটা টেনিস কোর্ট কমপ্লেক্স। সেখানেই ভারতের ইউকি ভামব্রি টেনিসে বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। যাতায়াতের পথে আমি বরাবর সেই কোর্টের কাছে একটু দাঁড়িয়ে যেতাম।

খেলার নেশা এখনও আমাকে রাত জাগিয়ে রাখে, ভোরে ঠেলে তুলে দেয়, জরুরি কাজ বা লেখালেখি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই সম্মোহন কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না। এই সম্মোহিত করে রাখার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে ক্রিকেট খানিকটা এগিয়ে আছে।

এখন মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়ার আকর্ষণ কমেছে। সে টেস্ট হোক কি ওয়ান ডে। তার কারণ, মাঠের পরিবেশ এখন আর তেমন পছন্দ হয় না, আর ইডেনের গ্যালারি থেকে খেলা ঠিক বোঝাও যায় না। বরং টিভিতে ক্লোজ-আপ এবং রিপ্লেতে খেলাটা আরও বেশি উপভোগ্য হয়। অন্তত আমার কাছে।

মনে আছে, ইডেনের যে-টেস্টে সৌরভের দলের কাছে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল, তার প্রথম দিন আমি মাঠে ক্লাব হাউস গ্যালারিতে ছিলাম। বড্ড ভিড় ছিল সেদিন। সারাদিন অস্ট্রেলিয়ার মজবুত ব্যাটিং দেখে বেশ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, এদের আউট করার মতো বোলার বোধহয় আমাদের নেই। খেলা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে হুড়োহুড়ির ভয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর আমি বেরিয়ে আসার পরই ইডেন গর্জে উঠল। অর্থাৎ উইকেট পড়েছে। খুব আফসোস হয়েছিল। শেষ লগ্নে বোধহয় দুটো কি তিনটে উইকেট পড়েছিল সেদিন। পাঁচ দিনের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাকি খেলাটা টিভিতে দেখেছি। টিকিটটা কাউকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

এক সময়ে টেস্ট ম্যাচ ছাড়া ক্রিকেট খেলা তো বিশেষ ছিল না। আন্তর্জাতিক খেলা মানেই টেস্ট ম্যাচ। তা-ও বিশেষ ঘন ঘন নয়। আকস্মিকভাবে ওয়ান ডে ক্রিকেটটি আবিষ্কৃত হয় এবং জনপ্রিয়তায় টেস্ট ম্যাচকেও পিছনে ফেলে দেয়। তারপর টি-টোয়েন্টি। কুলীন ক্রিকেট বোদ্ধারা শেষোক্ত দুটিকে ক্রিকেট বলেই মনে করেন না। আমার অবশ্য শুচিবায়ু নেই। আমি ওই দুটি ফর্ম্যাটও দিব্যি উপভোগ করি। আগেকার তুলনায় এখন ব্যাটিং অনেক বেশি আগ্রাসী, অনেক বেশি মারকুট্টে। বোলিংয়েও বৈচিত্র বেড়েছে।

এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে। নিউজিল্যান্ডে যাওয়া হয়নি, তবে অস্ট্রেলিয়া এক অন্যরকম দেশ। বিস্ময়কর রকমের সুন্দর। প্রত্যাশামতোই ক্রিকেটের অগ্রণী দেশগুলোই কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল, শুধু ইংল্যান্ড বাদে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ, মানে এগারোজন বাঙালি। অবশ্য ভারতের কাছে হেরে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু শেষ আটে পৌঁছোনোও কিছু কম কথা নয়।

আমেরিকা, চিন, ব্রিটেন, ইউরোপের দেশগুলোর গৌরব করার মতো অনেক কিছু আছে। অলিম্পিকে ঝুড়ি ঝুড়ি পদক পায়, প্রতি বছর তাদের কৃতী ব্যক্তিরা নোবেল প্রাইজ পান, তাঁদের জীবনযাপনও অনেক উন্নত। আমাদের মতো পোড়া দেশের গৌরব করার মতো অতীত-ঐতিহ্য ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। তাই কোনও একটা বিষয়ে আমরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ফেললে গোটা দেশ খুশিয়াল হয়ে ওঠে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটও আমাদের বিরল এক গৌরবান্বিত হওয়ার অবলম্বন। যদিও ক্রিকেট বিশ্বের সর্বজনীন খেলাই নয়। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তান ছাড়া ক্রিকেট নিয়ে অন্য দেশগুলির তেমন উন্মাদনাও নেই। তা হোক, তবু এই ক্রিকেট আমাদের মলিন মুখে হাসি ফোটানোর একটা উপায়। অভিনেতা অনিল চাটুজ্যে অনেকদিন আগে আমাকে একবার বলেছিলেন, আরে মশাই, আমাদের দেশের আছেটা কী বলুন তো! একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা সত্যজিৎ রায় আর দুটো স্পিনার।

টেস্ট ক্রিকেটে একটা ধ্রুপদী আলস্য ছিল। ধীর সুস্থির খেলা, তাড়াহুড়ো নেই, লাঞ্চ ব্রেক, টি ব্রেক, পাঁচ দিনে আবার একদিন বিশ্রাম। আভিজাত্যের একেবারে চূড়ান্ত। তাই গরিবের ছেলে বা অনভিজাতদের বিশেষ

গুরুত্ব দেওয়া হত না। তৎকালীন একটা ক্রিকেটে সাঙ্ঘাতিক শারীরিক ফিটনেসের তেমন দরকারও ছিল না। ব্যাটসম্যান একটা বল নিখুঁত টেকনিকে আটকাল, রান করল না, তবু হাততালি পেয়ে যেত ওই স্টাইলের জন্য।

সেই ক্রিকেটের আমূল বিবর্তন ঘটেছে। অভিজাতদের খেলা এখন আপামর জনতার বিনোদন এবং ক্রিকেটকে ঘিরেই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আর এই জনগণের উদগ্র আগ্রহ মেটাতেই ক্রিকেটে এসেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসন। এসেছে ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি। ভবিষ্যতে নতুনতর ফর্ম্যাট আবিষ্কৃত হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশ জুড়ে এই ক্রিকেটীয় উন্মাদনার ফলে কিন্তু এখন ঘরে ঘরে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়ে গেছে। এমনকী, মহিলাদের মুখেও আমি অতি বিচক্ষণ বিশ্লেষণ শুনেছি। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই রবি শাস্ত্রী বা হর্ষ ভোগলের চেয়ে ক্রিকেট বিষয়ে খুব একটা কম জানে না। একবার দশ বছর বয়সি একটি ছেলে আমাকে চায়নাম্যান আর গুগলির তফাত বুঝিয়ে দিয়েছিল, যা শুনে আমি তাজ্জব। কারণ, ছেলেটি আমারই ছেলে এবং তাকে ক্রিকেট বুঝতে প্রথম শিখিয়েছিলাম আমিই।

শেষ হল ২০১৫-র বিশ্বকাপ। সারা টুর্নামেন্টের উত্তাপ উপমহাদেশ জুড়ে টের পাওয়া গেল ভালোমতোই। ভারত ফাইনালে খেলেনি ঠিকই, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু আমাদের নিরুত্তাপ থাকার উপায় ছিল না। সোজা কথায় বলতে হয়, এই বিশ্বকাপটা অনেকের মতোই আমিও বেশ উপভোগ করেছি। আপনারাও করেছেন।

বিরাটের নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন

বিরাট কোহলির খেলা আমি প্রথম দেখি অনূর্ধ্ব উনিশদের বিশ্বকাপে। সেই দলে বাংলার শ্রীবৎস গোস্বামীও ছিল। আর তখনই বিরাটের খেলা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। শুধু নিখুঁত টেকনিক থাকলেই হয় না, ক্রিকেট খেলতে একটু সাহসেরও দরকার। বিরাটের কবজির জোর তো ছিলই, বুকের পাটাও বাপের ব্যাটার মতো। প্রতিপক্ষকে দুরমুশ করে ভারত সেই টুর্নামেন্ট জয় করতেই বিরাট আর শ্রীবৎসর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে আমি উত্তেজিত ছিলাম।

দুজনের তুলনায় বিরাট অবশ্য অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবং আরও কতটা এগোবে তা অনুমানসাধ্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্রিকেটের কিংবদন্তিরা বর্তমান সময়ে বিরাটকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলতে দ্বিধা করছেন না। এমনও শোনা যাচ্ছে, বিরাট সর্বকালের সেরাদের মধ্যেই গণ্য হবে। মাত্র আটাশ বছর বয়সেই শিরোনামে চলে আসা সহজ ব্যাপার নয়।

দিল্লির ছেলে, পঞ্জাবি পরিবারে জন্ম, অল্প বয়সেই পিতৃহারা। লোকসানে চলা ব্যবসা, ভাড়াবাড়িতে থাকা ছেলেটাকে বেশ লড়াই করে ক্রিকেটে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে। সেটা অবশ্য বড় কথা নয়, ওরকম লড়াই অনেককেই করতে হয়।

সচিনকে সে গুরু বলে মানে। কিন্তু আমি খেলা যতটুকু বুঝি, মনে হয় বিরাট একটু অন্যরকম। পুরোপুরি প্রকরণ মেনেও তার খেলায় একটা নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন আছে। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার

বিরুদ্ধে তার শেষের সেই অনবদ্য চারগুলো এখনও যেন দেখতে পাই। চোখ পিটপিট করা নীতিদীর্ঘ, ছিপছিপে ছেলেটা নানারকম অদ্ভুত হেয়ার স্টাইল ভালোবাসে, ভারী সুন্দর একটু লাজুক হাসি, দাড়ি রাখে। এসব মিলিয়ে তার একটা বেশ ইমেজ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে চিত্রতারকার সঙ্গে প্রেম। কিন্তু এসব কিছুই ক্রিজে তার নিবিড়-নিবিষ্ট ধ্যানকে নাড়া দিতে পারে না। বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালের কথাই ধরা যাক। অন্যরা যখন তেমন আহামরি কিছু করতে পারেনি, তখন বিরাট একাই ভারতকে দুশো রানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল, যখন মনে হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রাটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে কঠিনই হবে। শেষ অবধি ফল যাই হোক, বিরাট তার মহিমা হারায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আর কোনও ব্যাটসম্যানকে এত ধারাবাহিক ভালো খেলতে কদাচিৎ দেখেছি। কি দেশে, কি বিদেশে, যে-কোনও পিচে বিরাট অবধ্য এবং অনিন্দ্য। বেশ অল্প বয়সেই ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হয়েছে সে। অধিনায়কত্ব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই করে। এখনই সে ঈর্ষনীয় অ্যাভারেজের অধিকারী, অনেকগুলো বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সহ-স্বত্বাধিকারী হিসেবে যুক্ত, বিজ্ঞাপনে সে এখন অতি পরিচিত মুখ এবং দুনিয়ার তাবৎ তরুণীর কম্পিত বুকের কারণ। আর সেইজন্যই তার চিত্রতারকা বান্ধবীটিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা কটুকাটব্য সহ্য করতে হয়।

অনেকেরই ধারণা, বিরাটের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কালক্রমে সে হয়তো-বা সচিনকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, তার দৃঢ়তা, তার নাছোড় মনোভাব, প্রবল সাহস এবং অদ্ভুত নিবিষ্টতা ক্রিকেটে একটা নতুন মাত্রা এনেছে। বিরাটের খেলা যখনই দেখি, তখনই ভারতীয় টিমের জন্য একটা ভরসা এসে যায়। সে ব্যাকরণ মেনেই খেলে, কিন্তু সেই খেলার মধ্যেও যে আগ্রাসনটা সঞ্চারিত হয় সেটাই অদ্ভুত।

বিরাটের ফিটনেসও দেখবার মতো। যেমন দ্রুত রান নিতে পারে তেমনই তৎপরতার সঙ্গে ফিল্ডিংটাও করে। যাকে সম্পূর্ণ ক্রিকেটার বলে বিরাট তাই। একটু-আধটু বলও করতে পারে সে, তবে বিশ্বকাপ সেমি-ফাইনালে তাকে দিয়ে শেষ ওভারটা না করালেও চলত।
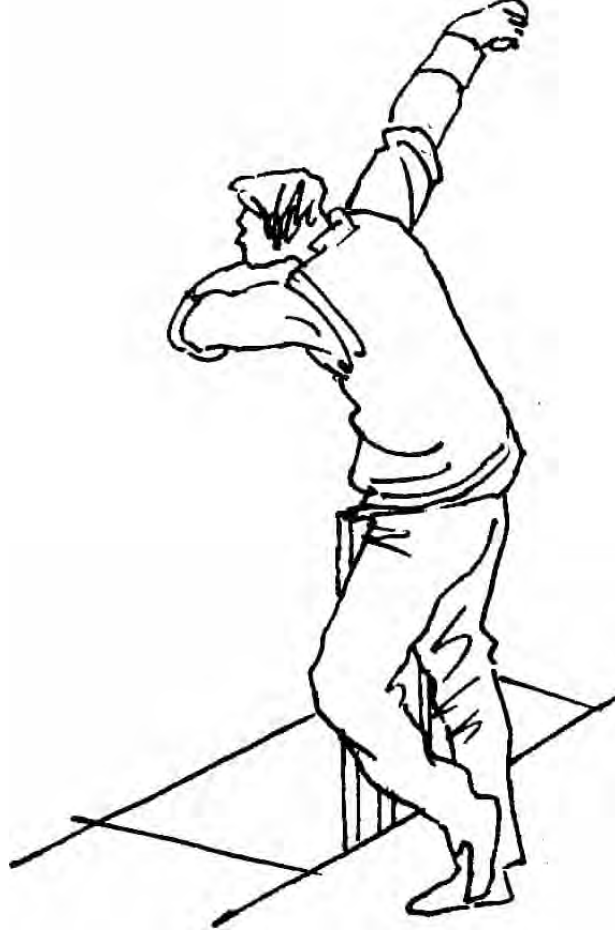
নম্র, অহংশূন্য ঋদ্ধিমান

২০১৪ সালের আইপিএল ফাইনাল। পঞ্জাব কিংস ইলেভেন বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স।

পঞ্জাব মারাক্কু টিম। বিশেষ করে দুটো বিগ হিটার ম্যাক্সওয়েল আর মিলার। কিন্তু কলকাতার নারিন, সাকিব, মর্কেলদের দাপটে সেই পঞ্জাবের যখন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, তখনই ছিপছিপে চেহারার ছোটখাটো বাঙালি ঋদ্ধিমান ব্যাট করতে এল। প্রথম কয়েকটা বল খেলল অতি নিরীহের মতো। একজন কমেন্টেটর একটু বাঁকা মন্তব্যও করেছিল তাই নিয়ে। অনতিপরেই ছোকরা যেন খোলস থেকে বেরিয়ে এল কালান্তক চেহারা নিয়ে। প্রায় কোনও বোলারকেই রেয়াত করল না সে। কুড়ি ওভারের খেলায় একশো পেরোনো চাট্টিখানি কথা নয়। হাতে গোনা কয়েকজনেরই রেকর্ড আছে। আর বাঙালি কারও নেই।

ঋদ্ধিমানের সেই খেলাটা আজও আমার চোখে লেগে আছে। ৫৫ বলে ১১৫। মনে আছে, আটটা ছক্কা মেরেছিল সেদিন। শতকারী হিসেবে তার কোনও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়নি। লাফ-ঝাঁপ তো দূরের কথা। যেন কিছুই করেনি তেমন।

আইপিএল আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট নয়। আর কুড়ি-কুড়িও নয় কুলীন খেলা। তবু মনে হয়েছিল, সৌরভের পর কোনও বাঙালি যদি কিছু করতে পারে, তবে শিলিগুলির এই ছেলেটি পারবে। সেই ফাইনাল ম্যাচটি অবশ্য পঞ্জাব হেরে গিয়েছিল, ঋদ্ধিমানের উজ্জ্বল ইনিংসটি তবু ওই ম্যাচটির স্মরণযোগ্য ঘটনা হয়ে আছে।

বাংলার লক্ষ্মীরতন বা মনোজ কিংবা শ্রীবৎসের মধ্যেও বিস্তর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মন্দ ভাগ্যই হবে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছাড়পত্র পায়নি। তাই ক্রিকেট-পাগল বাঙালির চোখ এখন ঋদ্ধিমানের দিকে। ঋদ্ধিমানের জায়গাটা এতকাল বেশ নড়বড়েই ছিল। সৌরভ যেমন ইংল্যান্ডে আবির্ভাবের প্রথম দুটো টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিল, দিল্লিতে তৃতীয় আবির্ভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ছিল সম্মানজনক অর্ধশত, ঋদ্ধিমানের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

ধোনি টেস্টম্যাচ থেকে সরে দাঁড়ানোয় তাঁর জায়গা নেওয়ার জন্য বিস্তর উইকেটকিপার তৈরি ছিল। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। ঋদ্ধিমান ধৈর্যশীল শান্ত মানুষ। তাই সে শুধু অপেক্ষা করেছে, যদি ডাক আসে।

ডাক আসাটা অনিবার্যই ছিল। তার কারণ, তার কিপিং। এটা সবাই জানেন যে, ক্রিকেটের মাঠে সবচেয়ে বেশি খাটুনির কাজ উইকেট কিপিং। সারাক্ষণ কোমর ভেঙে, হাঁটু ভেঙে খাপ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। সামান্যতম বেখেয়াল হওয়ার জো নেই। এবং প্রতিটি বল। লাফিয়ে, ডাইভ দিয়ে, ডাইনে বা বাঁয়ে, এক হাতে বা দু'হাতে ধরতে হবে ক্যাচ, বাঁচাতে হবে রান, বাইরান। কেউটের ছোবলের মতো তৎপর হাতে করতে হবে স্টাম্পিং বা রান আউট। কোনও একটা ফসকালেই সমবেত 'দুয়ো'। ফাস্ট বলে তবু কিপিং করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জটিল-কুটিল স্পিন সামলানো যে কী কঠিন, তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। আর এই একটা জায়গাতেই ঋদ্ধি অন্যদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে ছিল। তার কিপিং অসাধারণ। এমনকী, তৎপরতায় সে ধোনির চেয়েও ভালো। ইতিমধ্যেই সে ক্যাচ ধরায় রেকর্ডও করে ফেলেছে। ধোনিও তার উত্তরসূরিকে অপছন্দ করে না।

ঋদ্ধির অগ্নিপরীক্ষা ছিল তার ব্যাটিং। কারণ, শুধু ভালো উইকেটকিপার টিমের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে কিছু রানও করতে হবে। নইলে সে হয়ে যায় দলের বোঝাস্বরূপ। ভারতীয় কিপারদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, কুন্দেরন, কিরমানি মোটামুটি ভালো ব্যাটসম্যান ছিলেন। সবচেয়ে ভালো এখনও পর্যন্ত অবশ্যই ধোনি। সেই জায়গাটা ঋদ্ধিমানকে নিতে হবে।

এই অক্টোবরে ঋদ্ধির বয়স হল বত্রিশ। ক্রিকেটারের পক্ষে মধ্যবয়স। আমাদের ভয় হচ্ছিল, কিপিং-এর মারাত্মক চাপ নেওয়ার পর ব্যাটেও কিছু করে দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কি না। ঋদ্ধি আমাদের হতাশ করেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটা শতরান সে করে এসেছে। ভারতের মাটিতে, ইডেনে দ্বিতীয় টেস্টে দু'ইনিংসে অপরাজিত অর্ধশতাধিক রান। এবং মনে রাখতে হবে, ইডেনের এবারের বিচিত্র পিচে বল সমান বাউন্সে আসেনি, কখনও-সখনও বল ঘুরেছে ইচ্ছেমতো, দু-চারটে বাঁক খাওয়া বল হতচকিত করেছে দু'পক্ষের ব্যাটসম্যানকেই। এবারও মনে রাখা দরকার যে, দু'ইনিংসেই ভারতীয় টিমের বিপন্নতার সময়ে এই শীর্ণকায়, কিন্তু শক্তপোক্ত ছেলেটি অতিশয় বুদ্ধির সঙ্গে খেলেছে। বলতেই হবে, ঋদ্ধি খুব একটা রক্ষণাত্মক বা ধীরগতির ব্যাটসম্যান নয়। সে মারতে জানে। দ্বিতীয় ইনিংস সে শুরু করেছিল ছক্কা দিয়ে।

ঋদ্ধির প্রায় সবক'টা ইনিংসই আমি দেখেছি। মনে হয়, সে বল ভালোই দেখতে পায়, জাজমেন্ট খুবই ভালো। তার ট্রেডমার্ক শট বা মার্কামারা মার নেই। ফলে সে নানারকম ভেরিয়েশন আনতে পারে। তার ড্রাইভ বা সুইপ চমৎকার।

ধোনির মধ্যে উত্তেজনাহীনতা আছে, এ তো সর্বজনবিদিত। তার নামই দেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন কুল। ঋদ্ধিও কুল, সম্ভবত ধোনির চেয়েও কয়েক ডিগ্রি বেশি। এটাও শোনা যায়, ঋদ্ধি নাকি খুব কম কথা কয়। এতই কম যে, তার বউ নাকি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে, তার স্বামীটি আর-একটু প্রগলভ হোক। তার চেয়েও বড় কথা, ঋদ্ধি মোটেই প্রশংসার কাঙাল নয়। বরং কিছু একটা ভালো করলে সে তাড়াতাড়ি অন্যদের কৃতিত্ব দিতে শুরু করে। আইপিএল-এর সেই ম্যাচের পর বিজয়ী নাইট রাইডারের খেলোয়াড়দের

সঙ্গে ঋদ্ধিকেও সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ঋদ্ধি রাজি হয়নি। সবিনয়ে বলেছিল, সেটা ভালো দেখাবে না। আমার মনে হয়, এই নম্রতা, এই অহংশূন্যতা ঋদ্ধিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য খেলাও গুরুত্ব পাক

প্রসঙ্গ এবং অভিযোগ দুটোই পুরোনো। নতুন করে উত্থাপন করতে হল অধুনা নতুন কিছু অভিমুখ সৃষ্ট হওয়ায়। সেই প্রায় মধ্যযুগ থেকে ক্রিকেট নিয়ে ইংরেজের আবেগ, ক্রিকেট নিয়ে অতিপ্রচার, ক্রিকেট-সাহিত্য ইত্যাদি বিস্তর কসরতের পরেও খেলাটিকে বিশ্বজনীন করা যায়নি। কিন্তু পোড়াকপালে ভারতবাসী, যারা বিশ্বের ক্রীড়া-মানচিত্রে প্রায় অপাঙক্তেয়, যাদের অলিম্পিক পদকের ভাঁড়ে মা ভবানী, বিশ্ব-ফুটবলে যারা নিজ অঞ্চলেও কল্কে পায় না, তারা আর কিছু না পেয়ে অবশেষে ক্রিকেট আঁকড়ে ধরে আহ্লাদে আটখানা। জাতীয় দলের খেলুড়েদের রোজগার বছরে কোটি-কোটি টাকা, খেলে এবং বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়ে।

কিন্তু আক্ষেপ হল, এই বাড়াবাড়ি, এই হই-হট্টগোল এবং ডামাডোলে চাপা পড়ে যাচ্ছে ইদানীং ক্রীড়াবিশ্বে কয়েকজন অসামান্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদের বিরল সাফল্য। দাবা যদিও শারীরিক খেলা নয়, কিন্তু এই জটিল ও অনন্ত কূটকুশলতার খেলাটিতে একসময় একচেটিয়া আধিপত্য ছিল রুশদের। সেখানে দাবা অতীব জনপ্রিয় খেলাও বটে। তাদের আধিপত্যে থাবা বসাতে বহু বছর লেগেছে আমেরিকার একজন ববি ফিশার তৈরি করতে। কিন্তু ববির পর ফের রাশিয়া স্বমহিমায় ফিরে যায়। এটাই অকল্পনীয় যে, একটি ভারতীয় ছেলে সেই সিংহের গুহায় ঢুকে রুশ মহিমাকে ছিন্নভিন্ন করেছে একক প্রচেষ্টায়। তার পিছনে না ছিল ট্র্যাডিশন, না পরিকাঠামো, না সরকার। বিশ্বনাথন আনন্দ যে কী কাণ্ড করেছে, তা ভারতবাসী এখনও বোধহয় ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। তেমনই রোগাটে, ছিপছিপে দক্ষিণ ভারতীয় ওই মেয়েটি সাইনা নেহওয়াল। গত তিন-চার বছর ধরে এই মেয়েটির খেলা আমি মুগ্ধ হয়ে দেখে আসছি। প্রকাশ পাড়ুকোন আর পুলেল্লা গোপীচাঁদের পর এই মেয়েটি ব্যাডমিন্টনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে। ভারতবাসী কি যথেষ্ট সচেতন? মনে হয় না। অভিনব বিন্দ্রা বা অর্জুন অটওয়াল যেসব খেলার সঙ্গে যুক্ত, তা হয়তো সাধারণ ভারতবাসীর কাছে অনাকর্ষক। অনাকর্ষক স্নুকার বা বিলিয়ার্ডসও, নইলে এ-দু'টিতে গীত শেঠির মতো কতিপয় বিশ্বসেরা ভারতবাসীকে আমরা পেয়েছি। এদেশের অর্থনীতির নিরিখে এসব হল ধনীদের খেলা। কিন্তু তা হোক, তবু এরা ভারতকে বিশ্বক্রীড়ার মানচিত্রে জায়গা তো করে দিচ্ছে। মানছি, এসব খেলা দর্শক আকর্ষণের মতো নয়, জনপ্রিয় তো নয়ই, কিন্তু রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেতেই পারত।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ক্রিকেট-বিরোধিতা নয়। কারণ ক্রিকেট অতি উপভোগ্য, সূক্ষ্ম শিল্পসমন্বিত, রোমাঞ্চক ও বৌদ্ধিক খেলা। এ খেলাকে ভালো না বেসে উপায় নেই, কিন্তু শরীরের সব রক্তই শুধু মস্তিষ্কে ধাবিত হলে মুশকিল। জনপ্রিয়তাই যদি কোনও খেলার একমাত্র নিয়ামক হয়, তাহলে অন্যান্য খেলার ক্রীড়াবিদরা হতাশা বোধ করবেন বইকি! এদেশে সৌরভ, সচিন, দ্রাবিড়, ধোনিরা যত গুরুত্ব পান, ততটা কি পান লিয়েন্ডার পেজ বা দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়? এদেশে হকির একটি স্বর্ণময় অতীত থাকা সত্ত্বেও, কোনওদিনই হকি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। হকি খেলোয়াড়রাও তেমন বিখ্যাত হতে পারেননি। অথচ এদের কৃতিত্ব ক্রিকেটারদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। প্রত্যাশিত গুরুত্বের অভাবে এবং পরিকাঠামোজনিত দুর্বলতায় আমাদের অনেক খেলাতেই ভারতের সম্ভাবনা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবেশী চিন কিন্তু মাত্র কয়েক বছরেই সার্বিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রায় সবরকম খেলাতেই দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে বেজিং অলিম্পিকে ঝুড়ি-ঝুড়ি সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ তুলে প্রবল প্রতিপক্ষ আমেরিকা ও রাশিয়াকে হেলায় টপকে গেছে। চিনের অভ্যন্তরের ঘটনার কথা আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি, পেশাদারিত্ব ছাড়া কোনও খেলায় বিশ্বমানে উন্নীত হওয়া অসম্ভব। যে খেলায় স্পনশরশিপ বা দর্শকের আনুকূল্য নেই, সেই খেলায় সরকারকেই খেলোয়াড়দের সবরকম চাহিদা পূরণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এবং গড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত পরিকাঠামো। তা যদি না হয়, তবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া আর কোনও পন্থা নেই। গত বেজিং অলিম্পিকে চিনের কৃতিত্ব যদি আমাদের লজ্জা দিয়ে থাকে, তাহলে খুবই ভালো। লজ্জা হওয়া মানেই শিক্ষা হওয়া আর শিক্ষা হলে জেদ আর উদ্যোগ আসে। ভারতের ম্রিয়মাণ ক্রীড়াবিদরা সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করছেন।

গৌরবের শতবর্ষ

মোহনবাগান কোনওদিনই ঘটিদের টিম ছিল না, তবে হ্যাঁ, ডাকাবুকো বাঙালিদের টিম ছিল বটে। আর সত্যিকারের ঘটি-বাঙালের অনুপাত নিয়ে যদি কেউ টানাটানি করে, তাহলে বলতেই হচ্ছে মোহনবাগানই ছিল আসলে বাঙালদের টিম। ১৯১১-এর আইএফএ শিল্ডজয়ী টিমটির খেলুড়েদেরই দেখুন। শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ীর বাড়ি ফরিদপুর। রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ঢাকা বিক্রমপুরে, কানু রায়ের বাড়ি ঢাকা। বিজয়সূচক গোলটি যিনি করেছিলেন, সেই অভিলাষ ঘোষের দেশ ময়মনসিংহ।

মোহনবাগান ক্লাব জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় আবেগের প্রতিনিধি। এ-যুগে বসে সেই যুগের আবেগ, হীনমন্যতা, নিজদেশে পরদেশিদের মতো নতমস্তকে বসবাস করার অগৌরব কল্পনা করা কষ্টকর। তাই এখনকার যুব সম্প্রদায় ১৯১১-তে মোহনবাগানের শিল্ডজয়ের উন্মাদনাকে ঠিকমতো বুঝবে না। বুঝবে না, গোরাদের কাছে প্রায় কত বিষয়ে হেরে-যাওয়া হতমান ভারতবাসীর কাছে সেই জয় কতটা উজ্জীবক মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। তাই বাঙাল-ঘটি নির্বিশেষে আপামর বাঙালি তো বটেই, গোটা ভারতবাসীরই সমর্থন ছিল মোহনবাগানের প্রতি। মোহনবাগান তাই শুধু একটি ক্লাব তো নয়, একটি আবেগ। একটি প্রতীকও বটে।

সব ব্যাপারেই অগ্রপথিকের মর্যাদাই আলাদা। পরাধীন আমলেই মোহনবাগানের পর অন্যান্য দলও শিল্ড জিতেছে। কিন্তু আগরওয়ালার সম্মান শুধু মোহনবাগানেরই! তখন খেলোয়াড়েরা পয়সাকড়ি বিশেষ পেতেন না। খেলা ভালোবেসে খেলতেন। আর সবাই জানে যে, বুট কেনার সামর্থ্য ও বুট পায়ে খেলার অভ্যেস না থাকায় তাঁরা খেলতেন খালি পায়ে। শুধু অদম্য সাহস, প্রবল জাতীয়তাবোধ, জেদ, রাগ, গভীর দেশপ্রেম থেকে ওই খালি পায়েই তাঁরা টক্কর দিতেন গোরাদের সঙ্গে। অনেক বৃদ্ধ বাঙালকে দেখেছি, যাঁরা কখনওই মোহনবাগানকে ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক হননি।

পরবর্তীকালে ইস্টবেঙ্গলের উত্থান ঘটলে সমর্থকদের মধ্যে একটি ঘটি আর বাঙালের বিভাজন হয়। স্বাধীনতার আগে সেটি বোধহয় ততটা তীব্র আর তিক্ত ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতা এবং তজ্জনিত দেশভাগের পর বাস্তুচ্যুত বাঙালেরা যে-লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভিটের শোক, অভাব, তাড়না এবং অবিচারের শিকার হলেন, তার ফলেই তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল কিছু দ্রোহভাব! স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে বহুগুণ নিরানন্দকে

বরণ করে নিতে হয়েছিল তাঁদের। ফুটবল মাঠের বিভাজনও বাঙালদের সেই হারানো আইডেনটিটিরই সন্ধান, ফলে মোহনবাগান তার জাতীয় চরিত্র হারিয়ে অবনমিত হল ঘটিদের দলে। ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠল হারানো পূর্ববঙ্গের প্রতীক।

তবু একশো বছর আগেকার শিল্ড জয়ের যে-জয়ন্তী আজ মোহনবাগান পালন করছে, তার গৌরবের ভাগীদার গোটা বাঙালি তো বটেই, গোটা ভারতবাসীও! আর তৎকালে মোহনবাগানে নিরানব্বই ভাগ খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালি। আজও বাংলাকে ফুটবলের ধুরন্ধর জাত বলে ধরা হয়, যদিও ধীরে-ধীরে সেই গৌরব অস্তগামী হচ্ছে।

নিজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারল কই মোহনবাগান? আজ স্মরণে মননে অতীতকে ফিরিয়ে আনার একটি অক্ষম চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই পটভূমিই তো নেই। টিম বিক্রি হয়ে বসে আছে শিল্পপতির কাছে। বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনতে হচ্ছে খেলোয়াড়। ক্লাবের সংগঠনে নানা দলাদলি আর আকচা-আকচি।

কারণও আছে। ধীরেন দে-র আমল পর্যন্ত মোহনবাগানের মর্যাদা ছিল অক্ষুণ্ণ। সম্পন্নতা ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়রা শুধু ভাড়াটে সৈন্য ছিলেন না, তাঁদের আরও একটু সমাদর ছিল। অনেকটা পারিবারিক বন্ধনের মতো। অনেক খেলোয়াড় মোহনবাগানেই সারাটা খেলোয়াড়জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। প্রলোভন সত্ত্বেও অন্য ক্লাবে যাননি। এসব আবেগতাড়িত ব্যাপার-স্যাপার হয়তো এই পেশাদার যুগে চলে না। তাহলে পেশাদারিত্বই সুশৃঙ্খলভাবে অনুসৃত হোক! দুনিয়ার ফুটবল তো পেশাদারিত্বের উপরই উত্তুঙ্গ শিল্পের শিখরে উঠেছে। কিন্তু পরিকাঠামোজনিত অসুবিধার কারণেই হোক কিংবা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই হোক, এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির রাহুমুক্তি ঘটছে না। গোয়া বা পঞ্জাবের দলগুলির ফুটবলে উন্নতি দেখে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের ফুটবল-রাজধানী বাংলা থেকে না পশ্চিমে প্রবাসী হয়!

প্রবন্ধ। সমাজ

আত্মহত্যার মড়ক

আমার জীবনে প্রথম আত্মহত্যার ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আমি জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশনে ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমারই এক সহপাঠী, তার নাম স্মৃতি, রেল লাইনে গলা দিয়ে মারা যায়। যখন ক্লাস চলছে তখনই খবরটা এল এবং স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমরা ছুটলাম আউটার সিগন্যালের কাছে ঘটনাস্থলে। দ্বিখণ্ডিত দেহের স্মৃতিকে দেখে চিনতে পারি না। ভয়ে, বীভৎস দৃশ্যে প্রতিক্রিয়ায় মন এমনই বিকল হয়ে গেল যে, সেই ক্ষুধাতুর বয়সে পর পর কয়েকদিন ভাতের গ্রাস গলা দিয়ে নামতে চায়নি। চমকে চমকে উঠি বারবার সেই দৃশ্য মনে পড়ায়। দেড়-দু'ঘণ্টা ফুটবল খেলার ক্লান্তি নিয়েও রাতে ঘুমোতে পারি না। এক উজ্জ্বল সকালে বন্দুক পরিষ্কার করতে বসে আচমকা বন্দুকের গুলিতেই প্রাণ হারালেন বহু বন্দুক পিস্তল ঘাঁটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা, আজও নির্ধারিত হয়নি। লোকে বলে আত্মহত্যাই। কেন? বেঁচে থাকার প্রয়োজন খুঁজে পাচ্ছিলেন না, ফর হুম দ্য বেল টোলস? কিংবা সস্ত্রীক স্তেফান জাইগ? দু-দুজন সফল নোবেল লরিয়েট? আরও এক জাপানি নোবেলজয়ী লেখক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা হারাকিরি করে মারা যান। লোকে ভাবে, এঁরা কেন মরেন! বাবা, এত বড় মানুষ! এঁদের দুঃখটা কী? কার যে কী দুঃখ বলা বড় কঠিন!

যে আসবেই একদিন, সময়মতো, তাকে এই তাড়া দিয়ে নিয়ে আসা কেন? আর কেন এই একবিংশ শতকে এই তাড়াহুড়ো এত মাত্রাছাড়া?

গান আছে, 'মন চলো নিজ নিকেতনে'। কী যে হল সেই মনের, এখন মানুষের মন যেন চির-অনিকেত। পায়ে শিকলি বাঁধা দাঁড়ের পাখিটি হয়ে থাকতে নারাজ। কোন আলায়-বালায় সে যে ঘুরে বেড়ায়! আর মানুষ তাকে কুলায়ে ফিরিয়ে আনার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে, সাধে : মন, মনরে, চলো বাবা, নিজ নিকেতনে।

মনেরও বুঝি একটা ভরকেন্দ্র আছে কিছু, ঝড়-ঝাপটা, শোক, ব্যর্থ প্রণয়, হতাশা, একাকিত্ব সামলে দেয় ওই ধ্রুব বা কীলকেন্দ্রটি। কিন্তু ওটি নড়ে গেলেই গেল। একাকিত্ব? পৃথিবীতে এত বর্ধমান সংখ্যাতীত গায়ে গায়ে মানুষ তবু মানুষ একা কেন রে? যত ভিড় বাড়ছে তত কেন আরও একা হয়ে যাচ্ছে সে? এত সংহতির কথা, এত ভালোবাসাবাসির কথা, এত রাখিবন্ধন, এত ভ্যালেন্টাইন ডে-র দামি কার্ড, তবু কেন নিজের হাতেই নিজে খুন হয় মানুষ?

মন, চলো নিজ নিকেতনে। যেন দুষ্টু, দামাল ছেলেকে ডাকছে মা, ওরে ওরে আয়, ঝড় আসছে, বৃষ্টি নামবে, কামড়ে দেবে পাগলা কুকুর, ভূতে মারবে ঢেলা, ওই পুকুরধারে আছে খোক্কসের বাসা, ফিরে আয়

বাছা। মানুষের মন ঘর ছেড়েছে বহুদিন, বাঁধন কেটেছে, বাউণ্ডুলে হয়েছে, সন্ন্যাসী নয়। বাগে আনা কি সোজা কথা?

মনকে যা ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। কিন্তু মন্ত্রেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল মানুষ। ঈশ্বর, ধর্ম, নীতিকথা, রাজনীতি, ক্রমে বিশ্বাস টলে যাচ্ছে সর্বত্র, মাথায় মুহুর্মুহু নানা মতবাদের বোমাবর্ষণ। মন নিয়ে মানুষ আজ বড়ই বিপন্ন।

বলি আমি এই হৃদয়েরে, সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়? ওই একটা কথা, ও-কোনও মধুর সুইট নাথিং নয়, পাগল কবি চুপ করাতে চেয়েছিল তার মনের অসংলগ্ন প্রলাপকে। ওই প্রলাপতাড়িত মন তাকে নিয়ে যেত মধ্যরাতে, চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে, বিনা প্রয়োজনে টেরিটিবাজার থেকে আহিরিটোলা। চিনাদের পাড়া ছেড়ে কাঁহা কাঁহা মুলুক ভূতগ্রস্ত কবি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মনকে। তারপর একদিন দিবালোকে রাসবিহারী এভিনিউতে ট্রামের তলায় নিশ্চুপ হল মন। মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো?

আলোর দিকে পিছন ফিরে মানুষ আজও চিৎকার করে, অন্ধকার! বড় অন্ধকার!

আশ্চর্য, এই পৃথিবীতে আজ অদ্ভুত আঁধার এক, ডার্কনেস ইন আইডিয়াজ, ডার্কনেস ইন লাইফ, ডার্কনেস ইন পলিটিকস, ডার্কনেস ইন লাভ, অ্যান্ড ডার্কনেস অ্যাট নুন। আমাদের জানালায় উটের গ্রীবার মতো সেই নিস্তব্ধতা। বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, তবু সে সহসা দেখিল কোন ভূত! কে তাকে টেনে নিয়ে যায় দড়িহাতে ফাঁসুড়ে গাছের তলায়?

তবু মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটিই আকুল প্রার্থনা এই একবিংশ শতাব্দীতেও উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে, এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে। এই জীবনের তটভূমি ছেড়ে আসলে সে যেতে চায় না কখনওই। নিজের হাত টেনে সে নিজেকেই বলতে চায় যেতে নাহি দিব।

একবিংশ শতাব্দীর এত জাঁকজমক, মানুষের এত কীর্তির মধ্যে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থেকেও মানুষকে তবু কেন বলতে হবেই, আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে! আধখানা শরীর নিয়ে বেঁচে আছে যে পোকা, গলিত স্থবির ব্যাঙ, টার্মিনাল ডিজিজের রুগি, কে মরতে চায়? দু-এক মুহূর্তের আয়ু সে কাঙালের মতো ভিক্ষে করে। বড় সুন্দর এই ব্যক্ত জীবন, কিন্তু জীবনের অমেয় টলটলে জল ঢেকে আছে কচুরিপানার জঞ্জালে। সে জানে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জানে, কিন্তু তার বিশ্বাসকে বস্তুপুঞ্জে চাপা দিয়ে যে নিজেই মেরে ফেলেছে সে, তার মন বেহাত।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে আত্মহত্যা বাড়ছে, মানুষ বড় কাঁদছে। আমরা বড় অসহায়।

সংকীর্ণ ও বিকৃত অস্মিতা কখনওই কাম্য নয়

বেশ কিছুদিন ধরেই মহারাষ্ট্র এবং বিশেষ করে মুম্বইতে রাজ, উদ্ধব ও বাল ঠাকরের দলবল যে-মরাঠি অস্মিতার পারদ চড়িয়েছেন, তার নিন্দা দেশ জুড়েই চলছে। এই সংকীর্ণ মনোভঙ্গি যে দেশকে আরও নানা বিভাজন ও বিবাদের পথে নিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ সেই। কিন্তু মুশকিল হল, অল্পবিস্তর প্রাদেশিকতা বা মাতৃভাষার প্রতি দুর্বলতা সকলেরই আছে। আর থাকাটা অনভিপ্রেতও নয়। তবে মহারাষ্ট্রে যা হল তা ভারতীয়ের অস্মিতা নয়, যেন খানিকটা ভারতদ্রোহী মরাঠি আবেগ। 'ভারতদ্রোহী' কথাটা হয়তো তীব্র হয়ে গেল, কিন্তু হরেদরে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তা-ই। মরাঠা জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস কে না জানে! শুধু শিবাজিই তো নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মরাঠিদের অবদান এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সাহিত্য সংস্কৃতি, বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে তাঁরা যে-বিপুল সৃজনকর্ম করেছেন, তার স্বীকৃতি নতমস্তকে গোটা ভারত দিয়ে এসেছে।

কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুর মতো মুম্বইও এক বহুজাতিক মহানগর। মহানগরগুলিকে কোনওভাবেই প্রাদেশিক শহরের তকমায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। কলকাতা শহরে যে বাঙালির প্রাধান্য নেই, বৈভব বা নির্মিতি, লগ্নি বা প্রযুক্তি, দক্ষতা বা বিজ্ঞতায় যে আরও অনেকেই দড়, এ কথা তো আমরা কবে থেকে জেনে আসছি এবং মেনেও নিয়েছি। এ শহরের সবচেয়ে মহার্ঘ স্থাপত্য, বিপণি, বেসরকারি দফতর সবই অবাঙালিদের হাতে। এমনকী কলকাতার অভিজাত এলাকাগুলি থেকেও বিত্তে কমজোরি বাঙালিকে শহরতলিতে সরে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে। বাঙালির অস্মিতা দেশভাগের ফলে বিস্তর মার খেয়েছে। তা বলে প্রাদেশিকতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা এখনও হয়নি। ভয় হয়, মুম্বইয়ের শিবসেনা অন্যান্য প্রদেশবাসীকে সেই দিকেই প্ররোচনা দেবে কিনা।

পাকিস্তানি ক্রিকেটার নিয়ে শাহরুখ খানের একটি নিরীহ আক্ষেপকে যে এত বড় মাত্রা দেওয়া হবে এবং তাই নিয়ে তাঁর অভিনীত একটি চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে হিংস্র আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে, এটা ভাবলে অবাক হতে হয়। এত সামান্য কারণে এত কিছু করার দরকার ছিল কি? এই দলের কি আর কাজকর্ম বলে কিছু নেই? জয়া বচ্চন কোথায় হিন্দিতে বিবৃতি দিলেন, অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্লগে কী লিখলেন, অস্ট্রেলিয়া কেন মুম্বইতে খেলবে—এসব নিয়ে আন্দোলন করায় বা সহিংস প্রতিরোধে নামায় তো বাল ঠাকরের মতো প্রবীণ ও বিদগ্ধ নেতার অনুমোদন পাওয়ার কথা নয়।

মরাঠিদের অপমান নিশ্চয়ই যে-কোনও মরাঠিরই গায়ে লাগবে। ঠিক তেমনই, বিহারি, বাঙালি বা উত্তর ভারত-সহ গোটা ভারতকে অপমান করাও তো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উচিত নয়। রাজ, উদ্ধব বা বাল ঠাকরের উদ্ধত কথাগুলির মধ্যে তাই ভারতীয়-বিদ্বেষের কটু গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। এই বিদ্বেষের প্রকাশ কি প্রকারান্তরে মরাঠি মানসিকতাকেই সংকীর্ণ ও বিকৃত প্রাদেশিকতাতে মসীলিপ্ত করবে না?

আমাদের ভাগ্য ভালো যে, গরিষ্ঠ সংখ্যক মরাঠিই এই আন্দোলনের শরিক নন। সচিন তেন্ডুলকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সপাটে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি প্রথমে একজন ভারতীয়, তারপর একজন মরাঠি। মন্তব্যটিতে বালাসাহেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কটু মন্তব্যও করেছেন, কিন্তু আর ঘাঁটাননি। বস্তুত, তাঁর এই অত্যন্ত দুর্বল ভাবাবেগের আন্দোলনটি হালে পানি পাচ্ছে না। তাঁর সমর্থকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে পারঙ্গম। উপরন্তু, রুজি-রোজগারের জন্য যারা মুম্বইতে যায় তারা শিবসেনাকে ভয় পায়, বাল ঠাকরেকেও কখনও চটায় না। এই ভয় পাওয়াটাও শুভ লক্ষণ নয়। সমীহ করা বা শ্রদ্ধা করা এক কথা, কিন্তু মানুষ ভয় পাবে কেন?

রাহুল গাঁধীর বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে বালাসাহেব যেসব মন্তব্য করেছেন তা কুরুচির পরিচায়ক। উপরন্তু, তাঁর হুমকি উপেক্ষা করে যেভাবে আমজনতার সঙ্গে মুম্বই সফর করে গেলেন রাহুল, তাতেও সন্দেহ হচ্ছে, বালাসাহেবের সেই ভয়ংকরতা আর বেশি অবশিষ্ট নেই। যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে নানা অশান্তি সৃষ্টি করাই কেবল সম্ভব। আক্ষেপের বিষয়, বালাসাহেব ও তাঁর দল অতি সংকীর্ণ, বিভেদকামী, হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিতে আটকে আছেন। মরাঠি অস্মিতাকে নতুন গৌরবে উজ্জীবিত করার সাধ্য তাঁদের আর নেই।

বইবিমুখ অথচ টিভিমুখী

দেশের লেখাপড়া জানা যুব সম্প্রদায় কি ক্রমে বই-বিমুখ এবং টিভিমুখী হয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নটা পুরোনো এবং বহুচর্চিত। তবে তেমন বাস্তবসম্মত কোনও সমীক্ষা এতকাল চালানো হয়নি। এবার হয়েছে এবং থলে থেকে বেড়ালটি বেরিয়েও পড়েছে।

লেখাপড়া করে বা জানে, এমনতরো তেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরী, যুবক ও যুবতীর মতামত নিতে হয়েছে অবশ্য বইয়ের বাজারে মন্দা দেখেই বোধহয়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (এনবিটি) একটি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা, সমীক্ষাটি করিয়েছেন তাঁরাই। তাঁদের বিপণন এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা কতটা আন্তরিক এবং উদ্দীপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যক্তিগত মালিকানার স্তরে যে-আন্তরিকতা ও প্রয়াস থাকে, সরকারি উদ্যোগে তা প্রায়-সময়েই অনুপস্থিত। ফলে এনবিটি বা সাহিত্য আকাদেমির বই দামে সস্তা হলেও সহজপ্রাপ্য নয়। প্রচারের অভাবও প্রকট। ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা হলে এইসব উদ্যোগ অতীব সদর্থক ভূমিকা নিতে পারত।

যাইহোক, সমীক্ষাটি তবু সরকারি উদ্যোগেই হয়েছে। সমীক্ষাটি করেছে মূলত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় সমিতি (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ)। ১৯৯টি শহর এবং ৪৩২টি গ্রামে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের ৩৫ হাজার ৫৭৫ জনের উপর সমীক্ষাটি চালানো হয়।

সমীক্ষায় যা বলা হচ্ছে তার সারবস্তু হল, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় অবসর বা অবকাশ পেলে টিভি খুলতেই বেশি আগ্রহী, বই পড়তে নয়। জাতীয় যুব-পড়ুয়াদের ওপর এই ক্ষেত্র-সমীক্ষা জানিয়েছে যুব-মানসে টেলিভিশনের প্রভাব অনেক বেশি গভীর। শতকরা ২৮ ভাগ যুবক-যুবতীই অবকাশ পেলে টিভি দেখতেই আগ্রহী। অবসর পেলে বই পড়তে চায়, এমন যুবক-যুবতীর সংখ্যা মাত্র শতকরা সাড়ে সাত। শতকরা দশজন অবসর পেলে ঘুমোতে চায়।

এটি হল যুব-সম্প্রদায়ের বাসনা বা ইচ্ছের কথা। কিন্তু সত্যিকারের বই-পড়ার ক্ষেত্রে ছবিটা তত নৈরাশ্যজনক নয়। শতকরা ২৫ ভাগ বলেছে, তারা সময় পেলে বই-টই পড়ে, সেটা পড়ার বই বা অন্যতরো বই, যাই-ই হোক। এদের মধ্যে শতকরা ছয়জন বলেছে, তারা রোজই কোনও না কোনও বই পড়ে। শতকরা বারোজন সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করে থাকে। আর শতকরা

সাতজন বই পড়তে বসে মাসে একবার কি দুবার। অনেকের মতে এইসব পড়ুয়ারা অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে বই পড়ে, আর অনেকে বই পড়তে বাধ্য হয় আর কিছু করার নেই বলে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগের নাগালে কমপিউটার আছে। আর শতকরা একজন মাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার জানে এবং তাদের পছন্দ ই-মেল বা চ্যাটিং করা। তাদের মতে, বইয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইন্টারনেট এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম, অর্থাৎ টিভি।

বই পড়ার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতর ভূমিকা কিন্তু পূর্বাঞ্চলের। শতকরা ৪৩ শতাংশ কবুল করেছে, তাদের বই পড়ার অভ্যাস আছে। ওড়িশা, বিহার, বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডে কিছুটা কম, ৩০ শতাংশ।

গোটা সমীক্ষায় জানা গেছে, যারা বই পড়ে তাদের আট শতাংশের পছন্দ হিন্দি বই, তিন শতাংশের মরাঠি এবং দুই শতাংশের প্রিয় বাংলা গ্রন্থ। ইংরেজি বই পড়তে যারা আগ্রহী, তাদের সংখ্যা দুই শতাংশেরও কম।
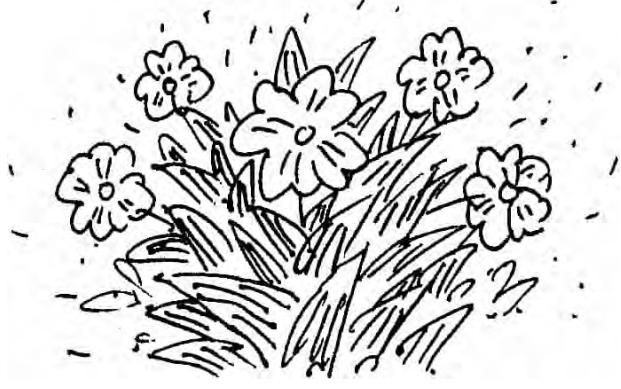
বই কেনার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় ক্রেতাকে প্রভাবিত করে? সাত শতাংশের মত হল বইয়ের দাম, প্রায় সমসংখ্যক মানুষের মত, বইয়ের বিষয়। ছয় শতাংশ বই কেনে লেখকের নাম দেখে। সমীক্ষকরা বলেছেন, কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত থাকে বিষয় এবং লেখকের নামের দ্বারা।

তারা কি বিজ্ঞাপন দেখে বই কেনে? না, তাও নয়। কোন নতুন বই বাজারে আসছে, সে বিষয়ে তারা অবহিত নয়। তারা বইয়ের খবর পায় আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে।

সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি আমাদের হাতে আসেনি। আশা করছি, তাতে পুস্তকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মোবাইল ফোনেরও উল্লেখ আছে। একজন যুবক বা যুবতীর কতটা সময় যে এই যন্ত্র নিয়ে কাটে, তা আমরা প্রতিনিয়তই টের পাই। আমরা এ-ও জানি না, সমীক্ষায় বই-পড়া বলতে কোন বইকে ধরা হয়েছে? নিশ্চয়ই পাঠ্যপুস্তক নয়। তার কারণ, পাঠ্যপুস্তক পড়া বাধ্যতামূলক বলেই তার ওপর সমীক্ষা নিরর্থক। তাহলে কি সাহিত্য? জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই? নাকি পত্র-পত্রিকা?

ভারতের শিক্ষার হার এতই কম যে, জনসংখ্যার তুলনায় বই-পড়ুয়ার সংখ্যা নগণ্য বললেই হয়। বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষা, বঙ্গভাষীর সংখ্যার নিরীখে। কিন্তু এত বাঙালি যদি বই পড়ত, তাহলে বাংলা বইয়ের বাজার অনেক উন্নত দেশকেও বহু পিছনে ফেলে দিতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত, সাক্ষর বাঙালি তথা ভারতবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার নগণ্য শতাংশ মাত্র।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর সরকারি উদ্যোগে বহু অর্থব্যয়ে এই যে সমীক্ষাটি হল, এর উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ। যুবসমাজকে বই-মুখী করার কী নিদান তাতে আছে তা আমাদের জানা নেই। ভয় হয়, এইসব ব্যয়বহুল সমীক্ষার প্রতিবেদনগুলি যথারীতি না আবার ঠান্ডা ঘরের আশ্রয়লাভ করে। বই-বিমুখ এই প্রবণতার অভিমুখ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিও অবিলম্বে শুরু করা উচিত। তা না হলে এইসব উদ্যোগ নিতান্তই হাস্যকর বহ্বাস্ফোট হিসেবে গণ্য হবে।

জনাকীর্ণ কলকাতায় ট্রাম একেবারেই অচল

যেমন 'গোঁফ দিয়ে যায় চেনা', ঠিক তেমনই একসময় ট্রাম দিয়ে চেনা যেত কলকাতা শহরকে। কারণ, কলকাতা ছাড়া দেশের আর তিন মহানগরে ট্রাম ছিল না। তখনকার দিনে বহিরাগতরা কলকাতায় এসে ট্রাম দেখে ভারি খুশি হত। ঘাসের নয়নাভিরাম বিছানায় পাতা ট্র্যাকে ট্রাম চলত প্রায় নিঃশব্দে, বিনা ঝাঁকুনিতে, পেট্রোল বা ডিজেলের দূষিত ধোঁয়া উদ্গারণ ব্যতিরেকে। বহু মানুষেরই শৈশবস্মৃতিতে ট্রাম অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। তারপর সময় বদলেছে এবং এখন দ্রুততর বদলাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের ভূগোলও বদলে যাচ্ছে। রাস্তা ও পরিসরের অভাবে এমনিতেই কলকাতা গতিমন্থর শহর। বিস্তর উড়ালপুল, ওয়ান ওয়ে করেও তাল সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাস্তাঘাট এখনকার প্রয়োজন অনুপাতে অতীব সংকীর্ণ। এবং প্রতি বছর হাজার কয়েক গাড়ি যুক্ত হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি পরিবহনে। এহেন অবস্থায় সরকার ট্রামকে পুনর্জীবন দান করতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে যতটা আবেগ কাজ করছে ততটা বাস্তববুদ্ধি নয়। ট্রামের প্রধানতম অসুবিধে এই যে, দূষণমুক্ত হলেও এই যান গতিতে মন্থর এবং কোনওভাবেই পাশ কাটাতে পারে না। মাঝে মাঝেই ট্রাম বে-লাইন হয়ে পড়ে, কারণ ট্রামের লাইনে খাঁজের গভীরতা কম। এই যানটি চলে ডাইরেক্ট কারেন্টে। প্রতিদিনের ব্যবহারে ডিসি যেখানে অপ্রচলিত হয়ে আসছে, সেখানে এখনও এই বিদ্যুৎব্যবস্থা ট্রাম চালানোর জন্য বহু ব্যয়ে চালু রাখতে হয়। ট্রামের যাত্রীসংখ্যাও দারুণ কমে গেছে। আমাদের মেদুর নস্টালজিয়া সত্ত্বেও কলকাতা শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলিতে ট্রাম অচল। প্রাগৈতিহাসিকভাবেই অচল। রাজ্য সরকার যদি ট্রামকে এই শহরে বহাল রাখতেই চান, তাহলে তার জন্য আলাদা পরিকল্পনা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ট্রাম চালাতে হবে রাজারহাট, সল্ট লেক, বাইপাস বা ডায়মন্ড হারবার রোডে, কিংবা দূরবর্তী শহরতলিতে, কিছুতেই কলকাতার জঙ্গম কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নয়।

আমাদের রাজ্য প্রকৃত অর্থেই গরিব। দারিদ্রসীমার নীচে শঙ্কাজনক জনসংখ্যা। অর্থাভাবে কত জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের অপেক্ষায়। এহেন আর্থিক পটচিত্রে কেবলমাত্র ট্রামের জন্য ১৭১ কোটি ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার প্রস্তাবিত ভরতুকি রীতিমতো বিলাসিতার শামিল। শুধু তাই নয়, এই অবস্থায় উন্নতি ঘটানোর পন্থা খুঁজতে সিটিসি কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করতে চলেছে। অলাভজনক বলে কলকাতায় ট্রামের জমানা শেষ হতে বসেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। সিটিসি-র কর্মীরা ট্রাম ছেড়ে বাস চালানো শুরু করতে বাধ্য হন। ছেড়ে দিয়ে ফের তেড়ে ধরা কেন, সেটাই প্রশ্ন।

আরও উদ্বেগের কথা হল, ট্রাম শুধু বহালই থাকবে না, তাতে যুক্ত হতে চলেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও। অন্তত কয়েকটি ট্রামে। অর্থাৎ, শ্বেতহস্তী পোষার খরচ। দ্বিতীয় শ্রেণি তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এত করেও ট্রামের জন্য আগ্রহী বা উদগ্রীব যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী পাওয়া যাবে কি? এর আগেও অনেকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন হেরিটেজ ট্রাম, সুন্দরী ট্রাম, রং-বেরংয়ের ট্রাম ইত্যাদি। সুতরাং বছরের পর বছর ফের ভরতুকি দিয়ে নস্টালজিয়া রোমন্থন চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। এই অর্থব্যয় কোনওক্রমেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। ট্রাম-ব্যবস্থা বহুকাল আগেই রুগণ বলে ঘোষিত হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, রুটের অভাবে এবং বাস্তব আরও বহু কারণে ট্রামকারগুলিরও বেহাল অবস্থা। সেগুলি মেরামত করার খরচও বিপুল। সুতরাং গরিব রাজ্যবাসীর ঘাড়ে আরও একটি জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেওয়ার মানে হয় না। আবারও বলি, ট্রামকে যদি সচল রাখতে হয় তাহলে তার জন্য আলাদা এলাকা, আলাদা পরিসরযুক্ত পথ এবং উপযুক্ত পরিবেশ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই জনাকীর্ণ শহরে যানজট সৃষ্টিকারী, মন্থর এই যানটিকে সচল রাখার চেষ্টা পরিত্যাগ করাই শহরবাসীর পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে।

ট্রাম শুরুতে ছিল বিদেশি বেসরকারি কোম্পানির হাতে। পরে রাজ্য সরকার তা নিয়ে নেয়। নব উদ্যমের ট্রাম আবার বেসরকারি উদ্যোগকারীদের কারও হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের তাতে আপত্তি নেই। নস্টালজিয়া বেঁচে থাক, ঐতিহ্য বহমান থাকুক, কিন্তু মূল শহরটিকে ট্রাম-মানচিত্রের বাইরে রাখা হোক, এটুকুই শহরবাসী হিসেবে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন।

আইনের এ কেমন ধারা!

অসুস্থ সন্তান জন্মের আশঙ্কায় অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা তাঁর গর্ভস্থ ছাব্বিশ সপ্তাহের সন্তানকে নষ্ট করার অনুমতি চেয়ে মুম্বই উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন। এই স্পর্শকাতর খবরটি বিরাট বড় খবর হয়ে সারা ভারতের বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে গিয়ে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও বিতর্কের সৃষ্টি করে।

চিকিৎসকরা ভদ্রমহিলার গর্ভস্থ সন্তানের হৃদযন্ত্রের কিছু ত্রুটি পেয়েছেন। ত্রুটিটি মারাত্মক, যে কারণে জন্মমাত্রই শিশুটির বুকে পেসমেকার বসাতে হবে এবং কয়েক বছর পর পর পেসমেকার বদল করে যেতে হবে—এই আশঙ্কাতেই ওই দম্পতি এই আবেদন করেন। ভদ্রমহিলাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কারণ তিনি অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম রোধ করতে আইনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এদেশে আইনের পথ ধরে কিছু লোক চলে বটে, কিন্তু বে-আইনের পথে চলে তার শত বা সহস্র গুণ। ইনি সেই পথ নিলে অনায়াসেই আইনের আবডালে কাজটি সেরে ফেলতে পারতেন এবং ঘটনাটি কোনও খবরও হত না। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মুম্বই উচ্চ আদালত ভদ্রমহিলাকে গর্ভমোচনের অনুমতি দেয়নি। আদালত বলেছে, ভ্রূণের বয়েস কুড়ি সপ্তাহ পার হয়ে গেলে আর গর্ভপাত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। কেননা ততদিনে ভ্রূণটি মানবাকৃতি প্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া এই অবস্থায় গর্ভপাতে মায়ের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়। আইনের পুঁথিগত দিকটিকে আঁকড়ে ধরে উচ্চ আদালত যেভাবে আইনি বৈধতার নিরিখে বিষয়টিকে নাকচ করে দিয়েছে, তা নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। প্রশ্ন উঠেছে, গর্ভস্থ সন্তান অস্বাভাবিক, অপরিণত, রোগগ্রস্ত জেনেও মা গর্ভপাত করাতে পারবেন না কেন? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একান্তভাবেই তাঁর নিজের। একথা না বললেও চলে যে, যে-কোনও মায়ের কাছে গর্ভপাত করানোর মতো বেদনাদায়ক ঘটনা আর নেই। কোনও মা তা মনে-প্রাণে চানও না। কিন্তু শারীরিক বা সামাজিক কারণে গর্ভপাত করাতে জননী বাধ্য হন। এই বাধ্যবাধকতার ওপর সামাজিক নৈতিকতার দায় চাপিয়ে দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করার প্রবণতা বিপজ্জনক। মুম্বই হাইকোর্ট সেই কাজটিই করেছে।

উচ্চ আদালত বহু ক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণের সমস্যা ও দুঃখ দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু এই বিষয়টিতে আদালত জননীর পাশে না দাঁড়িয়ে আইনি কচকচিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এদেশে ১৯৭১ সালে প্রবর্তিত গর্ভপাত আইন পুনর্বিবেচনা ও পরিমার্জনা করার সময়ও যে পেরিয়ে গেছে, এই কথাটি আদালতের মনে রাখা উচিত ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু দেশ-ই এখন অস্বাভাবিক বা বিকলাঙ্গ ভ্রূণের জন্মদানের ব্যাপারে আইন সংশোন করেছে। এইসব আইনে নিরাপদ-সময়

পেরিয়ে যাওয়ার পরেও গর্ভপাত করানোর সংস্থান রাখা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতির সুযোগ নিয়ে, এখন সময়-উত্তীর্ণ গর্ভপাতের ঝুঁকি নিতে ব্রিটেনের মতো রক্ষণশীল দেশও পিছপা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা মনে করে সেই মান্ধাতা আমল-ই ধ্রুব সত্য! তাই গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত এখনও ভ্রূণের বয়স কত, তার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। এমনকী ডাক্তারি পরীক্ষায় যতই ধরা পড়ুক ভ্রূণটি অস্বাভাবিক, আদালত কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বিচারে কর্ণপাত না করে নিজের বিচারে অটল থাকে।

আমাদের দেশে, যেখানে এই 'অস্বাভাবিক' বা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য না আছে রাষ্ট্রের তরফে কোনও আর্থিক অনুদান-প্রতিশ্রুতি, না আছে সমাজের দিক থেকে অন্তত মানবিক সাহায্যের আশ্বাসটুকু, সেখানে মুম্বই হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত সমস্যার সমাধানের বদলে আরও অনেক জটিলতার জন্ম দিল।

কোনও বাবা-মা যখন গর্ভস্থ ভ্রূণের সুস্থতা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আগেভাগে জানতে পারেন জন্মের পর তাঁদের সন্তান আজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে থাকবে, তখন তাঁদের মানসিক অবস্থা কত দূর করুণ, কত দূর হতাশাব্যঞ্জক এবং আনন্দশূন্য হয়, তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

আদালত এই দিকটি সম্পর্কেও নীরব। সকলের ছেলেমেয়ে সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক, অথচ আমাদের সন্তান নয়—সন্তানকে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে এই বেদনাও একটি বিরাট কারণ। জন্ম নেওয়ার পর অস্বাভাবিক সন্তানকে নিয়ে তাঁদের যে নিত্যদিনের যন্ত্রণা, তার শরিক কে হবে?
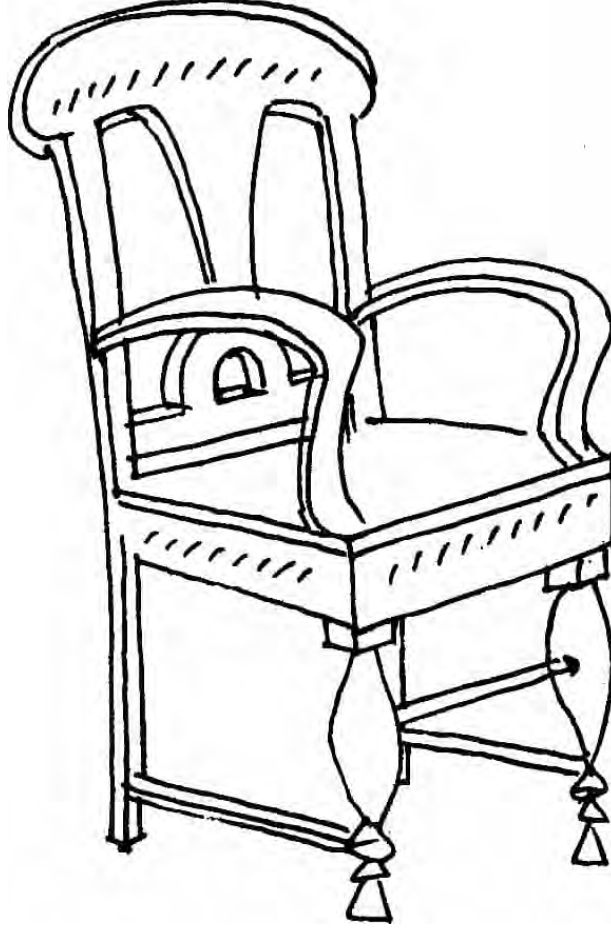
যার নাগাল এখনও বিজ্ঞান পায়নি

প্রথম-প্রথম প্লেনে উঠতে ভয় খায় না এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আর আমি তো আদ্যন্ত কাপুরুষ। আমার প্রথম বিমানযাত্রা ছিল কোচবিহার থেকে বাগডোগরা, পুরোনো মালবাহী ডাকোটা বিমানে, সময় লেগেছিল আধঘণ্টারও কম। সিট বা সিটবেল্ট কিছুই ছিল না। ছিল অ্যালুমিনিয়ামের বেঞ্চের মতো জিনিস। বিমানের মাঝখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা মালপত্রের ডাঁই। মাল-ই আসল, গুটি পাঁচেক প্যাসেঞ্জার ফাউ। দুরুদুরু বক্ষে সেই আধঘণ্টা সময় পার করাটাই ছিল অ্যাডভেঞ্চার।

দুর্বার গতির প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের অবদানে উড়ান এখন অনেক নিরাপদ, অনেক আরামদায়ক। আর আমাকে এখন বেশ ঘনঘন বিমানের সওয়ারি হতে হয়। কখনও-কখনও দীর্ঘ পনেরো-ষোলো ঘণ্টাও। ভয় কি এখনও করে না? করে। আবার ভেবে নিই, যা হওয়ার হবে। দুর্ঘটনা তো শুধু উড়োজাহাজের জন্য বসে থাকে না। ট্রেনে, বাসে এমনকী বাড়িতেও তা আকস্মিক ঘটতেই পারে। ভেবে কী লাভ? 'চালায় যে নাম নাহি কয়/কেহ বলে যন্ত্র যে, আর কিছু নয়',...ফলে যে অনিশ্চিত, তবু জানে নিশ্চিত তার গতি।

শূন্যমার্গে উড়ন্ত বিমান কতটা অসহায়, তা কয়েক বছর আগে এক বিমানকর্মী বর্ণনা করেছিলেন। শূন্যে বিমান একটি ডিমের খোলার মতো ঠুনকো। সামান্য অভিঘাতেই তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। কথাটা

মিথ্যে নয়। আর সম্ভাব্য বিপদও তো কত রকমের, যান্ত্রিক ত্রুটি, বিমানের অপহরণ, অন্তর্ঘাত, চালকের ভুলচুক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কত কী!

কয়েকমাস অগে মালয়েশিয়ার যে-বিমানটি নিরুদ্দেশ হয়েছিল তার জন্য গোটা দুনিয়া তোলপাড়। বিস্ময় এই যে, তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই রহস্যময় অন্তর্ধান আমাদের ভাবিয়েছে, উদ্বিগ্ন করেছে এবং একটি সতর্কতা সংকেতও দিয়েছে, তুমি যতই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বড়াই করো, এখনও সব কিছুই তুমি জানো না। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে উধাও কতিপয় বিমানেরও ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। সমুদ্রে ভেঙে পড়লে ভাসমান বিমানের টুকরো, মৃতদেহ বা জলে ছড়িয়ে যাওয়া জ্বালানির অন্তত হদিশ পাওয়ার কথা।

বেশ কয়েক বছর আগে বাগডোগরা থেকে কলকাতায় আসছিলাম। ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই মেঘলা আকাশে প্লেনের ঝাঁকুনি এবং লাফঝাঁপ শুরু হয়। সেই মারাত্মক কাঁপুনিতে এয়ারহোস্টেসের খাবারের প্যাকেট ভর্তি ট্রে ছিটকে পড়ল আমার গায়ে এবং পাশের ফাঁকা সিটে। মেয়েটিও কোনওক্রমে টাল খেয়ে একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ল। ঝাঁকুনির চোটে যাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মিনিট দশ-বারো সেই রামঝাঁকুনি বুঝিয়ে দিয়েছিল, মেঘলা আকাশে অনেক সময়ে বিমান আর গোরুর গাড়ির তফাত থাকে না। তুলনামূলকভাবে অবশ্য গো-শকট অনেক নিরাপদ। আমার তো ভয় হচ্ছিল, ওই ঝাঁকুনিতে প্লেনের জোড় না খুলে যায়।

রবি ঠাকুরের প্রাতঃস্মরণীয় একটি কথা আছে : 'ওরে ভীরু তোমার উপর নেই ভুবনের ভার'। আমার পক্ষে বড্ড লাগসই কথা। ধুকপুক প্রাণপাখি নিয়ে যারা বেঁচে আছে ভুবনের ভার তাদের কাঁধে নেই, বরং তারাই ভুবনের ভারস্বরূপ।

দুর্ভাগ্য মালয়েশিয়ার, তাদেরই তিন-তিনটে বিমানের একটি নিরুদ্দেশ, দুটি বিধ্বস্ত। সব বিমানযাত্রীই নিহত। অন্যের অপঘাত মৃত্যু আমাদের সন্ত্রস্ত করে, উদ্বিগ্ন করে, নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আমাদের মন খারাপ হয়, বিষণ্ণতা বোধ করি। সব ঠিক। আবার যখন বিমানে উঠি, সিটবেল্ট বাঁধি, যাত্রা শুরু করি, মনে হয় পৌঁছে যাব। ঠিকই পৌঁছে যাব।

কেউ-কেউ পৌঁছোতে পারে না বটে, কিন্তু অনেকেই পৌঁছেও যায়। জীবন তো এরকমই অনিশ্চয়তায় ভরা। তাই জীবনযাপনের যা কিছু বর্ণময়তা।

কিউ জেড ৮৫০১ বিমানটি চালাচ্ছিলেন আরিয়ান্তো। নিরুদ্দেশ বিমানের চালক আরিয়ান্তোর মেয়ে এখনও বাবার জন্য অপেক্ষা করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বাবার সঙ্গে তার ছবি, মেসেজ পাঠায়, বাবা, তোমাকে আমার এখনও দরকার, প্লিজ, ফিরে এসো।

আমার তো মনে হয় আরিয়ান্তো সেই ডাক শুনতে পান। ব্যক্ত জগতের সম্পর্কগুলি যতটা ঠুনকো, অস্থায়ী বলে প্রতিভাত হয়, তা হয়তো নয়। কার ঘরে কে জন্মাবে তার পিছনেও প্রকৃতির দীর্ঘ অঙ্ক কষা আছে। জীবনের নকশা তৈরি হয় কোনও এক নেপথ্যের রসায়নাগারে, যার নাগাল এখনও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পায়নি।

সারা দিনমান, চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর আকাশে উড়ছে, উড়ে চলেছে কয়েক হাজার বিমান। কয়েক হাজার মানুষ সর্বদাই বিরাজ করছেন ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতার শূন্যমার্গে। কেউ ভয়ে ভয়ে, কেউ অকুতোভয়ে। আমরা চাই যে-যার গন্তব্যে ঠিকঠাক পৌঁছে যাক। ঠিকঠাক পৌঁছে যাক।

সেকুলার কারে কয়

রাজনীতি থেকে এতটা আলগোছ থাকা ঠিক হচ্ছে কি না তা ভেবে আগে একটু বিবেকদংশন হত। আজকাল আর হচ্ছে না। বোধহয় বিবেকের দাঁত পড়ে গেছে, জুতমতো কামড়াতে পারছে না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও সন্দেহ হচ্ছে, দেশসুদ্ধ লোকের বিবেকই কি ফোকলা হয়ে গেল? কাউকে কোনও কারণে বিবেক দংশেছে বলে খবর নেই তো! শিশুকালে পাঠ্যবইতে স্লাই ফক্স বা ধূর্ত শেয়ালের গল্প ছিল, এখন যেন বই ছেড়ে ধূর্ত শেয়ালেরা বেরিয়ে পড়ে সারা দেশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গুজরাতে দাঙ্গা হলে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা গর্জন করেন, পশ্চিমবঙ্গে লাশ পড়লে দিল্লি চোখের জল মোছে। এখন যত নজর অন্যের কৃতকর্মের দিকে, নিজের কৃতকর্মের দিকে কেউ তাকাতে রাজি নয়। পশ্চিমবঙ্গের চশমায় নরেন্দ্র মোদী আর অমরীশ পুরীতে কোনও তফাত নেই। তাঁকে দিল্লিও 'লাশ ফেলার কারিগর' শিরোপা দিয়ে রেখেছে। এহেন ভিলেনকে গুজরাতের লোক রাজনীতি থেকে বানপ্রস্থে না পাঠিয়ে ভোটের মালা পরাল কেন, সেটা নিয়েই আমাদের অরাজনৈতিক ধন্দ। তাহলে কি হিসেবে কোথাও গোলমাল রয়ে গেল? গুজরাতের সংখ্যালঘুরাও নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তেমন বিষোদ্‌গার করছে না, বরং বলছে তারা ঠিকঠাক আছে। আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উন্নয়নে গুজরাত ভারতের সব রাজ্যকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া গোধরার পরবর্তী লজ্জাজনক দাঙ্গার পর সেখানে কিন্তু উগ্রবাদী হামলা, মৌলবাদী হঠকারিতা, দুমদাম বনধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই বললেই চলে।

মোদী বা বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বা দল বলে চিহ্নিত করাই যায়, কিন্তু প্রশ্ন হল, এদেশে অসাম্প্রদায়িক কে? দুটি আড়াআড়ি বৃহৎ সম্প্রদায় আছে বলেই এদেশের রাজনীতি কেবলই সাম্প্রদায়িকতার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতির শিক্ষা বিতরণ করছেন তাঁরাই নানা যুযুধান দলে বিভাজিত হয়ে বসে আছেন। শেখাবেন কি, তাঁদের নিজেদের শিক্ষারই যে অনেক বাকি। হাতজোড়-করা ক্রন্দনরত বিপন্ন মুখের একটি ফটোগ্রাফ কুতুবুদ্দিন নামে একজন গুজরাতিকে বিখ্যাত করেছিল। সে সপরিবার দাঙ্গাহীন পশ্চিমবঙ্গে চলেও এসেছিল স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। যতদূর জানি, সে টিকতে পারেনি, গুজরাতে ফিরে গেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে যাঁরা রাজনৈতিক রসায়ন হিসেবে ব্যবহার করছেন সেইসব ডান ও বাম নেতারা কি জানেন না যে, সমাজের তলাকার ক্ষুধার রাজ্যে যে কোটি কোটি মানুষ বাস করেন তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদটা কাজই করে না? হিন্দু বা মুসলমান বলে কোনও বিদ্বেষও নেই। ক্ষুধা ও অভাবই তাদের একাকার করে রেখেছে, বিভাজনরেখা গেছে মুছে। বঙ্গীয় নেতারা উন্নয়ন বলতে কলকারখানা

বোঝেন, কেমিক্যাল হাব বোঝেন, কিন্তু উন্নয়নের মানবিক সংজ্ঞার ধার ধারেন না। কলকারখানা দিয়ে রাজ্যের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা হাস্যকর অবিমৃশ্যকারিতা। যেখানে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল অরাজকতা, দুর্নীতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, পঞ্চায়েত স্তরে টাকা নয়-ছয়ের অগুন্তি অভিযোগ, সেখানে উন্নয়নের স্মারকগুলি খুঁজে পাওয়াই কঠিন। কলকারখানা পুঁজিপতিদের পকেট আরও ভারী করবে মাত্র। আর বাড়াবে দূষণের মাত্রা।

আরও আক্ষেপের বিষয়, এ-রাজ্যের একদা-উজ্জ্বল চা-বাগানগুলি ধুঁকছে বা বন্ধ হয়ে গেছে, অসংখ্য কলকারখানা ঝাঁপ ফেলেছে, প্রান্তিক জেলাগুলিতে না খেয়ে মরছে মানুষ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সুন্দরবন অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে গরু-ছাগল পোষা হচ্ছে, ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধ দূরস্থান, অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দরজা-জানালা অবধি নেই। বাইরের পুঁজি ডেকে আনা যতটা না জরুরি, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি রাজ্যের ক্ষতস্থানগুলি সারিয়ে তোলা। আর সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন, নরেন্দ্র মোদী এটা বুঝেছেন এবং করেছেন বলেই গুজরাতের মানুষ তাঁকে জয়মাল্য দিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। হিন্দুত্বের তাস বা সাম্প্রদায়িকতার জয় বলে গুজরাতের মানুষকে অপমান করলেই তো হবে না, তাদের কাছে আমাদের কিছু শেখারও তো আছে। যেভাবে নরেন্দ্র মোদী নিন্দুকদের কান মলে দিয়েছেন তাতে তাঁদের আক্কেল হওয়া উচিত।

কলম

দেবতারা মা দুগ্গাকে সুপারি দিয়েছিলেন তৎকালীন রুস্তম ডন মহিষাসুরকে খতম করতে। কাজটা বড় সহজ ছিল না, তার কারণ ডনকে দেবতারাই টিট করতে পারেননি। মা চন্তকার হাতের সংখ্যা কত তা নিয়েও কিছু ধন্দ আছে। অষ্টাদশভুজা দুগ্গারও বহুল প্রচলন ছিল এক সময়ে। পরে কোনও কারণে দেবী দশভুজায় পরিণত হন। দশ হাত, দশ প্রহরণ। সাদামাটা হিসেবে, দুগ্গার সব হাতেই কিন্তু মারণাস্ত্র নেই। রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ বা ঘণ্টা আপাতদৃষ্টিতে প্রাণঘাতী প্রহরণ বলে গণ্য হয় না। কিন্তু গভীর অর্থের অনুধাবন করলে রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ এবং ঘণ্টাও ছদ্ম-প্রহরণ। রুদ্রাক্ষ বীজমন্ত্রের আধার, আর মন্ত্রের মর্মে রয়েছে স্থূল বা গভীর স্পন্দন—যা সৃষ্টির মূলাধার। বিজ্ঞানও শব্দের অন্তহীন শক্তিকে মান্যতা দেয়। দূর ভবিষ্যতে শব্দই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। শঙ্খধ্বনি বা ঘণ্টার শব্দ অশুভ-বিনাশী হিসাবে বিশ্রুত। ভূমিকম্পে, প্রারম্ভিক বিপর্যয়ে শঙ্খধ্বনি এদেশের পরিচিত এক প্রক্রিয়া। ঘণ্টাধ্বনি বা কণ্ঠনিঃসৃত নাদও সেকেলে যুদ্ধের অঙ্গীভূত। বহ্বাস্ফোট প্রহরণ হিসাবে একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট, এই যা। প্রহরণগুলির মধ্যে একটি বিষধর সাপও আছে। সাপ আসলে পাশ বা বন্ধনরজ্জু। প্রয়োজনে অসুরের গলায় ফাঁস লটকে দেওয়ার জন্য। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে ডন মহিষাসুরের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং মারমুখো শি-ডন এই গুন্ডানি দেবী দুগ্গা। যুদ্ধ চলার সময় তিনি মুহুর্মুহু যে অট্টহাস্য করতেন, তাতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত হত। ভয়ংকরী ও সুন্দরী এই দেবী যদিও তার হন্তা, তবু তাঁর রূপমুগ্ধ মহিষাসুর তাঁকে বিয়েও করতে চেয়েছিল। মুশকিল হল, এই দেবীর পিতা নেই, সুতরাং পিতৃগৃহও থাকতে পারে না। ইনি কখনোই মা মেনকার গর্ভজাত নন, দেবতাদের শক্তি-সমন্বয়ে গঠিত এই দেবীর যুদ্ধজয়ের পর, কথা ছিল, দেবতারা যে-যাঁর গুণপনা বা অবদান ফিরিয়ে নেবেন এবং দেবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। শেষ অবধি দেবতারা ঠিক করেন, তেত্রিশ কোটি যখন আছে, তখন আর একটি বাড়লে ক্ষতিই-বা কী? সুতরাং দেবী দুর্গা কর্মহীন আর-একজন দেবী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

কথায় আছে, পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। লেখনি তলোয়ারের চেয়েও শক্তিশালী। এখনকার কলমে আর এত শক্তি আছে কি না কে জানে! তবে একসময়ে ছিল। হ্যারিয়েট বিচার স্টো 'আঙ্কেল টমস কেবিন'

লিখেছেন। ওই একটি নভেলের ঠেলাতেই বহুযুগব্যাপী অমানবিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয় এবং ক্রমে প্রথাটি অবৈধ বলে ঘোষিত এবং লুপ্ত হয়। নীলকর সাহেবদের অন্যান্য শোষণ থেকে চাষিদের রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' গোটা উত্তরভারতকে আজও সম্মোহিত করে রেখেছে। আর প্রাচ্যের বিশাল এলাকা জুড়ে দুটি বটবৃক্ষের মতো নিজ ছায়া বিস্তার করে রেখেছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

'কলমের জোর' কথাটি সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছি। কলম মুক্তিযোদ্ধা নয়, কুস্তিগির নয়, কিন্তু বিস্তর জলঘোলা করতে পারে। এবং করছেও।

তা কলম-ই কি আর এক জায়গায় বসে আছে? স্কুলের নীচু ক্লাসে আমরা পরীক্ষা দিতে যেতাম পি এম বাগচির কালির ট্যাবলেট জলে গুলে গলায় দড়ি-বাঁধা দোয়াতে ভরে, তার সঙ্গে কাঠের হ্যান্ডেলে পিতল বা লোহার নিব পরিয়ে নিয়ে, সঙ্গে নিতে হত অপরিহার্য ব্লটিং পেপার। ঝরনা কলমের রাজত্বও তো শেষ হওয়ার মুখে, বলপেনের দৌরাত্ম্যে। আর বলপেনকে হটাতে এসে গেছে কম্পিউটার-লিখন কি-বোর্ড। আমরা বিভ্রান্ত। তবে মূল ব্যাপারটা লেখা। আর লেখা মানেই কলম।

মহীশূরের চামুণ্ডা পাহাড়ে মা দশভুজার হাতে যে বধ হয়েছিল বলে কথিত আছে, সেই মহিষাসুর কিন্তু বাস্তবিক বধ হয়নি। নানা নির্মোকে এখন সমাজে নানাস্তরে তার নিপুণ ও ঘড়িয়াল অবস্থান। চেনাই মুশকিল, বধ তো পরের কথা। বলতে হয়, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ অসুর?' এই সকল অসুরবাবাদিগকে টিট করতে হলে শূলে, ভল্লে, খড়্গে তেমন সুবিধে হওয়ার নয়। বরং তেমন তেমন তেমন হাতে কলমের খোঁচায় তাদের নির্মোক খসিয়ে বে-আব্রু করা সম্ভব।

তাই মা দুগ্গার হাত যদি নতুন হাতিয়ার হাতড়ায়, তাহলে আমি তাড়াতাড়ি সেই হাতখানায় একটা কলম-ই গুঁজে দেব। লেখো মা, লেখো।

সব যুদ্ধের মূলেই একজন নারী

প্রাণঘাতী প্রেমের গল্প পৃথিবীতে নতুন কিছু নয়। সীতা, হেলেন, দ্রৌপদী কোনও না কোনওভাবে পুরুষদের উন্মাদ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। ভারা থেকে পড়ে গিয়ে কোনও রাজমিস্ত্রি মারা গেলে বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রথমেই তার সহ-রাজমিস্ত্রিদের জিগ্যেস করে, উও আওরত কাঁহা থি? বেশিরভাগ সময়ে উঁচু ভারায় বসে কাজ করার সময় নানা জানালার ফাঁকফোঁকরে সেই চিরন্তন নারীর ঝলক দেখা দেয়, আর অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রির পাকাপোক্ত হাতেও নেমে আসে অমোঘ বিহ্বলতা। ফলত পতন ও মৃত্যু।

তা বলে এসবের পিছনে নারীই ইন্ধন বলে পুরুষের আক্রোশ যুক্তিহীন। দায়ী পুরুষ-ই, দায়ী তার জন্মগত দুরপনেয় লাম্পট্য, যাকে আজও ল্যাঙট পরানো গেল না।

আবহমান কাল ধরে পুরুষের এই রাহুর প্রেমের গল্পে নবতম সংযোজন হিটলার। তাঁর বাল্যবন্ধু অগস্ট কুবিজেক-এর 'হিটলার, আই নিউ' নামক গ্রন্থটি রচিত হওয়ার সত্তর বছর পর প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাডলফ হিটলার তখন ষোলো বছর বয়সের সদ্য-গোঁফ-ওঠা তরুণ। থাকতেন অস্ট্রিয়ায়। ওই বয়সে তিনি স্তেফানি ইসাক নামে এক ইহুদি তরুণীর প্রেমে পড়েন। একতরফা প্রেম। আর সেই প্রেম হিটলারের মন-মগজ-সত্তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে বসেছিল। স্তেফানি হিটলারের প্রেমে পড়েননি বটে, তবে একটু-আধটু যৌবনোচিত লীলাবশে কখনও-সখনও ফুলটুল ছুড়ে দিতেন। হিটলার তাইতেই ধরে নেন যে, স্তেফানিও তাঁর প্রেমে পড়েছেন। স্তেফানি নাচতেন এবং নাচাতে ভালোবাসতেন। হিটলার বন্ধুমহলে ঘোষণাই করেছিলেন, বিয়ের পর ওকে আমি আর নাচতে দেব না।

কপাল খারাপ। হিটলার কখনও মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলেননি স্তেফানিকে। স্তেফানিও কখনও টের পাননি হিটলারের ভালোবাসা এবং বাসেনওনি। স্তেফানি একজন সেনা অফিসারকে বিয়ে করে ফেলেন এবং ভিয়েনায় চলে যান।

পুরুষ সহজেই প্রেমে পড়ে এবং উন্মাদ হয়ে যায়। কালবৈশাখীর মতো সেই প্রেম সব কিছু বাধাবিঘ্ন উড়িয়ে দিতে চায়, না পারলে প্রতিহিংসা নিতে উদ্যত হয়, নয়তো নিজেকে শেষ করে ফেলে। তা বলে এটা ভাবা ভুল হবে যে, দয়িতাকে পেলেই তার নির্বাণ হয়। তা নয়, পুরুষ এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতেও তত প্রাপ্তবয়স্ক নয়। শিশু যেমন নতুন খেলনার জন্য বায়না ধরে, জ্বালিয়ে মারে, তেমনই পুরুষেরও ঝোড়ো আগ্রাসী ভালোবাসা। আবার বাচ্চাছেলের মতোই বায়না মেটার পর নতুন খেলনার উপযোগ তার কাছে স্তিমিত হয়ে আসে, পুরোনো হয়ে যায়। আবার নতুন খেলনার জন্য উদ্বেল হয় সে। শাস্ত্রাদিতে বা যৌনবিজ্ঞানে পুরুষের এই বহুগামী স্বভাবের কথা বার বার বলা হয়েছে।

হিটলার সেই ইহুদি রমণীকে পেলেন না বলেই ইহুদি জাতটার ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বলে বাল্যবন্ধু কুবিজেক দাবি করেছেন, আর ওই দিশাহারা রাগই প্রেমিক হিটলারকে বিংশ শতকের সবচেয়ে বিকট নরহন্তায় পরিণত করেছিল। হতেও পারে। এই ঘটনার সত্যাসত্য জানার উপায় আমাদের হাতে নেই। কুবিজেক তাঁর বইটিতে লিখেছেন যে, হিটলার যে তাঁকে ভালোবাসতেন এটা কখনও জানতে পারেননি স্তেফানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও তিনি বেঁচেই ছিলেন।

আমরা শুধু জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবল লোকক্ষয় হয়েছিল। পরমাণু বোমার অবিশ্বাস্য ধ্বংসাত্মক চেহারা দেখেছিল মানুষ, তার চেয়েও ভয়াবহ ক্ষতি, মানুষের মনোজগতে ঘটেছিল বিপুল পরিবর্তন এবং মূল্যবোধের পাতালপতন। একটি ব্যক্তিগত প্রেম পরস্পরের হৃদয়কে মিলিত করতে না পারার ফলেই যদি পৃথিবীর এত ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে কি প্রেমে পড়তে একটু ভয়-ভয়ও করবে না মানুষের?

কে জানে কি, স্তেফানি আর হিটলারের বিয়ে হলে আমরা হয়তো আরও একটু সুন্দর পৃথিবীতে বাস করতাম। যে-বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি তাতে মিশে থাকত অনেক কম দীর্ঘশ্বাস।

পাঠ্য বইয়ে ভূতের গল্প বাদ!

সুকুমারমতি বালকবালিকাদের মন থেকে কুসংস্কার এবং ভয়ডর উৎখাত করতে সম্প্রতি এ-রাজ্যে পাঠ্যপুস্তকাদি থেকে ভূতপ্রেতের গল্প এবং ধর্মীয় প্রসঙ্গ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভূত এবং ভগবান, দুই এখন এ-রাজ্যে ব্রাত্য, অনভিপ্রেত এবং অবৈধ। দুনিয়াতে ভূতে বা ভগবানে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের সংখ্যা যথাক্রমে কত তা আমাদের জানা নেই বটে, কিন্তু অনুপাতটা বোধহয় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ-ই হবে। তা সে যাই হোক, আমাদের সরকারি কর্তাব্যক্তিরা জেনে গিয়েছেন যে ভূত বা ভগবান বলে কিছু নেই। কী উপায়ে সেটা জানা গেল, কোন গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা তদন্ত কমিটির মারফত তা অবশ্য তাঁরা প্রকাশ করেননি। তবু ফরমাশ জারি হয়েছে। পাঠ্যপুস্তককে নিষ্কলঙ্ক করার এই সাধু প্রয়াস ক্রমশ অন্যত্র বিস্তার লাভ করবে বলেই ভরসা করি। সেক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের যাবতীয় গ্রন্থ, পরশুরামের বিস্তর রচনা এবং বেচারি রবীন্দ্রনাথেরও নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ ইত্যাদির মুদ্রণ ও প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া বিচিত্র নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ কেউ-ই রেহাই পাবেন না। পঞ্জিকা, পুরোহিত দর্পণ থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু দুশ্চিন্তা রয়ে গেল। সমাজকে নিষ্কলুষ করতে হলে এগুলিকেও বিদেয় না করলে নয়। ভূত ও ভগবানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই জেহাদ অপ্রত্যাশিত নয় বটে, কিন্তু জনগণকে ভূত ও ভগবানের হাত থেকে বাঁচাতে তারা এত তাড়াতাড়ি ঢাল তরোয়াল নিয়ে নেমে পড়বেন বলে আগাম সতর্কবার্তা না থাকায় আমরা খানিকটা হতচকিত, এই যা। পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিত ভূত ও ভগবানগত সমস্যায় বড়ই বিব্রত, নইলে সরকার এই সমস্যার তড়িঘড়ি সমাধানের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগু হতেন না।

আমাদেরও মনে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন ভূত ও ভগবানজনিত সমস্যা ছাড়া আর কোনও সমস্যাই নেই। এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজমান, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ঊর্ধ্বমুখী ও শ্রমিককুল বিলকুল খুশ, হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন, সরকারি দফতরে কর্মসংস্কৃতির বান ডেকেছে। গঙ্গা ও অন্যান্য দুষ্ট নদী কোথাও ভাঙন না ঘটিয়ে শিষ্ট, শাসিত পথেই প্রবহমান এবং এ-রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন শান্তিরক্ষার কাজে নিবেদিতপ্রাণ, সম্ভবত এ-রাজ্যে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ, অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাও এখন আর নেই। এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পরেই সরকার ভূত ও ভগবানের ওপর নজর দিয়েছেন। আমরা তাঁদের সাধুবাদ জানাই।
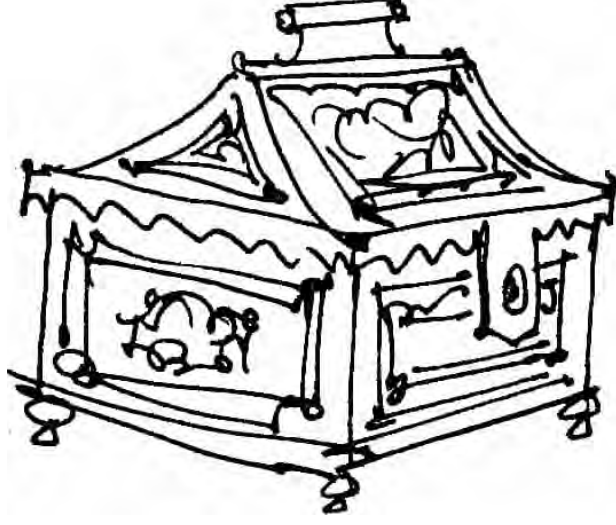
শতায়ু ভাবনা।

থুড়থুড়ে আর খুনখুনে বুড়ি ও বুড়োরা দুনিয়াকে বড্ড ভাবনায় ফেলে দিল যে! টসকে যাওয়ার সময় হয়ে গেলেও আজকাল টসকাচ্ছে না বড় একটা। শুধু বেঁচে থাকাই তো নয়, রীতিমতো বর্তেও আছে যে! আশি, নব্বই, একশো ঠেঙানো বুড়োবুড়িরা সংখ্যাতেও বেজায় বাড়বাড়ন্ত। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, শুধু মার্কিন মুলুকেই শতায়ু জীবিত বুড়ো-বুড়ির সংখ্যা লাখখানেকের কাছাকাছি। এবং খুবই জোরালো অনুমান যে, ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে ৬ লক্ষ ছাপিয়ে যাবে। এ হিসেব মার্কিন আদমসুমারি ব্যুরোর।

তা বুড়োবুড়িদের এই রবরবার কারণ কী? কারণটি অত্যাধুনিক সব উপকরণ, অতি স্বাস্থ্যসম্মত উপাদেয় খাবারদাবার, হাঁটা বা মন্থর দৌড় এবং রাতে সুনিদ্রা আর সামাজিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকা। প্রবীণ বয়সের নিঃসঙ্গতা অনেকটাই কেটে যায় আইপড-এ গান বা শ্রুতিসুখকর কিছু শুনলে। মোবাইল বা ইন্টারনেটে মেসেজ আদানপ্রদান করলে বা পছন্দসই সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে নৈশভোজে পেয়ে গেলে। মেরিল্যান্ডে শতবর্ষীয়ান মরিস এইসম্যান এই দীর্ঘায়ুর কারণ হিসেবে হাসিখুশি থাকা আর প্রার্থনার কথাও যোগ করেছেন।

আসল কথা হল, মানুষের বয়স হলেই সে তার বর্তমান সময় থেকে পিছিয়ে যেতে থাকে। তার ভাবনাচিন্তা, পছন্দ-অপছন্দগুলি আটকে থাকে তার বীত-যৌবনের স্মৃতিতে। ফলে সে আর বর্তমানে বাস করে না, স্মৃতিচারী এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। আধুনিক বুড়োবুড়িরা সেই বাধা টপকাতে চান। অত্যাধুনিক উপকরণকে উপেক্ষা না-করে অন্যদের মতোই তা থেকে নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন উপভোগ্যতা। যুগটাকে উপেক্ষা না-করে তার সঙ্গেই পা মেলাতে থাকেন। তাতে শরীরের বয়স থেমে থাকে না ঠিকই, কিন্তু মন ভারমুক্ত হতে থাকে। নিজেকে অনুপযোগী, অচল বলে আর মনে হয় না, তাই নিঃসঙ্গতার হাত থেকেও অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। আয়ুষ্মান আয়ুষ্মতীরা তো শুধু শরীরে বেঁচে থাকতে চান না, মনে-মননে, চিন্তা-ভাবনায়, আনন্দে-উপভোগেও বাঁচতে চান। মন যত সতেজ হয়, শরীর ততই হয় তার অনুগামী।

সম্প্রতি মার্কিন মুলুকে একশো জন শতায়ু নারী-পুরুষের ওপর একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, গান শোনা বা কমপিউটারে পছন্দসই ভিডিও দেখাও দীর্ঘায়ুর মস্ত সহায়ক। সোজা কথা, বুড়ো হও, কিন্তু বুড়িয়ে যেও না।

পৃথিবী ও পরিবেশের পরিবর্তনগুলির সঙ্গে মানানসই হয়ে নাও।

আধুনিক গ্যাজেটগুলিকে উপেক্ষা করবে না। যুগের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে পায়ে পা মেলাতে থাকো। এসব জেনে অবশ্য আমাদের এই গরিব দেশের বুড়োবুড়িদের তেমন লাভ নেই। কিন্তু ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীদের কমপিউটারের নাগাল পাওয়া সম্ভব কিংবা মোবাইল ফোনেরা, আই-পড-এর বা সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে ডিনারে যাওয়ার। বাদবাকিদের হাতে অপ্রাপ্যের দীর্ঘ তালিকা।

যেখানে পেট ভরানোটাই সমস্যা সেখানে ওসব শখ-শৌখিনতা আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া পরকালমুখো এবং ভাগ্যতাড়িত ভারতীয়দের থিম সং-ই তো হল 'হরি দিন তো গেল, সন্ধে হল...' তার জীবনদর্শনে দুর্জয় বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও যে তেমন করে নেই। থাকার কথাও অবশ্য নয়। দুর্ভোগ, দুর্ভাগ্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, বর্ণ ও বৈচিত্র্যের অভাব এই সব কিছুই আমাদের ইহলোকের বাস্তবতাকে এত উপভোগহীন করে তোলে যে, আমরা পরলোকপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকি। তবু গড় আয়ু এই ভারতেও ক্রমবর্ধমান। হয়তে-বা স্বাস্থ্যসচেতনতার কিছুটা বিস্তার এবং অত্যাধুনিক ওষুধবিষুধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতিই তার জন্য দায়ী। শেষ দুটিই অবশ্য পশ্চিম দুনিয়ার অবদান, যেখানে মানুষ বাঁচতে ও বাঁচাতে ভালোবাসে।
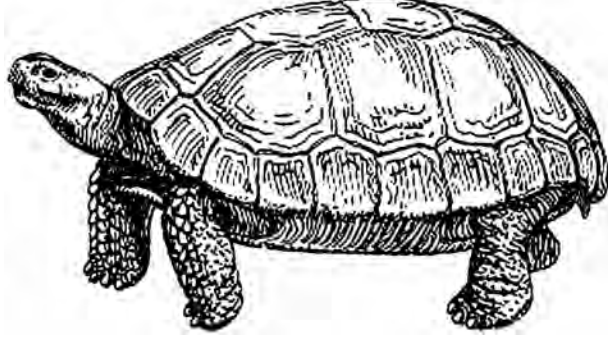
সীমিত আয়ুর আমরা তাঁর কাছে নত হই

তিনি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে থাকবেন। দেখে থাকবেন আরও কত মহাজনকে। তাঁর চোখের সামনেই সাহেবি কলকাতার দেশি কলকাতায় রূপান্তর ঘটল। নানা ঘটমানতার মধ্যে তিনি ছিলেন। গতিমন্থর, নির্বিকার, প্রতিক্রিয়াহীন। না, তাঁর কোনও স্মৃতি ছিল না। ছিল না বিস্ময় বা আনন্দের উত্তেজক মুহূর্তগুলি। শুধু বেঁচে থাকার একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকতা ছিল তাঁর।

অতিশয় শরীর ও দীর্ঘ আয়ুর কূর্মপ্রবর যে অবলোকনকারীদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় আকর্ষণ করতেন, তা-ও তেমন টের পেতেন না বোধহয়। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি নামকরণও হয়েছিল, তিনি তা-ও জানতেন না। পিতা-মাতা, বংশানুক্রম, জন্মভূমি, নাগরিকত্ব—কিছুই ছিল না তাঁর। শুধু তিনি ছিলেন। মানুষ তাঁকে ভালোবাসত, যেন বৃদ্ধ পিতামহ বা প্রপিতামহ। কিন্তু কী যায়-আসে তাঁর মানুষের ভালোবাসায়! পৌনে তিনশো বছর ধরে তিনি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছেন নিত্যদিন। শরীরের উপর দিয়ে আবর্তিত হয়েছে ঋতুচক্র। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। নিজের বর্মের ভিতরে নির্বিকার ছিলেন তিনি। অনেকটা সাধকের মতো। তবু তাঁর মধ্যে, না, সাধনা বলেও কিছু নেই। আছে জৈব তাগিদগুলি, আর দীর্ঘ, বড় দীর্ঘ পরমায়ু।

ওই পরমায়ুই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। মানুষের চার দিকে প্রাণের যত জৈব প্রকাশ, তা পদ্মপত্রে জলকণার মতো টলোমলো। সীমিত আয়ুর মানুষ তাই তাঁর কাছে যেত। কী আশ্চর্য, ইনি কতকাল ধরে বেঁচে আছেন! ইনি তো চলমান ইতিহাস! স্মৃতি ও বাক্য থাকলে ইনি আমাদের কত গল্পই শোনাতে পারতেন।

না, তিনি আমাদের কাছে কিছুই ব্যক্ত করেননি। শোনাননি তাঁর জীবনের কাহিনি। কিন্তু তাতে কী? ওই মহান কূর্মের তো কোনও দায় ছিল না। তাঁর উপরে আমরা আরোপিত করে নিতে পারি আমাদের নানা কল্পিত সম্ভাবনা।

তাঁকে কচ্ছপ মনে করলে একটু ভুল হবে। তিনি ব্যক্তিও। বিশেষ এক ব্যক্তি। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র। মেধা, চতুরতা, বিদ্যাবত্তা কিছুই ছিল না বটে, কিন্তু অস্তিত্বই যে কত গভীর হতে পারে, তিনি ছিলেন তারই প্রমাণ।

প্রায় শৈশব থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয়টা একতরফা, ওয়ান ওয়ে। তিনি চিনতেন না আমাকে। কিন্তু তিনি আছেন, এই সংবাদ অনেক নশ্বর মানুষের কাছে বড় স্বস্তিদায়ক ছিল।

অ্যালডেব্রা দ্বীপ চিনতেন না তিনি। তাঁর তো দেশ নেই। কিন্তু হয়তো বা সমুদ্র চিনতেন, চিনতেন অবগাহন, চিনতেন মুক্তি। কে জানে।

মাঝে মাঝে মৃত্যুসংবাদ এসে আমাদের বেঁচে থাকাটাকে বিঘ্নিত করে। অস্তিত্ব বিস্বাদ, লবণহীন মনে হয়।

আজ সে রকমই একটা দিন। প্রপিতামহ আর নেই। তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আজ আমাদের অশৌচ।

প্রবন্ধ। রাজনীতি

ওই দেববিগ্রহের নাম পার্টি

বৎস, আমাদের পথশ্রম সার্থক হইল। ওই দেখ, ত্রিভুবনবিশ্রুত এই সেই বৌদ্ধবিহার। মূর্তিটিকে দেখো। ঈষৎ বাম দিকে হেলিয়া আছেন। তা বলিয়া ইঁহাকে বামমার্গী ভাবিও না। অধিক বাম-ঝোঁকা হইলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করায় অসুবিধা হইবে। তাই ইনি বামে ঈষৎ টাল খাইয়া দক্ষিণ করতল সুদূরে বিস্তার করিয়াছেন। আর ওই করতলে ডলার, ইউরো, লিরা, ইয়েন কত-না মুদ্রা বর্ষিত হইতেছে। না পুত্র, মূর্তিটি কোনও বিশেষ দেবতার নহে, বরং অনেক দেবতার সমন্বয়। ভালো করিয়া দেখ, মূর্তিটির মুখমণ্ডল হইতে বৌদ্ধিক জ্যোতি সূর্যের ন্যায় নির্গত হইতেছে, নিরুপম আধারে কী অসীম সৌন্দর্যই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! উপরে বিমান হইতে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, মানব ধন্য ধন্য করিতেছে। আর মূর্তির মুখনিঃসৃত সুভাষিতাবলী সকলে শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে, পুত্র, ওই দেখ, ভিক্ষুগণ মাধুকরীতে বাহির হইয়াছেন। বাম হস্তে যষ্টি, দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষাপাত্র। ভীত হইও না, তাঁহারা যষ্টি আস্ফালন করিতেছেন বটে, তবে প্রহারের জন্য নহে। উহা দেশবাসীকে সবক শিখাইবার প্রয়াসমাত্র। যষ্টি নানা কাজেই ব্যবহৃত হয়। দেশে যত অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হইতেছে তাহার বিচার করিবার সাধ্য দেশের ন্যায়ালয়ের নাই। কাজেই এক্সট্রা জুডিশিয়াল বিচারের ভার ভিক্ষুদিগকেই লইতে হইয়াছে। হাঁ বৎস, ইঁহারা অযাচিত দানই গ্রহণ করেন বটে, তবে অনেক সময়ে অমনোযোগী মনুষ্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভিক্ষাপাত্রটি ঘন ঘন নাড়া দিয়া একটা ঝনৎকার তুলিয়া দেন। তাহাতে কী আশ্চর্য ফল হইতেছে দেখ, আবালবৃদ্ধবনিতা কাতারে কাতারে আসিয়া প্রকম্পিত হস্তে ভিক্ষাপাত্র ভরিয়া দিতেছে। কখনও মুদ্রায়, কখনও আনুগত্যে, কখনও দানপত্রে, কখনও বা মুচলেকায়। না পুত্র, দাতাগণের হস্ত প্রকম্পিত হইতেছে বটে, তবে তাহা ভীতির কারণে নহে। ভক্তির আতিশয্যেও ওইরূপ হইতে পারে। মোদ্দা কথাটা অতীব সহজ। এই দেশেরটা খাইবে, পরিবে, এই দেশের সম্পদে লালিত-পালিত হইবে, দেশের আরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তায় থাকিবে আর দাদাদিগকে মান্য করিবে না, ফান্ডে টাকা ঢালিবে না, তাহা কি চলে? বেয়াদপি ঘটিলে কি লগুড়ের পরিবর্তে মিষ্টান্ন প্রদান করা হইবে?

বৎস অবলোকন কর, সম্মুখে যে-রক্তিমাভা দেখিতেছ, তাহা অস্তরাগ নহে। এই দেশে মানুষের স্বপ্নই ছিল, সব লাল হো যায়গা। সেই স্বপ্ন আজ সার্থক হইয়াছে। এই দেশের সব কিছুই আজ লাল। যাহা আপনা

হইতে লাল হইতে চাহে নাই, তাহাকে ঈষৎ রগড়াইয়া লাল করা হইয়াছে। ওই দেখ, স্কন্ধোপরি লাঙ্গল লইয়া লাল কৃষক চলিয়াছেন, পশ্য পশ্য লাল মজদুরগণ উৎপাদন বাড়াইতে ছুটিয়াছেন, লাল পুলিশ শান্তিরক্ষা করিতেছেন এবং লাল বুদ্ধিজীবীগণ দেবতার স্তবগান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেবতার রাঙাচরণে সকলেই সমবেত আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

হাঁ বৎস, ওই দেববিগ্রহটির নাম পার্টি। এই দেশে পার্টিই সব। পার্টির পূজা না করিয়া জলপান করিবার জো নাই। তবে পুরাকালে এই পার্টির পূজা করিবার অধিকার বড় সহজে লভ্য ছিল না। তখন যুবক-যুবতীরা অনেকেই এই অধিকার পাইতে বছরের পর বছর চাতকপক্ষীর ন্যায় অপেক্ষা করিত। প্রত্যাশাবিহীন হইয়া পার্টির জন্য জান-কবুল করিয়া খাটিত। সামান্য পকেট-খরচের অর্থও পার্টির স্বার্থে ব্যয় করিত। চা-পাঁউরুটি খাইয়া দিনের পর দিন পার্টি অফিসের দীন-দরিদ্র টেবিল-বেঞ্চে খবরের কাগজ পাতিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিত। ক্লেশসুখপ্রিয়, দৃঢ়চিত্ত, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো সেইসব ক্যাডারগণের দিন আর নাই। তবে সেই প্রজন্মের কয়েকজন এখনও অবশিষ্ট আছেন! তাঁহারা হয়তো বিরলে বসিয়া সখেদে স্বগতোক্তি করেন, ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল!

বৎস, এই সেই অত্যাশ্চর্য দেশ। মনে রাখিও, এই দেশে অতি সাবধানে পা ফেলিতে হইবে। সর্বদা এই স্লোগানটি জপ করিও, জারা হটকে জারা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় বেঙ্গল মেরে জান।

বিতৃষ্ণার চপেটাঘাত।

যেন দু-দু'টি অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাত রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমজনতার ব্যাপক অসন্তোষকেই উন্মোচিত করে দিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ঐতিহ্য, শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। মানুষের প্রয়োজনের রকমফের, অভাবের প্রকৃতি, নির্যাতন ও বঞ্চনার খতিয়ান, খাদ্য-পানীয়জল-শিক্ষা বিষয়ে অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্য গজদন্তমিনারবাসী রাজনীতিবিদদের মজ্জাগত। লোকে তাঁদের আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতালোভী, ভোটভিখারি, দেউলিয়া মানসিকতার মানুষ বলেই মনে করে। ধূমায়িত সেই ব্যাপক অসন্তোষ এখন মুম্বই কাণ্ডের পর মানুষের নানা প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে। তার মধ্যে তীব্র ও তিক্ততম প্রতিক্রিয়া এনএসজি কম্যান্ডো সন্দীপ উন্নিকৃষ্ণনের বাবা আর সন্ত্রাস দমন শাখার প্রধান হেমন্ত কারকারের স্ত্রীর আচরণে প্রকট হল। তরুণ সন্দীপের বেদনাবহ মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গালুরুতে, শেষকৃত্যের জন্য। আমজনতার ঢল নামে অন্তিম যাত্রায়, যাতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পাও ছিলেন। কিন্তু সন্দীপ আদতে কেরলের ছেলে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন বোধহয় রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলেন এবং হয়তো বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বেতনভুক এনএসজি কম্যান্ডো অজানা-অচেনা এই যুবকটির আত্মত্যাগের ব্যাপারটি রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জারে ঠাসা তাঁর ঝানু মস্তিষ্কে প্রবেশই করেনি। অন্তরঙ্গ বা অনুচরবর্গের কেউ ব্যাপারটি ধরিয়ে দেওয়ায় তিনি তড়িঘড়ি ভ্রম সংশোধন করতে ধেয়ে-পেয়ে বেঙ্গালুরুতে সন্দীপের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। আর একথা কে না জানে, শোক নয়, রাজনীতিবিদদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার হল ভাবমূর্তি। কিন্তু অচ্যুতানন্দনের এই কুম্ভীরাশ্রুকে মোটেই পাত্তা দেননি সন্দীপের বাবা। তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে যে চপেটাঘাতটি তিনি করলেন, তা বস্তুত ভারতের আমজনতার নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করেছে।

অন্য দিকে নরেন্দ্র মোদী মুম্বই কাণ্ডে নিহত শহিদদের এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা করে যে-চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাকে হেলায় প্রত্যাখ্যান করে রাজনীতিবিদদের দ্বিতীয় চপেটাঘাতটি করলেন হেমন্ত কারকারের স্ত্রী কবিতা।

মুম্বই কাণ্ডের ভয়াবহতা আমাদের প্রশাসনিক দুর্বলতা, কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা, নিরাপত্তার শতেক ছিদ্রকে প্রকট করে দিয়েছে। এই কাজের পর নেতৃবর্গের লজ্জিত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার লক্ষণ নেই। পরিবর্তে হাততালি বা বাহবা পাওয়া বা ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য নানা ভণ্ডামি বা ভাঁড়ামির অভাব দেখা যাচ্ছে না। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখ ফিল্মস্টার ছেলে এবং এক চিত্র পরিচালককে নিয়ে বিধ্বস্ত তাজমহল হোটেলে গিয়েছিলেন দায় সারতে। আগুপিছু নিরাপত্তারক্ষী, চারদিকে মিডিয়ার ক্যামেরা। লোকে এই ভণ্ডামি দেখে ক্ষিপ্ত তো হবেনই। মন্ত্রীকে অপসারণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার পেছনেও আছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা। বিলাসরাওকে না সরালে হয়তো ভোটবাক্সে টান পড়বে। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অন্তত তাই বলছে। এদেশের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আর কেউ বিবেকবানের আচরণ আশা করে না। এখন দেশের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে বড় গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর চেয়েও বড় আত্মস্বার্থ।

নেতৃবর্গ সকলেই একরকম, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। রাজনীতিতেও কতিপয় সজ্জন এবং দরদি মানুষ আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা এখন হাস্যকর রকমের সংখ্যালঘু। দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা সকাল-বিকেল নিজেদের বয়ান পাল্টে ফেলেন, যাঁরা অম্লানবদনে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে বেড়ান, সমাজবিরোধী ও বশংবদ পুলিশ যাঁদের পরম বন্ধু। দেশ-কাল-পরিস্থিতিকে যাঁরা নিরন্তর নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ক্লান্ত, হতমান বিধ্বস্ত এই দেশ নিরন্তর পর্যুদস্ত হয়ে চলেছে এইসব রাজনীতিবিদদের হাতে। কে জানে, হয়তো বা আমাদের অযোগ্যতা আর অকর্মণ্যতারই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের শাসকের মধ্যে। ভয় হয়, এরপর গণতন্ত্রের উপরই না মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

রাহুল এখন নবীন ভারতের প্রতীক

এই দেশের রাজনীতিতে রাহুলের ক্রম-উদয়, নবীন রাজনীতিকদের মনে তো বটেই ভোটারদের মনেও ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনীতির পট-পরিবর্তন প্রসঙ্গে একটা নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

পঁচিশ বছরের নব্যযুবা বলতে বা বোঝায় তা তিনি নন। তবু এই উনচল্লিশ বছরের যুবা পুরুষটি ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে অতিশয় গুরুতর একটি ভূমিকা পালন করেছেন কেবল স্বভাবমাধুর্যে, এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে। প্রয়াত রাজীব গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর পুত্র রাহুলের এই উত্থান চমকপ্রদ এবং বিস্ময়করও। কারণ আততায়ীর হাতে রাজীব নিহত হওয়ার পর সনিয়া নিরাপত্তার কারণেই তাঁর মেয়ে এবং ছেলেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন। রাহুল আমেরিকায় গিয়েছিলেন পড়াশুনো করতে। ব্রিটেনেও। রাজনীতিতে আসবেন কি না জিগ্যেস করলে আগ্রহ দেখাতেন না। রাজীব গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটলে যেমন সনিয়া গান্ধী রাজনীতিতে আসতেন না, তেমনই সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু না ঘটলে রাজীবও সম্ভবত আসতেন না রাজনীতিতে। বরং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল ভাই সঞ্জয় গান্ধীর। তখন ইন্দিরা গান্ধীর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব রাজনীতি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। পাইলটের চাকরি, ইতালিয়ান স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর তখন শান্তির সংসার।

বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয়ের মৃত্যুর পরই অনিচ্ছুক রাজীবকে রাজনীতিতে আনেন ইন্দিরা। ভারতীয় রাজনীতিতে নেহরু পরিবারের পরম্পরা অনেকেই ভালো চোখে দেখেন না। কিন্তু এই পরম্পরা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে এমন নয়। ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ নিহত হওয়ায় দেশজুড়ে যে সমবেদনাসঞ্জাত উত্তাল

উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রবীণ ও যোগ্য মন্ত্রীদের সরিয়ে রেখে রাজীবকে তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রী করা হয়। এই ঘটনার একটি সুফল হল, ইন্দিরার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উত্তাল জনরোষ এবং উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত হয়ে যায়। বিগত লোকসভায় যখন ইউপিএ জিতল তখন সনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করার জোরালো সওয়াল উঠেছিল বিভিন্ন মহলে, কিন্তু অন্তরাত্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সনিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি খুব ধীরে ধীরে পুত্র রাহুলকে তৈরি করেছেন, রাজনীতির অঙ্গনে এনেছেন। রাতারাতি রাজা করে দেওয়ার মতো ভুল করেননি। বরং দেশকে ভালো করে চেনা ও বোঝার জন্য সাংগঠনিক কাজে পুত্রকে নিয়োগ করেছেন। মৃদুভাষী, আপাত নির্লোভ এবং সরল মুখশ্রী ও ঠান্ডা মেজাজের এই যুবকটি কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই নিজেকে তৈরি করছেন। ইদানীং রাহুলের বিপুল পরিক্রমা, গাঁয়ে-গঞ্জে প্রান্তিক মানুষের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ, নিরলস জনসংযোগ, এ সবই উদ্দীপ্ত করেছে ভারতের তরুণ প্রজন্মকে। বলতে কী, রাহুল গান্ধী এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পালে অনেকটাই বাতাস টেনে এনেছেন। নবীন প্রজন্মের এই প্রতিভূকে ভারতের মানুষ শুধু বিশ্বাসই করেনি, তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা জানিয়েছে।

অনেকেই রাহুল গান্ধীকে ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন, মৃদু গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতিতে সেটা সম্ভব হবে কি না তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে বহু লোকসভা কেন্দ্রে তরুণ ছেলেমেয়েদের মনোনয়ন দেওয়ায় তাঁর হাত ছিল। তাঁদের অনেকেই এই প্রথম লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং প্রথমবারেই জয়ী হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন কারণ, দেশের মানুষ তরুণ প্রজন্মকে প্রবীণদের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন।

এই দেশের রাজনীতিতে রাহুলের ক্রম-উদয়, নবীন রাজনীতিকদের মনে তো বটেই, ভোটারদের মনেও ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনীতির পট-পরিবর্তন প্রসঙ্গে একটা নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। নবীন প্রার্থীরা ভোটারদের যে আনুকূল্য পেয়েছেন, তাতে রাহুল গাঁধীর অবদান অপরিসীম। তাঁর মেধাবী ও স্থিতধী ইমেজ, সরকার যাতে 'আম আদমি'-র-সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে প্রচেষ্টা করা এবং কিছুটা হলেও তাতে সাফল্যলাভ ভোটারদের মনে নবীন প্রজন্মের জন্য বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিভু রাহুল এখনও মন্ত্রিত্ব নিতে অনিচ্ছুক, উপরোধ প্রত্যাখ্যান করে দলীয় সংগঠনেই নিজেকে নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর। বোঝাই যায়, তিনি তাঁর মায়ের মতোই বিবেচক এবং বাস্তববোধের অধিকারী। বুদ্ধিমানও। প্রত্যাশিত রাজনৈতিক পথে বিচরণ না করে তিনি যদি একটু অন্যরকম হয়েই ওঠেন, তাহলেই বা ক্ষতি কী?

প্রবন্ধ। সিনেমা

টিনটোরেটোর যিশু

ছবি একটাই, কিন্তু দর্শক হরেকরকম। নানা দৃষ্টিকোণ বা ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে ছবিটা দেখা বা উপভোগ করা হয়ে থাকে। এই আমি যেমন। সিনেমার খুঁটিনাটি শিল্পগত বা কলাকুশলগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত নই। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' আমি বার চারেক দেখেছি। ছবিটা নিয়ে এত আলোচনা কেন তা বুঝতে পারিনি। একবার এক চিত্রপরিচালক বন্ধুর সঙ্গে ছবিটা দেখার সময় তিনি আমাকে শিক্ষকের মতো ছবিটার গুণাগুণ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিলেন। তাতে খানিক ধাঁধা কেটেছিল।

'টিনটোরেটোর যিশু' সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনির ধারায় একটি চমৎকার সৃষ্টি। কাহিনি-কথনের যে দুর্লভ জাদু তাঁর হাতে ছিল তা অনুশীলনসাপেক্ষ নয়, কেউ কেউ ওই জাদু নিয়েই জন্মায়। তাঁর পরিণত বয়সে আনন্দবাজার পত্রিকার হয়ে আমি তাঁর যে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলাম তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, সাহিত্যিক বা চিত্রকরের চেয়েও নিজের ফিলমমেকার সত্তাটিকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পিতার পুত্র হিসেবে সন্দীপও নানা গুণে গুণান্বিত। শিল্প বোঝেন, সাহিত্য বা সংগীত বোঝেন। এবং তিনিও শেষ অবধি আদ্যন্ত ফিলমমেকার। কিন্তু তবু সত্যজিৎ রায়ের কাজের সঙ্গে সন্দীপের কাজের প্রতিতুলনা টেনে আনা ঠিক হবে না। দুজনে একরকম হতে যাবেনই বা কেন। বলতে বাধা নেই, সন্দীপ যে নিজস্বতা নির্মাণের চেষ্টা করছেন তা সাধুবাদযোগ্য।

'টিনটোরেটোর যীশু' অতীব জটিল এবং জমজমাট একটি কাহিনি। চরিত্র অনেক, প্রেক্ষাপটও বিভিন্ন। বৈকুণ্ঠপুর থেকে হংকং অবধি। কাহিনির সবিস্তার বিবরণ দেওয়া অপ্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলতে হবে যে, দুর্লভ চিত্রের যে বিশ্বজোড়া বাজার এবং সংগ্রাহকদের মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা তা নিয়ে বাস্তবেও অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। আর এ নিয়ে নভেলও কিছু কম লেখা হয়নি। কাহিনির রহস্যময়তা ধরে রেখে বেশ ঝকঝকে, উপভোগ্য টানটান একটি চলচ্চিত্র সন্দীপ উপহার দিতে পেরেছেন, নির্দ্বিধায় একথা বলাই যায়।

মুশকিল হল, কাহিনির গোয়েন্দাদের বয়স-টয়স বাড়ে না। শার্লক হোমস। সেক্সটন ব্লেক, ব্যোমকেশ, কিরীটি রায় বা ফেলুদা, এরা কেউই কাহিনির ক্রম মেনে বুড়ো হননি। শুধু শুরু থেকেই যারা বুড়ো তাদের কথা আলাদা। যেমন আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো বা মিস মারপল।

কিন্তু বাস্তব বড়ই অকরুণ। সৌমিত্র আর ফেলুদা নেই, শশী কাপুরও এখন ফেলুদাদু। সব্যসাচী চক্রবর্তী দাদু না হলেও ফেলুকাকু তো বটেই। যদিও সব্যসাচী অত্যন্ত ক্ষমতাবান অভিনেতা এবং ফেলুদার ভূমিকায়

তাঁর সাবলীলতাকেও প্রশ্ন করা চলে না। কথাটা ওঠে মানানসই কিনা সেই প্রশ্নে। আর বিভুবাবুও পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ শিল্পী। তাঁর সমস্যাটা আমি বুঝি। সন্তোষ দত্তের ইমেজ তাঁর পক্ষে বড় বাধা। সৌমিত্র চাটুজ্যেকে আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম, ভাই, সন্তোষবাবু মানুষটি কি সত্যিই বোকা নাকি? লোকটাকে এমন নিখাদ বোকা বলে মনে হয় কেন ছবিতে? সৌমিত্র বেজায় হেসে বলেছিল, আসলে কি জানো, খুব বুদ্ধিমান লোক ছাড়া ওরকম বোকার অভিনয় করা সম্ভবই নয়। বিভুবাবু একটু চেষ্টা করলেই সন্তোষ দত্তকে ভুলে তাঁর নিজের মতো করে ফের জটায়ুকে তৈরি করে নিতে পারেন বইকি। বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ফেলনা শিল্পী নন। তাঁর মুশকিলটা দেখা দিয়েছে হিন্দি-বাংলার মিশেল দিতে গিয়ে। এসব অবশ্য নিতান্তই গৌণ বিচ্যুতি। সব মিলিয়ে 'টিনটোরেটোর যীশু' হালফিল বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাহে বেশ উজ্জ্বল একটি সংযোজন। ক্যামেরার কাজ চমৎকার, হংকং-এর রাস্তায় গাড়ি ধাওয়া করার দৃশ্য অতীব বিশ্বাসযোগ্য ও রোমহর্ষক, রহস্য ও উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে।

যেটা সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে তা হল, টোটা এবং পরমব্রতর মানানসই অভিনয়। টোটাকে যে এরপর অবধারিতভাবেই ফেলুদার চরিত্রে দেখা যাবে তা অনুমান করে নিতে কষ্ট নেই। বাংলা ছবিতে আজ অবধি বিশ্বাসযোগ্য মারপিটের দৃশ্য দেখা যায়নি। ওই একটা ব্যাপারে বাঙালি নায়ক-বীরেরা বেশ অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। সোয়ার্ৎজেনেগার বা ধর্মেন্দ্র হয়ে ওঠা শারীরিক ও অনুশীলনগত কারণেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই বাংলা ছবিতে মারপিটের দৃশ্য দেখতে আমার কিছু অস্বস্তি হয়। এই ছবিতে সন্দীপ অবশ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। ভিলেন হিসেবে শিলাজিৎকে বেশ ভালোই লেগেছে দর্শকদের। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।

সন্দীপ ছবির টাইটেল থেকেই দর্শকদের চমকে দিয়েছেন। চমৎকার ছবিটির শুরু। তবে আমার ধারণা আবহসংগীতের ব্যাপারটা কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে করালে বোধহয় ভালো হত। নানা দিকে মন দিতে গেলে পরিচালনায় সমস্যা হতেই পারে।
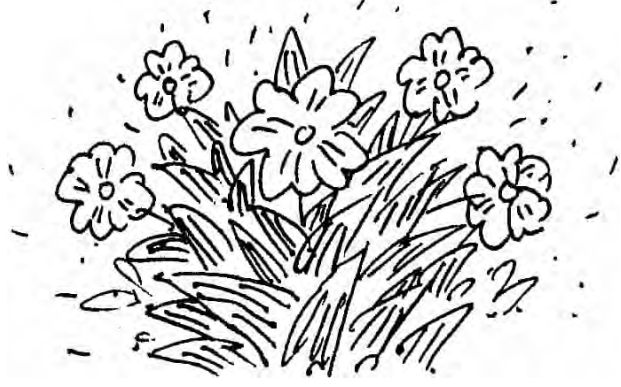
স্মৃতি

প্রথম পরিচয় পাঁচ বছর বয়সে

কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। সাল-তারিখে অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, সেটা ১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে।

কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের বছরটাকে নিয়ে আমি অনেক কাব্য করতে পারতাম, মজা করতে পারতাম। চার্লস ডিকেন্স-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারতাম, 'It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness'—আরও কত! কিন্তু না, পাঁচ বছরের বালকের কাছে পৃথিবী, যুদ্ধ, শান্তি, রাষ্ট্র এ-সমস্ত নিছক অর্থহীন শব্দ। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম, দোতলা বাস (এখনকার দোতলা বাসের মতন নয়, আর একটু ছোট)! পিচের রাস্তায় পাতা লাইন বরাবর দু'কামরার একটা রেলগাড়ি ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে চলেছে। এই সেই ছবিতে দেখা, স্বপ্নের ট্রামগাড়ি! চৌখুপি বাক্সের মতন, একটা দু'চাকার গাড়ি। একজন গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছে, আর একজন লোক সেই গাড়িটা টানতে-টানতে ছুটে চলেছে। আঙুল তুলে বাবা বললেন, "রিকশ"। ইস, মৈমনসিংহের বাড়িতে আমি এসব কিস্যু দেখিনি। সেখানে শুধু ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি! প্রথম দর্শনেই কলকাতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, বিস্মিত করেছিল, তীব্রভাবে আপন করে নিয়েছিল। এটা কলকাতা শহরেরই মহত্ত্ব বলতে হবে। নিউইয়র্ক শহর নিশ্চয় প্রথম দর্শনেই সুদূর অ্যালবামা কিংবা ভার্জিনিয়ার গ্রামের ছেলেকে এতটা আপন করে নেয় না, সাসেক্স কিংবা স্কটল্যান্ডের গ্রামের ছেলেকে লন্ডন শহর প্রথম দর্শনেই এত তীব্রভাবে আকর্ষণ করে না।

বাবা রেলে চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। '৪২ সালেই আবার বদলি হয়ে গিয়েছিলেন কাটিহারে।

'৪১ থেকে '৪২—একটা বছর আমরা কাটিয়েছি মনোহরপুকুর রোডের একটা বাড়িতে। তখনও কলকাতা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়নি। আমাদের বাড়ির একটু আগেই ছিল খোলা জলের একটা পুকুর, গা ডুবিয়ে মোষেরা বহাল তবিয়তে সেখানে স্নান করত। আজকের ঘিঞ্জি, জনাকীর্ণ মনোহরপুকুর দিয়ে হাঁটলে সেই পুকুরের কথা নিতান্ত প্রাগৈতিহাসিক বলে বোধ হবে।

মনোহরপুকুরে আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা, ঘরের পাশেই সুবিশাল এক ছাদ-বারান্দা। গরাদওয়ালা বিশাল জানলা, প্রায় ঘরের মেঝে অবধি বিস্তৃত। আজকের আর্কিটেক্ট বা এঞ্জিনিয়াররা নিশ্চয় সে-সব বিশাল জানলাকে নিতান্ত স্পেসের অপব্যবহার বলে আখ্যা দেবেন।

তবে, তখন অনেক জায়গা ছিল। আমার নিজের একটা তিন চাকার ট্রাই-সাইকেল ছিল। মা ঘরের জিনিসপত্র একটু সরিয়ে রাখতেন, আমি মহানন্দে সেই ঘরে সাইকেল চালানো অভ্যাস করতাম। এখন তো স্কোয়ার ফুট হিসেবে কলকাতায় ঘরের জায়গা মাপা হয়, ঘরে সাইকেল চালিয়েছি শুনলে আজকের ছেলেমেয়েরা তাই আমাকে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী মনে করবে। তবে, সেই কলকাতার বালক-বালিকারা নিতান্ত গ্রাম্য ছিল। আমার নিজের খেলনা ছিল শুধু ওই তিন চাকার সাইকেল আর কিছু পুতুল। এখন তো সর্বত্র ফ্রিসবি, লিও টয়েজ-এর আধুনিক মেশিনগান আর ভিডিও গেমস পার্লার-এর ছড়াছড়ি। শুনলে ভারী অপদার্থ বলে বোধ হবে, মনোহরপুকুরের রাস্তায় আমরা চোর চোর খেলতাম। টেনিস, স্কোয়াশ, বিলিয়ার্ডের তখনও নামই শুনিনি। মাত্র চল্লিশ বছরের ব্যবধানে, কলকাতা শহর দুই প্রজন্মের মাঝে এক বিস্তৃত ব্যবধান রচনা করে ফেলেছে। তাদের স্বপ্ন, অভ্যাস, শখ, জীবনযাত্রা সব কিছুতেই দেখছি আশমান-জমিন ফারাক!

লন্ডন শহরের একটা অংশে এখনও পুরনো বাড়ি, ক্যাসল অবিকল সেইভাবে সাজিয়ে রাখা আছে। কলকাতা পুরনো স্মৃতিকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। মনোহরপুকুরে আমাদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি। ভাঙা দরজা, মেঝেতে স্তূপীকৃত রাবিশ। কোথাও ইটের দেওয়াল ভেঙে গেছে, পলস্তারা খসে পড়েছে। নিতান্ত অ্যাডভেঞ্চারের লোভে, নির্জন দুপুরে আমরা সেই পোড়ো বাড়ির ঘরে ঘুরে বেড়াতাম। এখন সেইসব পোড়ো বাড়ি ভেঙেচুরে বহুতল বাড়ি তাদের নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেতে, আজকের কলকাতার ছেলেমেয়েদের তাই এনিড ব্লাইটন আর সিডনি শেলডন পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না!

এখন যেমন লোডশেডিং, যুদ্ধের বাজারে তেমন ব্ল্যাক আউট। সাইরেন বাজলে আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, জানলায় কালো কার্বন পেপার লাগিয়ে দেওয়া হত। মোটর সাইকেলে করে লালমুখো ব্রিটিশ সার্জেন্ট পুলিশ ঘুরে বেড়াত। বম্বিং-এর ভয়ে মনোহরপুকুর রোডে একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিল। ওপরের এয়ার-রেইডের ঢাকনাটা কোনওদিন হয়নি, শুধু ট্রেঞ্চের গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল। এখন, কর্পোরেশনের ঠিকাদারদের লোকেরা যখন রাস্তা ঠিক করার নামে যেখানে-সেখানে আচমকা গর্ত খুঁড়ে রাখে, তখন আমার সেই ট্রেঞ্চের কথা মনে পড়ে যায়।

'৪২ সালে কাটিহারে চলে গেলেও কলকাতায় ছুটি-ছাটায় মাঝে-মাঝেই এসেছি। উঠতাম পিসিমার বাড়ি, কিংবা মামার বাড়ি। পিসিমার বাড়ি ছিল কালীঘাটে, ট্রাম ডিপোর পিছনে। মামার বাড়ির ছিল চেতলা। এখন চেতলা ব্রিজ পার হলেই রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান-এর কারখানা, বিশাল-বিশাল বাড়ি। শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে, তখন চেতলাতেও ক্যাওড়াতলা শ্মশানের মড়া পোড়ার গন্ধ নাকে এসে লাগত। গয়লা বাড়ির সামনে গোরু এনে দুধ দুইয়ে যেত। বাজার বলতে শুধু বৈঠকখানা বাজার আর জগুবাবুর বাজারের নাম শুনতাম। একদিন মামা খুব ভালো একছড়া কলা এনে বললেন, এগুলি খুব ভালো। লেক মার্কেটের কলা। এখনকার ছেলেমেয়েরা যখন-তখন লেক মার্কেট, গড়িয়াহাটে গিয়ে আর্চিজ-এর পোস্টার কেনে, ফ্যান্সি মার্কেটে গিয়ে

নাইকের জুতো আর লিভাইস-এর জিনস-ট্রাউজার্স কেনে। লেক মার্কেট থেকে কলা কেনা কি তাদের কাছে খুব হাস্যকর বোধ হয়?

'৫৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলাম। হোস্টেলে থাকতাম। তখনও রাজনীতি তার কালজিহ্বাকে ছাত্রজীবনের আনাচে-কানাচে সেঁধিয়ে দেয়নি, এসপ্ল্যানেড ছিল আজকের তুলনায় ঢের ফাঁকা। কলেজ স্কোয়ারের রেলিং ছিল অক্ষত, বসার জন্য যখন-তখন ফাঁকা বেঞ্চ পাওয়া যেত। আমরা এসপ্ল্যানেডে সিনেমা দেখতে আসতাম। দূর থেকে চোখে পড়ত সবুজের উপর সাদা অক্ষরে লেখা Metro ; এখন সেই সবুজ, সাদা সব কিছুই রীতিমতো বিবর্ণ, আশপাশের উঁচু বাড়িগুলির কাছে নেহাত নিষ্প্রভ বলা যায়। আর তখন, মেট্রো সিনেমার ধরনে কলকাতায় অনেক বাড়ি তৈরি হত। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম মেট্রো প্যাটার্ন।

হোস্টেল থেকে প্রতি রবিবার যাদবপুরে পিসিমার বাড়ি যেতেই হত। গোলপার্ক পার হয়ে, রেললাইন পেরিয়ে হাঁটতে হত। ইস, ঢাকুরিয়া ব্রিজ এখন রেললাইন পেরিয়ে হাঁটার মজাটাই নষ্ট করে দিয়েছে। সেই ঢাকুরিয়া পার হয়েই বিরাট ধোপার মাঠ। আজ তার নাম যোধপুর পার্ক। যাদবপুর নেহাত এক পাড়াগাঁ, সেখানে জল-কাদা ভর্তি কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে ফলসা গাছ। বস্তুত, রাসবিহারীর মোড় এবং গড়িয়াহাটের মোড় পেরিয়ে যে কলকাতা হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবা যেত না! এখন লোকে, কলকাতা বলতে অনায়াসে গড়িয়া ছাড়িয়ে সোনারপুর, ঠাকুরপুকুরও ভেবে নেয়!

বেলেঘাটা, উলটোডাঙা...পূর্ব কলকাতা ছিল আমার কাছে নিতান্ত অচেনা! ধুৎ, ওসব জায়গায় তো স্রেফ ভেড়ি আর জলা, কোন দুঃখে যাব? ইস, তখনকার সেইসব ভেড়ি ও জলায় ঘুরে বেড়ালে আমি এখন অনায়াসে অভিজাত সল্ট লেকের গত জন্মের ইতিহাস লিখে ফেলতাম।

তখন, কলকাতায় ভিড় অনেক কম ছিল। হকার ছিল না, ফুটপাথ ধরে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যেত। সাহেবপাড়া, খাস এসপ্ল্যানেডেও প্রচুর গাছ। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে পাওয়া যায় ফারপোর রুটি, খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান মাখন আর সুইজারল্যান্ডের পনির। এখন, মুদির দোকানেও নুডলস আর চাউমিনের প্যাকেট পাওয়া যায়। সর্বত্র চিজ, সসেজ, সালামি কিনতে পাওয়া যায়। ইস, কলকাতার সাহেবপাড়ার গৌরবও শেষ অবধি হারিয়ে গেল!

কলকাতার বনেদিয়ানা চিনেছি অনেক পরে। ল্যাজারাস কিংবা প্রবর্তকের ফার্নিচার আমি অনেক বাদে, পার্ক স্ট্রিটের নিলামের দোকানে দেখেছি। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়িতে তখন ইন্টিরিয়র ডেকরেশন বা ফ্যাশন ডিজাইনিং আদপে শোনাও যেত না। আমাদের বাড়িতে, অতিথি এলে মাদুর পেতে বসতে দেওয়া হত। ডিভান ও সোফার যুগ শেষ, এখনকার আধুনিক ইন্টিরিয়র ডেকরেশনেও না কি বাড়িতে কার্পেট আর মাদুর বিছিয়ে বসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই শহর প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে পলে তার রূপ বদলায়। সেই পরিবর্তনের চনমনে উত্তেজনাই আমাকে আকর্ষণ করে।

তবে, এই শহরের মানুষগুলি কেমন যেন নির্বিকার, উদাসীন। টাটকা, সতেজ সবুজের ভীষণ অভাব। সব মেট্রোপলিটন শহরের ভিড়ই না কি এরকম। লুই মামফোর্ডের ভাষায় 'লোনলি ক্রাউড'!

ঠিকই। নিউইয়র্কের সাইডওয়াকে, অফিস টাইমের ভিড়ে লোকে যখন-তখন ধাক্কা মারে, লন্ডনের এঁদো, সরু গলিতে যখন-তখন ঝুপুস-ঝুপুস বৃষ্টি নামে, পিকিং শহরে 'লাস্ট এম্পারার'-কেও ভিড়ের মধ্যে, ব্রেক চেপে, সাইকেলে প্যাডেল করতে হয়। কিন্তু সেসব ভিড়ে আমার কিছুই যায় আসে না। কলকাতার ভিড় আর উদাসীনতা বড় গায়ে লাগে। যতই হোক, নিজের শহর তো!
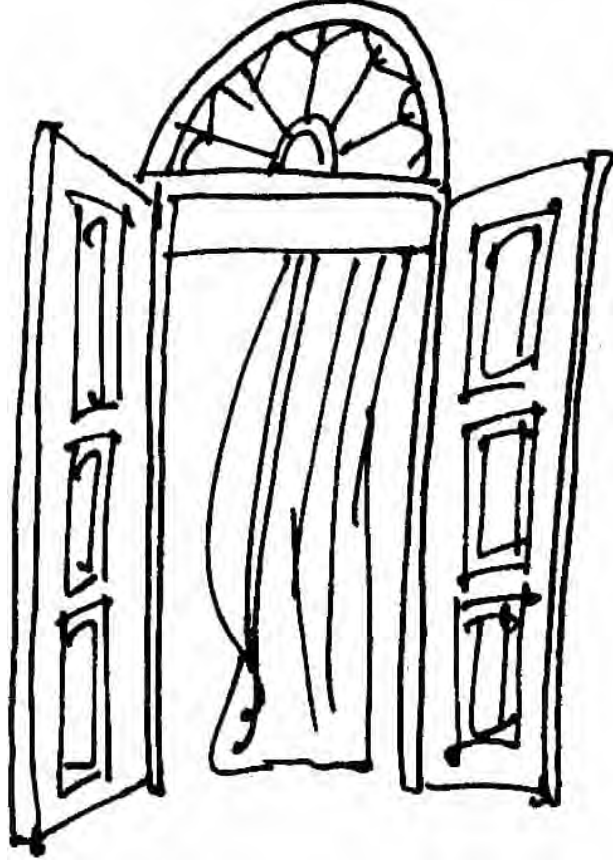
তখন

পৃথিবীতে তখন হাজারো ডামাডোল, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, জিনিসের আকাল, মহামারী, নৈতিক অধঃপতন, কিন্তু তখন আমার আশ্চর্য শৈশবকে কিছুই স্পর্শ করত না। এক কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নলীন হৃদয় চারদিকে এক সূক্ষ্ম উর্নার মতো পরতের পর পরত রচনা করে নিয়েছিল নিজের ভুবন, সেই ভুবনে ছিল কত অনুভূতি, কত আশ্চর্য আলো আর ছায়া, কত মায়াবী শব্দের টুপটাপ।

মা এক সময়ে সারদেশ্বরী আশ্রমে মানুষ হয়েছিলেন, সেই সুবাদে আমাদের যাতায়াত ঘটত বাগবাজারে। মনোহরপুকুর থেকে বাগবাজার যাওয়া তখন খুব শক্ত ছিল না এখনকার মতো। বাসে ওঠা যেত, ট্র্যাফিক জ্যাম কথাটা তখন কানে আসত না।

কী অদ্ভুত এক পবিত্রতার গন্ধ ছিল সারদেশ্বরী আশ্রমে। ঢুকলেই যেন দেহ আর মন শীতল হয়ে যেত। সেই শিশু বয়সেও বুঝতাম এখানে দুষ্টুমি করতে নেই। এখানে ঠাকুর আছেন।

গৌরীমার কথা মায়ের মুখে এত শুনেছি যে, তাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, চওড়া লালপেড়ে গরদের শাড়ি, মুখে গালভরা হাসি, শুনেছি, একটু শুচিবায়ু ছিল। এটো-কাঁটা মানতেন সাংঘাতিক এবং মানাতেনও। আর গভীর রাতে তাঁর কাছে আসত নানা আত্মা। সিংহাসনে কালীমূর্তি হয়ে উঠতেন জাগ্রত।

আমি দেখতাম দুর্গামাকে। মনোহর পুকুরের বাসাতেও এসেছেন প্রায়ই। সেই চওড়া পাড় শাড়ি, আর কী প্রশান্তি মুখে। আশ্রমে গেলে কত কী যে খেতে দিতেন ওঁরা, সুন্দর আর অদ্ভুত সব খাবার, পেটুক বলে কুখ্যাতি ছিল আমার, আশ্রমে গিয়ে কিন্তু বেশি খেতাম না। ইচ্ছে করলেও না। প্রসাদ তো বেশি খেতে নেই।

সেই আশ্রমে মা যখন ছিল তখনকার একটা গ্রুপ ফটো আমাদের বাসায় ছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন মেয়ের ছবি। একদিন মা আমাকে ফটো দেখিয়ে জিগ্যেস করল, বল তো কোনজন আমি?

ভারি অবাক হয়ে ফটো দেখলাম। সবাই 'কিশোরী', কারো হাতে সেলাই, কারো হাতে উল বোনার কাঠি, কেউ সেলাই মেশিনের সামনে বসা, মাকে একবারেই চিনতে পারি, কিন্তু ভারি অবাক হয়ে যাই কিশোরী মাকে দেখে। রোগা, গম্ভীর, মেশিনের সামনে বসে আছে।

মায়ের আশ্রমিক নাম ছিল মহামায়া। মাথায় অনেক চুল ছিল বলে মাকে ডাকা হত চুলওলা মহামায়া বলে।

বাবাকে একটু ভয় পেতাম, পারতপক্ষে কাছে ঘেঁষতাম না। তখন ছিল মা-সর্বস্ব জীবন। দিদি স্কুলে যেত, বাবা অফিসে সারাদিন, বাড়িতে মা আর আমি। দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেয় মাদুর পেতে মায়ে পোয়ে শুয়ে থাকতাম। তখন মা শব্দ করে পড়ত মহুয়া, বলাকা, চয়নিকা, কত কবিতা শুধু শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তা বলে মায়ের বাধ্য অনুগত ছেলেটি ছিলাম না মোটেই, এত দামাল ছিলাম যে মা সামাল দিতেই পারত না। ছেলেধরা, ভূত কত কী ভয় দেখাত তবু ঠিকই বেরিয়ে পড়তাম নানা অকাজ কুকাজে।

কিছুদিন আগে দাদু এসে তাঁর ছোট ছেলের সংসার দেখে গেছেন। কিছুদিন পর এলেন ঠাকুমা। নাড়ু, তক্তি, মোয়া, দেশের মিষ্টি এবং আরো কত কী বেরোতে লাগল পোঁটলাপুটলি থেকে। যত দেখি তত আশ্চর্য হয়ে যাই।

আমাদের শৈশবে মা-বাবার চেয়ে বহুগুণ আপন ছিলেন দাদু আর ঠাকুমা। ওরকম অগাধ প্রশ্রয়, সীমাহীন আদর এবং সব অপরাধের দ্বিধাহীন ক্ষমা তো আর কারো কাছে পাওয়া যাবে না কখনো।

ঠাকুমা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আর দিদির দখল নিয়ে নিলেন, আমরাও যেন খুঁটির জোর পেলাম। সারাদিন ঠাকুমার আঁচলের আবডালে আবডালে ঘুরি। রাত্রিবেলা দুপাশ থেকে দুই ভাইবোন তাঁকে বাদুড়ের মতো আঁকড়ে ধরে ঘুমোই। আর সারারাত গরমকালে তাঁর পাখা নড়ে।

আইনজীবী দাদু পয়সাওলা মানুষ। তাঁর গিন্নী হিসেবে ঠাকুমার হাতেও অঢেল টাকা। গলায় এগারো ভরি বিছে হার, দু-হাতে মোটা সোটা বালা, অনন্তচূড়। গোদা গোদা নোট গোনেন বাক্স থেকে বের করে। বাবার এখন আশি টাকা মাইনের চাকরি। অবশ্য সস্তা গণ্ডার দিন বলে সংসারে তেমন টানাটানি নেই। সেই সংসারে ঠাকুমা এসে হাল ধরলেন নতুন করে। খাওয়াদাওয়া এবং নতুন জিনিস কেনার জোয়ার লাগল।

কিন্তু সেসব বড় কথা নয়। বড় কথা হল ঠাকুমা। সেই মানুষটা যেন ফুরোন না, দিন দিন যেন অঢেল হয়ে ওঠেন। খেতে-শুতে সর্বদা সারাদিন কত যে গল্প বলেন, আমরা হাঁ করে শুনি। দিদির আর আমার মধ্যে নিত্য যে মারপিট লেগে থাকত তা পর্যন্ত একেবারে বন্ধ।

ঠাকুমার মুখে শুনতাম ভাওয়ালের গল্প। পরবর্তীকালে বহুবার জয়দেবপুর হয়ে ভাওয়াল গেছি, ঠাকুমার বাপের বাড়ি। সে এক আশ্চর্য জায়গা। স্টেশন থেকে বাঁশপাতায় ঢাকা একটা পথ ধরে বহুদূর হাঁটতে হত। তারপর রাজবাড়ি, পুকুর, বনজঙ্গল মিলে-মিশে এক রহস্যময় স্বপ্নপুরী। ভাওয়ালের মেজোকুমারের কথা, ঠাকুমা মেজোকুমারকে ভালোই চিনতেন। তবু তাঁর কথা তেমন বলতেন না। বলতেন ভাওয়ালের আশ্চর্য ভূতের গল্প। কলকাতার বিজলী বাতি আর চারদিককার শহুরে হট্টগোলের মধ্যেও আমাদের গা ছমছম করত।

ঠাকুমার দেশে ফেরার সময় হয়ে এল। আমি রোজ ঘ্যান ঘ্যান করি। আমি তোমার সঙ্গে যাবো ঠাকুমা।

ঠাকুমা আঁচলে চোখ মুছতে থাকেন। বুকে চেপে ধরে ধরা গলায় বলেন, যাবি!

যাবি!

ঠিক দাদু যেভাবে ফাঁকি দিয়েছিলেন তেমনিভাবেই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ঠাকুমা একদিন চলে গেলেন।

ঘুম ভেঙে উঠে মনে হল পৃথিবীটাই হারিয়ে গেছে। আজ ঠাকুমা আর ইহলোকে নেই। পৃথিবী বিবর্ণ লাগে।

লব

লব নামে একজন লোক ছিল। তার ঠোঁটদুটো ছিল বাঁকা। আমাদের যেমন আড়াআড়ি বা হরাইজন্টাল তার তেমন নয়, তার ঠোঁট ছিল অনেকটা লম্বের মতো ভার্টিক্যাল। খেটে খাওয়া মানুষ। সারাদিন তাকে কাজ করতে দেখতাম। সে কাজ কতখানি কাজের মতো কাজ তা বলতে পারব না। তখন আমার বয়স পাঁচ-ছয় বা সাত হবে। তখন পৃথিবী আমার কাছে নতুন। যা দেখি তাই বিস্ময়কর। লবও ছিল বিস্ময় বস্তু। তার কারণ তার ঠোঁট, ওরকম। লম্বমান ঠোঁট দিয়ে সে খায় কী করে সেটাই আমার প্রশ্ন ছিল। ঠাকুমাকে, জ্যেঠিমাকে, দাদুকে অনেকবার জিগ্যেস করেছি। খুব একটা স্পষ্ট জবাব পাইনি। আমি লবকে তার ওই ফাঁকা ঠোঁটের জন্যই একটু ভয়ও পেতাম।

ময়মনসিংহ শহরটা ছিল গ্রাম আর শহর মেশানো একটি জায়গা। তখনকার বেশিরভাগ শহরই ছিল তাই। ঘিঞ্জি বাড়ি-ঘর নয়। অনেক পতিত জমি, ফাঁকা জায়গা। গাছপালা, জঙ্গল, পুকুর দীঘি ছিল। জোনাকি পোকা, শেয়ালের ডাক। দু-চারটে বন্যপ্রাণী কিছুরই অভাব ছিল না। শহর মনে করলে শহর, গ্রাম মনে করলে গ্রাম। বিদ্যুতের বাতি ছিল না। সন্ধের পর ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বলত। রাস্তাঘাটে বাতির ব্যবস্থা নেই। আর ওই শহরটির মতো প্রিয় জায়গা আমার আর কোথাও ছিল না।

ময়মনসিংহ ছেড়ে যখন দূর প্রবাসে যেতে হল তখন সেই ছেলেবেলায় মনে হত, ময়মনসিংহে গেলেই আমার জ্বর সেরে যাবে। ময়মনসিংহে গেলেই আমি অঙ্কে একশোতে একশো পাব, ময়মনসিংহে গেলেই আর চাওয়ার কিছু থাকবে না।

শুধু জায়গাটাই তো সব নয়। ময়মনসিংহ মানেই ছিল দাদুর অগাধ প্রশ্রয়, ঠাকুমার চূড়ান্ত আদর আর জ্যেঠিমার সেই 'সোনার গোপাল' বলে ডাক। আরও ছিল বাঁধানো পুকুর এবং ব্রহ্মপুত্রের জলে দাপাদাপি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার। আর সাইকেলে হাফ প্যাডল করে সারা শহরে চক্কর মারা। জমিদারদের হাতি স্নান করতে এলে মাহুতকে পটিয়ে হাতির হাওদাহীন পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানো। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে বারবাড়ির মাঠের সেই অশ্বারোহণ। সুতরাং ময়মনসিংহের আকর্ষণ দুর্বার।

লব কী করত তা বলতে পারি না। বোধহয় জমিদারবাড়িতে কিছু একটা কাজে নিযুক্ত ছিল সে। তার মাথায় প্রায় সবসময় একটা গামছা পাগড়ির মতো করে বাঁধা থাকত। হাতে কখনও একটি ঝুড়ি নিয়ে বা একটা লাঠি নিয়ে বা মাথায় এক বোঝা ঘাসপাতা নিয়ে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোথায় যেন যেত বা আসত।

দাদু তাঁর ডেক চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছেন। আমি তাঁর চেয়ারের হাতলে নিয়মমতো বসে তাঁকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করছি। ঠিক সেই সময়ে লব এসে দাঁড়াল উঠোনে। হেঁটো ধুতি, গায়ে ময়লা গেঞ্জি। ভয়ে আমি দাদুর কোলে নেমে বসলাম।

দাদুর সঙ্গে লব কী কথা বলছিল জানি না। তবে সে উঠোনে উবু হয়ে বসেছিল, হাতজোড় করা।

এই বয়সে আমি মানুষের কাঁধে চড়তে খুব ভালবাসতাম। আমার জ্যেঠতুতো দাদারা এবং বাড়ির চাকর-ঠাকুর প্রায়ই আমাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরত। কিন্তু সবসময় চাপবার মতো কাঁধ পাওয়া যেত না।

দাদুই বোধহয় লবকে বললেন, আমার নাতিটারে কাঁন্দে লইয়া নদীর পার থিক্যা ঘুরাইয়া আনতো।

সেইদিন লবের লম্বমান ঠোঁটে প্রথম হাসি দেখলাম। আর আশ্চর্য, সেই হাসিতেই মুখটা ভারী অন্যরকম দেখাল।

লব যখন হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসো খোকা।' তখন আর আমার ভয় করল না। লবের শক্তিমান কাঁধে চেপে সেদিন মহানন্দে খানিক ঘুরে বেড়ালাম।

এরপর থেকে লব আমাকে কাঁধে নিয়ে প্রায়ই ঘুরিয়ে আনত। তার বাঁকা ঠোঁটের কথা আর আমার মনেই থাকত না, অদ্ভুত বলেও মনে হত না।

অঙ্ক ক্লাসের চার্লি চ্যাপলিন

স্যারদের খ্যাপানোর নাম দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বহু পুরানো ট্রাডিশন। তবে সব স্যর নন, যাঁরা একটু ব্যতিকগ্রস্ত, রাগী বা গম্ভীর, বা যাঁদের কোনও মুদ্রাদোষ আছে, তাঁদেরই আদর করে নাম দেওয়া হয়। আর এই নাম এক বার দেওয়া হলে সেই নাম বছরের পর বছর পরম্পরায় চলতে থাকে, আর বদলায় না। নাম দেওয়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অদ্ভুত উদ্ভাবনী বুদ্ধিরও পরিচয় থাকে।

যখন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি হয়েছিলাম, তখন আমি সদ্য-কিশোর। থাকতাম স্কুলচত্বরের মধ্যেই হোস্টেলে। আর একটু কম বয়সে আমি যে প্রচণ্ড দুষ্টু ছিলাম, সেই দুষ্টুমি তখন অনেকটাই প্রশমিত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, দুষ্টুমি আমাকে পুরোপুরি কখনও ছেড়ে যায়নি। তার কিছু রেশ এখনও আমার মধ্যে আছে।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কিছু দিন মুখচোরা ভাবটা ছিল। তার পরই আমি স্বমূর্তিতে প্রকাশ হলাম। তবে আমার দুষ্টুমি তখন খেলার মাঠে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবলে যত অনুরাগ, লেখাপড়ায় তার কণামাত্র নয়। তবু পরীক্ষার আগে মাসখানেক পড়লেই অঙ্ক বাদে অন্য বিষয়ে ভদ্রস্থ নম্বর পেয়ে যেতাম। অঙ্ক চল্লিশের ঘরের বেশি এগোত না।

আমাদের ইতিহাসের বসন্তবাবুকে ছেলেরা বলত গোরিলা স্যার। খুবই অন্যায্য নাম। কারণ বসন্তবাবু রোগা, লম্বা ফরসা মানুষ। গোরিলার সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। কিন্তু অঙ্কের স্যর কালীবাবুর নাম চার্লি অনেকটা যথাযথ। কালীবাবু নাতিদীর্ঘ, কালো, চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ। কিন্তু তাঁকে দেখে হাসি পেত না মোটেই। অঙ্ক-পাগল মানুষ ছিলেন। ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক লিখতে শুরু করতেন। রাগী বা রগচটা নন, কিন্তু খুব সিরিয়াস।

যখন হোস্টেলে থাকতাম, তখন ঘরে পরার জন্য হাওয়াই চটি আবিষ্কার হয়নি। আর আমাদেরও চটি কেনার মতো পয়সার জোর ছিল না। আমরা সবাই তখন সস্তার খড়ম কিনে ঘরে পরতাম। স্ট্র্যাপ লাগানো খড়ম দিব্যি জিনিস। লয়-ক্ষয় নেই, বহু দিন পরা যেত। দোষের মধ্যে একটু খটাং খটাং শব্দ হত। স্কুলচত্বরে থাকতাম বলেই ক্লাসে যেতাম একদম শেষ মুহূর্তে এবং ঘরে পরার খড়ম পায়ে দিয়েই। ধরা পড়লে অবশ্য মুশকিল ছিল।

সেদিন প্রথমেই কালীবাবুর ক্লাস। উনি ক্লাসে এসে সবে ঢুকেছেন, হঠাৎ কেন কে জানে, আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধির উদয় হল। আমি হঠাৎ পায়ের খড়ম-জোড়া দিয়ে খটাখট খটাখট কয়েক বার শব্দ করলাম।

এই বেআদবিতে কালীবাবু ভীষণ চটে গিয়ে 'কে শব্দ করল? কে খড়ম পরে এসেছে?' বলে উত্তেজিতভাবে পোডিয়াম থেকে নেমে এলেন। আমার ঠিক পিছনেই বসেছিল সুকুমার। সে আমাকে বাঁচানোর জন্য চট করে নিচু হয়ে আমার খড়মদুটো পা থেকে খুলে নিয়ে দরজা দিয়ে ছুড়ে স্কুলের মাঠে ফেলে দিল।

ধরা পড়ল চিন্ময়। সে হোস্টেলে থাকত না, কী কুক্ষণে সেদিন ভুল করে খড়ম পরে চলে এসেছিল! সে যত বোঝানোর চেষ্টা করে, শব্দটা করেনি, কালীবাবু ততই রেগে যান। কেসটা হেডস্যারের কাছে যাওয়ার উপক্রম। আর হেডস্যার হলেন স্কুলের হৃৎকম্প।

ব্যাপারটা কাপুরুষোচিত হয়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে কবুল করলাম, আমিই অপরাধী। কিন্তু কালীবাবু আমার খালি পা দেখে কথাটা বিশ্বাস করলেন না। ঘটনাটা বিস্তারিত বলার পর রাগে আত্মহারা কালীবাবু কী করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। খানিক পায়চারি করলেন, চক-ডাস্টার ছুড়ে ফেললেন, পোডিয়ামে বার কয়েক উঠলেন নামলেন। হুবহু চার্লি চ্যাপলিনের মতোই লাগছিল তাঁকে। অবশেষে অসহায় রাগে যে শাস্তিটা ঘোষণা করলেন তাও বড়ো করুণ। বললেন, খুব সাবধান! এর পর থেকে তোমার ওপর স্পেশাল নজর রাখা হবে।

টেস্ট পরীক্ষার অঙ্কে যথারীতি খুব খারাপ নম্বর। খেলাধুলায় ভালো ছিলাম বলে হেডস্যর সতীশ ভৌমিকের নেকনজরে ছিলাম। মার্কশিট দেখে আমাকে ডেকে থমথমে মুখে বললেন ফাইনালে এরকম নম্বর পেলে আগাপাছতলা বেত খাওয়ার জন্য তৈরি থাকিস। বাড়িতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বাবাকে যমের মতো ভয় পেতাম। গম্ভীর মুখে বললেন, হোস্টেলে গিয়া তো দেখি পাখনা গজাইছে।

বিপদ বুঝে একদিন কালীবাবুর কাছে গিয়ে মিনমিন করে বললাম, স্যর, আমাকে পড়াবেন? আমাকে দেখে মোটেই খুশি হলেন না তিনি। একটু যেন সচকিত হয়ে বললেন, ওঃ তুমি?

খুশি না হলেও পড়াতে রাজি হলেন। তিনি স্কুলের পর ক্লাসরুমেই একসঙ্গে কয়েক জনকে পড়াতেন। শুধু অঙ্ক। আমরা যে-যার হ্যারিকেন নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে অঙ্ক কষতাম। আর বলতে নেই, জীবনে সেই প্রথম বোধহয় অঙ্ক ব্যাপারটাকে আমি খানিকটা আস্বাদন করতে শুরু করি। বিশেষ করে অ্যালজেব্রা। তার ভিতরে যে মজাটা আছে কালীবাবু অত্যন্ত সহজে সেটা ধরিয়ে দিলেন। আর এমন তন্ময় হয়ে পড়াতেন এবং পড়াতে পড়াতে আবেগে উত্তেজিত হয়ে মাঝে মাঝে এমনভাবে কথার খেই হারিয়ে ফেলতেন যে আমার লোকটাকে দেখে অবাক লাগত। অঙ্কের মদিরা আকণ্ঠ পান করা একজন মানুষ। তিনি কাউকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য পড়াতেন না। ওসব তাঁর মাথাতেই ছিল না। তিনি শুধু অঙ্কের রূপকথার রাজ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

মাত্র মাস দুই তাঁর কাছে অঙ্ক শিখেছিলাম। আর তাতেই স্কুল ফাইনালের চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমার অঙ্কের নম্বর অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সামান্য বেতনের একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন বটে, তেমন সফল কোনো মানুষও নন। তবু কালীবাবুকে আমার একজন ক্ষণজন্মা মানুষ বলে মনে হয়। তাঁর জন্যই অঙ্ককে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।

খেলার নেশা

আমার সাত বছর বয়সের জন্মদিনে কেউ আমাকে একখানা ক্রিকেট ব্যাট, একটা ডিউস বল আর চারখানা স্টাম্প উপহার দিয়েছিলেন। বলতে গেলে একখানা সেট। এত কিছু একসঙ্গে আমরা পেতাম না। একটা লাট্টুর পয়সা আদায় করতে কিংবা তুচ্ছ মার্বেল জোগাড় করতে বিস্তর ঘ্যান ঘ্যান করতে হত। মজুরিতে পোষাত না। তা এই ক্রিকেট সেট পেয়ে প্রায় সম্মোহিত বিস্ময়ে এই জীবনের সুখ ভোগ করেছিলাম। সেই ব্যাটেই খেলা শুরু। আনতাবড়ি খেলা নয়, রীতিমতো ব্যাকরণসম্মত খেলা। কারণ আমার বাবা চমৎকার খেলতেন ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ফুটবল। স্ট্যান্স নেওয়া, বল করার কায়দা খানিকটা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। এই আশির কাছাকাছি বয়সেও আমার পিতৃদেব খেলায় যথেষ্ট আগ্রহী। একমনে খেলার রিলে শোনেন, বাজারের রাস্তায় যেতে যেতে খেলা হচ্ছে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়েন। সুতরাং খেলাধুলোর একটা উত্তরাধিকার আমাতে বর্তেছিল। বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সুতরাং রে রে করে ভবিষ্যতের টেস্ট খেলোয়াড় হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগা গেল।

এবড়ো-খেবড়ো জমিতে খেলা। অসমান বাউন্সে বল লাফিয়ে উঠে কপাল ফাটাল, নাক থেঁতো করে দিল, কানের পেছনে ছোবল মেরে সুপুরি তুলে দিয়ে গেল, কনুই, হাঁটু জখম হল কতবার। কে ওসবের তোয়াক্কা করে? ওই অসমান বাউন্স নিয়েই খেলা সড়গড় হয়ে যেতে লাগল। চোখ এবং রিফ্লেক্স তৈরি হতে লাগল। তখন টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে এত মাতামাতি নেই, ক্রিকেটারদেরও তখন বসানো হয়নি বিগ্রহের আসনে। সেটা গ্ল্যামারের যুগ নয়। ব্র্যাডম্যান বা ওরকম কয়েকজনের নাম আমাদের জানা ছিল মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। ক্রিকেটের ধারাভাষ্য প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না, দূরদর্শন তো দূরস্থান। পত্রপত্রিকাতেও ক্রিকেটের খবরকে হাইলাইট করার রেওয়াজ হয়নি। মফস্বলে তখনও অনেকেই ধুতি পরে ক্রিকেট খেলে। কিন্তু খেলাটার মধ্যে যে মাদকতা ছিল তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। কিন্তু ক্রিকেটেই তো খেলার শেষ ছিল না। গ্রীষ্মে ফুটবল ছিল এক অনিবার্য আশ্চর্য গোলক। চামড়ার আসল বস্তুটি না জুটলে বাতাবি লেবু বা ন্যাকড়ার বলই সই। বাতাবি লেবু ভারী জিনিস, বেশ শক্ত, উঁচু শট মারা যেত না, বাউন্স ছিল না। তবু ওই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে তা-ই নিয়ে পেটাপেটি করতে করতে লোহার ডাণ্ডের মতো শক্তপোক্ত হয়ে গেল পা। পরে লেস-দেওয়া বল জুটল। পাম্প দিয়ে ব্লাডারের মুখ বেঁধে তা বলের মধ্যে ঢুকিয়ে চামড়ার লেস দিয়ে বলের মুখ

বন্ধ করা ছিল বেশ একটা বিলম্বিত ঘটনা। লেস-এর জায়গায় পা লাগলে কেটে যেত চামড়া। তবু মথিত ঘাসের গন্ধ, স্বেদ ও শ্রমের ভিতরে এক শরীরী উন্মাদ আনন্দ আমাদের শৈশবকে ভরে দিত।

গাওস্কর আমার চেয়ে বছর তেরোর ছোট, পেলে চার। ফিল্মস্টারদের মতোই এঁদের বাজার। আমাদের শৈশবে ঠিক এরকম গুরুত্ব খেলোয়াড়রা কদাচিৎ পেয়েছেন। গোষ্ঠ পালের নাম শোনা ছিল বটে, কিন্তু পরে জেনেছি খ্যাতি জুটলেও ফুটবলে পেশাদারী প্রথা চালু ছিল না বলে তাঁর অর্থাগম হয়নি। ক্রিকেটে বা টেনিসেও সেটা পেশাদারদের যুগ নয়। ফলে খেলাটা ছিল সর্ব্বৈব ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা কারও বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল।

মফস্বলে আমাদের জীবন কাটত বৃহৎ জগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটে যাচ্ছে তার তরঙ্গ আমাদের কাছে পৌঁছত না। খুব বড় বড় বা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ছাড়া। যেমন আমরা ছেলেবেলায় একজনের নাম জানতাম, কিংবদন্তীর মতো। তিনি জো লুই। বক্সিং ব্যাপারটা আমাদের কাছে ঘুঁষোঘুঁষি মাত্র। একটাও সত্যিকারের বক্সিং বাউট দেখিনি। তবু জানতুম, জো লুই নিপীড়িত কালো মানুষদের এক দুরন্ত প্রতিনিধি। শক্তিধর সাহেবদের ঘুঁষিয়ে একের পর এক ফেলে দিচ্ছেন। মুখে মুখে তাঁর নাম। কাগজে প্রায়ই থাকত তাঁর ছবি। আমাদের ঘুঁষোঘুঁষি খেলার অনুপ্রেরণা ওই অবিসংবাদী জো। গ্লাভসের বদলে আমরা হাতে কখনও-সখনও ন্যাকড়া বাঁধতুম, কখনও বা তাও নয়। আমার উন্নত নাসিকাটি সেই যে ভাঙল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের যে বাধা সৃষ্টি হল তা পরবর্তী দীর্ঘ সময় চলেছিল। অবশেষে বিলাত প্রত্যাগত এক আত্মীয় ডাক্তার জোর করে কয়েক বছর আগে আমার নাক অপারেশন করে সেইসব ভাঙা হাড় অপসারণ করেন। ঘুঁষোঘুঁষি সেই বাল্যকালেই ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু জো শরীরী মৃত্যুর পরও আশ্চর্যজনকভাবে আজও বেঁচে আছেন। জো শুধু মুষ্টিযুদ্ধ বিশারদই তো নন, জো হার-মানা মানুষদের বেঁচে থাকার অফুরান উৎস। বক্সিং-এর প্রতি আমার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আজও আমাকে রিং-এর ধারে টানে। কতদিন এস ও পি সি-তে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বক্সিং-এর অনুশীলন দেখেছি, আন্তঃরেল মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে ক্লেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে গেছি। প্যাটারসনকে বিচ্ছিরিভাবে হারিয়ে দিয়েছিল সেডনি লিস্টন। লিস্টন মানবাকারে দৈত্য, উপরন্তু ভাড়াটে গুণ্ডা। তার প্রতি আমার কোনো সমর্থন ছিল না। প্যাটারসনের প্রতি ছিল। প্যাটারসন একমাত্র হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যে চ্যাম্পিয়নশিপ হারিয়ে তা আবার ফিরে পেয়েছিল। জোহানসনের সঙ্গে তার প্রথম লড়াইয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ আমি জানি। বার কয়েক ফিলমেও দেখেছি তাদের লড়াই। সাদা মানুষদের প্রতিনিধি জোহানসনের একটি মারাত্মক লুকোনো অস্ত্র ছিল। তার ডান হাতে। খবরটা প্যাটারসনের জানা ছিল না। মুষ্টিযোদ্ধারা ডান হাত ব্যবহার করে লড়াইয়ের শেষ দিকে। প্রথমদিকে ডান হাতটি ব্যবহৃত হয় রক্ষণ কার্যে। ডান হাতে ঘুঁষি চালাতে সময়ও একটু বেশি লাগে। জোহানসন লড়াইতে নেমেছিল প্রবল জনসমর্থন নিয়ে, ছিল বিপুল অর্থের নিশ্চয়তা। প্যাটারসন হারল অপ্রত্যাশিত আক্রমণে। রকি মার্সিয়ানোর পর আবার একজন সাদা মানুষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। তাকে নিয়ে যে সাঙ্ঘাতিক নাচানাচি হয়েছিল শ্বেতকায়দের মহলে তা নজিরবিহীন। প্যাটারসন ছিল চমৎকার মুষ্টিযোদ্ধা, বিশিষ্ট ভদ্রলোকও। কালো মানুষদের জন্য—বিশেষ করে নিগ্রো অনাথ শিশুদের জন্য তার বিপুল দান ছিল। অবসর সময়ে ফ্লয়েড প্যাটারসন যেত গরিবদের বাড়িতে, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনত। এরকম একজন মানুষ হেরে গেলে আমাদের দুঃখিত হওয়ারই কথা। তবে প্যাটারসন হেরে যাওয়ার পর একটা অদ্ভুত অজুহাত দিয়েছিল। সে বলেছিল, ওর ডান হাত সম্পর্কে আমার তো জানা ছিল না। মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে অজুহাতটি হাস্যকর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধাকে সব পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি থাকতে হবে। প্রায় বছরখানেক জোহানসন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে কাটাল তোফা আরামে আর হই-চই-এর মধ্যে।

মার্কিন মুষ্টিযুদ্ধের ধারাবাহিক একটি ঐতিহ্য আছে। মার্কিনদের মতো মুষ্টিযুদ্ধে এত আঁটঘাট আর কারও তেমন অধিগত নয়। কাজেই জোহানসনকে তার ঢিলেমির খাজনা দিতে হল ফিরতি লড়াইতে। প্যাটারসন তাকে প্রায় দাঁড়াতেই দিল না। আর সেইসঙ্গে তৈরি করে দিল নতুন নজির, হারানো খেতাব ফিরে পাওয়ার।

স্বভাবতই প্যাটারসন তখন আমাদের অতি প্রিয় এক মানুষ। জো লুইয়ের পর অমন প্রতীকী চরিত্র আর কেউ মুষ্টিযুদ্ধের জগতে আসেনি। বহ্বাস্ফোর্য সহকারে সেই প্যাটারসনকেই যখন চ্যালেঞ্জ জানাল সোনি লিস্টন তখনও আমরা নিরুদ্বেগ ছিলাম। খবরের কাগজে একদিন সোনি লিস্টনের একটি ক্লোজ-আপ ছবি ছাপা হল। লড়াইয়ের আগে এক ডাক্তার লিস্টনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। লিস্টনের বিশালত্বের পটভূমিতে ডাক্তারটিকে পুতুলের মতো লাগছিল। শঙ্কিত হলাম, মাত্র ছ'ফুট লম্বা এবং প্রায় ছিপছিপে প্যাটারসন এই দানবীয় মানুষটিকে কী করে নক আউট করবে?

লড়াই শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল। প্রথম মিনিটেই প্যাটারসন ভূমিশয্যা নিল। তারপর নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে পালিয়ে গেল লজ্জায়। ফিরতি লড়াইতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

মুষ্টিযুদ্ধের যে জগৎকে শাসন করতেন জো বা প্যাটারসন তা শাসন করবে লিস্টনের মতো ভাড়াটে গুণ্ডা? এটা ভাবতেই মন ভারী খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু ওই বিশালদেহী অমিত শক্তিধর দাঙ্গাবাজকে কে ঠেকাবে? ঠিক সেই সময় কবিতার গুঞ্জন আর প্রলাপের মতো আত্মগরিমা প্রচার করতে করতে প্রায়-নাবালক এক মুষ্টিযোদ্ধা ধীরে ধীরে উঠে আসছিল সোনিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। তার নাম ক্যাসিয়াস ক্লে। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, সুঠাম কিন্তু বিকট নয় এবং কমনীয় মুখশ্রীসম্পন্ন ক্লে-কে মুষ্টিযোদ্ধা বলে ভাবাই ছিল শক্ত। কিন্তু এই কবি-মুষ্টিকের প্রতি আমাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হল তৎক্ষণাৎ। ছোকরার বয়স নেহাত কম, বাইশ-টাইশের বেশি নয়। অলিম্পিকে একটা সোনার মেডেল পেয়েছিল। পেশাদার লড়াইতে এসে বেশ কয়েকটা অঘটন ঘটিয়েছে। তা বলে লিস্টনের মতো দানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে কি?

লড়াইটা আমি পরে সিনেমায় দেখেছি। মুষ্টিযোদ্ধাকে নৃত্যশিল্পের পর্যায়ে যে নিয়ে যাওয়া যায় তা ক্লের সেই লড়াই না দেখলে বিশ্বাস হত না। দুটি নৃত্যপর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি পায়ে ভর করে ক্লে কেবল সরে সরে লিস্টনের মারাত্মক ঘুঁষিই এড়াল না, হয়ে গেল ছায়ার মতো অস্পৃশ্য, মায়ার মতো অলীক। আবার নৃত্যপর পায়ে এগিয়ে এসে কী চমৎকার আক্রমণ করতে লাগল। হতভম্ব লিস্টন অবশ্য মার খেয়ে পড়েনি সেবার। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারই নিজের হাতের লিগামেন্ট। ষষ্ঠ রাউন্ডে তাকে বসে পড়তে হয়। টেকনিক্যাল নক-আউট। লড়াই হচ্ছে আমেরিকায়, এদিকে কলকাতায় আমি আনন্দে বিহ্বল। কেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আমার এরকম সব হয়। অকারণ উত্তেজনায়, অকারণ উদ্বেগে আমি বিস্তর আন্দোলিত হই।

দ্বিতীয় অর্থাৎ ফিরতি লড়াই হল আরও চমকপ্রদ, আরও অবিশ্বাস্য। প্রথম রাউন্ডের প্রথম মিনিটে এবং প্রথম ঘুঁষিতেই ক্লে নক আউট করেছিল লিস্টনকে। ফ্যান্টম পানচ বা ভূতুড়ে ঘুঁষির কথাও সেই প্রথম শুনি। দানব লিস্টন খুব সামান্য সময়ের জন্য রাজার মুকুট পরেছিল। তারপর অপ্রতিহত সম্রাট হয়ে বসল ক্লে। বক্সিং-এ এমন বর্ণময় চরিত্র আর আসেনি। সারা পৃথিবীর ক্রীড়াজগতেও আসেনি এমন ধারাবাহিক বিস্ময়। এমন বাকযোদ্ধা লোকও দুটি হয় না। বক্সিং লড়তে লড়তেও কথা বলত ক্লে। কথাই ছিল তার প্রেরণার উৎস। কেন নর্টনের কাছে ক্লে একবার হেরেছিল। শুধু পরাজয়ই নয়। তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ক্লে নতুন নাম নিয়েছে মহম্মদ আলি। তার পূর্বাশ্রমের নামে কেউ উল্লেখ করলে যে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়। নর্টন ইচ্ছে করেই লড়াইয়ের পর বারবার আলিকে মিস্টার ক্লে বলে উল্লেখ করেছিল। ঘটনাটা মনে রেখেছিল আলি। ফিরতি লড়াইয়ের সময় নর্টনকে ঘুঁষিতে ঘুঁষিতে জর্জরিত করতে করতে সে বারবার প্রশ্ন করেছিল, বলো তো আমার নাম কী!

আলির সবচেয়ে বিস্ময়কর জয় জর্জ ফোরম্যানের বিরুদ্ধে। ফোরম্যান এমনই এক জোরালো মুষ্টিযোদ্ধা যাকে অদূর ভবিষ্যতে কেউ হারাতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন না। উল্কার মতোই তার আবির্ভাব। আর তখন আলির কী অবস্থা! বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে যায়নি বলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার খপ্পড়ে পড়ে মুষ্টিযুদ্ধ গেছে, বউ বিচ্ছেদের মামলায় টাকাপয়সা শুষে নিয়েছে, সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু নেই। কয়েকটি বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আলির কেটেছে তীব্র হতাশার অন্ধকারে। সেই সুযোগে তার চেয়ে যোগ্যতায় খাটো মুষ্টিযোদ্ধারা তার পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। এই কয়েকটা বছর যদি আলির জীবন থেকে কেড়ে না নেওয়া হত তাহলে আলিই হয়তো বক্সিং-এর ইতিহাস নতুন করে রচনা করতে পারত। তবু সেই ভাঙাচোরা আলি যখন আফ্রিকার জায়রেতে ফোরম্যানের মুখোমুখি হল তখন সৃষ্টি হল আর একটি ধ্রুপদী লড়াইয়ের ইতিহাস। রিং-এর দড়িতে পিঠ রেখে ঝুল খেয়ে আলি যে নতুন কৌশল দেখাল তার নাম সে নিজেই দিয়েছিল রোপ এ ডোপ। ফোরম্যান তার মারাত্মক ঘুঁষিগুলো জমাতেই পারল না। দড়িতে পিঠ দিয়ে সেটিকে স্প্রিং-এর মতো ব্যবহার করে আলি এড়িয়ে গেল ফোরম্যানের মার, কিন্তু তা বলে সে উল্টে মারতে ছাড়েনি। তার সেই আচমকা পাল্টা মার ধীরে ধীরে বক্সিং চেতাবনীকারদের সমস্ত ছক উল্টে দিয়ে অপরাজেয় ফোরম্যানকে ধরাশায়ী করল সপ্তম রাউন্ডে। আর এই লড়াই নিয়ে অসামান্য একখানা রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসোপম বই লিখলেন নরম্যান মেইলার—দি ফাইট।

এই তো সেদিন সোল অলিম্পিক থেকে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, এমনকি সুরিনামের মতো ছোট্ট দেশও এক-আধটা পদক নিয়ে গেল। পদক নিয়ে গেল অনুন্নত আফ্রিকার মানুষও। ভারত বসে থেকে এল দর্শকের আসনে—হাস্যকর রকমের ব্যর্থতা নিয়ে। অথচ প্রতিটি অ্যাথলিটের পিছনে রাজকীয় খরচ বহন করা হয়েছে, বিদেশে প্রশিক্ষণেও বাধা দেওয়া হয়নি। তবে হলটা কী?

কী হল তা যে আমিও জানি এমন নয়। তবে মনে হয়, এদেশে উন্নতমানের খেলাধুলোর ঐতিহ্যই তেমন নেই। মনে আছে, একসময়ে ছেলেবেলায়ে আমরা হাই জাম্প, লং জাম্প আর পোলভল্ট করতাম। কেউ শেখায়নি। মাটি কুপিয়ে বাঁশের পোস্ট গেড়ে কঞ্চি দিয়ে 'বার' তৈরি করে আমরা হাই জাম্প আর শুকনো বাঁশ দিয়ে পোল বানিয়ে ভল্ট দিতাম। সাত-আট ফুট ভল্ট দিয়ে যখন নীচে পড়তাম তখন ইমপ্যাক্ট পা কোমর ঝিনঝিন করে উঠত। বেকায়দায় পড়লে হাত-পা ভাঙা বিচিত্র ছিল না। তবু কোপানো মাটিই ছিল আমাদের ল্যান্ডিং কুশন। হাই জাম্পে আজকাল রিভার্স অ্যাকশন দেখতে পাই, শরীর উল্টে মাথা আর কাঁধের ওপর ল্যান্ড করা। কোপানো মাটিতে ওই অ্যাকশন মানে ঝটিতি মৃত্যু। এমনকি 'বার'-এর সমান্তরালে শরীরকে তুলে রোল করে পড়ার যে তৎকালীন আধুনিক পদ্ধতি ছিল তাও কোপানো মাটিতে বিপজ্জনক। তবু আমাদের চেষ্টা ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেই চেষ্টায় খুব বেশি এগোনো অসম্ভব।

আমরা যেটুকু অ্যাথলেটিক্স করতুম তাও আমাদের অভিভাবকদের বিশেষ সায়ও ছিল না তাতে নাকি পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। আমরা সাঁতার শিখেছি নিজের চেষ্টায়, পুকুরে এবং নদীতে। কেউ শেখায়নি ক্রল কাকে বলে। ফ্রি স্টাইল, বাটারফ্লাই, ব্যাকস্ট্রোক ইত্যাদির নামই শুনিনি। আমাদের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে যাদের খেলাধুলোর প্রতিভা ছিল তাদের বিশেষ কোনও সমাদর ছিল না। এই মনোভাব অবশ্য এখন অনেক পাল্টে গেছে। চলেই গেছে বলা যায়। এখনকার অনেক মা-বাবা ছেলেদের খেলাধুলোয় আগ্রহী। মেয়েদেরও ক্রীড়ামনস্কতা বেড়েছে। আমি লেক-এর খুব কাছাকাছি থাকি। রোজই সকাল ও বিকেলে আমি বহু ছেলেমেয়েকে অক্লান্ত দৌড়াতে দেখি লেক-এর ধারে। বেশ লাগে। এই ক্রীড়ামনস্কতা প্রত্যেকের ভিতরেই যদি কিছুটা থাকত তাহলে বাঙালীর তথা ভারতীয়দের চেহারায় মেদ বা অবাঞ্ছিত রুগ্নতার সঞ্চার ঘটত না। ছিপছিপে অথচ জোরালো চেহারার মানুষ আজকাল চোখেই পড়ে না। আজকাল আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের বেশ একটু কদর হয়েছে। আর এই কদরের পুরোপুরি অপব্যবহার করে খেলোয়াড়রাই।

একটু ব্যাট চালাতে পারে বা ফুটবলে মোটামুটি লাথি মারতে পারে এমনধারা ছেলেছোকরার ডাঁট দেখলে গা রী-রী করে। একসময়ে যখন স্কুল মাস্টারি করতুম তখন আমার ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উঠতি খেলোয়াড় ছিল। পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব বিখ্যাত খেলোয়াড় হয়েছে। লক্ষ্য করতুম, খেলোয়াড় হয়েই তারা সবসময়ে সচেতন থাকছে অন্যেরা তাকে লক্ষ্য করছে কি না, মেয়েরা মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে কি না, পাঁচজনে খাতির করছে কিনা। বিনয়, নম্রতা, শ্রদ্ধাবোধ ব্যাপারটার খামতিই লক্ষ্য করেছি তাদের মধ্যে। সকলের সম্পর্কে একথা অবশ্যই বলছি না। কিন্তু বেশিরভাগেরই এই ব্যাপারটা ছিল। আমার এক উঠতি ক্রিকেটার ছাত্র বয়স্ক শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইয়ের সামনেই দিব্যি ডাঁটে সিগারেট খেয়েছিল। সেটা দেখে আমি সেই বয়স্ক মাস্টারমশাইকে বলেছিলুম, আপনি এ ঘটনায় দুঃখ পাচ্ছেন কেন, এ ছোকরার বারোটা বেজে গেছে। এ আর বড় খেলোয়াড় জীবনেও হবে না। হয়ওনি সে। অল্প বয়সে একটু-আধটু নাম করে ফেলেই মদ-মেয়েমানুষ করে বখে গিয়েছিল। এই বখে যাওয়ার ঘটনা যে খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে কত ঘটে তার হিসেব নেই। বাংলার একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে দেখেছি ডাঁটের চোটে ঘাড় ঘোরাতে পারত না। সম্ভাব্য টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হত তখন। সে মাঠে নামলেই হর্ষধ্বনি হত। খুব স্টাইল করে স্ট্যান্স নিত। রঞ্জিতে কয়েকবার বেশ ভালো রানও করেছিল। কিন্তু অহংকার এবং আত্মপ্রদর্শনের ঝোঁকটা বেড়ে যাওয়ায় খেলার চেয়ে কায়দাটাই বড় হয়ে দাঁড়াল তার কাছে। ক্রমে খেলা গেল, নাম-যশ গেল, বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হল সে। অথচ মনোযোগী এবং অধ্যবসায়ী হলে ছোকরার যে উন্নতি ঘটত তাতে সন্দেহ ছিল না। আমি তার ঝলমলে ব্যাটিং দেখেছি। এরকম অহংজনিত পতন আমাদের দেশে অনিবার্য। প্রথম কথা, আমাদের দেশের আবহাওয়ায় শরীরে মেদ-সঞ্চার ঠেকানো শক্ত, ফর্মও বেশিদিন ধরে রাখা কঠিন। তাই এদেশে বড় খেলোয়াড় হতে হলে আয়াসও অনেক বেশি দরকার। দরকার সংযত আত্মগত সাধনারও। ফ্যানদের মাতামাতি বা নারীর সপ্রসংশ কটাক্ষে ঘায়েল হলে আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। আমাদের দেশে ক'জন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড় নিয়মিত সুনির্দিষ্ট ব্যায়াম বা জিমনাস্টিকস করেন তাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। ফিটনেসের নিদারুণ ঘাটতি এবং রুটিনবদ্ধ জীবনযাপনে অনীহা খেলোয়াড়দের সর্বনাশ করছে। আগে বড় বড় দেশগুলোতে হকি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না বলে ভারতীয়রা একসময়ে হকি-সম্রাট হতে পেরেছিল। এখন উন্নত দেশের ফিট দুরন্ত খেলোয়াড়রা হকি স্টিক ধরতেই ভারতীয় হকির দৈন্য প্রকট হয়েছে। একথা মোটেই ঠিক নয় যে, ভারতীয় হকির মান নেমে গেছে। বরং অন্য দেশগুলো হকিতে উন্নতি করেছে বলেই ভারত পাত্তা পাচ্ছে না। তার মূল সমস্যা হল ফিটনেস আর স্পিড। শুধু স্কিল দিয়ে ওই দুটি দৈন্যকে ঢেকে দেওয়া অসম্ভব। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার খেলাটি আগাগোড়া যারা দেখেছেন টিভিতে তাঁরাই জানেন, বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে তেমনি অস্ট্রেলিয়ানরা নাস্তানাবুদ করেছিল ভারতীয়দের। কারণ, দৌড়, ধাক্কা, জোর কোনওটাতেই ভারতীয়রা তাদের সমকক্ষ ছিল না।

এই একই কারণে ভারতীয় ফুটবলও আন্তর্জাতিক আসরে পাতে দেওয়ার যোগ্যও নয়। পেশাদার ক্রীড়াদক্ষতা কাকে বলে সেই ধারণাই এখনও আমাদের হয়নি। আমার একটা ভীষণ প্রিয় খেলা হল টেবিল টেনিস। এখনও কোথাও খালি টেবিল দেখলেই মেতে যাই খেলায়। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় এই টেবিল টেনিস এমনই পেয়ে বসেছিল আমাকে যে, দিনের মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা খেলেও যেন তৃপ্তি হত না। হস্টেলে থাকতুম। সেখানকার টেবিলটির বেশি দাবিদার ছিল না। সুতরাং অবাধে খেলতে পারতুম। কেউ শেখায়নি কখনও, কিন্তু নিজেরাই নানা ধরনের মার আবিষ্কার করে নিতুম। স্ম্যাশ, স্পিন, ড্রাইভ। যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন কলেজ টুর্নামেন্টে নেমে অপ্রত্যাশিতভাবে একের পর খেলোয়াড়কে হারিয়ে পৌঁছে গেলুম ফাইন্যালে। এবং ফাইন্যালে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভুতুদাকে প্রায় দাঁড়াতেই দিলুম না। সেই সুবাদে নানা

পুরস্কারের মধ্যে একটি ছিল ভিক্টর বার্নার নামাঙ্কিত ব্যাট। সেখানা এখনও আছে, যদিও রবার গলে গেছে। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছি। সেইসময়ে টেবিল টেনিসে বিশ্ব শাসন করছেন ইংল্যান্ডের জনি লীচ। কিন্তু তার পর এল জাপানীরা। তাদের হাত থেকে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিল পরবর্তীকালে চীনারা। সোয়েদলিং আর করবিলিয়ন কাপে প্রতিবারই ভারতীয়রা যোগ দেয়। আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় বিশ্বপর্যায়ে প্রথম কুড়িজনের মধ্যেও গণ্য হয়েছে বলে জানি না। ব্যাডমিন্টনে প্রকাশ পাড়ুকোন একবার অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল—কোনও ভারতীয়ের সেই একবার মাত্র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের সমপর্যায়ের কৃতিত্ব। আর কিছু নেই। দুঃখ করে ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। ক্রীড়া জগতের সমস্যা ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও কত সমস্যা রয়েছে, কোনটারই বা সমাধান হচ্ছে! তাই ওসব আমি মনে রাখি না। শীতের রোদ্দুর ডাক দিলে কখনও কখনও বেরিয়ে পড়ি। ইডেনে রঞ্জির খেলা থাকলে গিয়ে ঢুকে যাই। ফাঁকা মাঠে বসে দিব্যি মনের আনন্দে দেখি ক্রিকেট। লেক-এর ধারে আমার ছেলে সাইকেল চালায়, আমি তার পাশে পাশে দৌড়োই। আশেপাশে হবু খেলোয়াড়রা নানা মাঠে ফুটবল প্র্যাকটিস করে। দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখি। টিভিতে খেলা থাকলেই খুলে বসে যাই। খেলার নেশা এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, জরুরী কাজ পণ্ড হতে বসে। কিন্তু এই দূরারোগ্য ব্যাধি সারবারও নয়। খেলা মানেই এক আদিম অনাবিল আনন্দের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।

বলং বলং ফুটো বলং

কলকাতার লেখাপড়া জানা ঘোড়াদের সহবৎ দেখে আমি বরাবরই ভারি মুগ্ধ। একরকম তাদের বদান্যতাতেই আমার হাত পা মাথা ভাঙেনি। নইলে সবুজ গ্যালারির উন্মত্ত ও উদ্বেল ঠাসাঠাসি লাইনে দমবন্ধ করা গরমে দাঁড়িয়ে গাঁ-ঘেঁষে দণ্ডায়মান বিশালকায় ঘোড়াদের বিপজ্জনক নৈকট্য অনেক আগেই আমাকে বিবিধ বিপদে ফেলতে পারত। অভিজ্ঞরা জানেন, মাউন্টেড পুলিশের ওইসব বুদ্ধিজীবী ঘোড়ারা কখনও সওয়ারের নির্দেশ বা ইঙ্গিত ছাড়া এক ইঞ্চিও নড়ত না, একদম পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। তবে হ্যাঁ, জীবদেহ বলে কথা। তাই তাদের দোদুল্যমান লেজের ঝাপটা এসে সম্মার্জনীর মতো বহুবার লেগেছে চোখে মুখে। আর তারা মাঝে মাঝে 'ভু-রু-র-র' জাতীয় একটা শব্দ করে গা কাঁপাত। মফস্সলের ছেলে বলেই তাতে একটু উদ্বিগ্ন হতাম ঠিকই। তবে ঘোড়া সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বহু দিনের। ময়মনসিংহে আমাদের বাড়ির বারবাড়ির মাঠে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ারা চরে বেড়াত। তাদের মুখে নারকেলের দড়ির লাগাম পরিয়ে দশ-বারো বছর বয়সে আমি অশ্বচালনা করতে শিখি। তবে সেইসব ঘোড়ারা কলকাতার মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়াদের মতো এত শিক্ষিত ছিল না। তাদের চালনা করতে পেটে হাঁটুর গুঁতো এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হত। আর পাঁচটা বাঙালির মতোই তারা ছিল গেঁতো ও অলস এবং কর্মবিমুখ।

ঘোড়াদের কথা এত সাতকাহন বলছি একটাই কারণে, কলকাতার ক্রীড়াঙ্গনে মাউন্টেড পুলিশ ছিল একটি অত্যাবশক উপকরণ। ছন্দায়িত পায়ে সেইসব অতিকায় ঘোড়ারা আজও যখন চৌরঙ্গি বা রেড রোড অহংকারের সঙ্গে পার হয়ে খেলার মাঠের চৌহদ্দিতে ঢোকে আমি হাঁ করে দেখি। মহিনের ঘোড়াগুলি পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে চরে বেড়াত। ওই কিমাকার ডাইনামো ঠিক কাকে বলে তা আমি আজও জানি না বটে, কিন্তু বেয়াদপ, লাইন ভাঙা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যখন নির্দয় মাউন্টেড পুলিশ জনসাধারণের ওপর ঘোড়া লেলিয়ে দিত তখন তাদের পায়ের নীচে মনুষ্যশরীর কিমায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনা।

সেইসব ভয়-ভীতি নিয়েই আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে সবুজ গ্যালারির লাইনে এগোতাম। টিকিটের অপরিসর খাঁচার মধ্যে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হল। তারপর গ্যালারির মুক্তাঞ্চল। খোলা হাওয়া, রোদ, সবুজ

মাঠ। একটু দেখেশুনে বসতে হত। কারণ বিপক্ষ দলের সমর্থকদের মধ্যে বসে নিজের দলের হয়ে চেঁচালে হেনস্থা হওয়ার ভয় তো ছিলই, তাছাড়া কিছু চ্যাংড়া-প্যাংড়া থাকেই যাদের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য ভাষা কলের জলের মতোই অবিরল প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সব ফুটবল মাঠেই এই ধরনের কিছু দর্শক আছে বলে শুনেছি।

আমরা যখন বেশ ছোট তখন ফুটবলের ছক ছিল খুব সোজা। দুই ব্যাক, তিন হাফ ব্যাক, পাঁচ ফরোয়ার্ড। এই ছকের অর্থ আক্রমণাত্মক খেলা। কোচ-টোচ থাকত কি না জানি না। হয়তো থাকত, কিন্তু কোচের এত গুরুত্ব ছিল না। আর খেলোয়াড়দের পদশিল্পের বিশেষ মর্যাদা ছিল। পাসিং-এর চেয়ে ড্রিবলিং-এর দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। খেলোয়াড় পায়ে বল রেখে খেলত, আর তা বাহবাও পেত বেশ।

কলকাতায় আমি আসি বিএ পড়তে। তার আগে মফসসলে আমি তো কম ফুটবল দেখে আসিনি। সেই বয়সে আমি ছিলাম খেলার পোকা। ক্রিকেট, ফুটবল, হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট, দৌড়—এসবেই সর্বাধিক সমর্পিত। কেওকেটা খেলোয়াড় হব এরকমই মনোগত ইচ্ছে ছিল বলে খেলাতেই সময় কাটত বেশি। কিন্তু মফস্সলে খেলা শেখানোর লোক পাওয়া ছিল ভার। যে উঠত সে নিজের চেষ্টাতেই উঠত। কিন্তু খুব বেশি দূর উঠতে পারত না।

জলপাইগুড়িতে চল্লিশের দশকের শেষ দিকটায় দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আমাকে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সেখানেই প্রথম ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত ঐতিহাসিক টিমের খেলা দেখি। ইস্টবেঙ্গলেরই খেলোয়াড় এবং দু-চারজন স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে মিলেজুলে দুটি দল করে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। সাধারণত ফ্রেন্ডলি ম্যাচে কেউ তেমন গা ঘামিয়ে খেলে না। তবু বহুশ্রুত ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, সালেকে তো চাক্ষুষ দেখা যাবে। আমাদের তৃষিত চোখে সেই খেলা যেন মায়াঞ্জন পরিয়ে দিল। তখন কত ছেলে যে ভেঙ্কটেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখত তার ইয়ত্তা নেই।

আজ বুঝতে পারি সেই সময়ে যে ফুটবল খেলা হত তাতে ছক তেমন প্রাধান্য পেত না। খেলায় নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষাও হত না। আর খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবনযাপনেও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আহার-বিহারের বালাই ছিল না। তখনও ফুটবলে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ততটা অনুপ্রবিষ্ট হয়নি।

সামাদকে দেখি লালমণিরহাট রেল স্টেশনে। বাবার সঙ্গে সামাদের হৃদ্যতা ছিল। লালমণিরহাটে আমি আর দিদি গাড়ি বদল করতে নেমেছি, সঙ্গে এক জ্ঞাতি কাকু, সামাদ আমাদের রিসিভ করেছিলেন। তখন মধ্যরাত, ঘুম জড়ানো চোখে সুপুরুষ ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে শুধু মনে হয়েছিল, ইনিই সামাদ! তাঁর খেলা দেখিনি, কিন্তু নামটা তো বাঙালির ঘরে ঘরে। সেই একজন মস্ত খেলেয়াড়কে প্রথম চাক্ষুষ করা আমার। তারপর ওই ইস্টবেঙ্গল টিমের খেলায় অত জনকে একসঙ্গে দেখা।

খেলাধুলোর প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল আগ্রাসী। আমার বাবা ছিলেন একজন বর্ণময় ক্রীড়াবিদ। হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস সবই খেলতেন। নামটাম করেননি, কিন্তু খেলার প্রতি তাঁর যে গভীর আকর্ষণ ছিল সেটাই বোধহয় আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাই। আমার সেই বালক বয়সেই আমি দুনিয়ার সবরকম খেলারই খবর রাখতাম। আমার বয়সি ছেলেরা তখন ফুটবলের বাইরে আর অন্য সব খেলার খবর রাখত না বড় একটা। এমনকী আমি খবরের কাগজে বক্সিং-এর খবরও খুঁটিয়ে পড়তাম। আমি যখন সিক্স কি সেভেনে পড়ি তখন জো বডকক আর লি শ্যাভোন্ডের মধ্যে একটা উত্তেজক লড়াই হয়েছিল, দেখেছি বন্ধুরা কেউ সেই খবর জানত না।

কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে যখন পড়ি তখন দেখতাম সেই শহরে খেলাধুলোর চর্চাটি বেশ ব্যাপক। মহারাজা নিজে ক্রীড়াবিদ ছিলেন বলেই সেখানে বড় খেলোয়াড়দের আনাগোনা ছিল। বিশেষ করে ক্যাবলা দত্ত নামে একজন প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফির খেলোয়াড় জেঙ্কিনস স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন। দিনের পর

দিন অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি খেলোয়াড় তৈরি করার চেষ্টা করতেন। কুচবিহারের ফুটবলও ছিল উঁচু মানেরই। অন্তত-দু-তিনজন এখান থেকে কলকাতায় মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন।

কিন্তু মফস্সল এগোতে পারে না পরিকাঠামোর অভাবে। মফস্সলে একটি মসৃণ মাঠ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোচ-টোচ বিশেষ কেউ থাকেন না। খেলোয়াড়দের চোট হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া কঠিন। প্রায়ই দেখেছি, হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা গোগ্রাসে পাঁউরুটি মাংস খায়। এবং যথারীতি পরে অম্বলে ভোগে। তাছাড়া সংসারের তাড়না, পয়সার অভাব, চাকরির অপ্রতুলতা—সব মিলিয়ে পরিবেশটাই খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার উপযোগী নয়। প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু কোনও প্রতিভাই প্রশিক্ষণ ছাড়া বিকাশ লাভ করতে পারে না।

সবুজ গ্যালারির কথায় ফিরে আসি। ময়দানের ঘেরা মাঠ ছিল ছোট, তাতে ফুটবল-পাগলদের তেমন আঁটত না।
র‍্যামপার্টের খোলা দিকটায় তখন অগুনতি মাথা দেখা যেত। অনেকে পেরিসকোপ চোখে লাগিয়েও দেখত। সেই ভিড় ও উন্মাদনার জ্বরটা আমাদের তপ্ত করে রাখত। প্লেয়ার নামলে যে গর্জনটা শোনা যেত তা বাস্তবিকই ছিল গগনভেদী।

কীরকম ফুটবল দেখতাম আমরা তখন? বাল্যাবস্থার ছক পাল্টে তখন চালু হয়েছে তিন ব্যাকপ্রথা। ফরোয়ার্ড পাঁচজন নয়, চারজন। একজনকে বলা হত উইথড্রন সেন্টার ফরোয়ার্ড। এসবের মর্ম অবশ্য কিছুই বোঝা যেত না। সাদাসাপটা দৌড়, ড্রিবলিং, সেন্টার এবং গোল করার চেষ্টা। এটাই বুঝতে পারা যেত। খেলা শুরু হলে শেখানো ছক কোথায় উড়ে যেত কে জানে! তখনও কোচের রবরবা শুরু হয়নি। আধুনিক ফুটবল বলতে আজ দুনিয়ার লোক যা বোঝে তা তখনও কলকাতার মাঠে দেখা যেত না। কিন্তু দল সমর্থনের উন্মাদনায় ফুটবলের হুটোপাটিটাই তখন মুখ্য ছিল।

কিন্তু কিছু পরে ফুটবলের ধারায় কিছু শৃঙ্খলার সঞ্চার ঘটেছিল। একটু একটু করে আন্তজার্তিক ফুটবলের কায়দাকানুন অনুপ্রবেশ করছিল বাংলার ফুটবলে। চুনী, বলরাম, পি. কে, অসীম সোম, দীনু দাস, সুকুমার সমাজপতিরা আমাদের যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে। কিছু আগে আর একজন বেঁটে খেলোয়াড় কলকাতাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মেওয়ালাল।

কলকাতার খেলাপাগল মানুষ যে ফুটবলের বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাত তা মনে হয় না। তাদের উৎসাহের মূলে ছিল দলগত সমর্থন। আর সেটাই ফুটবল মাঠে মাদকের মতো কাজ করত। দল ভালো খেলল কি না সেটা বড় কথা ছিল না, জিতলেই হল।

মনে আছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের একটি উত্তেজক ম্যাচে খেলার শুরুতেই মাত্র সাতাশ সেকেন্ডের মধ্যে মোহনবাগানের আকবর একটি গোল দিয়েছিল এবং সেই গোলেই ম্যাচের ফয়সালা হয়। প্রায় মধ্যমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে গোলটা করেছিল হাবিবের ভাই আকবর। তবু আমি ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের বলতে শুনেছি, গোলটা হয়েছে অফসাইড থেকে। অনেক সময়েই অযৌক্তিক আবেগ বোধবুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচক্ষণতাকে আবিল করে দিয়েছে।

এই সমর্থকপুষ্ট এবং সমর্থনশক্তিই ছিল কলকাতার দলগুলির নিয়ামক শক্তি। আমি অনেকদিন ধরে কলকাতার ফুটবলের মাঠে নিয়মিত গেছি। কিন্তু খুবই তিক্ততার সঙ্গে লক্ষ করেছি চুনী-পি.কে-বলরামদের আমল থেকে ফুটবল-নৈপুণ্যের ক্রমাবনতিই হচ্ছিল। গতি কমছে, আধিপত্যে ভাঁটা পড়ছে। ক্রমাগত উইং থেকে সেন্টার করে গেছে ফুটবলাররা বা পিছন থেকে সামনে লব করে দিয়েছে, যদি কোনও সুযোগসন্ধানী দলীয় ফরোয়ার্ডের পায়ে পড়ে। এ যেন পাসের গায়ে টু হুম ইট মে কনসার্ন লিখে পাঠানো। প্রকরণ নেই, খেলা তৈরি করার আগ্রহ নেই, শুধু যেন-তেন প্রকারেণ একটা-দুটো গোল দিতে পারলেই হল। তখনও

মাঝে মাঝে বিদেশি দল খেলতে আসত। তেমন আহামরি দল তো তারা নয়। তবু তারা অনায়াসে আমাদের সেরা দলগুলোকে চার-পাঁচ গোল দিত বেশি গা না ঘামিয়েই। বোধহয় অপমান করতে চাইত না বলেই, নিজেদের মধ্যে পাস খেলে শেষ দিকে সময় কাটিয়ে দিত। তবে সবটা সব সময়ে একতরফা হয়নি। কখনও কখনও এক আধটা বিদেশি দলের বিরুদ্ধে কোনও কোনও দিশি দল ভালোই লড়াই দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল একবার কোনও একটি দলের সঙ্গে ম্যাচ ড্র রেখেছিল। দিশি খেলোয়াড়দের কারও কারও ব্যক্তিগত দক্ষতা ছিল খুবই ভালো। কিন্তু খেলাটা তো দলগত।

সুরজিৎ সেনগুপ্তের কথাই ধরা যাক। এরকম কুশলী বলপ্লেয়ার কলকাতার মাঠে খুব কমই এসেছে। মাঠে পাতলা চেহারার এই ছেলেটির গতিও ছিল ভালো। একটি বিদেশি টিমের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে দেখেছিলাম সুরজিৎ একাই চার-পাঁচজন দুঁদে খেলোয়াড়কে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। খুবই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। আমরা খুশি হয়ে যথোচিত উল্লাসও প্রকাশ করেছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সুরজিতের একার ওই প্রচেষ্টা তার পায়েই মাথা খুঁড়ে মরল। কারণ ওই ভূতুড়ে ড্রিবলিং-এর পর কী হবে, কোন ছক বা পরিকল্পনায় খেলার রাশ নিতে হবে তা যে কারওই জানা ছিল না।

তখন ফুটবল মাঠে গেলেই আমার মনে হত, এক-আধজন খেলছে, গোটা দলটা খেলেছে না। আরও মনে হত মফস্সলে আমরা যে ফুটবল দেখেছি বা খেলেছি তার চেয়ে কি কলকাতার এইসব নামী দলের খেলার তেমন কিছু ইতরবিশেষ আছে?

ভয়াবহ আরও একটা জিনিস দেখতাম। অনেক সময়ে ভবানীপুর, কালীঘাট, উয়াড়ি বা স্পোর্টিং ইউনিয়নের মতো টিমও বড় ক্লাবগুলোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ত। কিন্তু শেষ অবধি তারা ম্যাচ জিতত না। তার কারণ বোধহয় বড় টিমকে হারালে সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছনার ভয়। একবার দেখেছি, ইস্টার্ন রেল একটি বড় দলকে সারাক্ষণ চেপে রইল। গোল হয়-হয় অবস্থা। রেলের বিরলকেশ ছিপছিপে একটি খেলোয়াড়—তার নাম দীনু দাস—একাই রক্ষণভাগ ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছিল। নির্ঘাৎ হারা ম্যাচটাও শেষ অবধি বড় দলটিই জিতল, খানিকটা কিংবা অনেকটাই রেলের রক্ষণভাগের বদান্যতায়। মাঠে বসেই শুনছিলাম, দীনু নাকি ওই বড় দলটিকে কখনওই গোল দেয় না। যেমন পি. কে দিত না মোহনবাগানকে বা চুনী ইস্টবেঙ্গলকে। এসব হয়তো মাঠের গুজবই হবে।

আসল কথা হল, কলকাতার তিন বড় দল ফুটবলের উন্মাদনার ফসল যত তুলেছে তত ফুটবলের মান উন্নয়নে মন দেয়নি। সেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, সেই ভালো খেলেয়াড় তুলে এনে দল গঠন করা এবং অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করে থাকা। স্থানীয় ফুটবলে কোনওক্রমে আধিপত্য বজায় রাখার কূপমণ্ডুকতাতেই তাঁরা আচ্ছন্ন ছিলেন। নামকাওয়াস্তে একজন কোচ বা ফিজিও থাকতেন বটে, কিন্তু তাঁদের তেমন কোনও ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল বোধহয় ষাটের দশকের শেষে বা সত্তরের গোড়ায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচ অমল দত্ত যখন কলকে পেলেন। তারপর পি. কে-এবং অন্যান্য কোচদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল এবং তাঁদের ভূমিকা যথোচিত গুরুত্বও পেল।

কলকাতার দর্শকরা কিছু অদ্ভুত। প্রিয় দল জিতলেই তারা খুশি, জঘন্য খেললেও। কিন্তু এই খুশির ভাগ নিতে পারতাম না আমি। মাঠে যেতাম বটে, কিন্তু ফিরতাম বিরক্তি নিয়েই, এমনকী আমার প্রিয় দল জিতলেও। কেবলই মনে হত, এ বড় নাবালক ফুটবল দেখছি। যত বয়স বেড়েছে ততই এরকম বিরক্তিও বেড়েছে।

তবু বলব একেবারে কিছুই যে পাইনি তা নয়। যেমন রাম বাহাদুর। মোটা মোটা থামের মতো দু'খানা পা নিয়ে কী দারুণ খেলত। বিপক্ষের লোক তাকে কাটাতে পারত কমই। পরে রাম বাহাদুর আরও মোটা হয়ে

যায় এবং ভুঁড়ি-টুঁড়ি নিয়েও যখন তাকে খেলতে দেখেছি তখনও তার তীক্ষ্ন অনুমানশক্তি এবং বুদ্ধিনির্ভর খেলা বেশ লাগত। কিংবা বলরাম, ওরকম বাজপাখির মতো আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় ছিল বিরল।

কিংবা আমেদ। খুব বুদ্ধি দিয়ে খেলত। কিংবা ফাকরি।

মনে আছে বার্মা থেকে নুর নামে একজন খেলোয়াড় এল সিজনের মাঝামাঝি। কলকাতায় তখন লিগ চলছে। ইস্টবেঙ্গল নুরকে নামিয়ে দিল মোহনবাগানের সঙ্গে ম্যাচে এবং সেটাই নুরের প্রথম খেলা। তার গোলে ইস্টবেঙ্গল জিতে যাওয়ায় তাকে নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গেল। ওই ম্যাচের কিছু দিন পরেই নুরের সঙ্গে আমার ঘটনাক্রমে পরিচয় হয়। কথায় কথায় সে অবাক হয়ে ইংরেজিতে বলেছিল, সাপোর্টারেরা এত চেঁচামেচি করছে কেন বল তো? ইস্টবেঙ্গল কি মোহনবাগানকে এই প্রথম গোল দিল?

আদেখলেপনা এবং আবেগ এবং ব্যক্তিপূজা ফুটবলকে আবিলই করেছে, সমৃদ্ধ করেনি মোটেই।

ময়দানে যাদের খেলা আমার আজও চোখে লেগে আছে তাদের মধ্যে একজন ছিল নাটকা, বাঘা সোমের ছেলে অসীম সোম। রেল দলে খেলত। তার চমৎকার বল কন্ট্রোল আর ঝাঁঝ দেখে আমার মনে হত এ চুনী-পিকের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। ছাড়িয়েও যেতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনায় যতি টেনে দিল লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তার অকালমৃত্যু। আমার মনটা বড্ড হায়-হায় করেছিল খবরের কাগজে সংবাদটা পড়ে। ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল সীতেশ দাসও।

শৈলেন মান্নার খেলা আমি খুব কম দেখেছি। তবে জার্নেল সিংহ কিংবা অরুণ ঘোষকে ভোলা যাবে না বা ব্যোমকেশ বসুকে। এঁদের মধ্যে যে বিচ্ছুরণ ছিল তা ভালো কোচের হাতে পড়লে এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারত। তবু যে পরিস্থিতিতে এঁরা খেলেছেন যথাসাধ্যই খেলেছেন।

বর্ষাকালে কলকাতার ফুটবলের মাঠ কোনও ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। গোলা কাদা, জমা জলে যে নরক ময়দানে তৈরি হয় তাতে ফুটবলের আয়োজন নির্লজ্জ কলকাতার পক্ষেই সম্ভব। এই মাঠগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নত করে তোলার কোনও চেষ্টাই হয়নি ভারতের ফুটবল রাজধানীতে। প্রাণ হাতে করে চোট-আঘাতের শঙ্কা ও সম্ভাবনা নিয়ে তবু যে খেলোয়াড়রা এখনও কলকাতায় ফুটবল খেলেন এ তাঁদের মহত্ত্ব।

মাত্রই কয়েকদিন আগে জাপান আর কোরিয়ায় আয়োজিত বিশ্বকাপ যখন দেখছিলাম তখন ভারি অবাক হয়েছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও মসৃণ মাঠে কোথাও এক ফোঁটা জল জমছে না, বল আটকে যাচ্ছে না, খেলোয়াড়রা এঁটেল মাটিতে আছাড় খাচ্ছে না। জাপানে তো একটি ঢাকা স্টেডিয়ামের মাঠটিকে দরকারমতো স্টেডিয়াম থেকে টেনে বের করে আনা যায় এবং ফের ঢোকানো যায়। ঘটনাটি টিভি-তে দেখে নিজের দেশের পরিস্থিতির জন্য করুণা হয়েছে। আমরা অতটা চাই না, কিন্তু মাঠগুলোর ভদ্রস্থ সংস্কার তো হবে। আমাদের আমলে ঘেরা মাঠে গ্যালারি ভেঙে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও কিছু কম ঘটেনি। তাছাড়া পানীয় জল বা প্রস্রাবাগারের অভাব তো ছিলই।

আমাদের ধারণা ছিল, সবুজ গ্যালারির দর্শকরা কিছু অসংস্কৃত, বর্বর, অসভ্য। তারা খিস্তি দেয়, নানা অঙ্গভঙ্গি করে, ঢিল ছোড়ে, মারপিট করে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সদস্য গ্যালারিতে খেলা দেখতে যেতাম তখন দেখলাম সেখানেও সাংস্কৃতিক অবনমন ঘটে গেছে। যথেষ্ট খিস্তিখাস্তা এবং অশ্লীল গালিগালাজ চলছে। ইট-পাটকেলও পড়ছে মাঠে।

টিভির নাম অনেকে দিয়েছে বোকাবাক্স। টিভি জিনিসটা নাকি আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রুচিবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে—এমনতরও শোনা যায়। আজকাল টিভি-র বিরুদ্ধে অনেকেই সরব। আমি টিভি-র আকাঁড়া নিন্দে করতে রাজি নই। বরং আমার তো মনে হয়, আমার ঘরে ওই টিভি সেটটিই হল দূরের জানলা। ওই

জানলা আমার কাছে কত অজানা, অদেখা তথ্য এনে দেয়, আমাদের জীবনে যোগ করে কত নতুন মাত্রা। টিভি-র কুপ্রভাব আছে বটে কিন্তু সুপ্রভাবও তো কম নেই।

টিভি না থাকলে আধুনিক ফুটবলের সমৃদ্ধ ঝলমলে চেহারাটাও যে আমাদের অজানা, অদেখা থেকে যেত।

ইতালি, জার্মানি, লাতিন আমেরিকায় কীরকম ফুটবল খেলা হয়? তা কি একেবারে অন্য রকম একটা জাদুবিদ্যা? অজানা, অচেনা কোনও শিল্প? না, তা মোটেই নয়। খেলোয়াড়দের মৌলিক কৌশল একইরকম আছে। সেই ডজ, সেই ইনসাইড আউটসাইড। কিন্তু তফাত হয়ে গেছে আকাশপাতাল রণকৌশলে, গতিতে, নিখুঁতত্বে, ফিটনেসে, সক্ষমতায় এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে। শুনেছি কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়াড় তৈরির শিক্ষক বাঘা সোম বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বকাপ ফুটবল টিভি-তে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, এসব এত স্পিডে হচ্ছে কী করে?

খুবই তাজ্জব হয়েছিলেন তিনি। আমরাও।

ধরা যাক, কলকাতার মাঠে একজন খেলোয়াড় পঞ্চাশ গজের একটা ফ্রি কিকে গোল দিয়ে ফেলল। খুবই কৃতিত্বের ঘটনা। আবার একবার বিশ্বকাপে রোনালডিনহো ইংল্যান্ডকে ওরকমই দূরত্ব থেকে ফ্রি কিকে গোল দিয়েছিল। তফাত হল, কলকাতার খেলোয়াড়টি দশবারের মধ্যে হয়তো একবার কি দুবার গোল দেবে। রোনালডিনহো দেবে সাত-আট বার।

আমরা জানি মোহনবাগানের এ. দাশগুপ্ত লেফট আউটে বল পায়ে কীরকম হরিণের মতো দৌড়ত কিংবা ইস্টবেঙ্গলের সুকুমার সমাজপতি কীরকম ইঞ্জিন হয়ে যেত। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সেরা দৌড়বাজের চেয়েও স্টেফি গ্রাফ জোরে দৌড়োয় এবং স্টেফি গ্রাফ একজন টেনিস খেলোয়াড় মাত্র। তফাত এইখানে।

কলকাতার একটি বড় দল রাশিয়ার খেলতে গিয়েছিল। খেলার কথা থাক। সেই দলের একজন খেলোয়াড় তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, এক জায়গায় খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়দের সবাইকে জিমনাসিয়ামে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিশাল, অত্যাধুনিক জিম দেখে ভারতীয় খেলুড়েদের চোখ ছানাবড়া। অনেক যন্ত্রপাতি তারা চেনেই না। তারা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল রুশ ফুটবলাররা কি অনায়াস দক্ষতায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে জিমনাস্টিকস করে যাচ্ছে। লেভ ইয়াসিনকে দেখা গেল রিং-এ গ্রেট সার্কেল করতে। খেলোয়াড়টি বুঝেছিল তফাত কোথায় এবং কতটা।

কলকাতা বা ভারতবর্ষে ফুটবল একসময়ে ছিল গ্রীষ্মকালের খেলা। ইংল্যান্ডে বা ইউরোপেও এটা সামার স্পোর্ট। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা এটাই বুঝতে পারলেন না যে, ইংল্যান্ড ইউরোপের গ্রীষ্মকাল আর ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকাল এক নয়। তার ওপর ওরা ফুটবল খেলে রাতে, আমাদের হয় দিনে-দুপুরে। এই ভ্যাপসা বা চিংড়িপোড়া গরমে ফুটবলের মতো শ্রমসাধ্য খেলায় যে একশোভাগ দেওয়া যায় না তা এখনও কর্তব্যাক্তিরা বোঝেন না। সুতরাং এই অত্যাধুনিক আর্দ্রতাযুক্ত গরমে বা দিল্লির মতো মরু আবহাওয়ায় ফুটবলের উৎকর্ষ ঘটবার কথা নয়। আমাদের ক্ষীণস্বাস্থ্য, মাঝারি উচ্চতার, মধ্যম গতির খেলোয়াড়রা তাই বিশ্ব মানচিত্রে নেই।

ভালো ফুটবলারকে যে লম্বা-চওড়া হতেই হবে তা নয়। যত দূর জানি, পেলে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, মারাদোনা তো প্রায় বামনবীর। কাজেই আকার নয়, প্রকারটাই আসল কথা। প্রকার এবং প্রকরণ। ইচ্ছা, আন্তরিকতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিকাঠামো।

নাগা কুকি, খাসিয়া, আদিবাসীদের ভিতর থেকে ক্রীড়াজগতে কাউকে খুঁজে আনা হয় না তো। কেন হয় না কে জানে! যারা স্বাভাবিক নিয়মেই শরীরনির্ভর তাদের ভিতর কষ্টসহিষ্ণু, ব্যথাসহিষ্ণু, সক্ষম-মজবুত ছেলে খুঁজে পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কলকাতায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গিয়েছিলেন একজন নাগা ফুটবলার। কিন্তু ওই একজনই তারপর আর কেউ এলই না। নেপালিদের ভিতর থেকেই বা বহুসংখ্যক

খেলোয়াড় আসে না কেন কে জানে। রাম বাহাদুর, বীর বাহাদুর, শ্যাম থাপা বা ভাইচুং ভুটিয়ার মতো পাহাড়ি ছেলেরা যদি সংখ্যায় বেশি আসত তাহলেও কিছু হতে পারত।

বাল্য কৈশোর যৌবনে ফুটবল দেখার স্মৃতি আমার খুব সুখকর হয়নি। নেশার টানে মাঠে গেছি বটে, কিন্তু তিক্ততারই সঞ্চয় হয়েছে বেশি। এখন মাঠে না গেলেও দেশি টিমের খেলা মাঝে মাঝে টিভিতে দেখি। মনে হয় না, ফুটবলের দারুণ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক। যখন চিন-জাপান-কোরিয়া আদাজল খেয়ে লাগেনি তখন এশিয়াডে জয় বা রোম অলিম্পিকে দারুণ খেলার (মনে রাখতে হবে অলিম্পিকে পেশাদার খেলোয়াড়রা খেলে না) স্মৃতি ছাড়া রোমন্থন আর কী নিয়ে করা যায়?

গানের ভেলায়

যেমন 'পুজোর গান'—কথাটা শুনলেই স্মৃতির হাত ধরে, গানের ভেলায় ভেসে, আমি কয়েক দশক পিছিয়ে যাই—আমার চোখে ভেসে উঠে ময়মনসিংহের একফালি গ্রাম। পুজোর প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই সেখানকার বাতাসে ভেসে বেড়াত 'আগমনী' গান।

আমাদের ময়মনসিংহের বাড়ি ছিল এক্কেবারে পাড়াগাঁ। গ্রামের বউ-মেয়েরা পাড়ার ভেতর ঘুরে ঘুরে আগমনী গান গাইত, আর বাড়ি বাড়ি থেকে চাল-ডাল-কাপড় এমন সব পুজোর নানা উপকরণ জোগাড় করত। অনেকটা আজকের চাঁদ তোলারই একটু অন্যরকম, একটু আন্তরিক সংস্করণ।

'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী' ধরনের কিছু গান দল বেঁধে গাওয়া হত। মেঘ-কাশফুল-শিউলি ছড়ানো প্রকৃতির সুরের সঙ্গে ওই গানের সুর মিলে গিয়ে আমাদের মনে খুশির হাতছানি, পুজোর মেজাজ এনে দিত। আগমনী থেকে বিজয়া প্রতিদিনই একটা না একটা গানের ব্যাপার থাকত। পুজোর ক'দিন মণ্ডপে হত ভক্তিমূলক গান, আর এই গানের রেশ থাকত পুজো পেরিয়ে যাওয়ার পরেও। প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে গেলে সবারই মন খারাপ হত। সেই বিষণ্ণতার ওপর প্রলেপ দিত বিজয়া-সম্মিলীর অনুষ্ঠান। মণ্ডপের ভেতরেই ঠাকুরের বেদির জায়গায় তক্তাপোশ পেতে গানবাজনা হত। আমরা থাকতাম পূর্বাপর ঘটনার সাক্ষী, অরসিক অথচ মুগ্ধ শ্রোতা। আমাদের কাছে ওটাও ছিল একটা ইভেন্ট। সব পাড়াতেই কিছু না কিছু গাইয়ে-বাজিয়ে থাকতেন, তাঁরা ওইদিন হিরো হয়ে যেতেন। স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো হত না।

বাবা রেলের চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। সেইসূত্রে নানা জায়গায় আমরাও বাবার সঙ্গে ঘুরেছি—বিহার, গোমাহানি, বদলপুর, আমিনগাঁও, কানপুর, লামডিং—অনেক রিমোট জায়গাতেও থাকতে হয়েছে। সব জায়গাতেই দেখেছি প্রায় একই চিত্র। রেল কলোনিতে পুজো হত, গোটা মহল্লার লোক অংশ নিত সে পুজোয়। সব জায়গাতেই বিজয়ার পর জোর একপ্রস্থ গানবাজনা হত। পাড়ার কারও সাধারণ হারমোনিয়াম, কারও ডুগিতবলা, জুটিয়ে এনে প্রাণের আনন্দে সবাই গানবাজনা জুড়ে দিত। পরে বিজয়া সম্মিলনী ঘিরে,

গানবাজনা, শহরাঞ্চলেও দেখেছি, তবে সেখানে নামীদামি গাইয়েদের উপস্থিতি; জাঁকজমক বেশি, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সেই আটপৌরে অনুষ্ঠানের স্মৃতি আজও অমলিন।

আমার গান শোনার আদি স্মৃতির কথা ভাবলে আমার এখনও খুব হাসি পায়। তখন আমার পাঁচ-ছ বছর বয়স হবে। বাড়িতে একটা চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন ছিল। সেই কলের গানে দম তাতে রেকর্ড চাপানো হত। এই প্রক্রিয়াটাই ছিল দিয়ে উত্তেজনার। অনেক পুরনো রেকর্ড ছিল। ধুলোমলিন সেইসব গালার রেকর্ড থেকে খুব একটা পরিষ্কার আওয়াজও বেরোত না—তবু কী আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। একটা গানের কথা মনে আছে, শিল্পীর নাম ধাম কিছুই জানি না, খিনখিনে গলায় এক মহিলার গান—'আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি, আমারে দাওগো বাঁচায়ে'—ঈশ্বরমুখী সে গানের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু বারবার শুনতাম। সেকালের অনেক বিখ্যাত গাইয়েদের গান এভাবেই রেকর্ডে শুনেছি, কিন্তু 'গান শোনা' ব্যাপারটাই শুধু মনে আছে।

তখন আমাদের বাড়িতে রেডিও ছিল না। অন্যের বাড়িতে বাজত কান খাড়া করে শুনতাম। আমাদের রেডিও হয়েছে একান্ন-বাহান্ন সালে। একবার আমার টাইফয়েড হয়েছিল, দিনের পর দিন শুয়ে আছি, মাথার কাছে রেডিওটা ছিল, খুলে দিয়ে হঠাৎ ওই গানটা শুনলাম, সেসময় খুব বাজত গানটা—'কোন এক গাঁয়ের বঁধূর কথা'—সেই রোগশয্যায় শুয়ে গানটা মাথার মধ্যে ঢুকে গেল, গানটা 'প্রিয়' হয়ে গেল।

রেডিওর গায়কদের তখন দারুণ কদর। আমাদের বাড়িতে একজন ভদ্রলোক আসতেন, নরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ—রেডিওতে গান গাইতেন। তিনি এলেই বাড়িতে গানের আসর জমে যেত। রোগা পাতলা চেহারা, লম্বা চুল—নরেনকাকু জমিয়ে গান ধরতেন আমাদের বাড়ির আসরে। এসব হত বাবার উদ্যোগে। বাবা তো রীতিমতো গানবাজনা করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, এ ছাড়া ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙের গান। খেয়াল-ঠুমরি নয়, রাগাশ্রয়ী ধরনের। সেই সূত্রে অন্য শিল্পীরাও আসতেন, বাড়িতে গানের বৈঠক বসত। বাবা ক্রিকেট খেলতেন ভালো, টেনিস খেলতেন কিন্তু এত মন দিয়ে চাকরি করতেন যে অন্য কিছু আর মন দিয়ে করবার ফুরসত পেতেন না। চাকরিটাই খেয়ে নিত বাকি সব ইনভলভমেন্ট। ফাঁক পেলেই গুনগুন করতেন। আমি বাবার ধারা পাইনি, গলায় একেবারেই সুর নেই, এ ব্যাপারে আমি 'মায়ের ছেলে'।

অন্যের গানে মগ্ন হতে পারি, নিজে এক কলিও গাইতে পারি না। আমার গায়কজীবন শুরু হয়েছিল স্কুলে। প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, অসংখ্য বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতাম 'জয় জগদীশ হরে'—ব্যস ওই পর্যন্ত। গাইতে না পারলেও ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে। কুঁজোর চিৎ হয়ে শোওয়ার ইচ্ছের মতন হয়তো আপনমনেই গেয়ে উঠলাম, 'আমার মল্লিকাবনে' বা 'তার ছিড়ে গেছে কবে'। তবে সে গান কেবল আমিই শুনি বলে কোনও বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয় না।

তবে আমার স্ত্রী গানটা জানে। রীতিমতো রাগরাগিণীর তালিম নিয়েছে অনেককাল ধরে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্য গানও গায়, অবশ্যই সময়-সুযোগ পেলে। আর আমি কোনও গান গাইবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ওর কাছে শুনতে চাইলে শুনিয়ে দেয়। গাইতে না পারলেও আমাকে নিয়মিত গান গাইতে হয়—সকালে দুটো, বিকেলে দুটো প্রার্থনাসঙ্গীত করতে হয়। আগ্রা সৎসঙ্গের প্রার্থনাসঙ্গীত। গলায় সুরের বংশ নেই, তবু ভজন করতে হয়। ভক্তিসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতও হয় আমাদের সংঘে। রামপ্রসাদী গান আমার খুবই প্রিয়—আপনমনেই কখনও হয়তো গুনগুন করে ফেলি—'আমায় দে মা তবিলদারি'—কিন্তু আমার ভেতর কোনও গায়ক নেই, তবে শ্রোতা আছে।

সেই গ্রামেগঞ্জে ঘোরার সময় থেকেই কান পেতেছি গানের কাছে। দূর মফস্সলে চা-বাগানের পাশে, ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে লোকসুর শুনে আমি বড় হয়েছি। সেই কবে শোনা জসীমউদ্দিনের গান এখনও কানে লেগে আছে। মাঝিমাল্লাদের গান আমাকে খুব টানত। সিনেমায় মাঝিদের দেখলে যেমন মনে হয় তাদের

কাজই যেন গান গাওয়া, নৌকো ছেড়েই গান জুড়ে দিল, বাস্তবে তো তা হত না। কখনও কখনও শোনা যেত মাঝিমাল্লাদের ভাটিয়ালি। মুলিবাঁশ ভর্তি নৌকো চলেছে ভেসে, হঠাৎ হয়তো গান ধরল। একটু কর্কশ গলা, তবে গানটা আসত ভেতর থেকে। এইসব লোকায়ত গানের ভেতর থেকে আমি এসে পড়েছি নাগরিক জীবনযাপনে।

আমাদের কাটিহারের বাড়িতে আমি প্রথম একজন বিখ্যাত গাইয়ের পাশে বসি। 'শাপমুক্তি', 'কবি' ছবির সেই জনপ্রিয় গায়ক-নায়ক রবীন মজুমদার। তাঁর তখন দারুণ নামডাক, কিন্তু সময় সুযোগ হলে আসতেন আমাদের বাড়িতে, গানটান গাইতেন। তখন আমি খুবই ছোট। পরে যখন আমি লেখালিখি করে একটু-আধটু পরিচিতি পেয়েছি, তখন রবীনবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর উনি বলতেন, 'তোমাদের বাড়িতে কত গান গেয়েছি'।

কলকাতায় এসে আমার আধুনিক গানের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়। কলেজ হোস্টেলে বছরে একটা করে গানের জলসা হত। সেখানে মূলত আধুনিক গানের শিল্পীদেরই প্রাধান্য থাকত। টাকার জোর ছিল না বলে সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের ইচ্ছে থাকলেও আনা যেত না। যাদের ছুঁতে পারতাম যেমন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের আনা হত। একবার গায়ত্রী বসু নামে একজন অতীতের নামী শিল্পীকে আনা হয়েছিল। একই সঙ্গে যেন একটা উন্মাদনা এবং গান শোনা চলত এই সোশ্যাল ঘিরে।

ক্ল্যাসিক্যাল গানবাজনা আমি বুঝি না, মানে ব্যাকরণ জানি না, তবে সেজন্য 'মুগ্ধ' হতে কোনও অসুবিধে হয় না। রেকর্ডে বা কনফারেন্সে রাগসঙ্গীত শুনে আমি নির্দোষ আনন্দ পেয়েছি। প্রথমবার ক্ল্যাসিক্যাল কনফারেন্সে শ্রোতা হওয়ার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল—তখন 'যুব উৎসব' হত কোলকাতায়। এখন যেখানে ইন্ডোর স্টেডিয়াম, তখন জায়গাটা ফাঁকা ছিল, ওখানেই হত। সে উৎসবে নানারকম সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে একটি রাগসঙ্গীতের আসর হত। হোল নাইট অনুষ্ঠান, টিকিটের দাম ছিল আট আনা। সেই রাতে শুনেছিলাম ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান—আহা গানে অমন স্ফূর্তি, চা খেতে খেতে, পান খেতে খেতে গেয়ে চলেছেন, মন ভরে যাচ্ছে। দেখে বোঝা যেত, শিল্পী স্টেজে বসে থাকলেও অন্যলোকের বাসিন্দা। অনেকেই গেয়েছিলেন সারারাতের সেই আসরে। ভীষ্মদেবের গানের স্মৃতিটা বেশি করে উঠে আসে। আর শুনেছিলাম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল-ঠুমরি, যাঁকে জানতাম আধুনিক গানের শিল্পী, তাঁর কণ্ঠে ওরকম গান শুনে দারুণ ভালো লেগেছিল। যেন একটা আবিষ্কারের আনন্দ। শেষ প্রোগ্রাম ঘিরে ছিল রাধিকামোহন মৈত্রর সরোদ। উনি বাজিয়েছিলেন 'আহির ভৈরোঁ'। রাগরাগিণীর কিছুই বুঝি না। অথচ শুনতে শুনতে কী আশ্চর্য রকমের সুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। শরীরে একটা শিহরন হচ্ছিল—একেই 'আনন্দ' বলে। ভোর হচ্ছে—আকাশে আলো ফুটছে—সঙ্গে সারোদে সেই অনির্বচনীয় সুর, সবমিলিয়ে এক মহার্ঘ প্রাপ্তি হয়ে আছে।

গান নিয়ে কোনও পূর্বসংস্কার নেই বলে আমি সহজভাবেই সাধারণের গানের কাছে কান পাতি, জুটেও যায় প্রাপ্তি। যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান আমাকে মুগ্ধ করে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তর গান আমার ভালো লাগত, এমনকী, যাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে অনেকে নাম সিঁটকোয় সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতও আমার বেশ লাগে। আধুনিক গানে হেমন্তর বেশিরভাগ গানই আমার পছন্দ, ভালো লাগে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান, এবং একটু অফ বিট ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠের একটা অন্য ধরনের মাদকতা আছে।

ইংরেজি গানেও আমি মজা পাই। ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গান দারুণ লাগত একসময়। আর একজনও ওই যে হেমন্তর মতো গলা—মজার গান করে, প্যাট বুনদারুণ লাগে।

হালফিলের আধুনিক গান সেইভাবে টানে না। সংখ্যায় বেড়ে গেছে গান, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষেত্রেই গানের মূল এলিমেন্ট লিরিকটা খুব পুওর। গীতিকার ভালো নেই, নাকি ভালো গীতরচয়িতারা সুযোগ পাচ্ছেন না জানি না। আজকের আধুনিক গানে মজা পাওয়ার মতো 'আধুনিক' হতে পারিনি এমনও বলা যায়।

এই শহুরে জীবনযাপনে ক্লিষ্ট হয়ে, হঠাৎ মেদিনীপুর, সুন্দরবনের ঘুরে এলে যেমন তরতাজা হয় নার্ভ-শরীর, তেমনই গ্রামীণ গানেও বেশ একটা ঝর্নায় স্নানের আনন্দ হয়। কীর্তন শুনলে টের পাই এই চেঞ্জটা। রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালিতে পাই এই রসদ। এখন তো আর সেই গ্রাম নেই, শহর ঢুকে গেছে গ্রামে। গানের মধ্যেই সোঁদা গন্ধটা পেতে চাই। আর মেটালিক শহরে বসে বারবার, ফিরে ফিরে স্মরণ নিই সেই রবীন্দ্রনাথের গানের।

রবীন্দ্রনাথের নিজের গলায় গাওয়া রেকর্ডের গান 'অন্ধজনে দেহ আলো'—এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আমার একটি উপন্যাসের ভাঁজে ভাঁজে ধূয়োর মতো ঢুকে পড়েছে সেই গান, এমনকি রেকর্ডের ব্যাপারটি পর্যন্ত।

আমরা জীবনের শেষ দিনে যদি কোনও গান শোনবার অবকাশ জোটে, হয়তো আমি শুনতে চাইব, রবীন্দ্রনাথেরই গান—'তবু মনে রেখো—'

শারদোৎসব

মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন। আসল সংসারের স্বাদ পাওয়ার আগে এই পুতুলের সংসারে সে মজে থাকে। মূর্তিপূজক তিনি নিজেই ছিলেন। কিন্তু পাগল ঠাকুর কতবার যে মায়ের সিংহাসনে চড়ে বসে মায়ের ভোগ খেয়ে ফেলতেন! ও কি সত্যিই পাগলামি? নাকি ভগবান রামকৃষ্ণ ওইভাবেই মানুষকে শেখাতে চাইতেন, যেখানে মূর্তির শেষ সেখানেই শুরু তাঁর—মূর্তির আড়ালে যিনি—সৃষ্টি-স্থিতির নিয়ামক পুরুষ। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলতেন, চরণপূজা মানে চলনপূজা। তাঁর চলনে চলাই হচ্ছে প্রকৃত তাঁর পূজা। শুধু ফুল-বাতাসা সাজিয়ে দেওয়া বা তুলসী বেলপাতা চাপিয়ে দেওয়াই পূজা নয়। তাঁর চরণামৃত নিয়ে খেতে চেয়েছিল এক ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, চরণামৃত নয়, চলনামৃত নিয়ে যাও। জীবনের সব অস্তিবাচক আচরণই ধর্মাচরণ। ভগবান আছেন কি নেই তা নিয়ে সংশয় থাকে থাক, ধর্ম কিন্তু আমাদের বাঁচতেই শেখায়—আস্তিককেও, নাস্তিককেও।

ধর্ম সম্পর্কে নাসিকাকুঞ্চন বাড়ছে। নাস্তিক্যের বাহবাও বাড়ছে। আবার পাশাপাশি বাড়ছে বারোয়ারি পূজা, বাড়ছে মন্দির, বাড়ছে সংঘ। আসলে এ এক বিভ্রান্তির যুগ! কে যে কী করবে তার কিছু ঠিক পাওয়া যায় না। চলল কিছু মানুষ বাঁকুয়া ঘাড়ে তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে, চলল কিছু তারাপীঠে মায়ের বাড়ি। কোথায় গেলে কী হবে তা বুঝে উঠতে পারছে না মানুষ। এই না-বোঝার ফাঁকে ফাঁকে ধর্মব্যবসায়ীদের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। মানুষের দুর্বলতার, ভয়ের, অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে তাদের হাত এগিয়ে আসে।

আসলটা যদি জোরালো হয় তবে তার নকলটাও থাকবেই। বাজারে যেমন নামী ব্র্যান্ডের জিনিসের নকল হয় সবচেয়ে বেশি। ধর্ম জিনিসটারও তাই হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গ দুর্গাপূজা। মা দুর্গার সৃষ্টি হয়েছিল নানা দেবতার নানা অবদানে। তিনি পারসেন্টেজ গডেস। অসুরবধের পর তিনি তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সমাজে স্থান পেয়ে যান। শিবের সঙ্গে তাঁর কদাচ বিয়ে হয়নি। উমা আর তিনি এক নন। মহিষাসুরকে তিনি বধ করেন চামুণ্ডা পাহাড়ে, মহীশূরের কাছে। কোন এক কার্যকারণসূত্রে তিনি বাঙালির প্রিয় হয়ে উঠলেন তা বোঝা দুষ্কর। প্রিয়ই শুধু নয়, তিনি কখনও দেবী, কখনও ঘরের মেয়ে। তাঁকে নিয়ে কত বিজয়া আর আগমনী গান। বাপের বাড়ি আসা এবং পতিগৃহে ফিরে যাওয়া ইত্যাদি কত মাত্রাই যে যোগ হয়েছে মা দুর্গার ওপর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠে না-হোক পঞ্চাশ বছর ধরে বেতার প্রকম্পিত করে আসছে। দুর্গা—বাঙালির পূজিত দুর্গাই কি চণ্ডিকা? বলা দুরূহ। দেবদেবীর মিশ্রণ ঘটানো এবং তাঁদের ওপর মানবিকতা আরোপ আমাদের পুরনো স্বভাব।

বিতর্ক যতই তোলা যাক, মা দুর্গা দীর্ঘদিন হল জেঁকে বসেছেন বাঙালির সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, কালচারে, ছবিতে, চলচ্চিত্রে, প্যান্ডেল নির্মাণ-ডেকোরেশন-বিজলী বাতির কেরামতিতে, বাঙালির বাণিজ্যে। দুর্গাকে উপলক্ষ করে বাঙালির বছরওয়ারি এই উৎসবের উৎস কদাচ তার ধর্মপ্রাণতা নয়। উৎসবমুখিনতা মাত্র।

শরৎ ঋতু বাঙালির অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে সুসময়। কৃষিনির্ভর ভূখণ্ডে সম্পন্নতার আবহ নিয়ে আসে শরৎ।

এ সময়ে চাষি-বাসী-গৃহস্থ সকলেরই ট্যাঁকে কিছু পয়সা, গলায় গান, প্রাণে আনন্দ। কয়েকটি দুর্বৎসর বাদ দিলে শরৎ ঋতু নিয়মিতভাবেই আমাদের অভাবী সংসারে কিছু লাবণ্য সঞ্চার করে। উৎসবের সেইটেও হয়তো অন্যতম কারণ।

বাঙালির দুর্গা আর চণ্ডীর চণ্ডিকার মধ্যে অনেক তফাত। তা হোক। তাতে কিছু যায় আসে না। দুর্গোৎসবকে ধর্মীয় উৎসব বলে ভাবতেই হবে—এমন কোনও কথা নেই। বাস্তবিক প্রকৃত ধর্মচর্চার সঙ্গে এইসব পূজাপাঠের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। এ তো এক ধরনের বড় করে পুতুল খেলাই। পেশাদার পুরোহিত মন্ত্র পড়ে চলে যান, তাঁর মন্ত্রপাঠ কতদূর শুদ্ধ ও নির্ভুল তা বলা কঠিন। সম্ভবত এসব ভেবেই পুরোহিতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু তবু পুজোপাঠের মধ্যেই নিহিত নেই ধর্মের সারবস্তু। আসল কথা হল, মানুষ যতক্ষণ না প্রতি পদক্ষেপেই ধর্মের শর্ত পূরণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ধর্মাচরণ বলে কিছু নেই।

ধর্ম মানেই হচ্ছে জীবনের পথে সঠিক চলা। অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির অনুগ যা তাই পালন করা। নইলে দিনে দশটা দুর্গাপূজা করেও কিছু হওয়ার নয়। জীবনবৃদ্ধির ধর্ম যেখানে পালিত হচ্ছে সেখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটছে। মূর্তি আমাদের সেই অরূপের আভাস দেয় মাত্র। মূর্তি অনেক সময়েই অনেক কিছুর প্রতীক। দশপ্রহরণধারিণীর ওই দশটি প্রহরণ আমাদের জীবনযুদ্ধেরই অস্ত্রশস্ত্র বোধহয়। অসুরদলন মানে কি নয় অসৎ নিরোধ? দুর্গার চারটি সন্তান বীরত্ব, বিদ্যা, সম্পন্নতা ও সিদ্ধির প্রতীক। মানুষেরই নানা ইচ্ছা যেন আরোপিত হয়েছে মায়ের মূর্তিতে।

শিউলি আর কাশফুলের কথা বিস্তর লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে শরতের রূপবর্ণনাও। লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু শরতের শ্বাসরোধকারী অপার্থিব সৌন্দর্যের যথাযথ প্রকাশ কি লেখনীতে সম্ভব! ভাগ্যক্রমে আমি পূর্ববঙ্গের মানুষ। আমার বিচিত্র শৈশবের অনেকটাই কেটেছে প্রকৃতিসমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গে। শহর-গঞ্জে বসে শরতের সঞ্চার ততটা বোঝা যায় না যতটা বোঝা যায় খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে। সভ্যতার অভিশাপে মানুষের বাড়বাড়ন্ত এখন ক্ষীয়মাণ প্রকৃতিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। চাষের জমি, জঙ্গল, ফাঁকা পরিসর ভরে উঠছে বসতে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৃক্ষনিধনের মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আরণ্যক ভারত ক্রমশ ন্যাড়া ভারতে পরিণত হচ্ছে। ঋতুচক্র আবর্তনের জন্য যে শর্তগুলি প্রয়োজন ছিল তারই যদি অভাব ঘটে শরতের আগমন মানুষ কী করে যে টের পাবে সেটাই চিন্তার বিষয়। গাছপালা, অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয় জল ইত্যাদির সঙ্গে জনসংখ্যার বিষম অনুপাত পৃথিবীর নাভিশ্বাস তুলে ছাড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি প্রতিশোধ হয়তো নেবেই, বিশাল বিনষ্টির ভিতর দিয়ে। সেটাও তো কাম্য ছিল না।

গৌতম বুদ্ধের আমলে গোটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ। মানুষের সন্তানসন্ততি বাড়তে বাড়তে এখন ধরিত্রীর পাত্রখানি উপচে পড়ার জোগাড়।

গৌতম বুদ্ধের আমল তো দূরের কথা। আমাদের শৈশবের চিত্রই তো আলাদা ছিল।

কলকাতায় শৈশবের কিছু সময় কেটেছে। তখন দেখেছি, সাহেব-রচিত এ শহরে প্রকৃতির অভাব ছিল না। পথ চলতে বকুল বিছিয়ে থাকত পথে, হঠাৎ পাওয়া যেত ছাতিম ফুলের গন্ধ। কত কৃতিত্বের সঙ্গে এই

শহরটি উষর করে দেওয়া হয়েছে। এ শহরে জাঁকের পুজো বড় কম হয় না, কিন্তু মা দুর্গার অনুষঙ্গ তার প্রকৃতির চালচিত্রই যে নেই!

মফস্বলে সেই আমলে, চল্লিশের দশকে, শরৎ নামক এক চিত্রকর নেমে পড়ত চারদিকে আশ্চর্য সব ছবি ফুটিয়ে তুলতে। সেই ঋতুবর্ণন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শরৎকালে সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে যাই। এই ঋতু শুধু বাইরের জগতে নয়, আমার অভ্যন্তরেও সঞ্চার করে এক উল্লাস। বছরের এই একটা সময়ে আমার মন ভালো থাকে। এই ব্যক্তিগত অনুভূতি আমার একারই শুধু নয় বোধহয়।

ছেলেবেলায় প্রতিমার বৈচিত্র্য ছিল না বিশেষ, ডেকোরেশন বলতে কাগজের শিকলি আর রঙিন কাগজ, আলো বলতে হ্যাজাক লণ্ঠন। মাইক ব্যাপারটা ছিল না। তৎকালে অনেক মিটিঙে নেতারা চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিতেন। চোঙা ফুঁকে কিছু কিছু প্রচারকাজ চলত। প্রয়োজনটা বড় এবং গুরুতর না হলে লাউডস্পিকার দেখাই যেত না। সুতরাং পুজোর প্যান্ডেল শব্দদূষণে দূষিত হত না। ঢাক, কাঁসর আর উলুধ্বনির সঙ্গে মিশত কচিকাঁচাদের সোল্লাস চেঁচামেচি। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু কথাটা হল শৈশব। শৈশবে যা মানুষ দেখে তার ওপর একটা মায়াঞ্জন মাখানো থাকে। সেই সময়ে মানুষের কল্পনা প্রবণতাও কিছু লাগামছাড়া। উঠোনটা কত বড় বলে মনে হয়! বাড়িটা কত উঁচু বলে মনে হয়। কত সুন্দর লাগে অসুরকেও। বড় হলে বিচারবোধ পাকে। একই জিনিসের অন্যরকম মূল্যায়ন হতে থাকে। কোনটা ঠিক ঠিক দেখা কে বলবে? ওই যে ঘুড়ির পিছনে ছুটতাম, ওই যে স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তার গর্তে জমা জলে ইচ্ছে করে পা ভেজাতাম, নদী বা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়তাম অবলীলায়, কাটা ঘুড়ির পিছনে দৌড়োতাম দিগবিদিকশূন্য হয়ে সেসব তো ছেলেমানুষিই। কিন্তু অনুচিত কি? আমার ভিতরটার বাচ্চা ছেলেটা তো আজও ওইসব করতে চায়। গাম্ভীর্য ও বয়সের ছিপি এঁটে আটকে রাখি তাকে।

সে এক পঞ্চমীর বিকেল। টুলু নামে আমাদের বয়সী একটি জ্ঞাতির ছেলে কোথা থেকে হাত দেড়েক এক দুর্গামূর্তি ঘাড়ে করে নিয়ে এল। ছোটর মধ্যে সেই মূর্তিতে সবই আছে কিন্তু, চালচিত্র, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী বাহনসহ, অসুর ও সিংহ কিছু বাদ নেই।

টুলুর বাবা নিজে পুরুতগিরি করেন। কায়ক্লেশে সংসার চালান। সৎ ব্রাহ্মণ। পুজোকাটানি দিনে বাড়িতে বিগ্রহ আনলে যে পুজো না করে উপায় নেই এ তিনি ভালোই জানেন। কিন্তু দুর্গাপুজো কি চাট্টিখানি কথা! কত আয়োজন কত প্রস্তুতির দরকার। তিনি গরিব মানুষ, পেরে ওঠেন কী করে!

সুতরাং আমাদের সেই জ্যাঠা ঠ্যাঙা নিয়ে ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন, বেরো বেরো বাড়ি থেকে। যেখান থেকে এনেছিস সেখানে ফেরত দিয়ে আয় ওই মূর্তি।

টুলু গোঁজ হয়ে দাঁড়ানো। আমরা হতভম্ব এবং বাক্যরহিত।

জ্যাঠা বিস্তর বকাঝকা করতে লাগলেন।

ঘাড়ে দুর্গামূর্তিটা রয়েছে বলে জ্যাঠা তাকে কষে দু'ঘা দিতে পারছিলেন না। কিন্তু মুখ দিয়ে তোড়ে র্ভৎসনার স্রোত বেরিয়ে আসছে।

বেরো, বেরো, এক্ষুনি যা...। নইলে ঘোর অমঙ্গল।

আমার মোক্তার দাদু ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। চেঁচামেচি শুনে ঠাকুমাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, চেঁচামেচি কিসের? কী হয়েছে?

ঠাকুমা বললেন, আর বলো না। টুলুটা কোথা থেকে এক দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে এসেছে। পুজোকাটানি দিন। ওর বাবা তাই চেঁচাচ্ছে।

দাদু শুধু বললেন, হুঁ।

ঠাকুমা বললেন, এখন বেচারি করে কী?

দাদু বললেন, টাকা বের করে দাও। বারবাড়িতে মণ্ডপ বানাতে হারাণ মিস্ত্রিকে খবর পাঠিয়ে দাও। আর ফুলু, ফুকু ওদের বলো পুজোর ফর্দ পীতাম্বরের কাছ থেকে নিয়ে যেন বাজার থেকে সব কিনে আনে আজই।

রাশভারী গম্ভীর ও প্রবল ব্যক্তিত্ববান আমার দাদুর দাপটে তখন বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সুতরাং তাঁর কথাই হল সুপ্রিম কোর্টের রায়।

ঠাকুমা সিন্দুক খুলে টাকা বের করে নিয়ে পীতাম্বর জ্যাঠাকে বারবাড়ি থেকে ডাকিয়ে এনে বললেন, কর্তার ইচ্ছে হয়েছে, পুজো হবে। তুমি আয়োজন করো।

পীতাম্বর জ্যাঠা হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। সে কী কান্না! হয়তো মনোগত গোপন বাসনা ছিল নিজের দুর্গোৎসব করবেন। তা আর হয়ে ওঠেনি। কান্না তাই আর থামে না। আমরা তাঁকে ঘিরে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি। পুজো হবে নাকি? সত্যিই আমাদের নিজের পুজো হবে? কী উৎকণ্ঠা তখন!

তারপর কান্না থেমে জ্যাঠার মুখে হাসি ফুটল। আর তার পরেই শুরু হল ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি। এখনকার মতো ডেকোরেটরদের রমরমা চিল না তখন। কেউ গেল বাঁশের খোঁজে, কেউ গেল ঘরামির সন্ধানে। সেই বিকেলবেলায়, পুজোর মাত্র একদিন আগে শুরু হল আমাদের আয়োজন।

হ্যাজাক জ্বেলে দেওয়া হল, আমরা রাজ্যের ছেলেপুলে জুটে গেলাম বারবাড়ির মাঠে। হইহই করে বাঁশ এসে পড়ল, চালার জন্য এল টিন, মাটি চেঁছে জমি চৌরস হতে লাগল। সে যে কী সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনা! দাদারা মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাইকেলে ঘন ঘন এখানে সেখানে চলে যাচ্ছে কেউ না কেউ। আমাদেরই দোকান থেকে চলে এল শালু আর চন্দ্রাতপের কাপড়।

বাঁশ-টাঁশ পুঁতে সারা রাত ধরে মণ্ডপ খাড়া হতে লাগল। রাতে না ঘুমোনোর প্রতিজ্ঞা ছিল, রাখা যায়নি। অবাধ, দুষ্টু চোখ কখন শক্ত হয়ে জুড়ে গেছে। কে যেন কোলে করে নিয়ে শুঁইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

সকালে উঠেই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে একছুটে বারবাড়িতে!

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কী সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে মা দুর্গার ঘর। তখনও কাজ চলছে বটে, কিন্তু ইট আর মাটির বেদীর ওপর প্রতিমা বসে গেছে। ঘরও তৈরি। সাজসজ্জা চলছে।

পাড়া ঝেঁটিয়ে মহিলারা চলে এসেছেন। নিকোনো হচ্ছে মণ্ডপ। কাগজের শিকলি বানাতে বসে গেছে বালিকাবয়সীরা। মণ্ডপে রঙিন কাগজ সাঁটা হচ্ছে। আয়োজন তেমন জমকালো নয়, কিন্তু আন্তরিকতা আর ভালোবাসায় যেন মাখামাখি চারদিক। সকলের মুখে হাসি, সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্তি। বাড়ির পুরুষেরা চেয়ার পেতে বসা। তাঁদের খুশির ভাবটাও গোপন থাকছে না। দাদু গম্ভীরভাবে মাঝে মাঝে এসে ঘুরেটুরে দেখে যাচ্ছেন।

ঢাকি এসে গেল। বজ্রগম্ভীর আওয়াজ তুলে ঢাক-বাজনা শুরু হতেই চারদিক থেকে পিলপিল করে আরও কত কচিকাঁচা যে এসে জুটল তার হিসেব নেই।

সত্যি বটে তার মধ্যেও মাঝেমধ্যে ইগোর ফ্ল্যাশ বা অহং-এর সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছিল। বৃহৎ কর্মে ঝগড়াঝাঁটি তো বাঁধা। এসব না হলে পুজো কি পুজোর মতো হয়? তা ঝগড়াটাও আমরা ছোটরা খুব উপভোগ করতাম তখন। কে হারে, কে জেতে তা নিয়ে খুব কৌতূহল ছিল।

এসব গণ্ডগোলের মধ্যেই হয়তো জ্যাঠতুতো দাদা এসে আমার কানটি ধরে বললেন, বেয়াদপ, না খেয়ে এখানে পড়ে আছিস! কাকিমা খুঁজে খুঁজে হয়রান। যা বাড়ির মধ্যে।

খাওয়ার কথা আমাকে বলতে হয় না, অতিশয় পেটুক ছিলাম। তবু ওই পুজোর উত্তেজনায় পেটপুজো ভুলে বসে আছি।

পুজোর তিনটে রঙিন দিন যেন তরতর করে চলে গেল, যেমন ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে পালতোলা নৌকো যায়। দীন আয়োজন, ছোট্টো মণ্ডপ, একরত্তি প্রতিমা—তবু তাই যেন আমাদের অনেক। মনে আছে সেবার আর আমরা অন্য পুজো দেখতে বিশেষ যাইনি।

তিনদিনের পুজোর পর এল বিজয়া দশমী। কে বলবে যে মা দুর্গা মাটির পুতুল মাত্র! ভাসানের আগে মেয়েরা প্রতিমাকে সিঁদুর পরাতে গিয়ে কেঁদে লুটোপুটি। সত্যিই যেন বিবাহিতা মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাচ্ছে। পুরুষদের চোখও ছলছল।

মাটির প্রতিমায় প্রাণসঞ্চারের প্রথা আছে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে তা করেন। আমার তো মনে হয়, প্রতিমায় প্রকৃত প্রাণসঞ্চার হয় ওই ভালোবাসায়। জড়বস্তুতে মানুষের চৈতন্য আর প্রেমের আরোপিত আবেগে।

ব্রহ্মপুত্রে সেই ছোট্টো প্রতিমা ভাসান দেওয়া হল নৌকোয় করে মাঝগাঙে নিয়ে। আমাদের ছোটদের নৌকোয় তোলা হয়নি। তাতে হতাশ হলাম বটে, কিন্তু নদীর জলে ঝাঁপিয়ে লাফালাফি কিছু কম হল না।

আর তারপরেই সন্ধেবেলা মণ্ডপে পীতাম্বর জ্যাঠাকে ঘিরে শান্তিজলের ছিটে নেওয়া। ফাঁকা মণ্ডপে এরপর বসল শতরঞ্চি পেতে হারমোনিয়াম আর তবলা সহযোগে গানের আসর। বাবা, জ্যাঠামশাই সবাই গান জানতেন। ময়মনসিংহ শহরের অন্য সব গায়কেরাও চলে এল। রাগপ্রধান ঠুংরি আর গজলে আকাশ-বাতাস মাত হয়ে গেল।

আজও সেইসব অনবদ্য জলসার কথা ভুলতে পারি না। যতবার পুজো হয়েছে ততবারই বিজয়ার দিন বসেছে সান্ধ্য জলসা। কানে যেন তার অনুরণন আজও ভেসে আছে।

বাবার চাকরি হল, মা আর বাবার সঙ্গে দিদি আর আমি ময়মনসিংহ ছাড়লাম।

সেই ছাড়ার কষ্ট যে কী সাঙ্ঘাতিক তা বোঝানো যাবে না।

কিন্তু মানুষ সব অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে নেয়। নিতেই হয় তাকে। আমাদেরও নিতে হল। এলাম প্রথমে কলকাতায়। দুটো ঘর, আর দুটো ওপেন টেরেস নিয়ে দোতলায় বাসা। দিদি ইস্কুলে যায়, আমি ঘরের মধ্যে ট্রাইসাইকেল চালাই, নানা দুষ্টুমিতে মাকে জ্বালাতন করে মারি।

কলকাতার পুজো দেখে আমরা স্তম্ভিত। সেই তখনও কলকাতায় বিজলী বাতির আলোয় ঝকমকে সাজসজ্জায় যে পুজো হত তা ময়মনসিংহ থেকে আগত মফস্বলিদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বাবার পুজো দেখার নেশা ছিল সারাজীবন। অষ্টাশি বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে অবধি কোনও বছর তাঁর পুজো দেখে বেড়ানোর ক্লান্তি ছিল না। মনে আছে, কলকাতার প্রথম পুজো দেখেছিলাম বাবার হাত ধরে ঘুরেঘুরেই। সেই দেখে বেড়ানোর বিপদ ছিল কম নয়। বাবা প্রবল হন্টনবীর। মাইলের পর মাইল অনায়াসে হাঁটতেন। আমার দুখানা কচি পায়ের সেই সাধ্য ছিল না। কিন্তু রাগী বাবাকে সে কথা বলি কী করে! অবশ্য এক সময়ে বলতেই হল, চোখের জল চেপে, ভয়ে ভয়ে। বাবা পট করে কোলে তুলে নিলেন। কোলে নিয়েই আবার হাঁটা শুরু করলেন। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ছি কে জানে! ভোরবেলা জেগে দেখি মায়ের বুক ঘেঁষে শুয়ে আছি।

বাবার রেলের চাকরি। সুতরাং দুদিন পরপরই চলো মুসাফির, বাঁধো গাটরি।

কাটিহার। এক দিকে রেল-শহর, অন্য ধারে সিভিল টাউন। তখনকার ওই তুচ্ছ শহরের সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। আমরা থাকতাম সাহেবপাড়ায়। দেবদারু গাছের সারি ছিল পথের দুপাশে। রেলের যে বাংলোয় আমরা থাকতাম তার চারদিকে ঘেরা অনেকখানি জমি। গাছগাছালিতে ভর্তি। আর ছিল মায়ের হাতে-করা বাগান। কী ফুল যে ফুটত সেই বাগানে!

আবার মফস্বল। বিহার-বাংলায় মেশামেশি দ্বিপাক্ষিক জনপদ। প্রাদেশিকতা ব্যাপারটাই ছিল না তখন। সেই মিশ্র সংস্কৃতিতে বেশ জাঁক করেই পুজো হত। তবে রেল কলোনিতে নয়, হত সিভিল টাউনে। সেই অঞ্চলটা ছিল কিছু নোংরা, অপরিচ্ছিন্ন এবং ঘিঞ্জি। তবু সেইসব দীন পরিবেশও পুজোর উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। আমাদের হাজারি ঠাকুর আমাকে নিয়ে কত পুজো দেখিয়েছে। পা ব্যথা করলে তার কাঁধে উঠে পড়তুম।

কাটিহার ছেড়ে মাল জংশন। এ এক অদ্ভুত নির্জন জায়গা। দিনেদুপুরে বাঘ বেরোত। আমাদের কাঠের বাংলো বাড়ির পিছনেই ছিল হায়পাথার চা বাগান। তখন যুদ্ধ চলছে। তার মধ্যেই চলে এল পুজো।

মাল জংশনে ক'টাই বা লোক! স্টেশনের আশেপাশে রেলবাবুদের বাসা ছাড়া সামান্য কিছু লোকের বাস। তবু পুজো কি আর না হয়ে পারে! সেই অতি নির্জন জনপদেও একটা-দুটো পুজো ট্যাং ট্যাং করে ঠিকই হত। সেইরকম উন্মাদনা ছিল না, তবু সামান্য কিছু মানুষের উৎসাহই যেন লোকাভাবকে পূরণ করে দিত।

তারপর কত কত জায়গায়। আমিনগাঁও, লামডিং, বদরপুর, পাণ্ডু, আলিপুরদুয়ার। যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ানো।

যৌবন তখনও আসেনি। উদ্ভিন্ন কৈশোর। বিপজ্জনক বয়ঃসন্ধি। সেই সময় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা কখনও করতাম না। এমনকী দিদির বন্ধুরা ডেকে কথা বললেও অস্বস্তি হত। মেয়েদের সম্পর্কে এই বিমুখতা বাল্যাবধি।

অচলা নামে একটা মেয়ে ছিল। রং কালো, কিন্তু বড় বড় চোখ আর ঢলঢলে মুখ ছিল তার। বেশ লাগত তার মুখখানা।

লামডিঙে তখন মাঠে ময়দানে উদ্দণ্ড ডাংগুলি বা ক্রিকেট খেলে বেড়াই। কারও দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই, রুচিও নয়।

পুজোর প্যান্ডেলে এক সকালে বসে আছি। সঙ্গে দু-চারজন বন্ধুবান্ধব।

পিছন থেকে কে যেন ডাকল, এই রুনু।

তাকিয়ে দেখি, অচলা।

আলাপ ছিল না। একটু থতমত খেয়ে বললাম, কী?

তোদের বুধুকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।

বুধু আমাদের কাজের লোক। একটু পাগল। নানারকম অকাজ করে বেড়াত। খবর শুনেই ছুটলাম। গিয়ে দেখি বুধু দারোগাবাবুর সঙ্গে প্রবল লড়ালড়ি করছে। সে একটা দিশি কুকুরছানা পুষেছিল, তার নাম দিয়েছিল ইস্পাত। সেই ইস্পাতকে নিয়েই গণ্ডগোল। পাড়ার পটল নামে একজন লোক ইস্পাতকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সকালে। তাই নিয়েই মারপিট, ঘটনাটা তুচ্ছ, মিটেও গেল। কিন্তু সেই থেকে আলাপ অচলার সঙ্গে।

অচলা তাকায়। একটু করে হাসে। অর্থপূর্ণ চোখ, অর্থপূর্ণ হাসি।

একদিন বলল, তুই অমন হাঁ করা কেন?

হাঁ-করা মানে বোকা-বোকা। বললাম, কেন কী করলাম?

এমনভাবে আনমনে পথ হাঁটিস যেন দুনিয়ায় কিছু নেই। তুই আছিস আর রাস্তাটা আছে।

আমি একটু ওরকম। মাও বলে।

কাল জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। তাকাসনি কেন?

এমনি।

তোর জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম।

কয়েকদিন গেল। তারপরই একদিন পথে অচলা মুখোমুখি পথ আটকাল। হাতে একটা বই। আমার হাতে বইটা দিয়ে বলল, ভিতরে চিঠি আছে। দেখিস।

সে কী বুক কাঁপুনি আমার। চিঠি! আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র।

সেই চিঠি বাড়িতে খুলতে সাহস হয়নি আমার। এমনকী লোকালয়েও নয়। সাইকেল নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে টিলার পাশে হরিণের জঙ্গলের ধারে বসে সেই চিঠি কাঁপা হাতে খুলি। তাতে যা লেখা ছিল তা অনেকটা এরকম : বোকা কোথাকার, তুই কি কিছু বুঝিস না? কেন বুঝিস না রে? ভয় পাস? আমার চোখের দিকে একবারও তাকাতে পারিস না! আমি যে তোর জন্য কী পাগল! আমার সঙ্গে এবার পুজো দেখবি? শুধু তুই আর আমি। আর কেউ নয়।

না, অচলার সঙ্গে পুজো দেখা এ জীবনে হয়নি। তার আগেই বাবার বদলির অর্ডার এসে গেল।

পুজো প্যান্ডেল থেকে অগুন্তি প্রেম হয়েছে। প্রেম থেকে বিয়েও। আমার জানার মধ্যে রবীনদার সঙ্গে যমুদা বউদির। আলিপুরদুয়ার জংশনে তখন প্রেম থেকে বিয়ে একটা বিরাট ঘটনা। এক পুজো প্যান্ডেলে আলাপ হয়ে সেটা যখন বিয়ে অবধি গড়াল তখন জোড়ে রাস্তায় বেরোলে পাড়ার মেয়ে-বউরা ভিড় করে লাভ ম্যারেজের যুগলকে দেখত আর গা টেপাটেপি করে হাসাহাসি করত।

বিয়ের কয়েক বছর পর দুজনে সে কী ঝগড়াঝাঁটি। রবীনদা বলতেন, প্রেমে কী আর ওর সঙ্গে পড়েছিলাম, প্রেমে পড়েছিলাম ওর মেক আপ করা মুখের সঙ্গে। এখন মেক আপ উঠে গিয়ে আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে।

আর যমুনা বউদি বলতেন, বিয়ের আগে ইনিয়ে বিনিয়ে কত মিথ্যে কথাই না বলত। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, তোমাকে ছাড়া আর কারও দিকে তাকাতেই পারি না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এক জন্মের নয়।

আবার ভাবও হত। মিলেমিশে বেশ ঘরও করত দুজনে।

তখন রেলগাড়ি এত বেশি চলত না, তৃতীয় শ্রেণীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। প্রাক-পুজোর সময়টায় তখন ট্রেনে ভিড় হত ভয়াবহ। আমার এক দাদা কাটিহার থেকে প্রায় বারো ঘণ্টা ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে পূর্ববঙ্গে যান। এইসব বিপদ ও কষ্ট ট্রেনযাত্রীদের গা-সওয়াই ছিল। কিন্তু পুজোয় বাড়ি পৌঁছোনোর আনন্দে কষ্ট ভুলতে দেরি হত না।

এখন পুজোয় বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা কমছে। তার কারণ যৌথ পরিবার অবলুপ্ত হওয়ার ফলে বাড়ি জিনিসটার অর্থসঙ্কোচন ঘটেছে। তবে বাঙালি এখন পুজোয় বেড়াতে যায়।

আমরা বিশেষ বেড়াইনি। বাবার রেলের পাস থাকা সত্ত্বেও বেড়ানোর প্রবণতা একেবারে ছিল না বলে সারা ভারতবর্ষ আমার বা আমাদের কাছে ছিল অচেনা। আশ্চর্য, এই বেড়িয়ে বেড়ানোর শখ আমারও তেমন নেই। পুজোর আগে-পরে এই যে দলে দলে বাঙালি নানা দিকে বেরিয়ে পড়ে আমার কেন যেন সেরকম ইচ্ছেই হয় না। পাহাড়ে সমুদ্রে নয়, আমার বরং ভালো লাগে কাছাকাছি বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে বা নির্জন নদীর ধারে বসে থাকতে বা ঘরের কোণে বসে আপনমনে ভাবতে।

আমরা ছেলেবেলায় এত বেড়াতে যাওয়া দেখিনি। কেউ কেউ হয়তো যেত কিন্তু তখন বেড়ানোটা এমন সর্বজনীন প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়নি।

আর একটা ব্যাপার হল মেয়েদের কেনাকাটা। পুজো এলে এখন তো মেয়েরাই কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়েন। দোকানপাটে তাঁদেরই ভিড়। চল্লিশ দশকের গোড়ায় ময়মনসিংহে মেয়েদের কেনাকাটা ছিল অভাবনীয়। তখন কুলির মাথায় কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত। গাঁটরি খুলে বসলে মেয়েরা পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ঘিরে ধরত তাকে। এখনকার মতো এত ডিজাইন, এত রং, এবং বৈচিত্র্য তখন কোথায়! মেয়েরা বোধ হয় এত সাজতে জানতও না তখন।

আর আমরা ছোটরা যা পেতাম তা কহতব্য নয়। একই ছিট কাপড়ের জামা হত সবার জন্য। একই কাপড়ে প্যান্ট। কোনও কোনও বছর নতুন জুতো জুটত, সেই বিশ্রুত বাটার নটি বয় শু। সেই জুতোয় লয়ক্ষয় নেই।

তখন পুজোর সবচেয়ে বেশি আনন্দের ব্যাপার ছিল আত্মীয় সম্মেলন। পুজোর ছুটিতে প্রবাসী ছেলেমেয়ে বাড়ি আসত—পুজোর সেটাই ছিল উজ্জ্বলতম দিক। আমরা ময়মনসিংহে যেতাম, দাদু-ঠাকুমা জ্যাঠা-জ্যেঠির কাছে। আসত পিসিমারা তাদের ছেলেপুলে নিয়ে। সে এক মহা সম্মেলন। কলকাকলিতে ভরে থাকত বাড়ি। ওইসব পরিবার আমাদের শিখিয়েছিল যৌথ বেঁচে থাকার তুক। এখন ছোট ছোট পরিবারের ছেলেমেয়েদের হৃদয় তেমন প্রসারিত হতে পারে না।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে যখন কলকাতায় পড়াশুনো করি তখন শিলিগুড়িতে মা-বাবার কাছে যাওয়া ছিল বাঁধা।। দার্জিলিং মেল-এ উদ্দণ্ড ভিড়। ফার্স্ট ক্লাস পাস থাকা সত্ত্বেও আমি প্রায়ই যেতাম সেকেন্ড ক্লাসে এবং রিজার্ভেশন না করেই। তখন সকরিগলি মণিহারি ঘাট পেরোতে হত স্টিমারে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি তখন ভয়াবহ পথশ্রমের ব্যাপার। দুর্গাঠাকুর নয়, মায়ের মুখখানা দেখলেই তখন সব কষ্ট জল হয়ে যেত।

বাবা পুজো দেখতেন। একটু বড় হওয়ার পর আমার আর ইচ্ছে করত না প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ভিড়ে পুজো দেখে বেড়ানোর। মনে আছে, ইংরিজি বই পড়া শুরু করেছিলাম নুট হামসুনের 'প্যান' উপন্যাসটা দিয়ে। সেটা কিনে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির এক ডাকের কাকু হুইলারের স্টল থেকে। ট্রেনে পড়ার জন্য। ট্রেনে পড়া হয়নি, তবে কলকাতায় হোস্টেলে এসে সেটি পড়তে শুরু করি এবং আচ্ছন্ন হয়ে যাই। ওই যে নেশা চেপে বসল আজও ছাড়েনি। আমাদের বাড়িতে বাবার সংগ্রহে বিস্তর ইংরেজি বই। বাবা ছাড়া কেউ পড়ত না। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আমার নতুন নেশা হল সেইসব বই পড়া। মায়ের সঙ্গে সারাদিন ঘুরঘুর করি আর বই পড়ি, এই ছিল আমার পূজাবকাশ।

আজও পুজো কাটে ঘরের মধ্যেই। বইপত্রই পড়ি বেশি। বাইরে বেরোতে একটু আতঙ্কই হয়। আমার পাড়ার ৯৫ পল্লীর পুজো কমিটিতে আমাকেও রাখা হয়েছে। তাঁরা এসে প্রায়ই আমাকে ধরাধরি করেন একটু যাওয়ার জন্য। দায়সারাভাবে একবার হয়তো যাইও। কিন্তু ওই উদ্দীপ্ত জনস্রোতে গা ভাসানো আর সম্ভব নয়। যতই আকর্ষক হোক প্যান্ডেল, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, আমি শত হস্ত দূরে থাকি।

কলকাতাকে আমি ভালোবাসি বটে, কিন্তু সেটা পারসেন্টেজ ভালোবাসা। তার মনটা নয়। তার ভিড় নয়, পথঘাট নয়, যানবাহন নয়। ভালোবাসাটা এই কুশ্রী শহরের অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার মতো কালচারের প্রবাহটি। ভালোবাসা তার রুচি ও শিল্পবোধের প্রতি। তার সাহিত্যিপ্রাণতার প্রতি।

আর এইখানেই প্রজন্মের ফারাক। আমার ছেলেমেয়েরা ভালোবাসে কলকাতার পুজো। এই অসহনীয় ভিড়, এই ধুমধাড়াক্কাতেই তারা অভ্যস্ত। কাশফুল তারা দেখেনি। মা দুর্গার ঘরোয়া পুজোর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের কথা তারা শোনে বটে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না।

এটা ঠিক কথা, পুজো এক সামাজিক পার্বণ মাত্র। দুর্গাপুজোর সঙ্গে ধর্মাচরণের যোগ অতিশয় ক্ষীণ। কাজেই এটিকে ধর্মীয় আখ্যা দেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। দুর্গামাকে কেন্দ্র করে কিন্তু মানুষ বাঁচে। মৃৎশিল্পী, ডেকোরেটার, ইলেকট্রিশিয়ান, বেকার যুবক।

বিজয়া দশমীর পর বাড়ি বাড়ি নাড়ু, তক্তি, মোয়া খেয়ে বেড়ানোর যে আনন্দ ছিল তার স্বাদ এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে রুচিকর নয়। তারা নুডলস খায়, হ্যামবার্গার খায়, চাইনিজ খায়, তন্দুরি খায়। কোন দুঃখে গুচ্ছের গুড়ের জ্বাল দেওয়া বা চিনিতে পাকা দেওয়া নারকোল, চিড়ে, মুড়ি গিলবে? বাড়িতে বাড়িতে মেয়েরা যে অগাধ পরিশ্রমে সে সব খাবার বানাতো তা এখন অর্থহীন। বাড়িতে বিজয়ার পর অতিথি এলে

খাবার দেওয়ার নিয়ম অনেকে মানেই না। দিলেও দোকান থেকে কিনে এনে দেয়। ক্যালরি সচেতন বাঙালি আজকাল মিষ্টি এড়াতে শিখেছে। সুতরাং বিজয়ার লৌকিকতাও গেছে ভোগে। যাক, দুঃখ নেই।

বিবর্তন তো হবেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশো বছর পরও দুর্গাপুজো হবে বটে, কিন্তু এখনকার মতো তো আর নয়। তবে খোলনলচে পাল্টে যাবে। রূপ বদলাবে, প্রথা-প্রকরণ বদলাবে। আজকের নতুন প্রজন্ম তখন বুড়ো সেকেলে। এখনকার পুজোর কথা শুনে ভবিষ্যতের নতুন প্রজন্ম নাক সিঁটকোবে।

আবার কে জানে, শুভবুদ্ধির উদয় হলে মানুষ হয়তো জনসংখ্যা কমিয়ে ফেলবে, বাড়বাড়ন্ত হবে প্রকৃতির। আবার হয়তো নদীর ধারে ধারে আদিগন্ত কাশফুল আর শহরে গঞ্জের আনাচে-কানাচে ফুটবে শিউলি। মাইক থাকবে না। ঢাকি আসবে ঢাক ঘাড়ে করে। এক চালচিত্রের নীচে প্রতিমা আবার ফিরে আসবে।

কিংবা কে জানে কী হবে!

ভালোবাসার কাঙাল

মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই একদিন আমার সমগ্র সত্তা মুচড়ে ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে এসেছিল, এলেম আমি কোথা থেকে? মাঝে মাঝে হঠাৎ তৃণভূমির লুকোনো সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াত ওই প্রশ্ন। তার বিষে আমি যত বার জর্জরিত হয়েছি, তার সীমা নেই, সংখ্যা নেই। আজও ঘাতকের মতো সেই প্রশ্ন অলক্ষ্যে অপেক্ষা করে থাকে।

এই জীবন, এই স্পষ্ট সমগ্র জগৎ, এ কি একটা ঠাট্টা মাত্র? এসবের মানে কী? কোন উদ্দেশ্যে রচিত এই জড়জগৎ, এই চৈতন্য, এই প্রাণ? জবাব নেই। হেমন্তের কুয়াশার মতোই যেন সৃষ্টির সমস্ত সত্য কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। স্থির, নিরুত্তর।

মানুষের কাছে তার জন্মভূমি, তার মা এবং তার বাল্য কৈশোরের পারিপার্শ্বিক যে কতটা মূল্যবান এবং কতটা বিভাজ্য তা যে-কোনো মানুষই অল্পবিস্তর জানেন। আমি আরও বেশি করে জানি, তার কারণ আমাকে দেশ হারাতে হয়েছে। কিন্তু তখন আমি কিশোর; না, কিশোর নয়, বালক। তারও আগের যতবার আমাকে শৈশবে ঘরছাড়া হতে হয়েছে ততবারই ওই জন্মভূমির টান আমাকে আকুল করে তুলত। ময়মনসিংহ ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। যেখানে দাদু-ঠাকুমা-জেঠিমা, চার জেঠতুতো দাদা, ব্রহ্মপুত্র নদ, গন্ধলেবুর গাছ, পুষ্করিনী, করমচার চারা—এইসব আপাত তুচ্ছ এবং নশ্বর আকর্ষণসমূহ বিরাজ করত। আজ আর বাস্তবের সেই ময়মনসিংহ নেই। কিন্তু মনে মনে আজও তাকে গড়ে তুলি। এবং মনে মনে সেইখানেই পালিয়ে যাই।

আমার জীবনের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছেন আমার মা। মাকে ঘিরেই ছিল আমার ভালোবাসার জগৎ। কিন্তু আমি ছিলাম এক ভয়ংকর দুষ্টু এবং বজ্জাত ছেলে। পুরোপুরি হার্মাদ ধরনের। আর আমার মা ছিলেন ভারি শান্তশিষ্ট ধর্মপ্রাণ মহিলা। আমাকে সামলাতে মাকে হিমশিম খেতে হত। এই দুষ্টু ছেলেটিকে সামলানোর জন্যই মা আমাকে পাশে শুইয়ে কবিতা পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবির কবিতা। আর ওই কবিতা আমার মাথায় ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে ঘুরে বেড়াত। কী করে বোঝাই যে, এই রূপময় পৃথিবীতে আমি তখনই আকণ্ঠ উপভোগ করতাম!

তবু জীবনানন্দের উটের গ্রীবার মতো 'নিস্তব্ধতা' নয়, এক বিষণ্ণতা এসে হানা দিত আমার মনের মধ্যে। আর সে এমনই এক বিষাদ, এমনই এক অভিজ্ঞান-সংকট, এমনই এক আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, যা মানুষের অস্তিত্বকে নাস্তিতে নিক্ষেপ করে। এই সংকটের কথা আমি বহুভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু বোধহয় যন্ত্রণাকে ততটা সঞ্চারিত করতে পারিনি পাঠকের মধ্যে। তার কারণ এই যন্ত্রণার ব্যক্তিগত দহন কাউকে বোঝানো অসম্ভব। এই সংকট আমার একেবারে বাল্যকাল থেকে। পরে তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এবং একটা সময় আসে, যখন আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য হই। জীবনের এই মহাসংকটের সন্ধিক্ষণে আমাকে রক্ষণ করেছিলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। অকপটে বলি, এই সংকটকাল থেকেই আমার তৃতীয় জন্মের শুরু।

তৃতীয় জন্মের কথা বলি। তখন আইএসসি পড়তে গিয়ে কোচবিহারের কলেজ হস্টেলে আমার প্রথম মেলানকলিয়ার সূত্রপাত। এও সেই অভিজ্ঞান-সংকট, তবে দীর্ঘস্থায়ী। হস্টেল ছেড়ে মায়ের কাছে চলে গেলাম, তখন পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে রেল বাংলোয় আমাদের সংসার। মা আমার চোখমুখ দেখে কী বুঝলেন জানি না। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন আমার পইতে দেওয়া হবে। কিন্তু একটা মুশকিল ছিল।

পইতের সময় সপ্তনদী হয়। তার সপ্তম ঘর হচ্ছে সন্ন্যাসের ঘর। আর মাকে বিভিন্ন জ্যোতিষী বারবার বলেছেন যে, তাঁর বড়োছেলে অর্থাৎ আমার কোষ্ঠীতে প্রবল সন্ন্যাসযোগ বিদ্যমান। ফলে পইতে দেওয়া ঠিক হল বটে, কিন্তু মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ল। মনে আছে, সপ্তনদীর সময় মা আমাকে সপ্তম বৃত্তে পা রাখার অনেক আগেই আটকে ফেলেছিলেন। তবু বৈরাগ্য যে আমাকে মুক্তি দেয়নি, সেটা টের পেয়েছিলাম দণ্ডি-ভাসানের দিন।

ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতে বুকজলে নেমে যখন দণ্ডি ভাসিয়ে দিচ্ছি, তখন সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে আবছা আলোয় বৈরাগ্যের ছাইরঙা দিক-দিগন্ত। স্রোতে ভেসে যাওয়া আমার গৈরিক বসন এবং দণ্ডি আমাকে এমন সম্মোহিত করেছিল যে, মনে হল আমার ঘর-বাড়ি-পিছুটান কিছু নেই। এক মহাজগৎ দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে আকুলভাবে টেনে নিতে চাইছে। বিপদ বুঝে আমার জ্ঞাতিভাই তারাপদ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু তবু ওই বাইরের টান অনেকদিন আমাকে আনমনা করে রেখেছিল। আজও সেই টান টের পাই মাঝেমধ্যে।

আমার ছোটোভাইয়ের জন্ম হয়েছিল আমার জন্মের দশ বছর পর। ভাই জন্মানোর খবরে আমার সে কী উল্লাস! ভাইকে আমি খুবই ভালোবাসি। আর সেই ভালোবাসারই সঞ্চার ঘটেছিল 'রঙিন সাঁকো' উপন্যাসটিতে। হাওড়ার বালিতে বসে লিখেছিলুম উপন্যাসটি। ভালোবাসার কথা লিখতে, বলতে বা ভাবতে গেলে আমি বড়ো দ্রবীভূত হয়ে যাই। আবেগ মথিত করে আমাকে। বাবার চাকরি রেলে, বদলি-বহুল সেই চাকরির টানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দু-দিন পরপর ডেরাডাণ্ডা তুলে স্থানান্তরে যেতে হয়। তার উপরে স্বাধীনতা এবং দেশভাগজনিত কারণে আমাদের লেখাপড়ার বারোটা বেজেছিল। উনিশশো পঞ্চাশ সাল নাগাদ আমাকে পাঠানো হয় কোচবিহারের স্কুল হস্টেলে। সেই থেকে শুরু আমার দীর্ঘ মেস-হস্টেল-বোর্ডিং-এর জীবন। বরাবর মায়ের সঙ্গে থাকার অভ্যাস আমার। মাকে ছেড়ে দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না।

শুধু মা নয়, যে দিদি আমার কাছে নানা নির্যাতন সয়েও আমার বইপত্র, খাতা-পেনসিল গুছিয়ে রাখত, যে দুটো খুদে ভাইবোন ছিল আমার ভীষণ প্রিয় আর অনুগত, তাদের ছেড়ে দূরে যাওয়া ছিল বেজায় শক্ত।

দূরে দূরে থেকে আমার ভিতর পরিবার পরিজনের প্রতি এক অবোধ প্রবল ভালোবাসার জন্ম হয়। এই আকুলতাকে আমি নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি আমার লেখায়। তবু মনে হয় আমার ভাষাজ্ঞানের অভাবে, আমার প্রকাশভঙ্গির ব্যর্থতায় আজও বুঝি সবাইকে আমার ভিতরকার ভালোবাসার কথাটা বোঝাতেই পারিনি। বেশ কিছুদিন আগে আমার বাবার যখন পরিণত বয়সে দেহান্ত হয়, তখন তাঁর শেষকৃত্য করার সময়ে শিলিগুড়ি শ্মশানে বাবার শিয়রে বসে তাঁর মাথাটা বুকে নিয়ে শিশুর মতো শুধু বলে গেছি, আমি তোমাকে কত ভালোবাসতাম তা কি বুঝতে পেরেছ বাবা? কখনও বুঝেছ? এই একই কথা আজও বিদেহী মাকে কতবার জিগ্যেস করি।

আমার অকথিত ভালোবাসার কথা কি বোঝে, বুঝতে পারে এই পৃথিবী, এই কলকাতা, এই দেশ? ভাষা দিয়ে সব কি প্রকাশ করা যায়? একবুক ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়াই, কাঙালের মতো চাই আমার বউ, ছেলে, মেয়ে সেই ভালোবাসার তরঙ্গ টের পাক। টের পাক চারদিককার মানুষজন, ঘরের চড়াইপাখিরা, টের পাক স্থাবর-অস্থাবর যতকিছু। এমনও হয়েছে, ভাষাহীন বোবার মতো বসে থেকেছি দিনের পর দিন, কলমের কালি গেছে শুকিয়ে। লেখা হয়নি। উপযুক্ত ভাষার অভাবে কত কথা জানানোই গেল না মানুষকে।
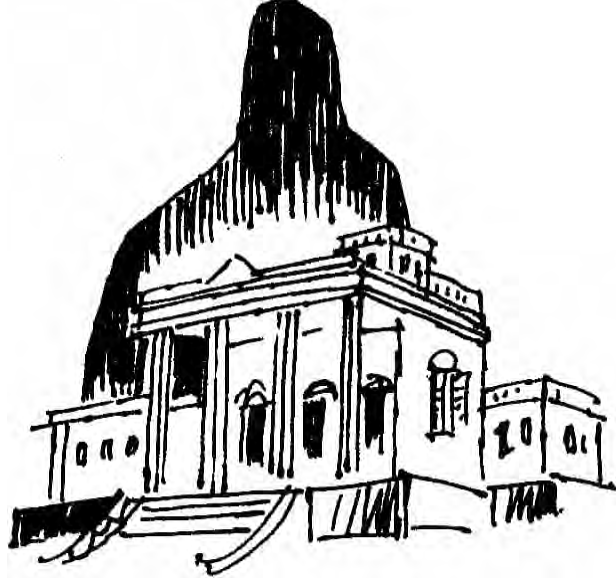
নিশুতরাতের মেমসাহেব

সাতঘাটের জল খেয়ে বড়ো হতে হয়েছে আমাকে। সমতল ছেড়ে পাহাড়ে, পাহাড় ছেড়ে জঙ্গলে, জঙ্গল ছেড়ে টিলার মাথায়, ভূত-ভূতুড়ে সব জায়গায়। বাবার চাকরিটি ছিল অবিরাম বদলির। আর আমাদেরও অবিরাম ঠাঁইনাড়া। বছরে বছরে বদলে যেত পরিবেশ, মানুষজন, প্রকৃতির পটভূমি, ভাষা। বদলে যেত অনুভূতি, বোধবুদ্ধি।

তখন কতই বা বয়স হবে! পাঁচ বা ছয় বছর। বাবা রেলে চাকরি পেয়ে কাটিহারে চলে গেলেন। মনোহর পুকুরের ভাড়ার বাড়ি ছেড়ে তাঁর পিছু-পিছু আমরা। মা, দিদি, আমি। কাটিহারে গিয়ে সাহেবি কেতার বাংলো দেখে তো আমরা হাঁ। টিনের চালের আর মাটির ভিটের ঘরে জন্ম, বড়ো হওয়া। কলকাতায় দিনকয়েক পাকাবাড়ির আশ্রয় জুটেছিল বটে, কিন্তু সে তো পায়রার খোপ। আর, এ যে আমাদের গেঁয়ো চোখে প্রাসাদ! চারদিকে বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা বাগান। সামনে দুধারে দেবদারুর সারিওলা পাথরকুচির পথ। না, আমার চেনা জন্মভিটের সঙ্গে কাটিহারের কোনো মিল নেই। ব্রহ্মপুত্র নেই, পুকুর নেই, ঢেঁকিশাকের জঙ্গল নেই, শীতে নদীর বুকে জেগে ওঠা চর নেই। তবু, কাটিহারেরও এমন কিছু ছিল, যা আমার চোখে মায়া জাগিয়েছিল। অন্য রকমের সব গাছ, পাখি, তাতে অন্য রকম গন্ধ, অন্য রকমের পোশাক, কেতা। সাহেবসুবোয় ভরা ব্রিটিশ আমলের সেই কাটিহারে গিয়ে আমরা কিছুটা থতমত, অপ্রতিভ।

ভূত নিয়ে যে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে, তার সূত্রপাত এখানে এসে। জীবনে প্রথম ভূতের সঙ্গে মোলাকাত। তবে মেমসাহেবের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটেনি কখনও। এখনও পর্যন্ত সেই মেমকে চোখে দেখিনি, শুধু জুতোর শব্দ শুনেছি। দিনের পর দিন নিশুত রাতে আমার এবং শুধু আমারই ঘুম ভাঙিয়ে সে এসে চলে গেছে। কোনো বার্তা বয়ে আনত সে আমার জন্য? কী জানি! না, আজও জানা হয়নি আমার। তবে এটুকু জানি, পারিপার্শ্বিক থেকে যেটুকু দেখা যায়, যেটুকু অনুভব করা যায়, দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য, জড় ও যাবতীয় যা আছে, তা-ই সব নয়। আমাদের জানার বাইরে, অন্য মাত্রায়, অন্য তরঙ্গে

অজানা কত কী যে রয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। হায়, আমাদের মস্তিষ্কের বড়াই! মানুষের যেটুকু মস্তিষ্কে দেওয়া আছে, তার অতিরিক্ত মেধা তার নেই। বিশ্বরহস্যের কাছে তার বিজ্ঞানদর্শন এখনও নতজানু।

স্মৃতি হাতড়ে একটা ঘটনার কথা বলি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা কানে আসছে। ঋতুটা তখন হেমন্ত। হঠাৎ এক বিকেলে আচমকা হাজারটা যুদ্ধবিমানের শব্দে আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। মা কিছুটা ভীত হয়ে ছুটে এলেন। নড়া ধরে আমাদের ভাইবোনকে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরে। দরজা-জানালা আঁট করে বন্ধ করে দিলেন। পাগলা এক টর্নেডো ফাঁকা জমির উপর দিয়ে ধেয়ে এল। সেই ঝড়ে মজবুত একতলা বাড়িও থরথর করে কাঁপছে। বাইরে গাছগাছালি ভেঙে পড়ছে প্যাঁকাটির মতো। আমাদের একতলা বাড়িটা সেই ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। সেই ভয়ে মা এবং কাজের লোকেরা হাট করে খুলে দিল জানালা-দরজা। আমরা দুই ভাইবোন একটা টেবিলের তলায় জড়োসড়ো হয়ে অপার বিস্ময়ে দেখলাম, কী এক উন্মত্ত ঝড় আমাদের ঘরে ঢুকে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। চেয়ার-টেবিল উলটে পড়ছে। পড়ে ভাঙছে কাচের বাসন। ভয়ংকর দুলছে সিলিং ফ্যান। ঘরের ভিতর দিয়ে মেল ট্রেনের মতো বয়ে যাচ্ছে ঝড়, কুটোকাটা, পাখির বাসা, গাছের পাতা, টিনের কৌটো, আরও কত কী! চওড়া জাফরি ঘেরা বারান্দা পার হয়ে তেরছা বৃষ্টির বল্লম বিশাল ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চলে যাচ্ছে অনায়াসে। আমার এই বুড়ো বয়স অবধি ওরকম ভূতুড়ে ঝড় আর দেখিনি। ঝড় থামতেই ছুট লাগালাম। গিয়ে দেখি পিছনের বিশাল আমগাছ ভেঙে শ'য়ে শ'য়ে বক মরে পড়ে আছে। ভেঙেছে বাসা, ডিম। মরেছে যত কুসি কুসি ছানা। সেদিন থেকে বুঝেছিলাম, আপাত শান্ত, সুন্দর প্রকৃতির ভিতরেই লুকিয়ে থাকে মহম্মদি বেগ। কখন রূপ পালটে ফেলে কে জানে!

কাটিহার ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু মেমসাহেব ছাড়ল না আমায়। বাবা এক সাহেবের কাছ থেকে সোফাসেট ও চারটে চেয়ার সমতে একখানা মস্ত বার্মা সেগুনের ডাইনিং টেবিল কিনেছিলেন। নিশুত রাতে মেমসাহেব তার হাই হিলের শব্দ তুলে এসে মাঝে মাঝেই পরিক্রমা করে যেত টেবিলটা। সেই শব্দ, সেই অনুভূতিটা টের পেতাম শুধুমাত্র আমিই। কেন? এই প্রশ্নের জবাব আজও মেমসাহেব নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছে।

২

শৈশব-কৈশোরে নানা কল্পনা, ভয়, অনুভব, সাধ আমার চারদিকে বুনে যেত লতাতন্তুজাল। বোধের প্রথম যখন উন্মেষ ঘটল, সেই ঊষাকালের আলো-আঁধারির কথা বলছি। কেন জানি মনে হয়, শৈশব খানিকটা ঊর্ণনাভের মতো রচনা করি আমরা। মা, ঠাকুমা, জেঠিমা, পিসিমা, মাসিমা, দিদিমাদের নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপের ভিতর স্নেহ, প্রশ্রয়, আদিখ্যেতার জারক রসে একটু একটু দুষ্টু হয়ে উঠেছি তখন, একটু একটু দামাল। চোখে অপার রূপমুগ্ধতা, বিস্ময়, ভয়। সেই তখন থেকেই আমার মতো করে শৈশব রচনা। পাঠকের কাছে এ আমার শৈশবের সাহকাহন নয়, বরং অনুভূতিগ্রাহ্য এই চারপাশটাকে বারবার আবিষ্কার করার তাগিদ থেকেই এত কথা। যা প্রত্যক্ষ, যা স্পর্শযোগ্য, যা ফলিত, যা অনুভূতিযোগ্য, তা ছাড়া কি আমাদের পারিপার্শ্বিকে আর কিছুই নেই? ইন্দ্রিয়াতীত কিছু? ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে শম্ভুগঞ্জের জলাভূমিতে যে নীলচে শিখা লাফিয়ে উঠত মাঝে মাঝে, তা ছিল ভূতের লণ্ঠন। কাকে বলে আলেয়া? কী তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সেই বয়সে আমার জানা ছিল না। জানা ছিল না বলেই গা ছমছম করা যে আনন্দটা ভয়ের সঙ্গে মিশে থাকত সঙ্গোপনে, তা আমার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মতো। যখন বহুরূপী আসত বা মুশকিল আসান, তখন তো জানাই ছিল মানুষই ওই রকম বিকট সাজ সেজে আসে। তবু, ঠাকুমা বা জেঠিমার কোলে উঠে আঁকড়ে ধরে থাকতাম ভয়ে। কিন্তু, তার মধ্যে যে আনন্দের শিহরণও মিশে থাকত, তা আজ বেশ বুঝতে পারি। কখনও কখনও মৃদু ভয় বড়োই উপভোগ্য, অতি ভয় মারক।

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায়

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে/হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।।/ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো —'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,/জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

আমার জন্মঋতু হেমন্তকে আবাল্য যেমনটা চিনে এসেছি এতকাল, তা অনেকটা ওই রকমই। হেমন্ত মানেই রহস্যময়ী কুয়াশা, হিমের রাতে ভূতুড়ে আঁধার, দীপান্বিতায় আলোর উৎসব আর আকাশপ্রদীপ জ্বালানো।

মনে আছে যতবার আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়েছি ততবারই এক গা-শিউরানো অশরীরী অনুভূতি হয়েছে। রঙিন কাগজের ঘেরাটোপে একটি মাটির প্রদীপকে বাঁশের ডগায় বেঁধে উঁচুতে তুলে দেওয়া আয়াসসাধ্য কাজ ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল দেবতারা এবং বিগত পূর্বপুরুষদের আত্মারা পাছে শূন্যমার্গে পথ হারিয়ে ফেলেন, তাই ঘন কুয়াশায় ওই দীপটি তুলে ধরার নিয়ম। আমি সন্ধের পর প্রায়ই ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশপ্রদীপটির দিকে চেয়ে থেকেছি, কাউকে কি দেখা যাবে? বিশেষ করে আমার প্রিয় দাদুকে?

পূর্বপুরুষেরা কীরকম ছিলেন কে জানে! হয়তো স্নেহশীল, সজ্জন, নিরীহ, ধর্মভীরু। ঠিক যেমন মানুষ আমার পছন্দ। হয়তো আমার প্রিয় দাদুর মতোই তাঁরা। আমার প্রশ্রয়দাতা এবং সর্বংসহ দাদুর প্রতি আমার চিরকালীন পক্ষপাত। আমার মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তার আগেই আমাকে কিছু জাগতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা আমি আজও ভুলে যাইনি। হেমন্তে আকাশপ্রদীপ জ্বালানো সেই শিক্ষার একটা।

আজকাল, এখনও কলকাতার আনাচে-কানাচে রুগণ গাছেও শিউলি ফোটে। ছাতিমের গন্ধ এখনও ডিজেলের বিষবাষ্পকে ছাপিয়ে এসপ্ল্যানেডেও আমাদের নাসারন্ধ্রে হানা দেয়। কিন্তু একসময়ে এই ঋতুতে যে-লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্যামাপোকাসহ নানা ভ্যারাইটির পতঙ্গের সঞ্চার ঘটত আবহে, বেশ কয়েক বছর তাদের দেখা নেই। কোনও রহস্যময় কারণে তাদের প্রজনন বন্ধ হয়ে গেল কি না কে জানে? নাকি এ-ও সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়েরই ফল? আর বিটকেল গন্ধের সেই গান্ধিপোকা? তাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শও আজকাল তেমন পাচ্ছি না। প্রশ্ন ছিল, সারা বছর এদের দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু ঠিক এই কুয়াশার সঙ্গেই যেন তারা ঝাঁক বেঁধে জন্মায়।

আর কী আশ্চর্য জীবন তাদের! ঠিক স্ফুলিঙ্গের মতোই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল, সেই তারি আনন্দ। স্ফুলিঙ্গের জায়গায় পতঙ্গ বসিয়ে নিলেও বেমানান হয় না। ক্ষণজীবী এই হৈমন্তী পোকারা কেন যে মরবার জন্যই জন্মায়! আজ বুঝি, আমাদের

দীপাবলি, ভারতের দেওয়ালি এই সমস্তই কালী বা লক্ষ্মীর আরাধনার পিছনে এক ব্যাপক নিধনযজ্ঞ। পোকা মারবার জন্যই না লকলকে শিখার লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো! মানুষ তো জানে, আগুন দেখলে পোকারা আর স্থির থাকতে পারে না, দূর দূর থেকে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দেবেই তারা। এবং মরবে। পরদিন সেই সব নির্বাপিত প্রদীপের তলায় লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের মৃতদেহ ঝাঁট দিয়ে জড়ো করলে কয়েক সের হত। এই নিষ্ঠুর নিধনযজ্ঞকে মানুষ কী সুন্দর পূজার মোড়কে আড়াল করেছে!

আমার বড় জানতে ইচ্ছে হত, সারা বছর এই পোকাদের তেমন দেখা যায় না কেন? এরা তখন কোথায় থাকে? কোথায় থাকে এদের মা-বাবারা? শুধু শরৎ হেমন্তে যেন হঠাৎ ঘাস থেকে, মাটি থেকে পঙ্গপালের মতো পোকারা শরীর বেয়ে উঠে আসে। কামড়ায় না, হুল দেয় না, কানে বা চোখে ঢুকে কিছু উৎপাত করে, পোশাকের ভিতরে ঢুকে গায়ে সুড়সুড়ি দেয়, বিপজ্জনক নয়, তবে বিরক্তিকর। আর এই সময় পোকার ভোজ খেয়ে আমাদের দেওয়ালের টিকটিকিরা কেমন গোদা আকার ধারণ করে। ওজন বেড়ে যায় কয়েকগুণ।

আজকাল কলকাতার বাজারে সারা বছর ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক চাষ নানা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফলস্বরূপ। তখন তো এমন ছিল না। হেমন্ত সম্পন্নতার ঋতু। নতুন চাল, ছোট ছোট নানা নাকফুল কানফুলের মতো ফুলকপি, টেনিস বলের সাইজ বাঁধাকপি। তার পরতে পরতে যেন ঢুকে থাকত হেমন্তের কুয়াশা আর শিশিরের জল। গলায় কলসি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত খেজুরগাছ। খুব ভোরবেলায় মাটির হাঁড়িতে রস বিক্রি করতে আসত ব্যাপারি। সেই রসে জুড়িয়ে যেত অন্তরাত্মা। 'গেলাসে গেলাসে পান করি'-র পরেও তৃষ্ণা থেকেই যেত। সেই বিস্ময়গুলো আজ আর নেই।

চোরা বিশুষ্ক বাতাস উত্তর থেকে হিম বয়ে আনে। গাছেদের তেমন এক্সপ্রেশন নেই। হয়তো নেই, কিন্তু আমরা ঠিক টের পেতাম, তার প্রাণ করে 'দুরু দুরু, পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।' শালগাছের বড় পাতা যখন ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে সশব্দে পড়ত, তখন প্রত্যেকটা পতনই ছিল যেন ঘটনা।

সব বৃক্ষই কিন্তু পত্রমোচী নয়, আর এদেশে তেমন ব্যাপক তুষারপাত ঘটে না। ফলে শীতপ্রধান দেশের বিখ্যাত 'ফুল' আমাদের নেই। তবু যে-শীত আমাদের ছেলেবেলায় লেপের ওম-এর ভিতরেও চোরের মতো সিঁদ কেটে ঢুকত, তা এখন আর কোথায়? যে-বিশুদ্ধ ও নির্মম শীতের সঙ্গে কাটিহার, লামডিং, বদরপুর, আমিনগাঁও, দোমোহানি, মাল জংশন, দেওঘর বা ঝাড়গ্রামে আমাদের দেখা হয়েছিল, সে আমাদের শরীরের প্রতিটি হাড়ে কাঁপন তুলে দিত। আর সেই শীত নিয়মমাফিক তার দূত পাঠাত এই হেমন্তে। না জানা ছিল পশ্চিমি ঝঞ্ঝা বা বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তের কথা, না ছিল বিশ্বের উষ্ণায়ন। দুর্গাপূজার আগেই ঘরে ঘরে লেপ-কাঁথা রোদে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। রাতে শুতে গেলে কাঁথাকানি গায়ে না টানলেই চলত না। হেমন্তেই লেপ-কম্বল দরকার হয়ে পড়ত। সন্ধের পর বেরোলেই গায়ে আলোয়ান, হাফ সোয়েটার।

আমার বড় পিসেমশাই মুলোর শাক দিয়ে এক থালা ভাত তুলে ফেলতেন। বলতেন, আর কিছু লাগে না। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। মরা মাটিতে কৃত্রিম রাসায়নিক ঢুকিয়ে আর পোকা মারার ওষুধ দিয়ে এবং অসময়ে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ফসল ফলিয়ে মানুষ যা সব কেরদানি করেছে, তাতে শাকপাতার আসল স্বাদটাই ঝাড় হয়ে গেছে। কয়েকদিন লন্ডনে সস্ত্রীক থাকতে হয়েছিল। আমি বাজার করে আনতাম, স্ত্রী রান্না করতেন। দেশের তুলনায় বহু গুণ বেশি দামে কেনা ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন। মুখে দিয়ে কোনওটাকেই সেটা বলে মালুম হত না। কোথাকার ফলন কে জানে! অথচ কী তাদের পুরুষ্টু ও দেমাকি চেহারা। আজকাল কলকাতার সবজিতেও লন্ডনের সেই স্বাদ।

খেত-খামার দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সবুজ ছোলা শুঁটি ছাড়িয়ে খেতে খেতে পথশ্রম হালকা হয়ে যেত। আর ঝলসানো ভুট্টা! এখনও কলকাতার পথেঘাটে বিক্রি হয়। কিন্তু ভুট্টা থাকলেও, বয়স এবং দাঁতের জোর

তো আর বসে নেই!

হেমন্ত এক অপরূপ ঋতু। অন্তত এই পোড়া বঙ্গভূমে। আমার সবচেয়ে প্রিয় শরৎ, তার পরই হেমন্ত। এই দুই ঋতু যত জাদুবিদ্যা জানে, তত আর কেউ নয়। তাদের আস্তিনে যত লুকনো তাস, তা বের করে লহমায় পাল্টে দেয় চরাচর। শরতের অপার্থিব আলো আর ছায়া, ক্ষণে ক্ষণে মেঘবৃষ্টি আর রোদ হেমন্তে এসে প্রগাঢ় এক রহস্যের মোড়কে আড়াল করে সব কিছু। পৃথিবীকে গভীর গভীরতর মনে হয়।

ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমার বাল্যকাল এক জায়গায় কাটেনি। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে বারবার হেঁচকা টানে এক জায়গা থেকে উৎপাটিত আর-এক জায়গায় গিয়ে রোপিত হয়েছি। আর কী অদ্ভুত সেইসব জায়গা, যা উত্তরবঙ্গে, বিহারে, অসমে ছড়িয়ে রয়েছে।

কবুল করি, সেই বাল্যকালেও দূষণের ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, যখন সকাল-বিকেল লক্ষ লক্ষ বাড়িতে ঘুঁটে দিয়ে কয়লার উনুন জ্বালানো হত। সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলত, নাক জ্বলত, শ্বাসের কষ্ট হত, কাশি হত। রেহাই ছিল না। কয়লার আগে ছিল কাঠের জ্বাল। তারও জ্বালাযন্ত্রণা ছিল। হেমন্তের কুয়াশা যে তখনও বিশুদ্ধ ছিল না তা জানি। আজও সেই ধোঁয়াশাই গ্রাস করছে আমাদের।

কলকাতার মতো বাঁধানো শহরে ঋতুচক্র টের পাওয়া কিন্তু কঠিন। গ্রীষ্ম বর্ষা ঠিক আছে, কিন্তু অন্য সব সূক্ষ্ম ঋতু একটু ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে। যেমন বিশ্রুত বসন্তকাল। কাব্যে ও প্রাচীন শাস্ত্রে এই ঋতুর বন্দনার অবধি নেই। প্রেমের ঋতু। হৃদয় বিনিময়ের উপযুক্ত কাল। সে হয়তো ছিল কখনও। কিন্তু এখন শীত যেতে না-যেতেই গরমের থাবা এমন নেমে আসে যে, বসন্ত চৌপাট। তেমনি শরৎ আর হেমন্তও বিপন্ন প্রজাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিনগাঁও বা লামডিং বদরপুরে টিলার ওপর স্থিত বাংলো বাড়ি থেকে আমরা যে-শরৎ আর হেমন্তকে দেখেছি, তাঁরা কলকাতাতেও বছর বছর আসেন বটে, কিন্তু বড্ড বুড়ো বুড়ো, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, লাবণ্যহীন চেহারা। শুধু আদলটুকু বোঝা যায়, এই যা।

ত্রিশের দশকের শেষ এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে আমি কয়েক বছর কলকাতায় ছিলাম—খুব ছোট—তবু মনে আছে বেশ যে, এ শহরে তখন গাছপালা ছিল। প্রচুর গাছপালা, ফাঁকা পরিসর, ঝোপঝাড়। মনোহরপুকুরের নিরিবিলি রাস্তায় দাদুর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোকিলের ডাক শুনেছি। কতবার হাত থেকে খাবারের ঠোঙা ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে চিল। পেঁচা ছিল, বাদুড় ছিল। বছর ত্রিশেক আগেও যাদবপুরের কালীবাড়ি লেনের এক বাড়িতে বুলবুলি পাখিকে জানালার পাশে শেফালি গাছে বসে থাকতে দেখেছি। এখন ভারতে চারটি মহানগরের মধ্যে কলকাতাকেই সবচেয়ে বৃক্ষহীন, প্রকৃতিহীন বলে মনে হয়। সবচেয়ে বেশি বৃক্ষবান দিল্লি।

কলকাতায় হেমন্তের সঞ্চার যত দুর্বলই হোক, আজও গ্রামগঞ্জে, বাংলার আনাচে-কানাচে তার মায়াবী সঞ্চার। তার কুয়াশা, ছাতিমফুল, তার মৃদু শীত আর কুহক নিয়ে। পুরনো জাদুবিদ্যা সে তো আজও ভোলেনি। লহমায় সে আজও চরাচর জুড়ে তার প্রবল মায়া বিস্তার করে দেয়। মানুষ আজও সম্মোহিত হয়।

আজও টের পাই মায়ের গায়ের গন্ধ

আমি মা-আঁকড়া ছেলে। মাকে ঘিরেই আমার গোটা জগৎ, যত দিন না দেশভাগ এবং তজ্জনিত প্রবাদ আমাকে নির্বাসিত করেছিল বৃহত্তর জগতে।

দেশভাগ হল বলেই ভেসে পড়তে হল আমাদের। বাবা বদলি হলেন অসমে। তারপর উত্তরবঙ্গ, ফের অসম। কিন্তু সেসব জায়গায় তখন তেমন স্কুলটুল ছিল না। আমার আর দিদির লেখাপড়ার বারোটা বাজছিল। তাই আমরা প্রেরিত হলাম অন্যত্র, আত্মীয়ের আশ্রয়ে। তারপর শুরু হয়েছিল আমার বোর্ডিং আর হস্টেলের জীবন। মায়ের কাছছাড়া হয়ে থাকার যে কী গভীর মনোবেদনা, তা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। মা ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার। আনমনা, ভুলো স্বভাবের ছিলাম বলে আমাকে নিয়ে মায়ের উৎকণ্ঠা আর উদবেগ ছিল সবচেয়ে বেশি। দূরে নিক্ষিপ্ত হলেও এক অদৃশ্য সুতোর টান মা নামক সত্তার কেন্দ্রাতিগ টানে অব্যাহত রেখেছিল আমার আবর্তন।

গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটি হলেই মায়ের কাছে যাওয়ার যে আনন্দ, তার বুঝি কোনো তুলনাই নেই। আমার ভুবনজোড়া ছিল মা। ছুটিতে রেল কোয়ার্টার্সের বাড়িতে এসে পৌঁছলে মনে হত, এমনটি আর কোথাও নেই। ভালোবাসায় সে এক আশ্চর্য অবগাহন।

ক্রমে বড়ো পরিবারে ভাঙন শুরু হল। 'দেশের বাড়ি'র অস্তিত্ব বলে কিছু রইল না। দাদু প্রয়াত, ঠাকুমা পিসিমার বাড়িতে—তবু ভাইবোন, মা-বাবা আর বাবার পিসি বালবিধবা এক ঠাকুমাকে নিয়ে সেই পরিবারটির মধ্যে কী এক অপার্থিব মায়ার বন্ধন ছিল। সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আমার মা। তাঁর দুটি হাত, তবু কেন যে তাঁকেই দশভুজা বলে মনে হত!

আমার তখনও অক্ষরজ্ঞান হয়নি। দুপুরবেলায় খাওয়ার পর মনোহর পুকুরের দোতলা বাসায় লাল মেঝেতে মায়ের কাছ ঘেঁষে শুতাম, আর মা পড়ে শোনাত রবি ঠাকুরের কবিতা। মায়ের মুখের সেইসব কবিতা আমার ভিতরে ঢুকে যেত নির্ঝরের মতো।

কবে চলে গেছে মা। বাবা। এখনও মায়ের গায়ের গন্ধ স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে আসে। আমাকে নিয়ে যায় আশ্চর্য শৈশবে। দুর্গামূর্তির মুখে বারবার তাঁরই মুখের আদল দেখতে পাই। পৃথিবীর নোঙর তুলে মা কবেই যাত্রা করেছেন। কিন্তু মানুষ তো দেহেই বাঁচে না, বেঁচে থাকে আত্মদানের স্মৃতিতে, স্মরণে, মননে। আজও রোজ সকালে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করে পিতৃস্তুতি ও মাতৃস্তুতি করি, তাদের জলজীয়ন্ত টের পাই। প্রয়াত বলে মনে হয় না। মনে হয়, একটু আড়ালে আছেন মাত্র। দুটি জীয়ন্ত চোখ বড়ো মায়ায়, ভালোবাসায় চেয়ে থাকে আমার দিকে। আমার পূজা বুঝি নিত্যই গ্রহণ করেন তাঁরা।
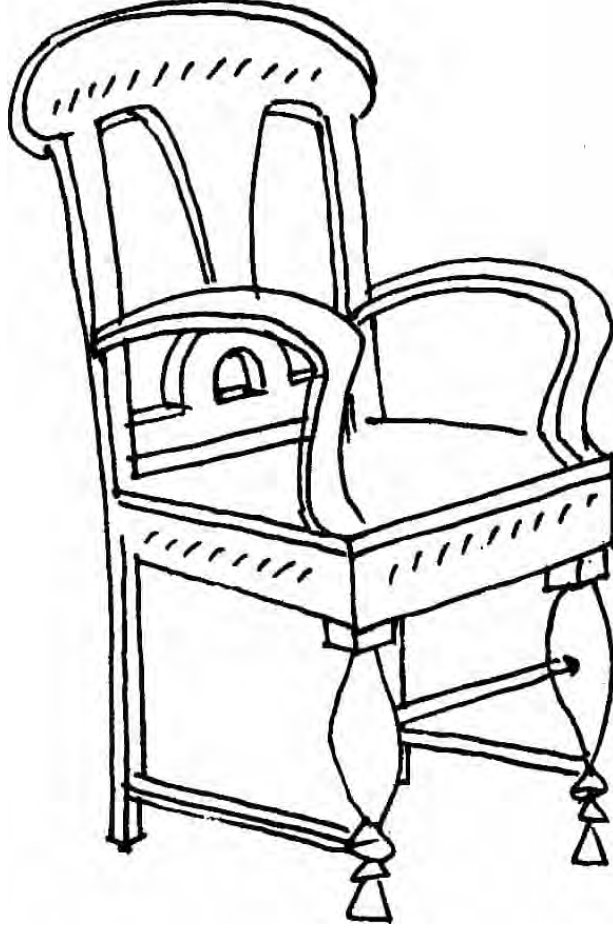
যা আর কোথাও নেই

শীতের এক ভোর রাতে, ঘুমচোখে, বাড়ির বাইরের মাঠে, অন্ধকারে আমি পা দিয়েছিলাম পিঁপড়ের বাসায়। লাল পিঁপড়ে মুহূর্তের মধ্যে আমার দু পায়ে ঊরু অবধি বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের সেই মরণ-কামড়ের জ্বালা আমার ঘুমের চটকা ভেঙে দিয়েছিল। অত পিঁপড়ের যৌথকামড় আমি আর কখনও খাইনি। জ্বালা কবে উধাও হয়েছে, রয়ে গেছে তার স্মৃতি। সেই রাত্রিশেষে আমরা ময়মনসিংহ ছেড়ে ভারতের ট্রেন ধরেছিলাম। তখন আমি নিতান্তই বালক, তবু বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে আর আমাদের ঠাঁই নেই। এই যাওয়াই যাওয়া। তাই কি পিঁপড়েরা ওইভাবেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল? ওই বারবাড়ির উঠোনে রোজ লাফঝাঁপ করেছি, খেলেছি, কই কখনও পিঁপড়ে কামড়ায়নি তো! সেই ভোররাতে তারা কী করে এল ঠিক আমার বিদায়যাত্রার পথটিতে!

শরীরের জ্বালা থাকে না, স্মৃতিতে থাকে তার মৃদু রেশ। সেইটে আছে। আজও আছে।

দেশ স্বাধীন ও ভাগ হয়েছে এটা তখন লোকমুখে খুব শুনছি। কিন্তু তত বুদ্ধি নেই যে ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারি। কিছু হচ্ছে, একটা কিছু হচ্ছে। বড়রা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, অনিশ্চিত আশঙ্কায় কিছুটা জবুথবুও। আমাদের—অর্থাৎ ছোটদের তত কিছু হচ্ছিল না। চারদিকে একটা কিছু ঘটছে—কিন্তু ওসব বড়দের ব্যাপার, এই মনে করে আমাদের নানা অকাজ-কুকাজে ভরা জীবনযাত্রা ছিল অব্যাহত।

মনে আছে, সেদিন চোদ্দোই অগস্ট। সকালবেলায় আমাদের বাড়িতে এলেন আমার জ্যেঠতুতো দাদার বন্ধু ফজলুদা। ভ্রূ একটু কোঁচকানো, চিন্তিত মুখশ্রী। আমাকে ডেকে বললেন, ফ্ল্যাগ উঠাওনাই ক্যান? মাইনষে কওয়াকওয়ি করতাছে।

বাস্তবিকই, সেইটে আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা তোলারই কথা। কিন্তু বাড়ির বেশিরভাগই ভারতে চলে যাওয়ায় আমাদের বাড়ি থাকার মধ্যে আছেন বুড়ি ঠাকুমা আর একজন দাদা। তাঁরাও দেশ ভাগাভাগির দুশ্চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, পতাকা তোলার কথা খেয়াল করেননি।

আমি বললাম, আমাগো ফ্ল্যাগ তো নাই।

ফজলুদা আমাদের শুভানুধ্যায়ী। বললেন, আমি বাড়ি থিকা ফ্ল্যাগ পাঠাইয়া দিতাছি। বাঁশে বাইন্ধা তুইল্যা দিও।

ফজলুদা ফ্ল্যাগ পাঠিয়ে দিলেন। পাকিস্তানের সবুজ সাদা সেই পতাকা আমি সোৎসাহে বাঁশে বেঁধে তুলে দিলাম বাড়ির সামনে। পতাকার রং বা কোন দেশের পতাকা তাই নিয়ে কোনও বিচারবোধ কাজ করেনি তখন, সেই বয়সে।

শহর জুড়ে বোমা ফাটানো হচ্ছে, বাজি পুড়ছে। মহা শোরগোল, মহা আনন্দ। সেই উৎসবের শরিক হতে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাস্তবিক সেই উন্মাদনার বোধহয় তুলনা নেই।

সমস্ত শহরটাই যেন বেরিয়ে এসেছে পথে। স্বাধীনতার অর্থ কী তা হয়তো অনেকেই বোঝে না। শুধু বোঝে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য উৎসব করা যায়। গাইট্টা বোমের কানফাটানো আওয়াজ, পাকিস্তানের জয়ধ্বনি, কায়েদে আজমের ছবি নিয়ে মিছিল, আতর, গোলাপজলের ছড়াছড়ি, হাসি উল্লাসে সরগরম সেই দিনটি আজও ভোলার নয়। কিছু বুঝি না-বুঝি, আনন্দে উদ্বেল এক হৃদয় নিয়ে সেদিন সারা শহর হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। স্বাধীনতার অর্থ বোঝা গেল না কিছুই।

আজও বুঝিনি।

শুধু বুঝি এক বিশাল রূপময় ভূখণ্ড, যা ছিল আমার জন্মভূমি, আমার সমগ্র চেতনার ভিতরে প্রবহমানতা সঞ্চার করেছিল যে ব্রহ্মপুত্র নদ, রেলপোল, পগারপারের ঢেঁকীশাকের জঙ্গল, বন্ধুবান্ধব, সাঁতার, সাইকেল, সবই নাগালের বাইরে চলে গেল।

একটা ভূখণ্ডের জন্য সেই ভূখণ্ডের বসবাসকারীদের এই মায়া কেন তা যুক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বুঝে ওঠা যাবে না বুঝি। 'এই আমার দেশ' এইরকম একটা যুক্তিহীন আবেগই হয়তো দেশপ্রেমের বীজ। আসলে গোটা পৃথিবীটাই তো মানুষের দেশ। আজও প্রসারিত সংজ্ঞায় বলা যায়, আমাদের দেশ কি নয় এই গোটা ব্রহ্মাণ্ড? কিন্তু আমাদের অবুঝ আবেগ তার ছোট হাতে অত বিশালকে সাপটে ধরতে পারে না। তাই ভাগ করে নেয়, ছোট করে নেয়। যেমন বিস্কুট ভেঙে টুকরো করে তবে খাওয়া।

আমিও কোনও তেমন নির্বিকার লজিক্যাল মানুষ নই। তাই আজও ওই ভূখণ্ডের প্রতি আমার এক দুর্নিবার আকর্ষণ।

কিন্তু কেন, সেইটেই প্রশ্ন। কাবুলিওলাও নিজের দেশের জন্য কাঁদে। উষর এবং তত আকর্ষণীয় নয় এমন একটি ভূখণ্ড পেয়ে ইহুদিদের আবেগ কেন গগনস্পর্শী? কেন এতকাল দেশহীন তারা ছিল নিরানন্দ অনিকেত? কেন সামান্য একটু জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াই প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলের মধ্যে?

আবেগ! আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধিমান, যুক্তিশীল মানুষ সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই আবেগ বর্জন করবে। কিন্তু আপাতত ওই আবেগই আমাদের চালনা করে বিভিন্ন শিল্পে, নির্মাণে, জীবনের পাত্র উপচে পড়ে মাঝে মাঝে ওই আবেগেই সওয়ার হয়ে।

দেশ শুধু ভূগোল নয়, মানচিত্রও নয়, দেশ একটি কেমন ব্যাপার যেন। পূর্বপুরুষ, ঐতিহ্য, স্মৃতি, মায়া বা আর কিছু বা অনেক কিছুর মিশেল? কি করে যে ব্যাখ্যা করি।

কিন্তু বাঙালের মতো আমি আজও আমার ছেলেমেয়েকে শেখাই, তোমাদের দেশ কিন্তু কলকাতা নয়। তোমাদের দেশ ঢাকা, বিক্রমপুর।

ভাগ্যক্রমে তারাও তা অস্বীকার করে না। কিন্তু যে-দেশ আমার বাল্যকালেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমারই সত্তা থেকে, তাকে আপন করে নেওয়া ছেলেমেয়ের কাছে তো সহজ নয়।

এক-একদিন আমার ছেলে বা মেয়ে আমাদের কাছে দেশের কথা জানতে চায়। কী ছিল সেই দেশে? কী এমন ছিল যা আর কোথাও নেই?

ঠিক বোঝাতে পারি না। অনেক কথা বলি, কিন্তু তবু বুঝতে পারি আমার আবেগ ওদের তেমন গভীরে স্পর্শ করে না। তবে মেনে নেয়, হ্যাঁ, দেশ ছিল ঢাকা বিক্রমপুর। গ্রামের নাম বানিখাড়া। এক খ্রিস্টান কবি তাঁর এপিটাফে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, 'যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে জন্মভূমি...।' বুঝি সাহেব-হতে-চাওয়া ওই মনীষীরও রয়েছে এক মেদুরতা। আমি কোন ছার!

বাবার সঙ্গে শিলিগুড়ির বাজারে

প্রথম টেরিলিনের শার্ট পরা যে লোকটাকে দেখেছিলাম তাকে মনে হয়েছিল মহাকাশচারী বা গ্রহান্তের মানুষ। 'টেরিলিন' এই জাদু শব্দই তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তীব্র উন্মাদনা। টেরিলিন এক আজব বস্তু, ইস্তিরি লাগে না, ছেঁড়ে না, চিরস্থায়ী। দাম? সেও দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো, 'টেরিলিন' আবিষ্কারের বছরখানেক পরে বোধহয় জিনিসটা প্রথম চোখে দেখি এবং তারও বছরটাক বাদে সে-বস্তু ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়। কারণ আমি মফস্বলের ছেলে। নতুন যা কিছু চালু বা আবিষ্কার হয় তা কলকাতা ছুঁয়ে মফস্বলে পৌঁছোয় অনেক দেরিতে।

এই কলকাতা ও মফস্বলের পার্থক্য যে কতখানি তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কলকাতা যদি নিউ ইয়র্ক তো মফস্বল গোবিন্দপুর। সারা শরীরের রক্ত মুখে সঞ্চারিত হলে কী হয় এক বিখ্যাত লেখক সেই উপমা প্রয়োগ করেছিলেন। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলের তফাৎ হল সেই পর্যায়ের। নোংরা গান্ধা, ভিড়াক্কার, বিশৃংখল যত দোষই কলকাতার থাকুক তবু এ শহরটাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। শিল্প, সংস্কৃতি, জীবিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর চাবিকাঠি আঁচলে বেঁধে বসে আছে কলকাতা। কলকাতা বাঙালির ঈশ্বরী, কলকাতা বাঙালির নিয়তি।

আজও কলকাতার ফ্যাশন মফস্বলে পৌঁছোয় হাঁটিহাঁটি করে। সে যুগে অবস্থা আরো খারাপ ছিল।

সে যাই হোক, বলেছিলাম টেরিলিনের কথা, কিংবা ঠিক টেরিলিনের কথাও নয়, 'টেরিলিন' নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের কথা। বিস্ময় খুবই স্বাভাবিক। আমরা ছিটের জামা ছাড়া আর কিছুই তেমন চোখেই দেখেনি। যখন ইস্কুলের প্রথম পাঠ নিচ্ছি তখন আমাকে কে যেন একটা আলপাকার কোট দিয়েছিল। সবুজ

ও সোনালি সুতোর ভারি জমকালো সেই কোট আমি লজ্জায় পরতাম না। কারণ ঠিক ওরকম জমকালো সাজে তখনকার আমার বয়সী কোনো ছেলে সাজত না। আলপাকার কোটটা পরলে সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাত।

আমার শৈশব যে খুব দূরবর্তী কিছু তা তো নয়। তবু আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর যে চেহারা ছিল তার বড় বেশি দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পৃথিবীর পরিবর্তনের গতিতে উল্কার বেগ। পরিবর্তনের এই দ্রুতগতির জন্যই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার জীবনটাকে এক অতীত ইতিহাসের ধূসর অধ্যায় বলে মনে হয়। গ্রাম দেশে তখনও আমার বয়সী শিশুরা ধুতি আর পিরান পরে। আমরা আধা শহুরে শিশুরা পরি হাফ পেণ্টুল। আজকাল কোনো বয়স্ক মানুষ হাফ প্যাণ্ট পরে অফিসে যায় না। সে আমলে আকছার যেত। গরম দেশের পক্ষে হাফ প্যাণ্ট কিছু খারাপ কিছু জিনিসও নয়।

সেই প্যাণ্ট এবং শার্ট ছিল আমাদের অভ্যস্ত পোশাক। কিন্তু তাও সংখ্যায় খুব বেশি থাকত না। দুটি-তিনটি প্যাণ্ট এবং দু'টি তিনটি শার্ট। আজকাল বাচ্চাদের জামা প্যাণ্টের বৈচিত্র্য ও এক্সক্লুসিভনেস দেখলে মাথা ঘুরে যায়। শুধু বাচ্চাদের পোশাকেরই আলাদা দোকান বা বাজারও কলকাতায় তৈরি হয়েছে। একটা বাচ্চার মোটামুটি ভালো একটা পোশাকের দাম দুশো থেকে চারশো টাকা শুনলে আমরা আর ভড়কাই না, চমকাইও না। কিন্তু তখন বারো আনা গজের জামাকাপড় আর পাঁচ সিকে গজের প্যাণ্টের কাপড়কেই শিরোধার্য করেছি। এখনকার বাচ্চারা যেমন এক পুজোয় চার পাঁচ সেট পোশাক পায় আমরা তেমনটি ভাবতেও পারতাম না। আমাদের ছিল এক জামা এক প্যাণ্ট।

বর্ষার জলভারাক্রান্ত মেঘ ছিঁড়তে লাগল। আস্তে আস্তে ছিন্নমেঘের ক্ষণবর্ষণও অবসিত হয়ে এল। দেখা গেল আকাশের ধোয়ামোছা নীল মুখখানি। সকালে শিউলির গা-শিউরানো গন্ধে আর বাতাসের হিমের ছোঁয়ায় মন আনচান করতে থাকে। আগমনী গান শোনা যায় পথে ঘাটে, পৃথিবীটা কেমন যেন গভীর, গভীরতর এক রূপের খনি হয়ে ওঠে।

সেই সময়েই শুরু হত পুজোর আশ্চর্য সব কেনাকাটা।

প্রথম পথম জ্যাঠামশাই মস্ত একটা গাঁট এনে ফেলতেন, তাতে থান থান কাপড়, শাড়ি। ছোটদের জন্য একই ছিটের ঢালা ব্যবস্থা, বাছাবাছি নেই। তাতেই কী আনন্দ! পরে একটু বড় হয়ে দোকানে যেতে পেরেছি বড়দের সঙ্গে। তবে দোকানে গিয়েও যে নিজে পছন্দ করব তার উপায় ছিল না। বাচ্চাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার রেওয়াজ তখন চালু হয়নি।

মফস্বলের একটা সুবিধে হচ্ছে এখানে দোকানগুলো কলকাতার মতো এত নৈর্ব্যক্তিক নয়। সবই প্রায় চেনা দোকান। রয়ে বসে পাঁচটা সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে কেনাকাটা চলত। ফাঁকে ফাঁকে দর কষাকষি। আমরা হাই তুলতাম।

আজও মনে পড়ে, জুতো কেনার যত আনন্দ তত বুঝি আর কিছুতেই নয়। জুতো মানেই বিশেষ এক কোম্পানির বিশেষ একটি জুতো, নটি বয়। অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন, নটি বয়ের মতো দুষ্টু জুতো আর হয় না। অতিরিক্ত টিকত বলে আমরা ব্লেড দিয়ে সোল কেটে ফেলতাম। বারবার সেই নটি বয় জুতোই কেনা হত বটে, তবু জুতো কেনার শিহরণ ছিল আলাদা রকমের। সেই জুতো অন্তত পনেরো দিন বালিশের পাশে বাক্স সমেত নিয়ে ঘুমোতে যেতাম। পায়ে দিয়ে হাঁটতাম বিছানার ওপর পাছে ধুলো লাগে। তারপর নতুন জুতোয় বিস্ময় কমে গেলে তা ঘরের কোণে ফেলে রেখে ইস্কুলে যেতাম খালি পায়ে। খালি পা—তখন খালি পা-ই ছিল স্বাভাবিক।

দোকানে দোকানে আজকাল চারদিক ছেয়ে গেছে। কি কলকাতা কি মফস্বলে যে কোনো বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই দুধারে নিশ্ছিদ্র দোকান চোখে পড়বে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, এত দোকান? কেনে কে?

বাস্তবিক বাল্যকালে আমরা এত দোকান দেখিনি। তখন না ছিল দোকানের এত জাঁকজমক বা আলোর বাহার। এখন দোকানে আর যেতে হয় না, দোকানই যেন ঘরে ঢুকে বসে প্রায়। তখন কিন্তু দোকান আর বসতবাড়ির মধ্যে একটু ফাঁক থাকত। একটু দূরত্ব। দোকানে যাওয়া ছিল একটা ঘটনার মতো। বিশেষ করে মফস্বলে। হ্যাজাক বা ঝোলানো সেজবাতির আলোয় সন্ধ্যের পর কেনাকাটা হত। ভিড় ছিল না বললেই চলে। মানুষ এত উন্মত্ত হয়ে কিনতে ছুটত না তখন। কেনাকাটা ছিল সীমিত, পরিমিত, প্রয়োজনমাফিক।

মেয়েদের কথাই ধরা যাক। দোকানে গিয়ে মেয়েরা শাড়ি পছন্দ করে কিনছে এ দৃশ্য আমাদের বাল্যকালে ছিল বিরল। শাড়ির গাঁট নিয়ে আসত ফেরিঅলা, ঠাকুমা এবং বয়স্করা পছন্দ করে কিনতেন সকলের জন্য। মোটামুটি ভালো তাঁতের শাড়ি। যতদূর মনে পড়ে তখন বছর বছর শাড়ির ডিজাইনে বিপ্লব আসত না। আর্টিস্টদের ডাকা হত না ডিজাইনের জন্য। পিওর সিল্ক, বিষ্ণুপুরী, মুর্শিদাবাদী, কাঞ্চিপুরম, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, এসব নামই খুব একটা উচ্চারিত হতে শুনিনি। এখন মেয়েরাই দোকানে সবচেয়ে ভিড় করে। তাদের জন্যই শাড়ির ডিজাইনে বিপ্লব আনতে হিমসিম খাচ্ছে ডিজাইনাররা। তিনশো-চারশো থেকে হাজার-দু'হাজার টাকা দামের শাড়ি আজকাল হাসতে হাসতে বিকোয়। মনে আছে, ছেলেবেলায় কাটিহারে কোন এক মহিলা একশো টাকা দামের শাড়ি কিনেছিল বলে মহিলামহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অথচ সে যে খুব প্রাচীনকালের কথা তা নয়।

গত বছরও উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে পুজোর বাজার করতে করতে বেরিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। শিলিগুড়ির চেহারায় এখন নির্ভুল কলকাতার ছাপ। জমজম করছে শহর, ঝলমল করছে দোকান। শহরে পয়সা উড়ছে। অথচ চল্লিশ দশকে এই শিলিগুড়ি ছিল নির্জন ঘুমন্ত এক গঞ্জ মাত্র। চারদিকে জঙ্গল, বাঘ, হাতি। পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের গোড়ায় শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বাড়লেও শহর তেমন জমজমাট ছিল না। মহানন্দার ধারে দিনেদুপুরে খুনখারাপি হত। এখন শিলিগুড়ির গুরুত্ব হাজার গুণ বেড়েছে। আসাম, সিকিম, ভূটান, নেপালের সঙ্গে গোটা ভারতের যোগাযোগকেন্দ্র, সামরিক ছাউনি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য বহু দিক দিয়েই এই শহরের অপরিসীম গুরুত্ব। তাই ধাঁ করে এই শহর সব শহরকে ছাড়িয়ে এখন কলকাতার সঙ্গে পাল্লা টানছে। ফ্যাশানও। কলকাতায় চালু হওয়ার আগেই শিলিগুড়িতে চালু হয়ে যায় নতুন নতুন ফ্যাশান। বাবার সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে এই ফ্যাশনের ধাঁধায় পড়ে গিয়ে দুজনেই কিছু অপ্রস্তুত। দোকানে ঢুকে বাবা তাঁর নাতি-নাতনীর জন্য পোশাক কেনেন, মেয়ে ও বউমাদের জন্য শাড়ি। মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্যেস করেন, এটা কেমন, ওটা কেমন? আমি অভ্যাসবশে বলছি, ভালোই তো। বেশ তো। আসলে সেই কৈশোরের অভ্যাস। বাবা বা গুরুজনেরাই জিনিসপত্র পছন্দ করেন, কেনেন, আমরা মতামত দিই না, দিয়ে অভ্যাস নেই। মধ্যবয়সেও মনে হয়, বাবাই তো পছন্দ করছেন আমার চিন্তা কী?

আজ আমিও তো ছেলেমেয়ের বাবা, সংসারের অন্যতম কাণ্ডারী, রোজগেরে। তবু বাবার পাশে পাশে এ দোকানে-ও দোকান ঘুরে কেনাকাটা করতে করতে কখন যে সেই শৈশব ফিরে আসে তা বুঝতে পারি না।

শৈশব বোধহয় মানুষকে আমৃত্যু ছাড়ে না। আর ছাড়ে না বলেই বোধহয় মাঝে মাঝে বেঁচে থাকতে এত ভালো লাগে।

ঠাকুর দেখা

মৃন্ময়ীই যে চিন্ময়ী তা বিশ্বাস করতে শিশুকালে কোনো কষ্ট হত না। শাস্ত্র ঘাটতে হয়নি, তর্কের প্রয়োজন পড়েনি, আমারা দশমীর দিন দুর্গার চোখে জল দেখতে পেতাম। মহিলা-মহলে কান্নাকাটির ধুম পড়ে যেত; মৃন্ময়ীকে সিঁদুর পরানো হচ্ছে, মুখে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে সন্দেশ। পানও। সেই প্রথা এখনো বলবৎ। ছোটো ছেলেমেয়েরা আজও দশমীর দিন প্রতিমার চোখে জল দেখতে পায়।

আমি পাই না। দুর্ভাগ্য আমারই।

একটা সময় ছিল, মাইলের পর মাইল হেঁটে হঠকারিতায় প্রতিমা দেখে বেড়াতে ক্লান্তি ছিল না। সে এক উদ্দণ্ড প্রতিযোগিতার যুগ। এত বহুসংখ্যক পুজো হত না বলে একটা মণ্ডপ থেকে আর একটা মণ্ডপের দূরত্ব ছিল অনেক। গোটা পাঁচ-সাত প্রতিমা দেখতে কয়েক মাইল হাঁটতে হত। কিন্তু ক্লান্তি লাগত না। ঢাকের গুমগুমাগুম শব্দের মধ্যে এমন এক "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" প্রেরণা থাকত যে রক্ত নেচে উঠত। আর ছিল বন্ধুদের মধ্যে কে ক'টা দেখেছে তার প্রতিযোগিতা।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে মণ্ডপসজ্জা এখনকার মতো দেখনসই ছিল না। মফস্বল শহরে বিজলি বাতির অভাব ছিল। তাই হ্যাজাক ভরসা। আজকের তুলনায় সে কত-না দীন আয়োজন! কিন্তু তখন অভ্যন্তর ছিল আনন্দমুখী, গ্রহণপটু, স্বল্পেই অনেক পাওয়ার বোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। হ্যাজাক বা বিজলিতে ছিল সমদৃষ্টি।

গত বছরেও গড়িয়াহাটার কাছে সেই বিখ্যাত পুজোমণ্ডপে গিয়েছিলাম। খুব অভিজাত পাড়ার এই রুচিবান পুজোর মণ্ডপটিতে ঢুকলে মনে হয়, কোনো বড়লোকের ড্রয়িংরুম। ওপরে ঝাড়লণ্ঠন, চারদিকে ভেলভেট বা ওইরকম কোনো মহার্ঘ জিনিসের পরদা। তলায় কার্পেট। মূর্তি বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি করা। তাতে উঁচু জাতের ভাস্কর্যের শিল্পসুষমা। ঢাক বা মধ্যবিত্ত লাউডস্পিকারে হিন্দী গান-টান নেই। বদলে স্টিরিওতে রবিশঙ্করের মিহি সেতারের গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে সিলিং ফ্যানে ঘূর্ণিত ফিসফিসে বাতাসে। গায়ে গায়ে দারুণ সব সুন্দরী মহিলা ও অভিজাত পুরুষ দাঁড়িয়ে, যাঁদের নৈকট্যে সাধারণ মানুষ নিজেকে নিয়ে ভারি হীনম্মন্যতায় ভোগে। সুগন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। বিদেশী পারফিউম, ধূপকাঠি, গুগগুল ও চন্দনের গুঁড়ো মেশানো ধূপের ধোঁয়া। পুরোহিত কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকই হবেন বোধহয়। নির্ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ছেন। মণ্ডপের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত নাচানাচি হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি বা চেঁচামেচি করছে না। ধীর সুস্থির ভদ্র ও সংযত তাদের আচরণ। ইংরিজিতে কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে।

এই মণ্ডপটিতে দাঁড়িয়ে আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে, এটি বাংলায় বাঙালির দ্বারা বাঙালির পুজো। মনে হচ্ছিল যেন, লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে ব্যাপারটা ঘটছে।

একসময়ে খুব নামডাক ছিল ফায়ার ব্রিগেডের দুর্গোৎসবের। সে এক মারণযজ্ঞ। রাজ্যের যে শহরেই ফায়ার ব্রিগেডের পুজো হত সে শহরের সেটাই হয়ে উঠত সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে জাঁকালো, সর্বাধিক জনপ্রিয়। কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে একবার—মাত্র একবারই আমি ফায়ার ব্রিগেডের পুজো দেখতে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে আছে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে চটি হারিয়ে চশমার ডাঁটি ভেঙেও শেষ পর্যন্ত আমি মণ্ডপের সিকি কিলোমিটারের মধ্যেও পৌঁছোতে পারিনি। কিন্তু অনেক অধ্যবসায়ী ধৈর্যশীলা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহিলাকে কোলে ন'মাসের বাচ্চা নিয়েও সেই মহামানবের উদ্বেল তরঙ্গ পেরিয়ে দেবীদর্শন করে আসতে দেখেছি। এঁরা পারেনও।

নবীন পাল লেনের এক অ-সম্ভ্রান্ত বোর্ডিং-এ একতলার এঁদো ঘরে কয়েক বছর আয়ু বিসর্জন দিতে হয়েছিল। নবমীর সারা রাত ঘুমোতে পারতাম না। শিয়রে জানলা, জানলা ঘেঁষে রাস্তা। সারারাত অবিরল দলবদ্ধ পদশব্দ। ক্লান্ত পা, উদ্দীপনাময় পা, নিদ্রাতুর পা। কিন্তু চলেছে। অবিরল চলেছে। সারারাত খোলা তেলেভাজার দোকান। পুজোর ফুটপাথ জুড়ে বসেছে চপ কাটলেট ওমলেটের ফলাও প্রদর্শনী, রাত দুটোয়, তিনটেয়, চারটেয় কোনো সময়েই খদ্দেরের কামাই নেই। মধ্য কলকাতা নবমীর সারারাত তীব্রভাবে জেগে থাকে। জেগে থাকে বুড়ো, বাচ্চা, যুবক-যুবতী। প্রত্যেকের মুখে উদ্ভ্রান্ত আনন্দ, অস্থির উদ্দীপনা, নিদ্রাহীনতার কিছু ক্লান্তি।

আমার বাবার বয়স সত্তরের ওপর। বিশ শতকের প্রথম দিককার মানুষ। এখনো পুজোর চারটে দিন তাঁর উৎসাহ দেখার মতো। লম্বা লম্বা পা ফেলে, হাতে টর্চবাতি এবং লাঠি নিয়ে সন্ধের মুখেই বেরিয়ে পড়েন। রাত দশটা অবধি মণ্ডপে মণ্ডপে অবিরাম চক্কর দিয়ে যখন ফেরেন তখন তাঁকে মোটেই ক্লান্ত মনে হয় না। ফিরে এসেই এক কাপ চা নিয়ে বসে যান বিভিন্ন মণ্ডপের সাজসজ্জা এবং প্রতিমার বর্ণনা করতে।

এই প্রাণশক্তি আমার মধ্যে খুঁজে পাই না। তবে আমার পরিবারেও নব্য অতিথিরা এসেছে। রক্তের দোসর। তাদের আবদার তো ঠেলতে পারি না। বিপুল কৌতূহল তাদের, চোখে এখনো রহস্য ও রূপের অগাধ তৃষ্ণা। তাদের নিয়ে বেরোই। ভিড় এড়িয়ে, বাজির আগুন থেকে বাঁচিয়ে সাবধানে ঠাকুর দেখাই। মণ্ডপে মণ্ডপে শিশুদের বিপুল মেলা। আলো। বাজনা। গান। তারা অপার বিস্ময়ে দেখে। বড় ইচ্ছে করে ওদের আনন্দ ও বিস্ময়ে একটু ভাগ নিতে। কিন্তু ভিতরে যে মরা নদী, তার শুকনো খাতে কিছুতেই আর ঢল নামে না যে!

পুজোর চারদিন বড় ইচ্ছে করে কর্মব্যস্ত জীবনের দুর্লভ অবকাশে অ-পঠিত কিছু বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে। দুম দাম পটকা ফাটছে চারদিকে, অবিরাম বাজছে লাউডস্পিকারের গান, তার মধ্যেই এক স্তব্ধ জগতের ভিতর বুঁদ হয়ে যাবো। কিন্তু তাও ঘটে ওঠে না প্রায়ই। বকেয়া বহু কাজ জমে থাকে হাতে, আসেন অতিথিরা, যেতে হয় সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে। চারটে তো মোটে দিন। ফুরিয়ে যায়।

মণ্ডপে মণ্ডপে স্থাবর প্রতিমা তবু অনিচ্ছুক, উৎসাহহীন আমার চোখের সামনে ভেসে যায়। জানি খড়ের কাঠামো, ওপরে মাটি, তাতে রঙের চাপান। আদ্যন্ত পুতুল। সেই শৈশব থেকেই জানি, যখন মৃৎশিল্পীর কাঁধের ওপর দিয়ে জুলজুলে চোখে দেখতাম প্রতিমার নির্মাণ। কিন্তু তবু শৈশবে জানতাম, ষষ্ঠী পুজোর দিন ওই প্রতিমার প্রাণসঞ্চার হয়। চোখে শেষ তুলির টান টানেন শিল্পী। দেবীর বোধন হয়। অমনি মৃন্ময়ী হয়ে ওঠেন চিন্ময়ী।

আজ কল্পনার রাশ ততদূর বল্গাহীন নয়। তবু প্রতিমাকে ঘিরে যে প্রাণপ্রাচুর্যের পাত্র উপছে পড়ে সেও একরকম প্রাণ সঞ্চার। মণ্ডপে আমি কদাচিৎ যাই। কিন্তু পুজো শেষ হলে, বিসর্জনের পর শূন্য মণ্ডপ, হাঁ-হাঁ করা বেদী দেখলেই বুকটা মোচড় দেয় আজও। কী যেন নেই। কী যেন হারিয়ে ফেলেছি।